তেরশ' পঞ্চাশ

গোপাল হালদার

পুথিঘর
২২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ—জানুয়ারী, ১৯৪৫

দ্বিতীয় প্রকাশ—মে, ১৯৪৬

মূল্য সাড়ে চার টাকা

৪৭, মধু রায় লেন, কলিকাতা পপুলার প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে যামিনী মোহন ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত ও ২২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, পুথিঘরের পক্ষ হইতে সুবোধ চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত।

পরম পূজনীয়

শ্রীযুক্ত প্রমোদাকান্ত হালদার

শ্রীচরণকমলেষু—

২৮শে পৌষ, ১৩৫১

কলিকাতা

লেখকের কথা

'১৩৫০'র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল। প্রায় আট-দশ মাস প্রথম সংস্করণ শেষ হয়ে গিয়েছে ; আশাতীত রকমের তাড়াতাড়ি তা ফুরোয়। কিন্তু ছাপার গোলযোগে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশে দেরী হল।

এ গ্রন্থ মন্বন্তরের কথাচিত্র। সে চিত্র তিন পর্বে। প্রথম পর্ব 'পঞ্চাশের পথ' (এক বৎসর পূর্বে তার প্রথম সংস্করণ শেষ হয়েছে। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হতে আরও মাসখানেক লাগ্‌তে পারে) ; দ্বিতীয় পর্ব 'উনপঞ্চাশী' ; আর এই তৃতীয় পর্ব 'তেরশ পঞ্চাশ'—সামান্য পরিবর্তিত করে এখন তা আবার প্রকাশিত হল।

এই তিন পর্বে আমি চেষ্টা করেছি ডকুমেণ্টারি উপন্যাসের ধরনে উপন্যাস লিখ্‌তে। প্রত্যেক খণ্ডেই এক-একটি 'লেখকের কথায়' আমি যা বলেছি, সম্ভবত এখনো তা পাঠকের জানা থাকা দরকার। এখানে এখণ্ডের প্রথম সংস্করণের সেই লেখকের কথার সারাংশ তাই উল্লেখিত হল :

প্রথমত, প্রত্যেক খণ্ডই পরস্পর সম্পর্কিত ; তবে প্রত্যেক খণ্ডেই এক-একটি পর্য্যন্ত হয়েছে,—ইতিহাসের দিক থেকেও, কাহিনীর দিক থেকেও। দ্বিতীয়ত, আমি একে সমসাময়িক কালের ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসাবে উপস্থিত করেছি। চরিত্রসমূহ যদিও ঐতিহাসিক নয়, ঘটনা বিকৃত হতে দিই নি। তৃতীয়ত, আমি এই ঘটনাবলী উপস্থিত করেছি একজন সাধারণ শিক্ষিত বাঙালীর দৃষ্টিপথ থেকে, দেখতে চেয়েছি এই ঘাত-প্রতিঘাতে তার সম্ভাবনীয় পরিণতি। চিত্রের সে কেন্দ্র নয় ; সমসাময়িক কালের সে সহজ ও সক্রিয় সাক্ষী।

সমসাময়িক এই ইতিহাসের সব চেয়ে বড় সত্য অবশ্য রাষ্ট্রনীতি। আলাপ-আলোচনায়, কাজে-কর্মে, প্রতিদিন আমরাও তা বুঝে না বুঝে

স্বীকার করি। কিন্তু উপন্যাসে আমাদের দেশে খুঁজি রাজনীতি-বর্জিত গল্প। আমার বিচারে সেরূপ গল্প একদিক থেকে সত্য, তবে তা অসম্পূর্ণ; আর নিশ্চয়ই সমসাময়িক ইতিহাসের দৃষ্টিতে তা অনেকাংশে অবাস্তব। মন্বন্তরের কথায় ও চিত্রে অন্তত আমি তেমন কালাতীত কাহিনী বলতে চাই নি; জেনে বুঝেই প্রাধান্য দিয়েছি রাষ্ট্রনীতিক অবস্থা ও আলোচনাকে কর্মী ও মানুষের কথা ও চরিত্রকে। এ পরীক্ষা পশ্চিমে মালরো বা ষ্টাইন্‌বেকের হাতে সার্থক হয়েছে, আমাদের দেশেও সার্থক না হবার কারণ নেই। আমার চেষ্টা ব্যর্থ হলেও জানি—শক্তিমান্ লেখক প্রস্তুত হচ্ছেন, আর এ দেশের পাঠকও তাই প্রস্তুত হয়ে উঠবেন।

২৭শে মে, '৪৬
কলিকাতা

গোপাল হালদার

চরিত্র-পরিচয়

বিনয়	...	বর্মা প্রত্যাগত ডাক্তার
হেনা	...	বিনয়ের বোন, কলকাতার অধিবাসী
শচীপ্রসাদ চৌধুরী	...	বিনয়ের ভগ্নীপতি, কলকারখানার মালিক।
উষা	...	বিনয়ের মামাত বোন।
শৌরীন	...	উষার স্বামী, অর্থনীতিতে বিশেষজ্ঞ, সম্পাদক।
মুরারি সেন	...	বাঙালী কলকারখানার মালিক।
মীর শাহেদুদ্দীন	...	পুরাতন কংগ্রেসম্যান, সোনাপুর।
মীর জাহেদুদ্দীন	...	ঐ ভাই, লীগের এম-এল-এ।
অমিত	...	কলকাতার রাজনৈতিক কর্মী।
সুধা গুপ্তা	...	ঐ মেয়ে কর্মী।
প্রমথ মজিদ শিবুদা'	}	রাজনীতিক কর্মী, সোনাপুর।
বীরু সেন	...	পুরাতন রাজনীতিক কর্মী, বর্তমানে কণ্ট্রাক্টার।
বেণু	...	বীরুর স্ত্রী।
রেণু	...	ঐ বিধবা শালী।
সীতা রায়	...	সোনাপুরের মেয়ে টিচার।
গীতা রায়	...	কলকাতার ছাত্রী, সীতার বোন।
রাজেন্দ্র বাঁড়ুজ্জে প্রভাত চৌধুরী	}	সোনাপুরের ইস্কুল মাষ্টার।

চরিত্র-পরিচয়

যশোদা চৌধুরী ইদ্রিস মিঞা প্রমোদ চৌধুরী	সোনাপুরের মিলিটারি কণ্ট্রাক্টার।
মিঃ নির্মল দাশগুপ্ত জে, পি, মিত্র ব্যানার্জি সামেদ ইত্যাদি	সোনাপুরের সরকারী চাকুরে।
সুরেশ দত্ত যাদববাবু বরদাবাবু প্রভৃতি	সোনাপুরের কংগ্রেসের নেতা।
বৈকুণ্ঠবাবু ...	সোনাপুরে হিন্দু নেতা।
কেশব চক্রবর্তী ...	সোনাপুরে বিনয়ের প্রতিবেশী।
টুনির মা (মাসী মা) ...	কেশব চক্রবর্তীর স্ত্রী।
মুকুন্দ পাল সুরেন্ চৌধুরী	ব্যবসায়ী।
হাফেজ মহম্মদ কাজী ইব্রাহিম খাঁ বাহাদুর প্রভৃতি	লীগের নেতা।

১

বিনয় সোনাপুরে ফিরে এল।

বিনয় বুঝে নিয়েছিল—জীবনের একটা পর্ব তার শেষ হয়ে যাচ্ছে।—সুধার সঙ্গে তার জীবন আর সে জড়াতে চাইবে না, অমিতের কাছ থেকেও আর বিনয় দাবী করবে না সস্নেহ প্রীতি। তার জীবন অনেক পাকে জড়িয়ে গেছে ওদের সঙ্গে এই এক বৎসরে। এক বৎসরই বা কই? ক'মাস তো মাত্র,—জাপানীরা বর্মা দখল করতে লাগল, শত শত ভারতবাসীর মত বিনয়ও এল তার অপরিচিতা মাতৃভূমিতে। এই অপরিচিতের পৃথিবীতে যাদের পরিচয় সে নানা কাজের মধ্য দিয়ে পেল, তাদেরই সঙ্গে তার জীবনও জড়িয়ে গেছে।

পথে পথে বিনয়ের মনে পড়েছে সর্বক্ষণ সুধার সেই পরমাশ্চর্য বড় বড় চোখ দুটি। কত সহজ আনন্দে মনে হয়েছিল সেদিন সুধা বিনয়কে স্বীকার করে নিলে। মাত্র সাত দিন পূর্বে,—ডিসেম্বরের সেই সকালবেলা,—হাতে হাত রেখে এই সুধা সেই কলকাতা শহরের পথের উপর অকুণ্ঠিত মনে মেনে নিয়েছিল বিনয়ের দাবী, স্বীকার করেছিল বিনয়ের ভালোবাসা। আর সাত দিন যেতে-না-যেতে সেই সুধা শুষ্ক কণ্ঠে উদাসীন চোখে বললে, 'সময় নেই, বিনয়, ঢের কাজ সামনে। যাচ্ছি আমি।' সে চোখে সেই কৌতুকোজ্জ্বল হাসি নেই, আছে এক উত্তেজনায় ক্লান্ত অসহিষ্ণুতা।

অমিত—বিনয়ের 'অমিদা'—সেও বললে, 'একটা বৃহৎ সত্যের সামনে আজ আমরা। অনেক কাজ এখন, বিনয়, আসি তবে।' মাত্র সাত দিন

পূর্বে অমিত কেমন আনন্দে পরিহাসমুখর হয়ে উঠেছিল বিনয়কে পাণিপ্রার্থী জেনে। আর সাত দিন যেতে-না-যেতে সেই মুখেই বিনয় কি কঠিন স্থির অকম্পিত নির্লিপ্ততা! 'অনেক কাজ এখন, বিনয়; তু যাও—রাত হচ্ছে।'—সে মুখ যেন বন্ধুর মুখ নয়—কোন্ অ বিদেশীর।

মাত্র সাত দিন। সে রাত্রিতে সাইরেন্ বাজল, বোমা পড়ল, কা নাম্‌ল মৃত্যুর ত্রাস, প্রাণভীত পশুর মত অসহায় জনতা কলকাতা ছে দিকে ছুটল। আর সুধা ও অমিতের জীবনগতি যেন উল্‌টে গেল। সঙ্গে তাদের কথা বল্‌বারও সময় নেই। বিনয়ের ভালোবাসা, না কিছুই তখন তারা শুন্‌তে চায় না; অনেক কাজ তাদের। 'কল রেঙ্গুন হতে দোব না'—সেই এক কথা; আর—'অনেক কাজ সাম্‌নে কাজ, কাজ, কাজ—যেন বিনয় কাজ চেনে না।

রেঙ্গুনেরই লোক ডাক্তার মজুমদার। দেখেছে সে এক বৎ রেঙ্গুনের এমনিতর সেই মৃত্যুপরীক্ষা, দেখেছে সেই প্রতারণা, অ কর্তৃপক্ষের; অসহায় দুর্ভাগা তার স্বদেশবাসীদের দুর্গতি। কলকাতাকে রেঙ্গুন হতে দেবে না। সে বলেছিল, তার দরিদ্র স্বদেশবাসী... সমাধিক্ষেত্র হবে এই শহর—এখনও তারা শহর ত্যাগ না করলে।

ঈষৎ ব্যঙ্গ ছিল ঠোঁটের আগায় ও দৃষ্টিতে সুহৃদ্ রায়ের যখন সে উত্তর দিয়েছিল সুধার পার্শ্বে দাঁড়িয়ে, এ তো ডিফিটিজম্, পরাজয়বাদিতা।—এ বিনয়ের পরাজয়বাদিতা, বললে সুহৃদ রায়।

পরাজয়বাদিতা? বিনয় সুহৃদ রায়কে চেনে না। কিন্তু বিনয় তার কথার উত্তর দিতে জানে। সে উত্তর পড়তে পারবে সুধা, পড়তে পারবে অমিতা'। সেকথা সুহৃদ রায় জানবে কি না জানবে তাতে বিনয়ের যায় আসে না কিন্তু সুধা ও অমিত দেখবে বিনয় তার স্বদেশকে ভালোবাসতে জানে।

এমনি দিনে বিনয় পেল সীতার চিঠি সোনাপুর থেকে লেখা। সীতা

জানতে চেয়েছে বিনয়ের খবর ; জানিয়েছে তার নিজের খবর, ইস্কুলের খবর, আর জানিয়েছে সোনাপুরের মানুষের দুর্দশার কথা—মানুষ খেতে পায় না, পরতে পায় না : ইস্কুল-কলেজ বোধহয় বন্ধ হয়ে যায়। ভুখমিছিলও শুরু হয়েছে। শহরের গরীব লোকে বলে, 'ডাক্তার সাহেব গেলেন কই ?' 'আসবেন না, ডাক্তার দা' ? জিজ্ঞাসা করছে সীতা এসব জানিয়ে।

সীতা লিখেছে, 'আসবেন না ?'

সোনাপুরে ফিরে এসেছে বিনয়। সুধা ও অমিতের সঙ্গে দেখাও করে নি, করবার প্রয়োজনও বোঝে নি। পথে তবু বার বার নিজেকে জিজ্ঞাসা করছিল, একটা চিঠি লিখে বল্‌বে কি একবার—কিন্তু কি বলবে ?

প্রমথ খবর পেয়ে সকাল বেলাই হাজির হল।

প্রমথকে দেখে বিনয় খুশী হতে পারল না। তার মনে পড়ল সুধাদের প্রধান কর্মী সোনাপুরে এই প্রমথ তাই বিনয় তার সঙ্গে আর ঘনিষ্ঠতা কামনা করে না। প্রমথ কর্মী মানুষ ;—তা হোক্ তাদের সঙ্গে বিনয়ের আন্তরিক যোগ আর সম্ভব নয়। অবশ্য প্রমথ সীতার সঙ্গেও সুপরিচিত। হয়ত বা সে সীতার সঙ্গে অধিকতর পরিচয় কামনা করে। বিনয়ের এইরূপই কি মনে হয়েছে যখন পনর দিন আগে সে কলকাতা রওনা হয়। প্রমথ তার কলকাতা যাওয়াতে আপত্তি করে নি। মজিদ আপত্তি করছিল ভুখমিছিলের নামে। আর সীতা আপত্তি করেছিল বিনা কারণে, 'না, ডাক্তার দা, আপনি এখান থেকে গেলে চল্‌বে না।' প্রমথকে সে বল্‌ছিল, ওকে ছাড়ছেন কেন ? প্রমথের দায়িত্বজ্ঞান আছে, বললে, কলকাতায় ওঁকে দরকার, আমরা কি করে বলি—'না'।

সীতার আগ্রহ ছিল—ব্যক্তিগত। আর প্রমথর আগ্রহহীনতা—তাও কি ব্যক্তিগত নয় ?

বিনয়ের অন্তত তাই মনে হয়েছিল সেদিন। আর তাই সে মনে মনে তখন হেসেছে—প্রমথ কেমন করে নিজেকেই প্রতারণা করছে।

প্রমথকে দেখে বিনয়ের মনে পড়ল এ সব কথা। সে খুশী হতে পারল না। বিনয় বুঝল, এখনি নানা সূত্রে প্রমথ জানাবে বিনয়ের এখানে ফিরে আসা ঠিক হয়নি। বিশেষত সীতার আহ্বানেই বিনয় ফিরে এসেছে জানলে প্রমথ আরও ক্ষুব্ধ হবে।

কিন্তু দেখা হতেই প্রমথ বললে, এসে গেছেন? বাঁচালেন যা হোক্। ভাবি নি কিন্তু এত তাড়াতাড়ি তার পাবেন, আর এসে যাবেন এত শীগগির।

বিনয় একটু চমকিত হল, বুঝলে প্রমথ তার করেছিল। বিনয় তা জানে না। বিনয় সে তার পায়নি, পাবার কথাও নয়। কলকাতায় তার এখন পৌঁছয় ডাকের চিঠিরও পরে। ডাকঘরে জমে আছে সব তার। বিনয় তাই আগে জেনে নিতে চাইল কোথায় প্রমথ তার করেছিল আর কেনই বা তার করেছিল। জিজ্ঞাসা করলে, কিন্তু এত কি দরকার পড়েছে এখানে বলুন তো?

দরকার নয়? মানুষ যে মরছে! সব বিশৃঙ্খল চারদিকে, চা'ল টাকায় তিন সের। মজিদ তখনি বলেছিল তার করতে যখন কেরোসিন বিলি নিয়ে গোলমাল হ'ল। আমি ভাবলাম, কি জানি কলকাতায় বোমা পড়ছে, যদি বা সেখানে আপনাকে দিয়ে কাজ হয়।

আমাকে? আমাকে দিয়ে কি কাজ হবে কলকাতায়?

বিনয় বলতে যাচ্ছিল, কলকাতায় অমিতেরা যে নীতি অবলম্বন করছে তাতে বিনয়ের সহানুভূতি নেই, তাই বিনয়ের কাজও নেই। কিন্তু সে কথা প্রমথকে বলে কি হবে? তার মতামত সর্বাংশেই অমিতদের মতোই হবে। বরং অমিতের থেকেও বেশী উগ্র হবে প্রমথর মতবাদ। প্রমথ অমিতের মতো হাস্যপ্রিয় নয়, তেমন সহৃদয়তাও তার নেই। বিনয়ের মনে যে ক্ষোভ ও বিরোধিতা জেগে উঠছিল, সে তা দমন করলে। না, ওদের সঙ্গেতো বিনয়ের আর ব্যক্তিগত মান-অভিমানের সম্পর্ক নেই। সে পর্ব শেষ হয়ে

গেছে। বিনয় সহজ কণ্ঠে বললে, কলকাতায় আমার কি কাজ? কিন্তু এখানেই বা আপনাদের এত গুরুতর কি দরকার পড়ল আমাকে?

তেমন গুরুতর দরকার না পড়লে কি তার করতাম? এ জন্যই বাড়িতে শুধু তার করিনি—মিষ্টার চৌধুরীর ঠিকানায়। একেবারে পার্টি আপিসেও অমি'দাকে করলাম তার. খাদ্যসংকট গুরুতর, ডাক্তারকে না হলেই নয়।

বিনয় এবার ব্যাপারটা বুঝলে ; তা হলে অমিত সুধাও জেনে গেছে এতক্ষণে যে, বিনয় সোনাপুরে এসে গেছে। হঠাৎ কলকাতা ছেড়ে চলে আসায় বিনয়ের মনে এদিকে কুণ্ঠা ছিল। সুধার সঙ্গে যেরূপ সম্পর্ক স্থির হয়েছে, তারপরে তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ না করে চলে আসা কি ঠিক? এখন প্রমথর কথায় সে তারই একটা কিনারা দেখতে পেল। সুধা ও অমিত মনে করবে প্রমথর তার পেয়েই বিনয় সোনাপুরে চলে গেছে, হেনাও বুঝবে সত্যই দাদার সোনাপুরে প্রয়োজন ছিল। হঠাৎ বিনয় যেন তৃপ্তি পেল এই সব ভেবে। বুঝবে সুহৃদ রায়, বুঝবে সুধা ও অমিত—তাকে না হলেই চলে না সোনাপুরে প্রমথ ও মজিদের। যে বিনয়কে সুধা ও অমিত কাজের নামে অমন অবজ্ঞা করেছে তখন কলকাতায় সে এমনি মূল্যবান কর্মী।

কাজ, কাজ, কাজ? বিনয় কাজকে ভয় করে নাকি? বিনয় সেখানে অপরাজেয়। বুঝবে তা এবার সুধা, বুঝবে অমিত, সুহৃদ রায় প্রমথের তার থেকে। প্রমথর উপরও যেন বিনয় আর তত অপ্রসন্ন রইল না। একটু পরিতুষ্ট অন্তরেই সে বল্‌লে, আমাকে না হলেই চল্‌ত না নাকি আপনাদের?

চলত, কারণ চালাতেই হত। কিন্তু সত্যি কথা, আপনাকে না হলেই নয়। 'জনরক্ষা সমিতি'র সম্পাদক আপনি আর জাহেদুদ্দীন সাহেব। জাহেদ সাহেবকে তো মেলা ভার, আপনাকে না হলে কি করে চলে?

প্রমথ বলতে লাগল, আপনি যান এখান থেকে এ আমার একটুও তখন ইচ্ছা ছিল না।

বিনয় মনে মনে হাস্‌ল, তাই নাকি প্রমথ? কিন্তু প্রমথ বল্‌ছে দেখলাম,

আপনি যেতে চান ; তাই তখন জোর করে ধরে রাখলাম না। তা ছাড়া, তখন ফসল কাটা শেষ হয় নি। পৌষের ফসল এবার ভাল হয়নি বটে, তবু ভাবলাম মানুষ ক'দিন তো অন্তত খেয়ে বাঁচবে এখন। কেরোসিন বিলিরও একটা নিয়ম শৃঙ্খলা শহরে আপনি করে গিয়েছেন। লোকে তেলও পাচ্ছে। কিন্তু এক সপ্তাহ যেতে না যেতে নানা খবর আসতে লাগল। শুনলাম চরের ধান নিচ্ছে ইব্রাহিমভাই, এদিকে কেরোসিনের ব্যবস্থায় নতুন গোলমাল বেধে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে খবর এল বোমা পড়ছে কলকাতায়। খবর নয়—খবর তো ভাল জিনিস—এল গুজব, খবরের রাজা। বোমারও অত জোর নেই ! তাই তৎক্ষণাৎ বুঝল সবাই, কলকাতা নেই, হাওড়ার পুল উড়ে গেছে, শেয়ালদ ষ্টেশান নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, সারার পুল চুরমার হয়ে গেছে ; আর রেল চল্‌বে না, ষ্টিমার চলবে না, নৌকা চল্‌বে না, মোটর চলবে না—কলকাতার মাল মফঃস্বলে আস্‌বে না। অতএব জিনিস-পত্রের দাম অমনি একসপ্তাহের মধ্যে হুহু করে বেড়ে গেল। আটা ময়দা ঘি এ-সবেরতো কথাই নেই, সর্ষের তেল চোদ্দ আনা হল, তারপর এক টাকা। ধুতি শাড়ী সাড়ে পাঁচ-ছ'টাকা থেকে একেবারে ছ' আর সাড়ে ছ'। চিনি হঠাৎ বজরংলাল বাবুদের গোলায় গুম হল, দশ আনা সেরেও বেরোয় না। ঢাকাপট্টিতে গুড় আট আনা সের। নুনের সের তিন আনা থেকে পৌনে চার আনা। সর্ষের তেল বারো আনা থেকে চৌদ্দ আনায় উঠল, এখন এক টাকায়। আর ধান-চা'ল একেবারে এক লাফে সাড়ে এগার। ঢাকাপট্টির মোহনবাঁশী খবর দিয়েছিল আগেই 'ইব্রাহিমভাইর লোক চরের চাল কিনে নিচ্ছে।' ভাবলাম, চরে এবার ধান-চাল কিনবে কে ? এবার নৌকো কই ? এসব ভেবে চরে আমরা গেলাম না—কিছু কিছু খোঁজ রাখলাম। দিন পাঁচ পরে জাহাজ-মারা থেকে খবর এল—চরের ধান-চাল সব নাখোদারা কিনে সরিয়ে ফেলল ! মজিদ ছুটল সেদিকে—

প্রমথ একটু থাম্‌ল,—বিনয় কি শুনছে না তার কথা ? বিনয় আশ্চর্য

হচ্ছিল—সীতার কথা তুলছে না যে প্রমথ। খুব চতুর প্রমথ, সে-কথা সে তুলবেই না। কেবল ধান চাঁ'লের গল্পই বলবে। বেশ, বিনয়ও তাই শুনবে সে'ও তো লোকের দুরবস্থার কথা শুনতেই চায়। বিনয় জিজ্ঞাসা করলে, কিন্তু চরের ধান-চাল সরিয়ে ফেলল কি করে? নৌকা পেল কোথায়?

প্রমথ বললে, ওরা সব পায়। নৌকা পায় না জেলে, নৌকা পায় না মাঝি মাল্লা, নৌকা পায় না চরের চা'ল আনতে গৃহস্থ চাষী, দোকানী-পশারী। কিন্তু নাখোদাদের নৌকা-জাহাজের অভাব কি? তারা সরকারী এজেন্ট। তাদের নৌকা মিলে, স্লুপ মিলে, মাল-টানা ষ্টিমারও মিলে;—ওরা সব পায়। গাড়ী পায়, লরী পায়, পেট্রোল পায়—সব পায়।

পায় তো চা'ল যায় কোথায়?

জাহাজমারার ঘাটে নামছে সামান্য। হয়ত তা বেগমপুরায় মালিয়াবাগে মুকুন্দ পালেদের গুদামে উঠবে। তারই এক চালান সেদিকে লুঠ হ'ল আর তার জন্য মজিদ গেল সেখানে। যেতেই তার উপর জারি হল অর্ডিন্যান্সের নিষেধ—সে শান্তি ভঙ্গ করবে। ওদিকে মহকুমায় ভুখমিছিলে গোলমাল হল; আমাকে রাখল দিন পাঁচ হাজতে পুরে। ততক্ষণে আসলে চরের চাল যাচ্ছে সূর্য্যিপুরে নাখোদাদের গুদামে, বাখরগঞ্জে তাদের নানা বন্দরের আড়তে। সেখান থেকে সে চা'ল যাবে আবার খিদিরপুরে, হয়ত কলম্বো, বোম্বাই, ঈরান, মিশর' সাত-সাগরের দেশী মাল্লা-খানসামাদের জন্য। কোথায় যাবে, কোথায় যাবে না, তারই ঠিক নেই।

কিন্তু এত চাউল কেন কিনছে ওরা? কে নেবে?

কে জানে সেদিন জাহেদ্দোদ্দিন সাহেব এসেছিলেন, বললেন, 'দিল্লী সরকার ইব্রাহিমভাইদের এজেন্ট নিযুক্ত করেছে যুদ্ধের চাল চাই।' হাফেজ বলেছিল, 'বাংলা-সরকারেরও এজেন্ট তারা। রেলওয়ের লোকেরা খবর দিলে চা-মালিকেরা শিলেটের এদিকে চাল কিনছে; বলে 'রসদ' দিতে হবে

শ্রমিকদের।' রেলওয়ে তো কিনছেই, এদিকে রসদের জন্য জাহাজ কোম্পানিও চা'ল কিনছে। আমাদের দেশী লস্করেরা তো এই চরের চা'ল ছাড়া খেতে চায় না। মোটা লাল চা'ল তাদের চাই। এভাবেই চলল চা'ল সাত সাগরের পারে।

বিনয় বললে, কিন্তু লাল চাল তো বরাবরই চালান যায়, নতুন আর কি? মনে মনে ভাবল, দেখুক প্রমথ বিনয় কোনো খবরই প্রমথর থেকে কম রাখে না।

প্রমথ বললে, বরাবর যায়, বরাবর আবার এখানেও চাল আসে। আর বরাবর না হোক্, এবার তো চরের চাল আমাদের না পেলেই চলবে না। বরাবর কিছু কিছু আমরা বর্মার চা'ল পাই, এবার তা নেই। তার উপর অনেক ধানী জমির ফসল তো জাপানের ভয়ে এবারে আগেই নষ্ট করে দিয়েছে। তার ওপরও নষ্ট হয়েছে ফসল আবার তুফানে বন্যায়। এদিকে নৌকা নেই, রেল নেই; তা নিজেরাও ভেঙেছি, বন্যায়ও ভেঙেছে। আবার হুকুম করে আমদানী রপ্তানী সব বন্ধ করা হয়েছে। খুশী মত বলা হয়েছে সোনাপুর জিলা চা'লের বাড়তি জিলা; তাই এখান থেকে ধান-চা'ল বাইরে যাবে, কিন্তু এখানে তা আসবে না—কেউ আনাতেও পারবে না। অথচ সরকারী হিসাবেই সোনাপুর বরাবর ঘাটতি জিলা। এই যেখানে অবস্থা চরের ধান চা'ল এবার আমাদের না পেলে চলে? তা এল না, চালের দরও নামে না। এতগুলো কারণ জমেছে এক-এক করে—প্রত্যেকটাই করে তুলছে অন্যটাকে প্রবল,—দুর্ভিক্ষের পথ তৈরী হচ্ছে মাস বছর ভরে। তার ওপর জানা গেল, ইব্রাহিমভাইর লোকেরা চরের ফসল কিনে নিচ্ছে। অমনি চা'ল বারো টাকা। মানুষ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল—কি হবে? কি হবে? সবশেষে এল তারপর কলকাতার বোমা—অমনি সাড়ে বারো টাকা। এখন? সাড়ে তেরো টাকা মণ। তিন টাকা সের গেছল গত বেগমপুরার হাটে।

সেখানে আবার চা'ল কিন্‌ছে কে?

কিন্‌ছে না কে? সবাই চিন্তিত, সবাই উদ্বিগ্ন আকুল; ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। ঢাকাপট্টির লোকেরা কিন্‌ছে তাই চা'ল প্রত্যেক হাটে, শিলেটের ওরাও কিন্‌ছে পাহাড়থাড়ীর দিকে। ওরাও নাকি পেয়েছে ইব্রাহিমভাইয়ের অর্ডার। কিন্‌ছে তা ছাড়াও এরোড্রোমের ঠিকেদাররা, মিলিটারির কণ্ট্রাক্টররা;—ইদ্রিস কণ্ট্রাক্টার কিন্‌ছে, কিন্‌ছেন যশোদা দা—

বিনয়ের কৌতূহল বাড়ল। যশোদা চৌধুরী বিনয়ের বন্ধু-স্থানীয় লোক —লোকও ভালো। কি বলতে চায় প্রমথ তাঁর সম্পর্কে? বিনয় বল্‌লে, যশোদা দা? কিন্তু বীরু যে বলেছিল তারা পূজার সময় চালের কণ্ট্রাক্ট ছেড়ে দিলে দেশের মানুষের দুর্দশা দেখে।

প্রমথ হাস্‌ল। বল্‌লে, ফৌজের চা'ল সরবরাহ না হয় করলে না। 'তা বলে নিজের মজুরদের খাওয়াব না?' বলেন যশোদা দা। 'তা হলে তো দিন মজুরেরা তোমাদের কম্‌রেড বীরুবাবুকে নিয়ে এসে আমার দুয়ারে ধন্না দেবে,—দিন মজুরের রসদ না দিলে তোমাদের কর্মী বীরুর নালিশ শুন্‌তে শুন্‌তে আমার প্রাণ বেরিয়ে যাবে।'

বিনয় বুঝলে এই সেই কমিউনিষ্ট প্রমথ। সে অসহিষ্ণু। বীরু তাদেরই বন্ধু, তাদের মধ্যে বিনয়ের সব চেয়ে নিকট ছিল বীরু। দাদা মারা যেতে অবস্থার দায়ে সে দল ছেড়ে যশোদাবাবুর সঙ্গে ঠিকাদারী করে-রোজগারও করছে। তাই প্রমথ বীরুকে আর সহজ চোখে দেখতে পারে না।

প্রমথ ততক্ষণ বল্‌ছে, এমনি ভাবে মজুরের নাম করে কিনছে সবাই—ঠিকাদার, দোকানদার, আড়ৎদার, ব্যবসাদার সবাই। সবাই বলে, এবার এ অঞ্চলে চাল থাক্‌বে না, ইব্রাহিমভাই ও হাফেজ সব লুঠে নেবে। অভাব সত্যই আছে, তার উপর এসেছে এই ত্রস্তভাব।

বিনয় বল্‌লে, কি করছে মানুষ বলুন তা হলে?

আর কি করবে? আধপেটা খাচ্ছে। আর বলে, বাঁচাও, বাঁচাও

মরিয়া হয়ে কেউ এক আধটা ধানের গাড়ী বা নৌকা লুট করতে যায়। ভদ্রলোকেরা তাদের ধরিয়ে দেয়, কেউ আরও হতাশ হয়ে জলে ঝাঁপ দিচ্ছে, গলায় দড়ি দিচ্ছে।

বিনয় বিশ্বাস করলে না—গলায় দড়ি দিচ্ছে কেমন?

দিচ্ছে বৈকি। দু'একটা খবর আসছে। শিবুদা লিখেছেন পাহাড়-খাড়ীর ওদিকে একটি বারুই বাড়ীর কথা। অবস্থাপন্ন ছিল ওদিক্‌কার বারুইরা এক সময়। ওদের মধ্যে শিক্ষিত লোকও আছেন অনেকে শহরে। ক'বছর ধরে পোকা লেগে ওদের পানের বরোজ নষ্ট হয়ে গেছে; অনেকেরই দিন চলে না। এ বছর ত কথাই নেই—কি খায়, কি পরে? স্ত্রী ছিল বাড়ি; স্বামী গেছে কোথায় কে জানে। জামাই এসেছে। বাড়ি এসে একেবারে ঘরে ঢুকতেই জামাই দেখে প্রায় অর্ধ-উলঙ্গ শাশুড়ীকে। কাপড় নেই, ঘর ছেড়ে বেরুতে পারে নি, পরনে যা আছে তা দিয়ে জামাইয়ের সামনেও নিজের লজ্জা তখন বাঁচাতে পারছে না—ঘরের মাদুরটাকে খুলে তার পিছনে গিয়ে দাঁড়াল। জামাই ছুটে বাইরে এল লজ্জায়। বুঝলে সব। কিছু না বলে চলে গেল হাটের দোকানে, একখানা শাড়ী কিনলে। শাড়ী হাতে বাড়ী ফিরে দেখে কেউ বাড়ি নেই। ঘরে ঢুকতে সাহস হয় না। শেষে ঢুকল। ঢুকে দেখে সেখানেও কেউ নেই। খুঁজতে খুঁজতে বেরুল বাড়ির পিছনে জঙ্গলে সেই ছেঁড়া কাপড়ে ফাঁসী দিয়ে ঝুলছে শাশুড়ীর দেহ।

শাদা কথা প্রমথর। বিনয় প্রমথর দিকে তাকিয়ে রইল। বিনয়ের মন থেকে অন্য কথা মুছে যাচ্ছে, সে প্রমথর সঙ্গে এই কথার দাবা খেলা ভুলে যাচ্ছে। বল্‌লে, একি সত্য?

শিবুদা' লিখেছেন। হয়ত এক-আধটুকু ভুল থাকতে পারে, কিন্তু শিবুদা বানিয়ে লিখ্‌বেন না।

বিনয় মনে মনে স্বীকার করলে তা সত্য। শিবুদা'কে তো সে অনেক

দেখেছে। শিবুদা' ওদের হয়েও ওদের ছাঁদে থাপ খেয়ে ওঠে নি; সকল মানুষের কাছে সে 'শিবুদা'ই রয়ে গেছে। সে মানুষকেই জানে, পলিটিক্সে ভুল করে—পার্টি লাইন চিনেও ঠাওর পায় না। মানুষকেই সে বড় করে ফেলে; আর তাই মানুষ তাকে বড় করে না, তাকে গ্রহণ করে আপনার করে—তাদের 'শিবুদা' সে। শিবুদা' মিথ্যা বল্‌বে না তা ঠিক; বানিয়ে বলবার মত বুদ্ধিই তার মাথায় আস্‌বে না। বিনয় বুঝলে ঘটনা একেবারে মিথ্যা হবে না। সীতাও এ জন্যই বোধ হয় অত বিচলিত হয়েছে, বিনয়কে আস্‌তে লিখেছে। এইরূপই কি আজ মানুষের অবস্থা? কি করবে তা হলে বিনয়?

সে জিজ্ঞাসা করলে, তা হলে কি করবেন?

প্রমথ তাকে কাজের প্ল্যান বল্‌লে। ভুখমিছিল বন্ধ করেছে, কিন্তু ক্ষুধা তো বন্ধ হয় নি। গড়ছি খাদ্যসমিতি, গ্রামে গ্রামে ঘুরছি, খাদ্য সম্মেলন ডেকেছি। প্রেসিডেণ্ট হবেন খাঁ সাহেব, সবাই যোগ দেবেন, আপনাকেই হতে হবে তার সেক্রেটারি।

আমাকে? আমাকে কেন?—বিনয় সচকিত হ'ল।

তা জিজ্ঞাসা করবেন লোকদের, প্রমথ তাদের প্ল্যান বল্‌ছিল।

বিনয় ভাবছিল, সে কি আবার প্রমথদের সঙ্গে কাজে জড়িয়ে পড়বে? না, না। তবে সে কাজ করতে চায়, করবেও। তাই বুঝে নিতে চায় সব কথা।

কি হবে সম্মেলনে?

তা আপনারা ঠিক করবেন। আপাতত বুঝছি, শহরে এখনি চাই খাদ্য রেশনিং। আর গঞ্জে গ্রামে বাঁধা-দরে চাল, ডাল, চিনি, তেল—এসব আদায় করতে হবে।

এখনো বাঁধা-দরের কথা বল্‌ছেন? দেখছেন না এই প্রহসন?

প্রহসন কই? ট্র্যাজিডি। গুদামে গুদামে চা'ল জমছে। ইব্রাহিম-

ভাইয়ের কথা ছেড়ে দিন, আমরা কি দেখি না মুকুন্দ পাল, মোহনবাঁশী, সিলেটপট্টির ওদের চা'ল বেগমপুরায়, পাহাড়খাড়ীতে, জাহাজমারায়, জালিয়াবাগে—কোথায় না জমছে? বজরংলালের ঘরে চিনি দেখি না? ফেঁপে উঠছে সব কর্তারা—কিছু বলে না তাই; এখন কেরোসিনও আবার দিচ্ছে দালালের হাতে।

বিনয় সচকিত হল, বললে কেন? কেরোসিন তো এ-আর-পি'র পোষ্ট থেকে, আমরা বিলি করছিলাম, তা বিলি হচ্ছে না?

কি করে হবে? আপনি নেই, জাহেদুদ্দীন সাহেবও চলে গেলেন সুষ্যিপুরে। তা বিলিতে আমাদের কোনো হাত নেই আর আগেকার মত।

বিনয় ব্যাপারটা জানল; আপনারা নেই দেখেই এ-আর-পি'র লোকেরা কেরোসিন বিলিতে গোলমাল শুরু করলে। আমাদের কাজে বাধা দিতে লাগল। বার এসোসিয়েশন থেকে তার সেক্রেটারিও আবার এক চিঠি দিলেন, 'এ তেল-বিলির কাজে নানা অবাঞ্ছিত দল মাতব্বারি করে। আমাদের তেল কম দেওয়া হয়, আমরা ইনটেলেকচুয়াল কাজ করি। রাত জেগে নথিপত্র দেখি!' ইত্যাদি। আমাদের কথায় পরীক্ষার জন্ম আপনারা ছাত্রদের বেশি তেল বন্দোবস্ত করেছেন। উকীলদের প্রত্যেকের জন্ম, তাদের মুহুরীদেরও প্রত্যেকেরই জন্ম তেমনি বেশি তেল দিতে হবে, এই হল তাদের কথা। এটাও পুলিশের ইঙ্গিতে লেখা—আই-বি আছে, উকীল মহেশবাবু ও রায়ও আছে। কেরোসিন বিলিটা আবার মহিম রায়ের হাতে দেওয়া চাই।

বিনয় জানে, কেরোসিন কোম্পানীর সাহেবদের মহিম রায় গোড়াতেই হাত করেছিলেন। 'লয়েল্ ও ডিপ্তায়েরেবেল ম্যান্, মিষ্টার রায়।' মহিম রায় হয়েছিল কেরোসিনের মালিক। ব্যাপারী আর প্রেসিডেন্ট পঞ্চায়েৎদের থেকে,—হাজারে হাজারে এ ক'মাসে মহিম রায় কামিয়েছিলেন।

ক্রমাগত দু'মাসের চেষ্টায় তা মহিম রায়ের হাত-ছাড়া হল যখন তখন নতুন এ্যাসিষ্টেণ্ট কণ্ট্রোলার মিষ্টার নির্মল দাসগুপ্ত তা দেন এ-আর-পি'র হাতে! তার অনারারি এ্যাসিষ্টেণ্ট চিফ্‌ওয়ার্ডেন একজন ডক্টর মজুমদার, আর একজন মীর জাহেদুদ্দীন এম-এল-এ; তাঁরাই তখন কেরোসিন বিলির ব্যবস্থা করেন। মহিম রায় অনেক বিরোধিতা করেছিল, সীতাকে দিয়ে পর্যন্ত বিনয়দের চাপ দিতে চেয়েছিল, তারপরে সীতাকে কি বিপদে না ফেলেছিল মহিম রায় গোয়েন্দা লাগিয়ে। মহিম রায় এবার উকীলদের দিয়ে ওরকম দরখাস্ত দিইয়েছে। মহেশবাবু তাঁর সঙ্গে জুটেছেন। মহিম রায় এই ব্যবসাটা আবার পেলে মহেশবাবু তাতে এবার একটা ভাগ পাবেন।

মহেশবাবুর কথা বিনয়ের মনে পড়ল। তিনি তার পুরনো প্রতিবেশী। খুব অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন সেবার তিনি বিনয়ের প্রতি—বিনয় তাঁকে যশোদা চৌধুরীর সঙ্গে মিলিটারি কণ্ট্রাক্টে জুটিয়ে দিতে পারল না, কেন? 'ইচ্ছা করেই তো ডাক্তার তা দেয় নি,'—মহেশবাবু বলেছেন সবাইকে,—ওই বীরু সেনকে নিলে যশোদা চৌধুরী বিনয় ডাক্তারেরই কথায়। ডাক্তারেরই একটা মতলব আছে। নইলে বীরু সেন জেল-ফেরতা স্বদেশী, কমিউনিষ্ট। খুব এখন দহরম মহরম তার কাপ্তেন মেজরের সঙ্গে; ডাক্তারের বাড়ীতে পর্যন্ত নিয়ে আসে গোরাদের। বীরু কমিউনিষ্ট—ডাক্তারের তার সঙ্গে কি? যশোদা ছিল আমার আত্মীয়—আপনার লোক। আমাকে সে কাজে নিলে আপনার লোকের উপকার হত।' বীরুর বেনামিতে বিনয়ই যে যশোদা চৌধুরীর সঙ্গে মিলিটারি কণ্ট্রাক্ট করছে এ খবর কি আর মহেশবাবু জানেন না? আরও অনেক ব্যাপারে জড়িত আছে বীরু ও বিনয়, মহেশবাবু তাও জানেন। সব রহস্যই জানেন মহেশবাবু। তবে তিনি ভদ্রলোক: তাই কিছু বলেন না। বিনয় মহেশবাবুর ক্রোধের কারণ বোঝে, তবু মনে মনে তাতে স্বস্তি

পায় নি! মহেশবাবু এবার ভালো লোক ধরেছেন মহিম রায়কে। সাংঘাতিক লোক মহিম রায়।—কি বিপদে ফেলেছিল সে সীতাকে।

প্রমথকে বিনয় জিজ্ঞাসা করলে, তা'হলে কেরোসিন বিলি আবার মহিম রায় নিচ্ছে? নিক, বাঁচা যায় এই মিথ্যা ভূতের বেগার খাটা থেকে?

তার মানে?—প্রমথ তীব্রকণ্ঠে বল্‌লে—ছেড়ে দোব নাকি আমরা? মজিদ তখনি বলেছিল আপনাকে তার করতে। বারের দরখাস্ত পেয়েই সেই দাশগুপ্ত সাহেব আপনাকে খবর পাঠায়। আপনি নেই, তা জানত না। কিন্তু লোকটাও পরে ঘাবড়ে গেছে। পুলিশের রিপোর্ট গেল, 'এ-আর-পি কমিউনিষ্টদের আওতায় গিয়ে পড়েছে।' 'কমিউনিষ্ট পার্টির ফাঁদে আমি পা দিচ্ছি না'—দাশগুপ্ত বল্‌ছেন।

বিনয়ের মনে পড়ল নির্মল দাশগুপ্তকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্র। হতভাগ্য যুবক। একদিন নাকি সেও ছিল স্বদেশী ভাবাপন্ন। আজও বলে, 'আমি সায়েন্টিফিক্ সোশ্যালিষ্ট।' বিনয় তার মানে জানে না। কিন্তু কেমিষ্ট্রিতে ফার্ষ্ট ক্লাশ ছিল দাশগুপ্ত। সে পাশ করে কোনো কেমিক্যাল লেবরেটরিতে ঠাঁই পেল না; শেষে হল সাব ডিপুটি। জীবনের এই ব্যর্থতার তিক্ততা তাকে পৃথিবীর উপরে তিক্ত করে তুলেছে। তারপরে? তারপরে অন্তরঙ্গতা সূত্রে জেনেছিল সে এক 'আশ্চর্য মেয়েকে'। 'আশ্চর্য সে মেয়ে'—বলেছে দাশগুপ্ত বিনয়কে—'আর সেই আশ্চর্য মেয়ে কমিউনিষ্ট দলে যোগ দিয়ে হয়ে গেল যেন মতবাদের মেশিন্। আমার বন্ধুর সঙ্গে দেখাও করলে না—বন্ধু তাদের ষ্টালিনের তাঁবেদার নয় বলে, ট্রটস্কির প্রতিভা স্বীকার করে বলে।'···বিনয়ের মনে পড়ছে সুধা গুপ্তাকে। সুধা গুপ্তা,—সেও আশ্চর্য মেয়ে। একটা রুদ্ধ ক্ষোভ বিনয়ের মনে জেগে উঠ্‌ল, সুধা গুপ্তা, জানো না, জানো না তোমরা, তোমাদের নিষ্করুণ উগ্রতায়, তোমাদের মতবাদের মত্ততায়

মানুষের পথে তোমরা কতখানি বাড়িয়ে দাও জ্বালা, জটিলতা, অজ্ঞান—আর মিথ্যা।

বিনয় ভুলে গেছল প্রমথকে। প্রমথ বললে, দাসগুপ্তের কাছে আপনি একবার যাবেন নিজে?

বিনয়ের একটুও ইচ্ছা নেই এই সরকারি মহলে ঘোরাফিরি করতে। সে বললে, আমি নই, জাহেদুদ্দীন সাহেব যাবেন।

তিনি কোথায়? জাহেদুদ্দীন সাহেব ইব্রাহিমভাইর ফাঁদে জড়িয়ে পড়েছেন; তাঁকে পাব কি করে?

কি আবার জড়িয়ে পড়লেন জাহেদুদ্দীন সাহেব?

ইব্রাহিমভাইদের চা'লের কারবারে এখানকার দালাল হবে কে, তা নিয়ে সেবার হাফেজ মোক্তার আর জাহেদ সাহেবে ঝগড়া হয়ে গেল, জানেন তো? হাফেজ লীগের সেক্রেটারি, সে পেয়ে গেল সেই দালালি। জাহেদ সাহেব লীগ এম-এল-এ, গোপনে কলকাতায় তদ্বির চালিয়েছেন ইব্রাহিম ভাইদের খোদ আফিসে। তাতেই তাদের এক অংশীদার সুখিপুরে এসে জাহেদ সাহেবকে ডাকায়, হাফেজকেও ডাকায়। লীগ্‌কে তো দুর্বল করা ঠিক নয়। লীগ্ হল ইব্রাহিমভাইদের রাজনীতিক খুঁটি। দুজনাকেই লীগের মধ্যে মানিয়ে না রাখলে ইব্রাহিমভাইদেরই ক্ষতি। অনেক কথার পরে ঠিক হয়েছে—সদরে এখন জাহেদ সাহেবই হলেন ইব্রাহিমভাইদের সাব্ এজেণ্ট; এখানে আর বেগমপুরায় তাঁর আসল আপিস আর আড়ৎ থাকবে—এখনি চাল কিনবার সময় তো। মহকুমায় আর চরে থাকবে হাফিজ মোক্তার, তার আপিস বসবে জাহাজমারার বন্দরে আর চরে।

বিনয় বিস্মিত হল, জাহেদুদ্দীনও তা হলে এই দালালিতে জুটে গেলেন?

প্রমথ ম্লান হাসি হেসে বললে, কে জুটল না, বলুন? সেবারই হাফেজের সঙ্গে সঙ্গে মোস্‌লেম লীগের যা কর্মী ছিল তা এই চা'লের ব্যবসায়ে গিয়ে পড়ল

—আর কংগ্রেসের ও হিন্দুসভার মুকুন্দ পাল রইল হাফেজের পিছনে আসল পুঁজিওয়ালা, নিজেদের ফড়ে আর ব্যবসায়ীদের নিয়ে। লীগের কর্মী আরসাদ্, রশিদ, আবদুল হাকিম সব দালালিতে ঝুঁকে পড়ছে। সাধে কি মীর শাহেদুদ্দীন বলেন—'হতভাগ্য মুসলমান জাতটা। এত যাদের নিজেদের গতিশক্তি, তাদেরই সবচেয়ে দুর্গতি—এই নেতাদের নীতি-হীনতায়। ভারতবর্ষের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি এই—এত বড় সচল শক্তির এমন নিশ্চলতা।' হাফেজ লীগের সেক্রেটারী, দালালিতে লাগল্। জাহেদ সাহেব ভাবলেন, এবার জিলা মোস্‌লেম্ লীগ তিনি হাত করবেন। কাজী ছিল জয়েন্ট সেক্রেটারী—এককালের কংগ্রেসওয়ালা সে—সেও এগিয়ে এল তার সঙ্গে! আমরা ভাবলাম, হয়ত দশজনের কাজে তাতে সুবিধাই হবে, লীগ অগ্রগতির দিকে যাবে। কিন্তু হাফেজ টাকাকড়ি হাতে পেতেই আরও শক্ত হয়ে বস্‌তে লাগ্‌ল। এদিকে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের ইলেক্‌সান আস্‌ছে—লীগের মনোনয়ন কে কে পাবে? খাঁ বাহাদুর, হাফেজ, কাজী, জাহেদুদ্দীন সব টানাটানি চালাচ্ছে, তুমুল তাদের কলহ। তারও একটা সুরাহা হল ইব্রাহিমভাইদের মারফত। চেয়ারম্যান হবেন খাঁ বাহাদুরই, জাহেদুদ্দীন, কাজী, হাফেজ, মেম্বর। তা ছাড়া জাহেদ সাহেব এই ইব্রাহিম-ভাইয়ের চা'লের দালালি পেলেন; চেয়ারম্যান হবার দাবিটা তিনি ছাড়লেন এই নগদ প্রাপ্তির জন্য।

বিনয় একটু দুঃখিত চিত্তে বসে বসে শুন্‌ল। জাহেদুদ্দীন—মীর শাহেদুদ্দীন সাহেবের ভাই জাহেদুদ্দীন—কতকালের সম্ভ্রান্ত ঘরের লোক, সেও জুটল ইব্রাহিমভাইদের দালালিতে।

প্রমথ চলে গেল। বিনয়ের তার প্রতি যে একটা অপ্রসন্নতা ছিল কখন তা চাপা পড়ে গেছল; সে নিজেও প্রমথকে সীতার কথা জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গিয়েছে। কিন্তু প্রমথ চলে যেতেই এবার তা বিনয়ের মনে পড়ল: বাঃ, চমৎকার প্রমথ। সত্যই একবারও সীতার কথা তুলল না। আচ্ছা চালাক

প্রমথ। এত কথা বললে, বললে না কেবল যে কথা তার পক্ষে সব চেয়ে বড় কথা। কিন্তু তাতেই কি সে কথা চাপা পড়ে নাকি? বিনয়ও অবশ্য প্রমথকে জিজ্ঞাসা করে নি সীতার কথা। প্রমথ হয়ত তাতে ভাবছে, 'খুব ঠকিয়েছি ডাক্তার দা'কে। কিছুই বুঝতে পারেন নি তিনি।' কিন্তু বিনয় এক নিমেষের জন্য ভুলে ছিল কি প্রমথর কথায়?

আর সত্যই, এত কি সঙ্কোচ ছিল প্রমথর সে কথা তুলতে? সীতা এখানে নেই, বেগমপুরায় গিয়েছে। সেখানে নতুন সে—এখানে তবু তাঁর দেশের অভিভাবক ছিলেন হেডমাষ্টার রাজেন্দ্র বাঁড়ুজ্জে—তার পিতার বন্ধু। সেখানে কে তার চেনা? বেগমপুরায় সীতা নতুন। তার সেখানে কত অসুবিধা হচ্ছে, কে তার খোঁজ রাখে?···প্রমথ রাখে নিশ্চয়। বিনয়কে সে সে-সব খবর দিতে চায় না? যেন প্রমথ না দিলে তা বিনয় পাবে না—যেন সীতা তার পর। সীতার সুবিধা-অসুবিধা যেন প্রমথেরই একা জানা থাকবে। এইটাই প্রমথর দুর্বলতা। তাই সীতার কোনো কথা সে উল্লেখও করলে না। যেন সীতা বলে কাউকে সে জানে না, এবং বিনয়েরও সীতাকে জানবার কথা নয়। সীতার নাম যেন প্রমথেরই একা জানা থাকবে। বিনয় মনে মনে বলে হাসল। কিন্তু আবার তার মনে হল, আসলে প্রমথ দুর্বল নয়, সে অন্ধও। মিথ্যা গর্বে সে অন্ধ। তার গর্ব, সে কমিউনিষ্ট কর্মী; কোনো 'দুর্বলতা' তাকে স্পর্শ করবে কেন? সে ভাবে, সে কাজের মানুষ,—যেমন সুধা ভাবে, ভাবে অমিত, তারা কাজের মানুষ। তার অর্থ তারা মানুষ নয়, কাজের কল। তাই বোমা পড়লে সুধা আর বিনয়ের সঙ্গে কথা বলে কি করে? 'অনেক কাজ সামনে' যে তার। 'অনেক কাজ সামনে'—ভাবে তেমনি প্রমথ। সীতার কথা সে কি তুলতে পারে? তুলতে পারেই না—এইখানেই প্রমথর মিথ্যা দেমাক। নইলে সত্যই প্রমথ দুর্বল নয়। দেহে এবং মনে সে সবল। তার ব্যক্তিত্ব আছে, তা সবাই জানে। তাই সে সোনাপুরে মজিদদের দলের নেতা। প্রমথর ব্যক্তিত্ব

আছে, এবং দায়িত্ব আছে—এ বিষয়ে প্রমথও সচেতন। এত সচেতন সে এদিকে, যে তাতেই সে ভুল করে। মিথ্যা গর্বটাকে মনে করে তার শক্তি, ব্যক্তিত্বের পরিচয়, আত্মমর্যাদাবোধের প্রমাণ। বিনয় আবার হাসল মনে মনে। শুধু এ সবের প্রমাণ তো তা নয়, প্রমাণ প্রমথ'র দুর্বলতারও—চিহ্ন তার আত্মবঞ্চনার। সে সীতার কথা না তুললেই কি সীতাকে ভুলে আছে? না, এ ভুল করবে বিনয়? এ তো তাঁর বিনয়কে ঠকানো নয়, নিজেকেই ঠকানোও। নিজেকে ঠকানো—নিজেকে প্রমথ বুঝায়, এ-সব কথা কি তার আলোচনা করা চলে এখন? অনেক কাজ সামনে—'মানুষ মরছে'।

সত্যই মানুষ মরছে, শিবুদাও লিখেছেন। আর সীতাও প্রায় তাই লিখেছিল, 'মানুষ খেতে পাচ্ছে না, পরতে পাচ্ছে না।' মানুষ মরছে। না. মিথ্যা বলে নি প্রমথ; শুধু মিথ্যা বোঝাচ্ছে নিজেকে, আর তাই মিথ্যা বোঝাতে চেয়েছে বিনয়কে। বিনয় তাতে ঠকে নি। তবে বিনয় বুঝছেও—বড় দুর্দিন দেশের। সত্যই দুর্দিন।

বিনয় উন্মনা হয়ে বসে রইল শীতের রৌদ্রের দিকে তাকিয়ে বিষণ্ণ চিত্তে। প্রমথ'র কথাগুলো মনে পড়তে লাগল। এই অবস্থা মানুষের, এমন ভয়ঙ্কর, এমন ঘনায়িত সংকট। মানুষ গলায় দড়িও দিচ্ছে। কর্তৃপক্ষ দেখছে না এসব? হয়ত তাদের দেখবার সময় নেই; হয়ত আগেই এসব ভেবে দেখেছে আমীর-ওমরাহরা। আগে হাতে মেরে তারা আমাদের যুদ্ধের রথে জুততে চেয়েছে, ভাতে মেরেও তারা কি সে চেষ্টাই করছে অন্য দিক থেকে? হয়ত এই তাদের পথ, অন্ধ পথ—হয়তো বানচাল সাম্রাজ্যবাদের এই অন্ধ কুটচাল, এইরূপই তার যুদ্ধনীতি।

ছোট-বড় ছেলে মেয়ে হাতে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে পথে বেরিয়েছে। ভিখারীর সংখ্যাও এই ক'দিনেই কি বেড়ে গেছে? 'কি করছি আমরা তবে? বিনয়ের মনে পড়ল জাহেদুদ্দীনকে—ইব্রাহিমভাইর দালালি সেও গ্রহণ করলে।

মীরপুরের মীর শাহেদুদ্দীনের ভাই সে—অবশ্য তফাৎ দুজনায় অনেক। সেই অসহযোগের দিন থেকে শাহেদ সাহেব এ জিলার কংগ্রেসম্যান্; আজ তাঁর নাম নেই, টাকা নেই। জাহেদের সব আছে—এম্-এল্-এ সে। সে অনেক কিছু হয়—সে কৃষক সমিতির পরিচয়ে এম-এল-এ হয়, হক্ সাহেবের সঙ্গে হয় লীগ্, আর আজ লীগ্ হয়ে আবার হকের বিরোধী। সে স্বার্থ জানে, স্বার্থ খোঁজে; তাই বলে এই ইব্রাহিমভাইদের সঙ্গে যোগ দেবে? হয়ত সম্পূর্ণ জাহেদুদ্দীনও বুঝছে না এর অর্থ। মানুষ গলায় দড়ি দিচ্ছে, জলে ডুবে মরছে,—হতাশায় মরছে, ত্রাসে মরছে, উদ্বেগে মরছে,—পশুর মত তারা দিশাহারা হয়ে ছুটছে, ডাক্ছে, 'আমরা মরছি, মরছি, মরছি; আমাদের বাঁচাও, বাঁচাও, বাঁচাও,—

কে বাঁচাবে তাদের? সরকার? দেশ? রাজশক্তি? না, জনশক্তি?

২

কেশববাবু স্নানে চলেছিলেন, এসে উপস্থিত হলেন। বললেন, দুবার এসে ফিরে গেছি। ঘুম থেকে ওঠেন নি দেখলাম একবার, আর একবার দেখি প্রমথ এসে জুটেছে। ওরা আপনাকে শুষে খাবে—দেখ্বেন পরে। তা বলুন তো—সময় নেই এখন আর, কাছারির বেলা হয়ে গেল—বলুন তো কলকাতার খবর কি? মানুষ-জন আছে এখনো?

কেশববাবু কলকাতার খবর শুন্তে উদ্‌গ্রীব। বিনয় বিশেষ উৎসাহ বোধ করলে না, যা জানে সংক্ষেপে বল্লে। তাতে নিরুৎসাহ হলেন না কেশববাবু। তাঁর কল্পনা গুজবের হাওয়ায় এত দূরে দূরে উড়িয়ে নিয়েছে তাঁকে যে, এই মৃত্তিকার দিকে কেউ তাকাতে বললে তা তিনি কানেই

তুলবেন না—আকাশে তথাপিও খানিকক্ষণ উড়তে পারেন—ওড়ার ঝোঁকেই। কেশববাবু আবার জিজ্ঞাসা করলেন, কি বলেন? কলকাতাতো এমনি শ্মশান হতে চলল?

তা ঠিক।

সর্বত্র বোমা—বাজারে দোকানে, বাড়ি ঘরে—আর শ্মশান হতে বাকি কি? মানুষ পালাচ্ছেও তো, কি বলেন? কিন্তু আমাদের এখানে কি বুঝ্ছেন?

বিনয় অন্যদিকে কথা পাড়ল, এখানেও তো খুব জিনিস-পত্রের দাম বেড়ে গেছে দেখ্ছি। মানুষ বাঁচবে কি করে?

কেশববাবু দাঁড়ালেন, বাঁচবে কি করে আর? বাঁচবার পথ নেই। আমাদের কি যে হবে বুঝি না। দেখেছেন তো জিনিসের দাম—সেই তো মাইনে, সেই। সাহেবকে আমরা বলেছি। তিনি বল্লেন, 'ছোট চাকুরেদের ভাতা আর বাড়াব না; তবে তোমাদের রেশন্ দোব।' আরে সব কি রেশনে পাওয়া যায়? কাপড় পাওয়া যায়, না, কাগজ পাওয়া যায়? সেই তো কাগজের হুকুম বেরুল—আর বাজারে কাগজ নেই। আপনার বীরু সেন তো, মশাই, সব কাগজ সেদিন কেউ বুঝতে না বুঝতেই বাজার থেকে কিনে ফেল্লে।

বীরু?

হাঁ, ডাক্তারবাবু, বীরু। বলেছি না বাহাদুর ছেলে? কোথায় স্বদেশী, কোথায় কি? খুব ব্যবসা ফেঁদেছে। ওদিকে বাড়িতে জমিজমা কিনে ফেল্ছে এরই মধ্যে।

বিনয় এখন বুঝতে পারলে, কেন প্রমথ বীরুর সম্বন্ধেও কিছু মত প্রকাশ করেনি। হয়ত এই তার কারণ—এ শহরের কাগজ সে গুদামজাত করে ফেলেছে। কলকাতায় যেমন শৌরীনের মারফৎ করেছেন মুরারি সেন।

কেশববাবু বল্লেন, যাক্, আপনি এসে গেছেন—আমাদের মঙ্গল।

বিনয় বল্‌লে, কিন্তু এসেছি তো, খাব কি ?

কেশববাবু হেসে বল্‌লেন, আপনার কি ? আপনারা তো এ-আর-পি'র রসদই পাবেন। আমরাই আপনার মুখাপেক্ষী হয়ে থাক্‌ব—যদি আপিস থেকে রসদ না দেয়। সেই রসদ দিলেই বা কি ? চিনি কই ? কেরোসিন কই ? লবণ কই ? রেজকি কই ? আমি বলি, 'সাহেব, নগদ ভাতা বাড়িয়ে দাও, নইলে এই সবই দাও রেশনে। শুধু চালে কি হবে ?' আমরা গৃহস্থ মানুষ। যা হোক মশায় ক্ষেতের ধান-চা'ল কিছু পাই। দেবত্তর ছিল কিছু, বছর প্রায় চলে, নইলেও চালিয়ে নিই। চা'লের দর একটু চড়েছে—বিক্রী করেছি।

বিনয় আশ্চর্য হল, আপনি চা'ল বিক্রী করে দিলেন নাকি ?

কেশববাবু উত্তর দিলেন, কি করব ? চা'ল তো সরকার দেবে বলছে। কিন্তু কাপড়, তেল, কেরোসিন—এসব তো আর আমাদের ঘরে হয় না। এসব আমাদের সরকার থেকে না দিলে পাব কোথায় ?

দরবাঁধা তো আছে।

দিন্ না আপনি সেই বাঁধা-দরেই কিনে ? ও কথা ছাড়ুন, বাঁধা দর তো নয়, তামাসা—ঘুষের রাজত্ব। তবে বড় কর্তাদের ব্যাপার, তাই ঘুষ নয়, আপনারাও তাতে আপত্তি করেন না।—কেশববাবু আবার একটু হেসে বল্‌লেন, আমাদের মত সামান্য আমলারা দু-পয়সা চাইলে তা হয় ঘুষ—তাতে আপনাদের ঘোর আপত্তি। মহিম রায় আর এস-ডি-ও আর অন্য কর্তরা কেরোসিন লুঠল, কি করলেন তাদের ?

কেশববাবুর এ অভিযোগ বিনয় ও তার সহকর্মীদেরই বিরুদ্ধে। কথাটার মোড় ফেরাবার জন্য বিনয় বললে, কিন্তু বাঁধাদরে জিনিস না পেলে গরীবরা কিনবে কি করে ? এত দরে কেউ কিনতে পারে কিছু ?

গরীব বল্‌ছেন কাকে ? আমাদের থেকেও গরীব আছে নাকি কেউ ? সরকারী পিয়াদা পাইক তারা চা'ল-ডাল পায়, উর্দি পোষাক পায়—আছে

বেশ। দিন মজুরী করে যারা তাদের তো কথাই নেই—বারো আনা, একটাকা মিলিটারি কণ্ট্রাক্টে মজুরি, তার ওপরেও পায় রসদ। চাষের 'বদ্‌লা'—তারাও খোরাকী পায়, মজুরী পায় আট-দশ আনা রোজ। কৃষক-কৃষক বলেন, তাদের তো দুদিন নয় এবার। এলাহি বক্‌স পাটারি চরের মাতব্বর—সাত হাজার মণ পেয়েছে ধান। সাত টাকা তখনি ধানের মণ। ক্ষেত গেরাস্থ যার আছে তার তো এবার সুদিন পড়েছে। আমরা যে মরছি—ভদ্রলোক, জমি নেই, জেরাৎ নেই, আছে মাসের মাইনা, আর পরিবারের ভাত কাপড়, ছেলেমেয়ের ইস্কুলে পড়া, পূজাপার্বণ, জামাই মেয়ে, নাতি দৌহিত্র। পৌষপার্বণ আস্‌ছে—গুড় নেই—একদিন পিঠা খেতে পাবে ছেলেমেয়ে? টুনির মা বলেন, একদিন করি সরু চাকলির পিঠে গুড় দিয়ে। আমি বল্‌লাম, 'থাক, সেই যে বলে ভাত জোটে না পিষ্টক খায়।' কাগজ নেই—সকাল থেকে মেজ নবাব আজ রাগ করে বসে আছেন। তা কাগজ কি আমি তৈরী করি? কাগজ না পেলে বাঁচা গেল, ইস্কুলে পড়ানোর আর দরকার নেই।

বিনয় অস্বস্তি বোধ করছিল, আবার বীরুর কথা উঠে পড়বে এখুনি—সে এ শহরের কাগজ আটকে রেখেছে। কিন্তু তখনকার মত বিনয় নিষ্কৃতি পেল। ক্ষীরোদ বাজার থেকে ফিরল। বিনয় বল্‌লে, এত দেরী করলে, ক্ষীরোদ, আন্‌লে কি?

দেরী হবেই তো বলেছিলাম। রেজকি নেই, নোট কেউ নেয় না, বলে দু' আনা বাটা চাই। মুকুন্দ পালের ভাই আপনার রোগী তো। বল্‌লে, 'বিকেলে এসো, কিংবা রাত্রে; এখন তো রেজকি দিতে পারি না।' আমি দোকানে দোকানে ঘুরি, পাই না।

ক্ষীরোদ কত বুদ্ধি করে রেজকি সংগ্রহ করেছে তা সবিস্তারে না বলে ছাড়বে না, বিনয়ের শুন্‌তেই হবে। কেশববাবু কিন্তু বিপদ দূর করলেন। বল্‌লেন, ক্ষীরোদ বলেই তবু মশায় পেলে রেজ্‌কি। আমরা তো সিকিটার

পয়সা পর্যন্ত পাই না। কে দেয়? মশায়, আদালতের পোদ্দার, সে পর্যন্ত দেয় না আমাদের। সে কারবার চালাচ্ছে দোকানীদের সঙ্গে। ক্ষীরোদের বাহাদুরী আছে।

বিনয় জান্‌ত, কেশববাবু ও ক্ষীরোদ পরস্পরকে দেখতে পারে না। কেশববাবুর রাগ—ক্ষীরোদ বিনয়ের চাকর, তাই অন্য প্রতিবেশীদের অবজ্ঞা করে। ক্ষীরোদের সন্দেহ—কেশববাবুর মেয়ে টুনি গোপনে বিনয়ের কোরোসিন তেল, বাড়ির এটা-ওটা নিয়ে যায়। একবার তাকে ক্ষীরোদ ধরেছিল; তাতে কেশববাবু উল্টো ইতরের মত ক্ষীরোদকেই গাল দেন, আর ক্ষীরোদকেই চোর বলেন। বিনয় সেই লজ্জাকর অবস্থাটা কাটায় সেবার—ক্ষীরোদকে বলে যে, টুনিকে কোরোসিন নিতে বলেছিল বিনয়ই। ক্ষীরোদ অবশ্য নিজের মুনিবের এই সাফাই সেদিন বিশ্বাস করে নি। বুঝলে ওটা ভদ্রলোকের পরস্পরের মানরক্ষা; ছোটলোকের সেখানে মান বাঁচল না, তাতে কি? কিন্তু বিনয়ই বা করবে কি? দেখেছে সে কেরোসিনের অভাব। অভাবে স্বভাব নষ্ট হবেই তো। টুনি গোপনে তেল নিয়ে গেলে তাতে আশ্চর্য হবার কি? তখনকার মত সে কেশববাবুর মান রেখেছে। ক্ষীরোদ তাতে ক্ষুব্ধ অভিমান পোষণ করেছে। কিন্তু এবার ফিরে এসে বিনয় দেখছে ক্ষীরোদ ও কেশববাবুর সে বিদ্বেষের সম্পর্ক যেন লঘু হয়েছে অনেকটা। বিনয় একটু আশ্বস্ত হল। কেশববাবু উঠে পড়লেন, এগিয়ে গিয়ে ক্ষীরোদের কেনা মাছ দেখ্‌লেন। সেখানে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, মাছ কত হল? দশ আনা!—তাঁর বিস্ময় বেড়ে গেল, একজনার মত মাছ—দশ আনা! দশ আনা! সাধে কি বলি টুনির মাকে, মাছ তো নয়, অখাদ্য—হিন্দুর আজকাল মাছ খেতে নেই। সধবা মানুষ, ছেলেপিলেও আছে; বাড়িতে মাছ আর আসে না, কেমন কেমন ঠেকে তাঁর। ঠেক্‌লে কি হবে? পয়সা তো আর তাতে আস্‌বে না। এই তো দশ আনায় একজনার মাছ,—না হয় ধরলাম দেড় জনার—ক্ষীরোদকেও ধরলাম,—দু টুক্‌রো

মাছ দুবেলা। হাঁ, এ রকমই দর—বেশিই বা হবে। ক্ষীরোদ বলেই এ দরে পেয়েছে। কিন্তু দশ আনার মাছ খেতে পারি আমরা?—নে, কাট।

ক্ষীরোদের সঙ্গে সঙ্গে কেশববাবু ভিতরে গেলেন। বিনয় শুনতে পেল তিনি ক্ষীরোদকে বল্‌ছেন, ভালো করে রাঁধিস্ কিন্তু। কি যে তুই রাঁধিস্ তুইই জানিস্। ভদ্রলোক খেতেও পায় না। এক-একদিন বলেন টুনির মা, 'রেঁধে পাঠাই।' পাঠাব কি? আছে কি? মাছ তো চোখে দেখি না, দুধ তিন সের টাকায় এদিনে, আলুও ছ আনা সের—কি রাঁধব, খাওয়াব যে ভদ্রলোককে? তুই এক কাজ করিস্ না ক্ষীরোদ? টুনির মাকে জিজ্ঞাসা করে নিস্ কি করে রাঁধবি। এমন মাছটা, ভদ্রলোক যেন খেতে পারেন রে, দেখিস্। কি করবি বল্ তো? কি করে রাঁধবি? প্রথম কি করবি?

স্নান ও আপিসের কথা কিছুক্ষণের মতো ভুলে কেশব চক্রবর্তী মাছ কি ভাবে রাঁধতে হবে সে কথাই বোঝাতে লাগ্‌লেন, বুঝলি রে, সকলের কপালে মাছ জোটে না আজকাল। জুটেছে যদি, নিজেতো খাবিই, ভদ্রলোককেও একটু যত্ন করে রেঁধে খাওয়াস্।

বিনয় চুপ করে বসে রইল। সত্যই কি অবস্থা এঁদের, এই অল্প মাইনের মধ্যবিত্তদের। মাছ নিয়ে নিজেরই অজ্ঞাতসারে কেশববাবু যে লোলুপতার ও দৈন্যের পরিচয় দিচ্ছেন, তাতে বিনয়ের নিজেরই মন লজ্জায় ও বেদনার ভরে উঠ্‌ছিল। কি নিদারুণ অবস্থা এঁদের—অল্প মাইনে, বহু পোষ্য, ভদ্রতা বোধ আছে,— অন্তঃসারশূন্য বর্ণাভিজাত্যও আছে। ওদিকে ঘরে কিছু নেই, তেল নেই, নুন নেই, মাছ নেই, দুধ নেই, কাপড় নেই, কাগজ নেই।

বিনয়ের মনে পড়ল মুরারি সেনকে—তের লক্ষ টাকার কাগজ তিনি কলকাতায় কিনেছেন, তার দাম এখন চল্লিশ লক্ষ টাকা। বিনয়ের আত্মীয় শৌরীন এ কাজে ছিল তার সহকারী সৌভাগ্য তারও লাভ হয়েছে। চা'লের মত কাগজেও মিষ্টার সেন একটা এখন অদ্ভুত কারবারের সুযোগ

পেয়েছেন। মুরারি সেন বাঙালী স্বাধীনতা-কামী ব্যবসায়ীদের নেতা, সুভাষ-বাবুর বরাবরের সহকারী তিনি, উনিশ শ' চৌদ্দ-আঠারর রাজবন্দী। তাঁর প্রাণে সে অগ্নিযুগের জ্বালা রয়েছে। তাঁর দেশপ্রীতিতে বিনয়েরও সন্দেহ নেই। ক্রুদ্ধ কণ্ঠে সেদিন তিনিই বলেছিলেন, 'সব কাগজ যুদ্ধেই গেল। দেশে লেখাপড়াও এরা একেবারে বন্ধ করছে যুদ্ধের নামে।' বিনয় বুঝছে কত সত্য তাঁর কথা। বিনয় প্রশংসা করেছে বাঙালী মুরারি সেনের, তাঁর ব্যবসায়ী বুদ্ধি আর চরিত্রবল দেখে। ব্যবসায় ক্ষেত্রে তিনি বাঙালীকে প্রতিষ্ঠিত করছেন—নিজের সেক্রেটারি হিসাবে শৌরীনকে সুযোগ করে দিয়েছেন, বিনয়কে পর্যন্ত ব্যবসায়ে উদ্বুদ্ধ করেছেন; ইন্‌ভেষ্টমেণ্ট ট্রাষ্টে তাকে ডিরেক্টর করে নিয়েছেন; বিনয়ের নিজের ঔষধের কারখানা—ন্যাশেনাল মেডিসিনকে তিনি ট্রাষ্ট থেকে পুঁজি জোগাতে সর্বদা প্রস্তুত। তাঁর চা'ল-কল আছে, কাপড়ের কল আছে, ব্যাংক আছে, ইন্‌শিওরেন্স আছে—বাঙলাকে মুরারি সেন গড়ছেন। বিনয় তখনো অতটা বুঝতে পারেনি যে, কাগজ গুদাম-বন্দী করলে লেখাপড়ার আরও ক্ষতি হবে। এখানে এসে এখন তা যেন তার চোখে ঠেকল এবার প্রথম। তবু সে ভাবছে, অন্যায়ই বা কি মুরারি সেনের? টাকার জোয়ার চলেছে, ব্যবসায়ীমাত্রই ব্যবসা করবে। চা'লের এজেন্সী নিচ্ছিল অবাঙালীরা; তিনিও বুদ্ধি করে যোগাড় করে হলেন তার একজন এজেণ্ট—তবু বাঙালীর রইল চা'লের কারবারে হাত। কাগজের কণ্ট্রোল অর্ডার হবে, মুরারি সেন আগে তা আঁচ করতে পেরেছিলেন—সুযোগ নিয়েছেন তাঁর ব্যবসায় বুদ্ধির। 'তিনি না নিলে অন্যে নিতেন'—শচীপ্রসাদ বিনয়কে বলেছে ঠিক কথাই,—'চা'লের বাজারে যেমন ইব্রাহিমভাই জেঁকে বসেছে, তেমনি কাগজেও হয়ত বসত কোনো মাড়োয়ারী বা দিল্লীওয়ালা, ইহুদী বা পার্শী বা মাদ্রাজী। মুরারি সেন থাকাতে এত বড় মুনাফা রইল কিছুটা বাঙালীর হাতে, অন্তত একজন স্বদেশীর হাতে।' এ যুক্তি বিনয় এখন আর সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করতে পারে কি? যে-ই কাগজ হাত করুক ছাত্ররা

কাগজ পাচ্ছে না, দেশের লেখাপড়ার পথ বন্ধ হচ্ছে। চোরাবাজারে কাগজ কিনে দেশের শিক্ষাদীক্ষা চলতে পারে না। তা হলে বীরুই বা কেন গেল কাগজের এই মুনাফাদারী করতে ?...একটা বড় সুযোগ ; ব্যবসায়ীর পক্ষে এরূপই তো ব্যবসায়। কিন্তু বীরু তো ব্যবসায়ীই শুধু নয়। সে সেবার ফৌজের চা'লের কণ্ট্রাক্ট ছেড়ে দেয়। কর্ণেলকে বলে, 'সাহেব, আমি এখানকার লোক, এখানেই মানুষ। এখানে মানুষ চাল কিনতে পাচ্ছে না, আর সে চা'ল তোমরা খচ্চরকে খাওয়াবে—এ কাজ আমার দ্বারা হবে না। অন্য লোককে দেও এই কাজ।' অন্য লোক সে কাজ পেয়েছে। বীরু বিনয়ের সত্যই আপনার। তার সঙ্গে বিনয়ের একটা অন্তরের যোগ পর্যন্ত স্থাপিত হয়ে গেছে। তাই, বীরুর আদর্শ বদলে গেছে—জনসাধারণের কর্মী বীরুর আদর্শ আর কণ্ট্রাক্টার যশোদা চৌধুরীর সহকারী বীরুর আদর্শ এক থাকতে পারে না—একথা বিনয়ের যেন ভাবতেও অস্বস্তি লাগছে। বিনয় দেখছে টাকার জোয়ারে আজ দেশ ছাপিয়ে যাচ্ছে। তারই টানে কি সেই বীরুর মত মানুষও আপনার স্বভাব খুইয়ে ফেলছে ক্রমশ! তা হলে জাহেদের আর দোষ কি ? তবু, মীর শাহেদুদ্দীনের ভাই সে।

আশ্চর্য, মীর শাহেদুদ্দীন কি ক'রে রইলেন অমন অনমনীয় সুন্দর পুরুষ ? 'শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমি রইব, বিনয়, এ জিলার মুসলিম্ কংগ্রেসম্যান্—যাদের বর্তমান নেই, ভবিষ্যত নেই ; তবু আছে এক অপরিবর্তনীয় পরিচয়, আর আছে অনমনীয় গর্ব—মুস্‌লিম কংগ্রেসম্যান্'। —সেবার তিনি বলেছিলেন। কেমন আছেন সেই শাহেদ সাহেব ? বিনয়ের বন্ধু তিনি, সব জানেন তিনি বিনয়ের। শাহেদ বিশ্বাস করে বসে আছেন, সুধা বিনয়কে ভালবাসে ; আর সে ভালোবাসা তেমন ফাঁকা হাল্কা ভালোবাসাও নয়—সাত দিনে যা উবে যায়, বোমা পড়লে যা ভেঙে যায়। বিনয়ের মনে হল ভুল করেছেন শাহেদুদ্দীন। করবেনই তো।

তিনি সুধাকে দেখেনও নি জানেনও না কি উত্তেজনায় উন্মাদনায় গড়া মেয়ে সে। বিনয়ই কি জানত সুধা এত নিষ্ঠুর, এত রূঢ়! বিনয়ের মনে হল, সত্যই সে সুধাকে জানত না। জানবে কি করে? কতটুকু সে দেখেছে তাকে? এখানে সোনারপুরেই তো বিনয় বেশি সময় কাটাল। সে দেখেছে মজিদকে, বীরুকে, শিবুদা'কে, প্রমথকে; দেখেছে মনুর 'বাই আম্মাকে', আমিনাকে, প্রমথদের শৈলদিকে, চিনুকে;—আর দেখেছে সীতাকে। হাঁ, সীতাকেই সে বরং দেখেছে বেশি। সেও ইস্কুলের টিচার। এখানকার হিন্দু নারী বিদ্যামন্দিরের হেড্ মিস্ট্রেস্ সে। কিন্তু সুধার মতো পলিটিক্সে সীতা মত্ত হয়ে যায় নি। মানুষ রয়েছে—ছেলে মানুষই প্রায়। অন্তত চাঞ্চল্যে, কথায়, আনন্দে সহৃদতায়, আর নিঃসঙ্কোচ সৌহার্দ্যে সীতা ছেলেমানুষ। সে সানন্দ আর সহৃদয়। দেশকে সেও ভালোবাসে। 'কিন্তু তাই বলে. প্রমথবাবু, আপনাদের মত ক্ষেপে যেতে পারব না—রুশিয়া রুশিয়া বলে।' 'বক্তৃতা শুনতে আমার ভালো লাগে না। কি ভালো লাগে? ভালো লাগে গল্প করতে। গল্প করতে, গল্প পড়তে; উপন্যাস পড়তে, কবিতা পড়তে'—বলে সীতা। বিনয় জানে প্রমথ এসব কথায় রুষ্ট হয়। প্রমথ রুশ-পলিটিক্সে উৎসাহী; সীতার ভালো লাগে রুশ গল্প। সে নানা সাহিত্য পড়ে; প্রমথ মনে মনে ভাবে সীতা শুধু কেন রুশ-সাহিত্য পড়ে না? ভাবে. বিনয়ই তার জন্য দায়ী। কিন্তু বিনয় বেশি পড়ে হাসির গল্প ও ডিটেক্টিব্ গল্প উপন্যাস। সীতা পড়ত কবিতা আর সাহিত্য। আর দু'জনায় তর্ক করত কোন্‌টা ভালো—ওড্‌হাউস্, না, রবীন্দ্রনাথ। আর দুজনাই ছিল একমত যে, পলিটিকসের বই অপাঠ্য। প্রমথ হাস্‌ত, বল্‌ত তাই বুঝি সব চেয়ে বেশি তা পড়ো সীতা।

নানা সূত্রে আবার বিনয়ের মনে পড়ল প্রমথ সীতার কথা ভোলেনি। সে বল্‌ল মানুষের দুর্গতির কথা।

সাম্‌নের পথ দিয়ে ছোট ছোট দলে যাচ্ছে ভিখারী। বিনয়ের সেদিকে দৃষ্টি গেল। না, মিথ্যা বলে নি প্রমথ—এই তো—এই তো আজ বাঙলা। 'বর্মা হতে দোব না তাকে,'—সুধা অমিত্ ভাবছে, ভাবছে বিনয় নিজেও। বড় দূর মনে হল সেই কথা, কলকাতার সেই দৃশ্য; বড় অলীক মনে হল সুধাদের সেই উত্তেজনা. নিজের বিক্ষোভ। এই তো বাঙলা দেশ—ভাত নেই, কাপড় নেই, দুর্দিন কঠিন হয়ে উঠছে, বুকের উপর চেপে বস্‌ছে। দেখ্‌ছে না কি কেউ তা? শুন্‌ছে না কানে দুর্দিনের পদধ্বনি? না, এ কি মিথ্যা? দুস্বপ্ন বিনয়ের, দুস্বপ্ন প্রমথর—বিনয়কে প্রবঞ্চনা?

'কিউ!'

বিনয় চম্‌কে উঠ্‌ল। দাঁড়িয়ে আছে ওরা। দাঁড়িয়ে থাক্‌বারই কথা, সারবন্দী হয়ে দাঁড়াবে—এ নিয়ম বিনয়রাই করেছিল প্রথম। দাঁড়িয়ে আছে সেই কেরোসিনের কিউ। বেলা ৪টা। এতক্ষণে তেল দেবার কথা, কিন্তু দেওয়া শুরু হয় নি এখনো। ভিড় বাড়ছে, বিরক্ত হচ্ছে সার-বন্দী পুরুষ ও বালকেরা। মেয়েরা বসে আছে ক'জনা এক পাশে। আগে ওরাই পেত প্রথম, এখন ওরাই পায় শেষে। সারে দাঁড়ালে হয়ত আগে পেতেও পারে। কিন্তু ততটা সাহস হয়নি এখনো ওদের। পুরুষের ভিড়, ভিড়ের চাপও আছে, মেয়ে বলে কেউ এদেরকে পথ করে দেয় না আজ আর। সে সুবিবেচনা উঠে গেছে।

দুপুর থেকে দাঁড়িয়ে আছি সাহেব; ওঁরা গা লাগান না। আমরা কাল ফিরে গেছি, সাহেব। খাতিরের লোকদের আগে দিচ্ছে ওঁরা। আমরা তো পাচ্ছিই না। ও লোকটা পিছন থেকে আগে চলে গেছে।—এমনি সব নালিশ। বিনয়কে চিনতে পেরে কলরব করে উঠ্‌ল সকলে।

বিনয় তাদের থাম্‌তে বল্‌লে, একে একে বলো তোমরা। কিন্তু কেউ থামতে চায় না। সবাই নিজের কথাটাই বলবার জন্য ব্যস্ত। এক-

জনার গলা সবচেয়ে উঁচু, একটু ষণ্ডা দেহ, গায়ের জামাও মন্দ নয়। সে অপরদের ধমকে দিলে—থাম্ না, আমি বল্‌ছি। আমরা এসে দাঁড়িয়ে আছি হুজুর। চারটায় তেল দেবার কথা। সেই তিনটায় এসেছি আমি। তীক্ষ্ণকণ্ঠে আর একজন বল্‌লে তুমি এসেছ তিনটায় মিঞা? এই তো এলে—জোর করে ঢুকে পড়লে আমাদের ধাক্কিয়ে সারের মধ্যে।

রোগা, ক্লিষ্ট লোক সে—নালিশ যাদের অনেক। প্রায় মারামারি লাগে আর কি? ষণ্ডা লোকটা বলছে, তোরা শালারা মুকুন্দ পাল আর ঢাকাপট্টির ভাড়া করা লোক না? সাহেব জানেন না বলে সে কথা। ফি বোতল তোদের থেকে দশ আনা দামে কেনে না মুকুন্দ পাল?

বিনয় সব বুঝলে ধমক দিয়ে বললে, যাও, লাইনে দাঁড়াও। যে লাইনে দাঁড়াবে না, সে পাবে না।

কথা কাটাকাটি করতে করতে দু'জনাই কিউতে দাঁড়াল। সারে দাঁড়িয়েও তারা ঝগড়া চালাল। সারের অন্যান্য লোকেরাও তাতে যোগ দিচ্ছে। বিনয় এগিয়ে এ-আর-পি'র গৃহমধ্যে প্রবেশ করলে। সেখানে তখন একটা ব্যস্ততা পড়ে গেছে। যারা এখানে ভারপ্রাপ্ত তারা জানত না যে বিনয় শহরে এসেছে। ঢিলে-ঢালা রকমের বন্দোবস্ত ছিল—তেলের টিন কেটে নানাভাবে তারা আগেই তেল সরিয়ে রাখছিল। কাগজপত্রও অগোছাল। সব নিয়ে তারা এখন বিব্রত হয়ে পড়ছিল—বিনয় তা দেখেই বুঝতে পারল। বললে, এদের তেল দিচ্ছেন না কেন এখনো?

এই দিচ্ছি, স্যর।—বললে তার সহকারী বাদ্‌শা আলী।

চারটা বেজে গেছে। শীতের দিন—দেরী করাচ্ছেন কেন? এরা গরীব মানুষ, খেটে খায়।

খুব ব্যস্ত-ভাব বাদ্‌শা আলীর চোখে মুখে।—হিসাব মিলিয়ে নিচ্ছিলাম, স্যর। কত তেল আছে, কত তেল গেছে, কাদের আজ পালা;—এরা নইলে নানা রকমে ফাঁকি দেয়। সারে দাঁড়াবে না, মারামারি করবে।

বিনয় বুঝলে, লোকের নালিশগুলো কাটিয়ে উঠবার জন্য প্রথমেই বাদ্‌শা আলী লোকের বিরুদ্ধে নালিশ করছে। বিনয় গম্ভীরভাবে বললে, তাতো হবেই। আপনারা দেরী করবেন, ফাঁকি দিতে তাতেই লোকের লোভ হয়। তেল লোকে পায় না, তাতেই নানারকম চুরির পথ খোঁজে—কেউ আপনাদের ফাঁকি দেয়, কেউ আপনাদের খুশী করে আগে তেল নিতে চায়। দেখে, সারে দাঁড়ালে তেল শেষ পর্যন্ত হয়ত পাবেই না, পায়ও না।

কে পায় না, স্যর? সব মিথ্যা কথা। ওদের এমনি কথাবার্তা।

পায়নি অনেকে, আমি জানি—দৃঢ়স্বরে বিনয় বললে।

সুর বদলে গেল: পাচ্ছে না, স্যর, ফুরিয়ে যায় বলে। আমরা তেল দিই; কিন্তু দিনে এক টিন করে এ পোষ্টে তেল দেওয়া হয়। তাতে কুড়ি বোতলের বেশি তেল হয় না।

কেন? চব্বিশ বোতল হবার কথা।

হয় না, স্যর। অত তেল থাকে না, একটু-আধটু ঢালতে নষ্ট হয়, গোলমালেও নষ্ট হয়।

আচ্ছা খুলুন, দেখছি আমি ক'-বোতল হয় টিনে!

লোকও বেশি যে, স্যর, নানা পাড়ার লোক এ পোষ্টে আস্‌ছে।

সে কেন হবে? সব পাড়াতেই তো পোষ্ট আছে।

পায় না, স্যর, ও-সব পোষ্টে পায় না বলেই এখানে আসে।

বিনয় বুঝলে এক ঘাঁটি আর ঘাঁটির কাঁধে দোষ চাপিয়ে দিয়ে এখনকার মত নিজেরা রক্ষা পেতে চায়।

দুদিনে তিন টিন এখানে দেবার কথা হয়েছিল। সে ওরা দেয়নি।—এবার বাদ্‌শা আলীর স্বর বেশ মোলায়েম হয়ে উঠল—আপনি নেই, স্যর, কে আদায় করে? আমাদের কথা তো সাপ্লাই আপিসের ওঁরা কানেই তোলে না। অথচ আপনার পোষ্টে এখানে ভালো বিলি হয়: তা শুনে লোকেও এ পোষ্টেই স্যর, ভিড় করে আসছে।

বিনয়ের বুঝতে ভুল হল না যে বাদ্‌শা মিঞা চতুর, সে আরও মোক্ষম্‌ অস্ত্র প্রয়োগ করছে। বিনয় গম্ভীরভাবে বললে, বেশ, তেল দিন, আর ততক্ষণ হিসাবের বইটা আমাকে দিন, দেখব—বাদ্‌শা মিঞা বিনয়ের দিকে বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে রইল। তারপর গম্ভীরভাবে হিসাবের খাতাপত্র এগিয়ে দিতে লাগল।

বিনয় জানে হিসাব দেখে লাভ হবে না। হিসাব ঠিক থাকবে, তেল কেউ পা'ক বা না পা'ক। তবু এ বইপত্র তার বাড়ি নিয়ে যেতে হবে একবার, পরীক্ষা করাতে হবে কাউকে দিয়ে। বিনয় বলতে লাগ্‌ল, কোনো ওজর শুনব না, বাদ্‌শা মিঞা, ঠিক সময়ে তেল দেওয়া আরম্ভ করবেন। মেয়েদের প্রথম দেবার কথা ছিল, তা দেন্‌ না কেন? শেষে তারা পায়ই না। কাল থেকে মেয়েদের তেল দিতে হবে প্রথম। অন্যদেরও মিথ্যা মিথ্যা দাঁড় করিয়ে রাখবেন না। সকলেরই কাজকর্ম আছে। ওরা দিন মজুর—ওদের একটা বেলা বন্ধ থাকলে এভাবে চলে না।

জনার্দন দাস বুদ্ধিমানের মত কথাটাকে মোড় ঘুরিয়ে দিতে লাগল, লাইনে ওরা দাঁড়াতেই চায় না, স্যর। দাঁড়ালে এত সময় লাগত না। গোলমাল হত না। এই লাইনের জায়গা নিয়ে ওরা কি যে করে ঠিক নেই। মেয়েদের এগোতে দেয় না, নিজেদের মধ্যেও মারামারি করে। পরশু তো রক্তারক্তি হয়ে গেল। আপনি ছিলেন না। মক্‌রম এ বস্তীর রিকশা টানে। এক বুড়ো ওর আগে যাবেই; মক্‌রম দিলে মাথা ফাটিয়ে বোতলের ঘায়ে। সেই আমরা আবার পোষ্ট থেকে ফাষ্ট এড্‌ দিই। তেল দেওয়াই তো শুধু নয়, স্যর্‌ এদের ঝগড়া মেটানো আবার এক কাজ।

বিনয় বুঝলে হয়ত কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়, হয়ত কিছুটা সত্য। জনার্দনেরাই গোলমাল বাড়িয়ে অবস্থাটাকে ক্রমশ জটিল করে তুলছে। আরও তা জটিলতর হয়ে উঠবে। উপায় কি? বিনয় ভাবতে লাগল।

বাদ্‌শা মিঞা ধীরে ধীরে বিনয়কে বললে, করবেন কি? কিছু কি

এদের ইমান আছে। এই কেরোসিন নিয়ে ওরা কি করে, জানেন? রাত্রিতে ওদের বাড়িতে একটি ডিবেও জ্বলে না। ওরা আবার শহরতলীর ছোট ছোট দোকানীদের বিক্রী করে, তারা দেয় চোরাবাজারে চালান।

বিনয় ধমক দিলে তাকে। কিন্তু মনে মনে মানল হয়ত এও মিথ্যা কথা নয়।

খানিক বসে খাতাপত্র নিয়ে চলল অন্য পোষ্ট দেখতে বিনয়। জানে সে সবখানেই এরকম গোলমাল। সে চলে গেলেই গোলমাল শুরু হয়েছে। তবু এরা এখন অন্তত একটু হুঁশিয়ার হবে। বিনয় সকলকে বললে, কেউ কেরোসিন না পেলে পরদিনই আমাকে বলবে।

সন্ধ্যা হলে বাড়ি ফিরে বিনয় অন্ধকারে চুপ করে বসে ভাবতে লাগল—কেরোসিন বিলির ব্যবস্থাটুকু মাত্র আমাদের হাতে; তাতেও দেখছি যে মানুষের কি ভিড়, কি দুরবস্থা। কি কঠিন হয়ে উঠছে মানুষের অবস্থা! না, মিথ্যা বলেনি প্রমথ। বিনয়কে সম্ভবত মিথ্যা বোঝাতেও চায় নি। বড় দুর্দিন আজ। দুর্দিন দেশের এমন মাথার ওপর জমে বসছে, পূর্বে তা বিনয় এমন করে লক্ষ্য করে উঠতে পারে নি। ভাবছিল, দুর্দিন এসেছে, সেই দুর্দিনই চলছে।

দুর্দিন এসেছে—বিনয় বুঝেছে বর্মা থেকেই। বর্মায় মাথার উপর তা অকস্মাৎ ভেঙে পড়ল; শত শত লোকের মত বিনয় দুর্যোগ মাথায় নিয়ে এলো তার স্বদেশে। বিনয়ের সে সব দিনের কথা ভাবতে এখনো মন ত্রস্ত হয়ে ওঠে! সে কি অভিজ্ঞতা তার জীবনে—সেই বর্মার পথ! কিন্তু সেখানেই তার অভিজ্ঞতা শেষ হতে পারল কই? সে ভেবেছিল তার দুর্ভাগ্য শেষ হয়েছে। কিন্তু এখানে এক মাস থাকতে না থাকতেই সোনাকান্দির পৈত্রিক বাড়ি তার ছাড়তে হল—ফৌজ এল সেদিকে। বর্মার পথের অভিজ্ঞতা তার মনে তখনো। সোনাকান্দিতে লোকের জীবনে

আবার সেই অভিসম্পাতের ছায়া দেখে বিনয় তাই স্থির থাকতে পারল না। হয়ত বর্মার পথে বিনয় আপন অজ্ঞাতে আপনার ব্যক্তিগত দুর্ভাগ্যকে দশজনের দুর্ভাগ্যের সঙ্গে এক করে দেখতে শিখে উঠছিল। কিন্তু সে তা ভুলে যেত সোনাকান্দিতে আবার 'এমনিতর অভিজ্ঞতার মধ্যে না পড়লে। হয়ত তার সেই অভিজ্ঞতারও ঠিক প্রকাশ ঘটত না সেদিন সোনাকান্দির সেই বিপদে বিনয়ের সঙ্গে বীরু সেন, শিবুদা, মজিদদের পরিচয় না হলে। তার দেশের লোককেও সে তা না হলে চিনতে পারত না। হয়ত সে বুঝত না এমন করে—এ তারই দুর্ভাগ্য নয় শুধু, মানুষেরই দুর্দিন।

না, অনেক কিছুই বিনয় তা না হলে জান্‌ত না, মান্‌ত না। বিনয় মনে মনে বসে বসে ভাবতে লাগল। হয়ত সেই বর্মার পথে পথে এই জনসাধারণের দুঃখের খোঁজ না পেলে মানুষের দুঃখই সে বুঝত না। সেদিন তার আহত আত্মা বারে বারে ক্রন্দন করেছে, হে বিধাতা, মেরো না, মেরো না! আমরা নির্দোষ, নিরাপরাধ, হয়ত নির্জীবও। কিন্তু পৃথিবীর রাজা-রাজড়ার এই হিংসার তাণ্ডবে আমাদের কেন এই মৃত্যুদণ্ড? এই যুদ্ধ, এই রাজনীতি, এই রাজ্যলিপ্সা মানুষের পাপ; আমরা কেন হব তার বলি? এর বেশি বিনয় সেদিন বুঝ্‌ত না, মানত না। সেদিন কত সহজ ভাবে সে বিশ্বাস করত রাজনীতি মানুষের এক অভিশাপ। 'আমি পলিটিক্‌স্ চাই না', বিনয়ের মনে পড়ল প্রথম সাক্ষাতেই সে বলেছিল সুধাকে পীড়িত অমিতের শয্যাপার্শ্বে কলকাতায়। সুধা উত্তর দিয়েছিল, 'আমি পলিটিক্‌স্ ছাড়া অন্য কিছুই চাই না।' মিথ্যা বলে নি বিনয়, মিথ্যা বলে নি সুধাও। পলিটিক্‌স কি, বিনয় তা জানত না, বুঝত না, চাইত না। বর্মায় মানুষ সে, সৌভাগ্যের কোলে মানুষ, স্বদেশে ফিরেছে; সাধারণ শিক্ষিত মানুষ সে—দেশকে ভালবাসে,—এই সে জানত নিজেকে। ঠিকই সে জানত; কিন্তু নিজেকে আরো তার জানতে বাকী ছিল। সাধারণ

মানুষ সে, সাধারণের পথে চল্‌তে চাইত। আজ বিনয় বুঝছে, এই সাধারণের পথই আসলে পলিটিক্‌সের পথ। মানুষের বিপদে আপদে সুখে দুঃখে বিনয় মানুষের পাশে পাশে চল্‌তে গেল—সোনাকান্দির ভিটেছাড়া লোকদের সঙ্গে গ্রাম ছাড়ল, চাঁপাডাঙ্গার ভিটেছাড়া গরীব চাষীদের হয়ে চাইল তাদের ঘরবাড়ির সুবিধা, বেলতলীর হাকিমহাকার উজাড় করা চাষী তাঁতী গৃহস্থ প্রভৃতির সাহায্যে এগিয়ে গেল—চাইল তাদের জন্য ঘরবাড়ি, ক্ষতিপূরণ, নিতান্ত খাওয়া-পরার পথ। এমনি চল্‌তে চল্‌তে বিনয় দেখল, যে পথ বেয়ে সে চলেছে তাই পলিটিক্‌সের পথ। মানুষ একসঙ্গে চলতে গেলেই সে চলা হয়ে ওঠে পলিটিক্‌স—চল্‌তে চল্‌তেই বিনয় বুঝলে এ সত্য। আর পলিটিক্‌সকে তাই তখন থেকে মনে মনে অস্বীকারও করতে পারল না। বিনয়ের জীবনে সে এক প্রকাণ্ড আবিষ্কার।

সুধা-অমিতের মত বিনয় পলিটিক্‌সকে আপন বলে গ্রহণ করেনি তবু তখনো। সে পলিটিক্‌সকে স্বীকার করেছে—যেমন অনেকটা এখানে দেখেছে সে সীতা স্বীকার করে—মানুষকে মানে বলে, মানুষের সঙ্গে এক সঙ্গে চল্‌তে চায় বলে। তাই সুধা বা অমিতের মত অত মতবাদের সূক্ষ্ম বিচার বিনয় করে না, তার কাছে আদর্শের অত জাতবিচার নেই। তার পথ সাধারণ পথ—পলিটিক্‌সের পথ হলে কি করা যায়? অন্যায় দেখলে সে বিচলিত হয়, অমিত ও সুধার মত বিচার করতে পারে না। বিনয় দেখেছিল এদেশে তখন সিপাই-রাজের জুলুম। ওদের চোখের সাম্‌নে ওদেরই সহকর্মী নীরদ প্রাণ হারাতে বসেছিল। ফৌজেরা তাকে প্রায় খুনই করে ফেলে; বিনয় প্রাণ দিয়ে চিকিৎসা করে তাকে বাঁচায়। সুধারা কেমন ঘটনাটা যুক্তি দিয়ে বিচার করলে; বললে, 'জনাতঙ্কগ্রস্ত সাম্রাজ্যবাদ এমনি আজ ক্ষিপ্ত হয়েছে। এমনি আঘাত মাথায় করেই দেশে দেশে আজ জনতা তৈরী করছে তার জয়ের পথ। আমরা লক্ষ্যভ্রষ্ট হব না।' অমিত সুধা প্রভৃতি রইল শীতল, অবিচলিত। বিনয় দেখেছিল তখন ভারতবর্ষের মনের

তাপ, জনতার দেহের গ্লানি ; আর মনে মনে বিনয় মেনেছিল, ভারতবর্ষের সে মুক্তি প্রতিজ্ঞাই সত্য—'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে।'

বিনয়ের ভুল হয়েছিল। বিনয় আজ তা জানে, বোঝেও। এই সোনাপুরে তার সে ভুল ভেঙে যায়। সে দেখে এর পথে ঘাটে তখন বিমুখ মুসলমান জনতাকে ; দেখে ভারতবর্ষ এক হয় নি। সে বর্মায় মানুষ, এখানকার হিন্দু মুসলমানের বিরোধ তাকে পীড়া দেয়, তার বিষ-বাষ্পে সে অন্ধ হয় নি। তাই সে সহজেই মুসলমানকেও বুঝতে পেরেছে, হিন্দুকেও স্বীকার করে ; আর সে দেখছে—ভারতবর্ষের মহাজাতি খণ্ড হয়ে আছে। ট্যানার, বীরুর সৈনিক বন্ধু। বিনয়কে বলেছিল তখন, 'পৃথিবীর লোক কিন্তু তোমাদের ভুল বুঝছে। সেই জনশক্তি থেকে ভারতবর্ষ বিচ্যুত হলে তার স্বাধীনতার আন্দোলনও দুর্বল হয়ে পড়বে।' বিনয় এসব মানে না ; হোক ট্যানার সজ্জন, সে বিদেশী। সে বুঝবে না—পৃথিবী বিনয়ের দেশ নয়, ভারতবর্ষই বিনয়ের পৃথিবী। কিন্তু সেই ভারতবর্ষের বহুজাতি সংযুক্ত না হলে ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে কি করে? কিন্তু কি কঠিন দিন গেছে তখন বিনয়ের। তাল হারা, লক্ষ্য হারা এক ঊনপঞ্চাশী হাওয়ার মুখে সে সঁপে দিচ্ছিল নিজেকে। এল এক নতুন উপলব্ধি বিনয়ের জীবনে, এক নতুন আবিষ্কার বিনয়ের পক্ষে—ভারতবর্ষ বিভক্ত, তার জীবনও তাই বিষাক্ত হয়ে উঠেছে।

সেদিনই কিন্তু বিনয় দেখেছিল—মুরারি সেন, শচীপ্রসাদ প্রভৃতি ব্যবসায়ের নেশায় মেতে গেছে। মুরারি সেন, মেহরা দেখেছেন—কত মুনাফা যুদ্ধের অর্ডারে। শচীপ্রসাদ দেখছেন—কত সুযোগ কল কারখানা বাড়াবার। টাকার জোয়ার চলেছে! টাকার জোয়ারে দেশই চাপা পড়ল—বলেছে শৌরীন। বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ. সে, সেও দু'-দশ হাজার করছে। সত্যি, টাকার জোয়ার চলেছে—কাগজের নৌকায় বণিক ও ব্যবসায়ীরা পাড়ি জমিয়েছে। ফলাও করে যুদ্ধের ব্যবসা করছে,—কণ্ট্রাক্ট,

কারখানা, দালালি। টাকার আজ অভাব কই? মুরারি সেনের ব্যাংক টাকায় ফেঁপে উঠছে; নানা দিকে তার হাত পড়ছে। শচীপ্রসাদের বাল্বের কারখানা দাঁড়িয়ে গেছে, লোহার কারখানা বড় হচ্ছে, বিনয়ের হয়েও কারখানা সে গড়ছে। কি তাদের উৎসাহ! —'এ যুদ্ধে কল-কারখানা দাঁড়িয়ে না গেলে আর সুযোগ থাকচে নাকি?' মধ্যবিত্তেরাও দু' অঞ্জলি ভরে নিচ্ছে কাগজের ঐশ্বর্য। বীরু ব্যবসা করছে, জাহেদুদ্দীন দালালি করছে, হাফেজের অবস্থা ফিরে যাচ্ছে; শিক্ষিতেরা কেউ আজ বেকার নেই। চাকরি আজ সর্বত্র, যুদ্ধের কেরানী চাই, যুদ্ধের মিস্ত্রী চাই, যুদ্ধের ডাক্তার চাই। লোকের চাহিদা বেড়ে গেছে—ব্যবসায়ীরাও লোক চায়, বণিকেরা লোক খোঁজে। সবাই আজ চাকরী পাচ্ছে, কেউ বসে নেই, কাজ পেয়েছে, বেঁচেছে! মরছে বরং গরীবেরাই—এইতো দেখে এল বিনয় শুধু কেরোসিনেরই জন্য ক্রন্দন। শুধু কেরোসিন, তার জন্যই মানুষের এ দশা। মনে পড়ল শিবুদা'র লেখা সেই বারুই মেয়েটির কথা—কাপড় নেই, জামাইর সামনে লজ্জা নিবারণ হয় না—তাই শাশুড়ী আত্মহত্যা করলে। চারদিকেই টাকা, কিন্তু সচ্ছলতা কই? চারদিকেই বরং বিনয় দেখছে দুর্দিনের ছায়া ঘনিয়ে আসছে। চারদিকেই সেই এক কথা—ধান নেই, চাল নেই, তেল নেই, নুন নেই, কাপড় নেই, কয়লা নেই, কাগজ পর্যন্ত নেই।

'বীরু সেন নিয়ে নিয়েছে এখানকার কাগজ।' বীরু সেন—বীরু পর্যন্ত! সেদিনও বীরু ছিল প্রমথদের বন্ধু—বিনয়েরও বন্ধু। বীরুর দাদা মারা গেল, চোখের জলে বীরু বাধ্য হল সংসারের দায়ে রোজগারে নামতে। বিনয় মনে মনে ভাবল, কাগজ নেবেই বা না কেন বীরু? এই তো ব্যবসা, এই তো রোজগারের দিন। তার পরিবার আছে, বাবা আছেন, মা আছেন—ওর জন্য তাঁরা বহু দুঃখ ভুগেছেন। তা হলে কোন দিকে তাকাবে বিনয়? কেরোসিনের কারবারে আবার লুব্ধ হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে মহিম রায়। তারও পিছনে মহেশবাবু প্রভৃতি, আর সঙ্গে তাদের মুকুন্দপাল,

ছোট বড় কত মহাজন, সবার শেষে প্রেসিডেণ্ট পঞ্চায়েৎরা। কেই বা কম ? এ-আর-পি'র ছোট বড় কর্মীরা আছে, শহরের আর শহরতলীর নানা দোকানদাররা আছে। সত্যি হয়ত এই সারবন্দী যারা দাঁড়িয়ে যায় তারাও আবার অনেকে কেরোসিন নিয়ে বেচছে ছোট দোকানীদের কাছে, তা আসে আবার ঢাকাপট্টির মোহনবাঁশীর মুকুন্দলালের ঘরে। হয়ত তারাই এদের পয়সা দিয়ে পাঠিয়ে দেয় কণ্ট্রোলে কিন্‌তে। পরে খুচরো বিক্রী করে তা আবার সাধারণের কাছে।

প্রমথ এসে বল্‌লে, অন্ধকারে বসে যে ?

আলো জ্বালাতে ইচ্ছা করে নি। সুইচটা টিপে দিন।

বিনয় কি দেখেছে, বল্‌লে সব। কথা হল—পরশু-তরশু সবাই কেরোসিনের দরখাস্ত নিয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করতে যাবে।

খাঁ বাহাদুর, বৈকুণ্ঠবাবু প্রভৃতির কাছে যেতে হবে না ? আপনাদের তো সবই সর্বদলীয় হওয়া চাই—বিনয় বললে।

প্রমথ হাসল। বস্‌লে, দেখুন, তবু আমরাই নাকি বড় গোঁড়া, দলীয় নীতিতে চলি।—বলে বল্‌লে, আবার সুরেশ দত্ত এসেছেন—কংগ্রেস এম-এল-এ। ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে তিনি দেখা করবার বিরোধী। অবশ্য লীগের সঙ্গেও একত্র তিনি কিছু করতে রাজী হবেন না। মোসলেম লীগও আবার তেমনি। এই জেলাবোর্ডের ভোট ব্যাপারে কংগ্রেস ও লীগের দু'দলকে একত্র করা গেল না। হাফেজ এসে জুটল একদিক থেকে, আর এক দিক থেকে এসে পড়লেন সুরেশ দত্ত—কিছুতেই কোনো ব্যবস্থা করা গেল না। মাঝখান থেকে বৈকুণ্ঠবাবুতে আর খাঁ বাহাদুরে একটা প্যাক্ট হয়েছে—ইনি চেয়ারম্যান, তিনি ভাইস্‌-চেয়ারম্যান্।—প্রমথ আবার বল্‌লে, তবে খাদ্য-সম্মেলনে সকলকে চাই—কংগ্রেসকেও, লীগকেও।

খাদ্য সম্মেলনে কি দরকার ;

বাঃ! আপনি বল্‌ছেন একথা ?

বলছি, কারণ আছে। খাদ্য দাবি করবেন? কিন্তু কি ভাবে?

বাঁধা-দর চাইব, রেশনিং চাইব, চাইব আমাদের খাদ্য কমিটি।

কিন্তু বাঁধা-দর চাইবেন কেন? চাষীরা আজ দু'পয়সা পাচ্ছে—ধান চা'লের দর বেশি থাকাতে—এ তো ঠিক।

বিনয়ের মনে পড়ছিল কেশববাবুর কথা—প্রমথ তাকে এদিকে কি ভুল বুঝাচ্ছে? না বিনয়ও ভুল বুঝেছে?

তেমন চাষী বাংলায় ক'জন? শতকরা পঞ্চাশ জনের বছরকার ধান হয় না, তত জমি নেই আমাদের—বললে প্রমথ।

বিনয় নিজেও জান্‌ত এ কথাই সত্য। ভুল বোঝেনি বিনয় তবে। তবু বল্‌লে, এ আপনি ঠিক বলছেন, প্রমথবাবু?

ঠিক বল্‌তে পারছি না—বলতে জানি না বলে। দেখছেন এই ধান চা'লের দাম আর জিনিসপত্রের দাম, তারপরে গ্রামে গ্রামে অসুখ। মানুষ মরছে, ডাক্তার দা,' মানুষ মরছে। কেশববাবুরা বোঝেন না কি অবস্থা মানুষের। সমস্ত ধান-চা'ল বিক্রী করে দিয়েছে চাষী-গৃহস্থ। নিজেদের কি হবে এর পরে, কিছু ভাবেনি দুর্ভাগারা। ভাবলে, 'সাড়ে এগারো টাকা মণ চা'ল—বাপের জন্মে শোনে নি কেউ। যা পেলাম খুব জিতলাম'।

বিনয় চুপ করে রইল। সে নিজেও বুঝছে, চাষী হাতে ফসল রাখে নি। শেষে বল্‌লে, কি বলেন, সত্যই কি দুর্দিন এল দেশে?

দুর্দিন নয় আর, ডাক্তার দা,—দুর্ভিক্ষ, দুর্ভিক্ষ।

বিনয় নিজের থেকেই উচ্চারণ করলে, দুর্ভিক্ষ!

দুর্ভিক্ষ এসে গেছে প্রায়। আর দেরী নেই—সবে পৌষ মাস—এখনি ধান নেই, চা'ল নেই, দেশে তেল নেই, নুন নেই, দেশলাই নেই, কয়লা নেই, কাঠ নেই, কাপড় নেই, কাগজ নেই—নেই কিছু নেই—নেই, নেই, নেই—

মহল্লায় প্রমথকেই বেশি ঘুরতে হবে, মজিদ শহরে নেই। বিশ্রাম করুক্ বিনয়, পথে এসেছে। তাড়াতাড়ি বিদায় নিলে প্রমথ।

বিনয় শূন্য পথের দিকে তাকিয়ে ভাবছিল—'নেই, নেই, নেই—কিছু নেই—কিছু নেই।' দুর্দিন নয়, দুর্ভিক্ষ—দুয়ারে দুর্ভিক্ষ!

প্রমথ ফিরে এসে বল্‌লে, ওদের চিঠি পেয়েছে নাকি আপিস? কাকে পাঠাবে? ফেব্রুয়ারীর শেষদিকে আসছে তো? তার আগে খাদ্যসম্মেলনও হয়ে উঠবে না— জিলাবোর্ডের হৈচৈ।

বিনয় বুঝতে পারল না। প্রমথ বুঝিয়ে বল্‌লে, এখানকার মহিলাদের এখানে একটা কনফারেন্স হবে—কলকাতার কোনো মেয়ে কর্মীকে আসতে হবে। কে আসবে, বিনয় জানে কি?

বিনয় কিছুই জান্‌ত না। তা বললে।

দেরী আছে অবশ্যি, কিন্তু জানা দরকার। মেয়েরা সীতাদি'কে নিয়ে যেতে চায় গ্রামে। জেনে যেতে পারলে ওদের প্রচারে সুবিধা হয়। নেত্রীরা না হোক, বাণী রায়, সুধা গুপ্তার মতো কেউ এলে ভালো হয়। অর্‌গ্যানাইজার চাই—যে ঘুরতে পারে।

বিনয় চুপ করে রইল। প্রমথও চলে গেল—একটা তাগিদ দিতে হবে আবার কলকাতায়।

সুধা গুপ্তা! এখানে আস্‌বে না কি? আসুক—দেখে যাক্ ডাক্তার বিনয় মজুমদারকে—দেখুক এসে সে বিনয়কে এই সোনাপুরে। দেখবে, বিনয় কাজের কাছে মাথা হেঁট করে না। দেখবে সে, বিনয়কে ডাক পড়ে খাদ্য সম্মেলনের জন্য, বিনয়কে ডাক পড়ে এ-আর-পি'র জন্য, বিনয়কে চাই কেরোসিনের জন্য, চিনির জন্য। বিনয়কে চাই অসুখে, বিনয়কে চাই দরবারে, চাই দুর্দিনে—দুর্ভিক্ষে।

কিন্তু না, বিনয় আর তার জীবনকে জড়াতে দেবে না ওদের সঙ্গে। সে পর্ব শেষ হয়েছে। তবে এই প্রমথ—মনে পড়ল বিনয়ের—বেশ, প্রমথ বললে এবার সীতার কথা। সহজ ভাবে বললে, অকুণ্ঠিত ভাবে বললে। যেন বেশ বোঝে সীতার খবর রাখা তার পক্ষেও স্বাভাবিক, বিনয়ের পক্ষেও

স্বাভাবিক। এত স্বাভাবিক যে, সে বিষয়ে যেন প্রমথ ও বিনয়ের বেশি কথা বলাও দরকার করে না। কোথাও কোনো কুণ্ঠা ছিল না প্রমথর কথায়। বিনয়ই বা কুণ্ঠাবোধ করবে কেন? না বোধ করলে সীতার খবর এবারও বিনয় জিজ্ঞাসা করলে না কেন? অথচ—সত্যই নতুন খবরও ছিল তো—সীতাও গ্রামে যাচ্ছে। অবশ্য, একেবারে নতুন নয়। সীতাও দেশের কাজ করতে চায়, করতও। বলেছেও বিনয়কে, 'মানুষের বাধায় আমি ভয় করতাম না ডাক্তারদা'। ভয় করি নিজেকেই—মা, ভাই-বোন্ তাদের কি হবে? এইটাই আমার ভয়। এজন্য এম্-এ পড়ার লোভ ছাড়ি—নইলে সীতার পড়া হবে না।' কাজে সীতার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সুবিধা নেই। তারপর মানুষের এই দুর্দিন দেখছে তো সীতা। বিনয়কেও তো সেই লিখেছে প্রথম, 'মানুষ খেতে পারছে না, পরতে পাচ্ছে না।' সীতা জানে—যেমন প্রমথ জানে—বিনয়কে চাই সোনাপুরে। বিনয়কে চাই—সীতা জানে, প্রমথও জানে—বুঝবে না তা সুধা, বুঝবে না তা অমিত। তারা জানে না সামনে দুর্দিন, দুর্ভিক্ষ।

বিনয় যেন ভাববার মত একটা নতুন রহস্য পেল। 'তোমরা দেখছ জাপানের বোমা, আর দেশে আসছে দুর্ভিক্ষ!' দুর্ভিক্ষ! কি তার রূপ? কি তার আয়োজন? বিনয় ভাবতে লাগল। যুদ্ধের একটা ছায়ারূপ সে দেখেছে, সে তা চেনে। অভাব ও মৃত্যু দেখেছে বর্মার পথে—দুর্দিনে। কিন্তু কি এই ছায়াময় মূর্তি—দুর্ভিক্ষ?

বিনয়ের মনে কোনো পরিষ্কার রূপ ফুটে উঠল না। শুধু একটা কথা ফিরে ফিরে কানে ধ্বনিত হতে লাগল, 'চাল নেই, ডাল নেই, তেল নেই; নেই, নেই, নেই।'

৩

বিরক্ত চিত্তে বিনয় ফিরে এসেছিল। নির্মল দাসগুপ্ত কোনো কথাই শুনবে না ; মানবে না কেরোসিন বিলিতে জনসাধারণের সহযোগিতা দরকার। 'এ-সব কমিউনিষ্ট পার্টির চাল,' বেশ বাঁকা সুরে সে বললে।

কমিউনিষ্ট পার্টি বলছেন কেন? দেখ্‌ছেন এতগুলো লোক। শহরের সাধারণ মানুষ এরা, সাধারণেরই সুবিধা-অসুবিধার দাবি—

দাশগুপ্ত বক্রদৃষ্টিতে এবার ইংরেজিতে বললে, সে সব আমি জানি।

কি বলবে বিনয় বুঝতে পারল না ; কেমন যেন অপমানিত বোধ করলে। অথচ দাশগুপ্তের কাছে সে এরূপ ব্যবহার একেবারেই প্রত্যাশা করে নি। প্রথম দিনে এই কৃতী যুবক তার সঙ্গে যেচে আপনা থেকে পরিচয় জমায়, নিজের দুঃখ নিজে বলে গেল। কেরোসিন বিলি তাদের হাতে দেয়, সীতার বিপদে সাহায্য করে, তার বাড়ি এসে এই দাশগুপ্ত বড়দিনের পূর্বে করে গেছে অনেক গল্প—অনেক কথা। বিশেষ করে বলেছে সেই আশ্চর্য মেয়ের কথা—যে ছিল তার বন্ধুর সহপাঠিনী, প্রত্যাখান করে সেই সহপাঠীর ভালোবাসা, আর শেষে হয়েছে কমিউনিষ্ট। বিনয় ভাবছে, কে সেই মেয়ে —আর কে সেই 'বন্ধু' দাশগুপ্তের? সে নিজে নয়ত? তার কথার তীব্রতা দেখে মনে হয়েছে হয়ত বা আসলে দাশগুপ্তই সেই 'বন্ধু'।

বিনয় তার সন্দেহ দূর করবার জন্য আবার এখন বললে, মিষ্টার দাশগুপ্ত, আপনার তো জানা আছে, আমি কমিউনিষ্ট নই। আমাকে একথা বলে লাভ কি?

দাশগুপ্ত এবার বিনয়ের দিকে তাকিয়ে বাঁকা সুরে বললে, ডক্টর মজুমদার, আমি তা বলতেও চাই না। কমিউনিষ্টরা এমন কিছু নয় যার জন্য আপনার কাছে আমি নালিশ করতে যাব—বলে হাসল কঠিন অস্বাভাবিক হাসি।

বিনয় আরও বিমূঢ় হল। বললে, সেরূপ কথাই উঠে না, মিষ্টার দাশগুপ্ত! তাতেই তো আমি বলছি, ওসব কথায় কাজ কি?

মিষ্টার দাশগুপ্ত ফিরে গেলেন, বললেন, কাজ আছে বই কি? আবার ইংরেজীতে তিনি শুরু করলেন, কারণ কমিউনিষ্টরা ভাবল খুব চালাকি করলে। এ-আর-পি'র নামে তেল বিলির ভার আপনারা হাতে নিলেন, তারপর এ-আর-পি'তে সব বদমায়েস কমিউনিষ্টদের আপনি ঢুকিয়ে দিলেন। খিড়কির দুয়ার দিয়ে তারা বিপ্লব করে ফেললে—যেমন ষ্টালিনের বান্দারা করছে। বলে নিজের থেকে হাসতে লাগলেন মিষ্টার দাশগুপ্ত।

বিনয় কি বলবে, বুঝতে পারল না। বললে, দেখুন, সত্য সত্যই এ-আর-পি'কে মজবুত করতে হলে আপনাদের ভালো ভালো যুবকদের নিতে হবে—দল বা মত বিচার করলে হবে না।

মিষ্টার দাশগুপ্ত ফের হেসে উঠে বললেন, বোঝাবেন গিয়ে তা আপনাদের এ-আর-পির কর্তা ডি, এস্, পি, বোস সাহেবকে।

বোস সাহেব কে?

আপনাদের আসল বন্ধু—আই-বি'র ডি, এস্, পি, যার রিপোর্টে আপনাদের কাজ ফাস হয়ে গেছে—এ-আর-পি'কে কি ভাবে আপনি কমিউনিষ্ট দিয়ে ভর্তি করে তুলেছিলেন।

আমি জন তিন চার যুবককে নিয়েছিলাম, রাজেন বাবুর ছেলে দ্বিজু, অখিল, এমনি সব,—তারা কর্মঠ আর সচ্চরিত্র।

হবেই, যখন কমিউনিষ্ট।

এবার বিনয় বিরক্ত হল—মিষ্টার দাশগুপ্ত, আপনি কথা শুনতে চাইছেন না।

দরকার কি? কাজেই দেখছি আপনি কি করছেন, কথা শুনে লাভ কি?

তা হলে শুনবেন না, যা বলতে এসেছিলাম।

বললে শুনব নিশ্চয়ই।

বিনয় একবার ইতস্তত করলে, উঠে পড়বে কি না। তারপর আবার মনে পড়ল, প্রয়োজন তার ব্যক্তিগত নয়, সে সাধারণের কাজে এসেছে।

বিনয় হেসে বললে, শুনুন, কেরোসিনের একটা ভালো ব্যবস্থা করুন। লোকে তেল পাচ্ছে না।

সে আপনাদের কার্যতৎপরতা। কাজের ভার নিয়ে আপনি ছুটে পালালেন কলকাতায়। জাহেদ সাহেব ছুটে পালালেন হুযি্যপুরে।—আপনারও ব্যবসাপত্র আছে, তিনিই বা ব্যবসা না ফাঁদবেন কেন? সমস্ত ব্যাপার এখন এ-ডি-এম্-এর কাছে গেছে রিপোর্টশুদ্ধ—আমাকে বলবেন না।

সাধারণের কথা শুনবেন না?

সাধারণ! এই কমিউনিষ্ট বুলি আপনিও শিখেছেন? মানুষ চিনি, মজুর চিনি, আপনাদের-আমাদের মত বাবুদের চিনি—পেটি বুর্জোয়া—চিনি বুর্জোয়াদেরও—কিন্তু এই পিপ্‌ল্ এল কোত্থেকে? ফরাসী রাষ্ট্র-বিপ্লবের আবিষ্কৃত মিথ্যা, আঠার শ' সত্তুরে তা শেষ হয়ে গেছল—তাকে নতুন উদ্ধার করেছেন মস্কোর নতুন জার, সম্রাট ষ্টালিন।

বিনয় ভালো করে বুঝল না মিষ্টার দাশগুপ্তের কথা। বললে, অত জানি না মিষ্টার দাশগুপ্ত, আমি কিন্তু সাধারণ মানুষ, সাধারণের সঙ্গে চলি, লোকের অবস্থা দেখছি, তাতেই বলতে এসেছি।

ওয়াণ্ডারফুল! একেবারে পিপ্‌ল্‌স্ ওয়ারের ভাষা—

তা আমি রাখি বটে, বিশেষ পড়তে পারি না।

না পড়লেও চলবে, বলতে পারলেই হবে।

বিনয় এবার উঠে পড়াই স্থির করলে। দাশগুপ্তের কাছ থেকে কোনো সাহায্য বা সৌহার্দ্য সে আর প্রত্যাশা করতে পারে না। তবু শেষবারের মত বললে: কিন্তু বলছিলাম, একবার দেখবেন না যাতে এরা জিনিসপত্র পায়?

দেখবেন কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই।' সিভিল সাপ্লাই বিভাগ রয়েছে কেন?

বিভাগ হলেই কি হল? তা হলে তো পাবলিক হেলথ বিভাগ হলেই মানুষ মরত না। যাক্ চলি আমি।

বিনয় ফিরে এল। দাশগুপ্তের ব্যবহারে সে আজ বিরক্ত হয়ে গেছে। বিনয় কমিউনিষ্ট নয়, দাশগুপ্ত তার একথাও আজ বিশ্বাস করবে না। যেন কমিউনিষ্ট না হলে কেউ মানুষের সুখ দুঃখের কথা বলবে না? যেন সাধারণ মানুষ এমন সাধারণ পথে চলতেই পারে না? এই সাধারণের পথ, এপথে চলা এমন কি অসম্ভব? এমন কি অসাধারণ? দাশগুপ্তের কমিউনিষ্ট আক্রোশ না থাকলে সে এই সত্যটা সহজেই বুঝত! বিনয়ের সন্দেহ ঘনীভূত হল—তবে কি সে আক্রোশের পিছনে আছে মিষ্টার দাশগুপ্তের এক ব্যর্থ অন্তরাবেগের ইতিহাস? ভাবতেই দাশগুপ্তের উপরে বিনয়ের বিরক্তি ক্রমে কমে এল। হতভাগ্য যুবক, জীবনে ব্যর্থতার সঙ্গেই কেবল পরিচিত হয়েছে; কার্যক্ষেত্রে সে সার্থকতার পথ পায়নি, অন্তরের দিকেও তার ভালোবাসা ব্যাহত রইল। ওর বুদ্ধি, ওর কর্মনিষ্ঠা, ওর আদর্শবাদ সবই ব্যর্থ বিকৃত হতে চলেছে। মানুষের সামান্য উপকার-অপকারের কথাও সে আর স্থিরভাবে বিচার করতে পারে না। হয়ত সেই 'আশ্চর্য মেয়ের' সঙ্গে দেখা না হলে এত ব্যর্থ হত না দাশগুপ্ত। হয়ত ভালোবাসায় সার্থক হলে এমন ব্যর্থ, বিকৃত হত না মিষ্টার দাশগুপ্তের জীবন। ধীরে ধীরে আপনার সার্থকতার পথ সে করে নিত জীবনের ক্ষেত্রে। সে বিদ্বান্, আদর্শবাদী; কে জানে, হয়ত এই দুর্দিনের আঁধারে সেও বিনয়ের মত এসে দাঁড়াত মানুষের পথে, মানুষের পার্শ্বে। হয়ত সে পেত তাতে তৃপ্তি, সার্থকতা। জীবনে সার্থকতার পথ তো অবরুদ্ধ নয় এখনো—কত কাজ মানুষ করতে পারে, কত কাজ মানুষের সামনে। কত বড় বেদনা পৃথিবী-জোড়া—তোমার আমার অন্তর-জোড়া বেদনার ভার কি তার থেকে বড়? তার থেকে সত্য?

বিনয় একবার থম্‌কে দাঁড়াল চিন্তার মধ্যখানে: 'তোমার আমার অন্তর-

জোড়া বেদনা। কিন্তু তার থেকে বড়, তার থেকে সত্যও আছে নাকি কিছু? আছে বিনয়? বিনয়ের সদিচ্ছা বলতে চায় আছে, আছে, আছে। কিন্তু দাশগুপ্তের প্রসঙ্গ ছেড়ে নিজের দিকে তাকাতেই তার সমস্ত অন্তর যেন বলে উঠল, না, না, না। বিনয় চিন্তার মাঝখানে থম্‌কে দাঁড়াল। আবার যেন দেখ্‌তে লাগ্‌ল—ডিসেম্বরের সন্ধ্যা, নিষ্প্রদীপ কলকাতার ম্লান-প্রদীপ গৃহে সুধা উঠে দাঁড়িয়েছে। উত্তেজিত মুখ-চোখে তার কঠিন শুষ্কতা। বললে, 'অনেক কাজ সাম্‌নে, সময় নেই, বিনয়, আমি চলি। চলে গেল সুধা ধীরপদে, তার পার্শ্বে সুহৃদ্‌ রায়—বিলাতী সুটের মধ্যে, বিলাতী সিগারেট মুখে—সবল, সুদর্শন, বিলাত-প্রত্যাগত ধনীসন্তান; ঠোঁটে ও চোখে তার হাস্যের আভাস। সুধা চলেছে বেলগাছিয়ার বস্তীর লোকদের ওখানে। নিষ্প্রদীপ কলকাতার পথে বিনয় ফিরেছে তার গৃহে—নিষ্প্রদীপ তার মন। সে মন কি একবার এক মুহূর্তের জন্য অস্বীকার করতে পারে এই সত্য—তার ভালোবাসার সত্য? সে সত্য পৃথিবীর সমস্ত সুখ দুঃখের থেকে বড় নয় কি? মানুষের সমস্ত সংকট ও সংগ্রামের থেকেও সত্য নয় কি তা? স্তব্ধ মৌন আকাশের মত সত্য, স্থির আর দিগন্ত-প্রসারী—বিনয়ের সেই ভালো-বাসা। কতটুকু তার কাছে মানুষের পৃথিবী? আর মানুষের বেদনা? বেলগাছিয়ার বস্তীর মজুরেরা কিম্বা কলকাতার আতঙ্কিত মানুষেরা? কে তারা বিনয়ের?

বিনয়ের মনে পড়ল আবার নির্মল দাশগুপ্তকে। মনে মনে শিউরে উঠল বিনয়। আপনার অন্তর-বেদনাকে বড় করে তুললে আপনার ব্যর্থতাকেই মেনে নিতে হবে। তারপর বড় হয় এমনি আক্রোশ, বড় হয় বিকৃতি—জীবনের হয় কঠিনতম পরাজয়।

বিনয় শিউরে উঠল আবার।

সংকোচ কাটিয়ে বিনয় এসে উপস্থিত হল। তাকে দেখে সীতা তো প্রথম অবাক। তারপর তার ছোট্ট দেহ আর সুন্দর মুখের উপর দিয়ে খেলে গেল একটা বিদ্যুতের তরঙ্গ।

ডাক্তার দা'! কবে এলেন? কখন?

বিনয় স্নিগ্ধ হাসি হেসে বললে, কাল এসেছি।

কি মজা! আসবেন লেখেন নি একবারও যে। আমি প্রমথকে বলেছিলাম, 'তিনি আসবেন নিশ্চয়।'

বিনয়ের মনে একটু ছায়া ভেসে উঠল।—প্রমথ বাবু এসেছিলেন নাকি এখানে?

এখানে? কই? আসবে নাকি? চিনু এল সেদিন, সেও তো বলে নি, 'প্রমথ মামা আসবেন'।—সহজ কণ্ঠ সীতার, সহজ মন।

বিনয় বৃথা সংশয় পোষণ করছিল। তখনি বললে, না, আমিও তার আসবার খবর শুনিনি। কেরোসিন নিয়ে ব্যস্ত তো সবাই, আবার তার মাথায় খাদ্য-সম্মেলন।

সীতার মুখে সানন্দ কৌতুক। বলছে, আমি তখনও সোনাপুরে। বললাম, 'ডাক্তার দা'কে খবর দাও তোমরা—কেরোসিন নিয়ে যখন এত গোলমাল।' প্রমথ বলে, 'তিনি আসবেন কি করে?' আমি বললাম, 'আসবেন—তোমরা দেখো।' তারপর কোথা থেকে শিবুদা' নাকি কি শুনে এসেছিল সেবার—ওরা তাই বললে, 'তিনি কলকাতায় থাকবেন।' সেখানে নাকি কে বসে আছেন আপনার জন্য। কে বসে আছেন ডাক্তার দা'?

এই সেই সীতা! সহজ ওর প্রশ্ন। কণ্ঠে হাসি, চোখে হাসি, মুখে হাসি—কিন্তু এ হাসি সহজ, স্নেহপ্রীতি ভরা এ হাসি, যাতে তীক্ষ্ণতা নেই, মায়া জন্মে। বিনয় রাগ করতে পারল না—এমন স্পষ্ট করে, বিনা সংকোচে আর কেউ এ প্রশ্ন করতে পারত?

সহাস্যে বিনয় বলল, তার ঠিকানা হারিয়ে ফেলেছি সীতা।

তেমনি সকৌতুকে উত্তর হল, কিন্তু তিনি তো আপনার ঠিকানা হারান নি?

সবাই কি আর তোমার মত যে আমার ঠিকানা খুঁজে নেবে?

পরিহাসই, কিন্তু শুধু পরিহাস নয়। সীতা তা বুঝলে কি? ততক্ষণ সীতা বলছে, কিন্তু পেয়েছিলেন তা হলে আমার চিঠি! অথচ একটা উত্তরও দিলেন না। আর আমি ঠিকানা কত খুঁজে বার করেছিলাম—প্রমথ নেই, মজিদ শহরে নেই, বিনোদ জানে না, শিবুদা' আপনাদের বাড়ি চেনেন, নম্বর জানেন না।

বিনয় সত্যই পুলকিত হচ্ছিল, বল্‌লে, তারপর?

পেয়ে গেলাম।

কোথায় পেলে?

কেন বলব? কৌতুকোজ্জ্বল চোখমুখ—চিঠির জবাব পর্যন্ত দিলেন না আপনি।

জবাব দিই নি কেমন?

দিয়েছেন? কই এখনো তো পাই নি।

পাও নি? সশরীরে এসে গেলাম, তাতেও তোমার চিঠির জবাব দেওয়া হল না।

একটু লজ্জা এসে মিশল সীতার কৌতুকের সঙ্গে। তা কাটিয়ে বল্‌লে, ও সব বুঝেছি। আস্‌তেন কিনা প্রমথদের তার না পেলে—শুনেছি তারের খবর চিনুর থেকে।

তার আমি পাই নি কিন্তু, সীতা। সত্য কথাটা বলে ফেল্‌ল বিনয় সীতাকে। প্রমথকেও সে বলে নি এ সত্য। তাকে বোঝাতে চেয়েছে, হাঁ, তাদের বিশেষ আহ্বানেই বিনয় এবার এসেছে সোনাপুরে। তার দাম আছে, সস্তা তাকে মনে করতে পারবে না প্রমথ—অমিত ও সুধাদের সহকর্মী যে প্রমথ। কিন্তু সীতাকে এখন বলে ফেলল।

সীতা বললে সত্যি ? তবে এলেন কি করে ?

কেন ? তোমার চিঠিতে।

বেশ বুঝা গেল সীতা এ কথা পরিহাস বলেই মনে করলে। সে বললে, বলেছেন প্রমথকে এ কথা ?

না।

বলবেন। অনুরোধ আমার, একবার বলবেন। তা হলে দেখবেন কি জব্দ হবে। আমার ডবল জিত হবে। বলেছিলাম, 'ডাক্তার দা' কি এসব খবর পেলে না এসে পারবেন ?' ওরা বলে, 'না, তিনি আসবেন না।' বাবুরা তো চলে গেলেন গ্রামে। আমি বাইরে গেছলাম, ফিরে দেখি— বস্তীর মেয়েগুলো কেরোসিন পায় না। আমার ইস্কুলের মালী-বউ, ঝি, দপ্তরীদের বাড়ীর বুড়ী বিধবারা, সবাই এসে বলে, 'ডাক্তার সাহেব কই ?' কি করি ? লিখলাম আপনাকে চিঠি। ওদের কিছু বলি নি। বলব কি ? আপনি জবাব দিলেন না—কার সঙ্গে গল্প করছেন, গান শুনছেন—ভারী রাগ করেছি মনে মনে আপনার উপর। একটা জবাবও দিলেন না।

জবাব দিতে নিজেই এলাম যে।

সে বুঝেছি। যাক্, আমার জিত হয়েছে—এসেছেন আপনি।

তাতেই তোমার জিত ?

নিশ্চয়। ওরা বলেছিল আসবেন না। ওরা কি চিনে আপনাকে ?

তুমি চেনো বুঝি খুব ?

চিনি না ?

বলো তো কি চিনেছ ? শুনি।

সে বলব কেন ? যাচ্ছিলেন কোথা ? কারা 'কল' দিয়েছে—

যাব কোথায় ? তোমার 'কলেই' এসেছি।

সত্যি ?—লজ্জার আভাস আবার দেখা গেল সীতার মুখে ক্ষণকাল। পরে সে বললে, কিন্তু এলেন কখন ?

সোনাপুরে এসেছি কাল। আর তোমার এখানে এখন, এই ক'মিনিট।

কিসে এলেন ?

যশোদা দা'দের গাড়ীতে।

তা হলে চা খান নি এখনো ?

তুমি খাওয়াবে না নাকি নইলে ?

খাওয়াতাম—রুশ চা।

আমার চীনা চা পর্যন্ত চলে—বর্মায় মানুষ, ওটুকু চলবে।

তা'ই তবে চলুক—চিনি নেই বেগমপুরার বাজারে। দুধ পাই নি এখনো কিছুতেই। কিন্তু হার মানি না, তবু চা খাই। একটু বসবেন ? রাঁধবার চাকর-বাকর পাই নি—দপ্তরি বাজার করে দিয়ে যায়। কলেজ এখানে—লোকজন পাওয়া যায় না। পাতা ওল্টান বরং বইপত্রের—আমি চট্ করে চা তৈরী করে আনছি।

তার থেকে থাক্ চা। বসো, গল্প করি। এখনি সন্ধ্যার গাড়ী আস্‌বে—ততক্ষণ তোমার চা করতেই নষ্ট হবে।

সে কি হয়, ডাক্তার দা ?

হয় না ? তবে চলো কোথায় তোমার চায়ের ব্যাপার—বসে গল্প করি, আর দেখি তোমার চা তৈরী করা।

সীতা বিশ্বাস করলে না, ভাবলে পরিহাস। বিনয়ের মনে পড়ল—তোমার একার কোয়ার্টার নয় বুঝি ?

একারই। যাঁদের বাড়ি তাঁরা থাকেন ওপাশে ; মাঝে বেড়া—দুয়ারও আছে। তাতে কি ? চলুন আপনি।

এমন একটা উৎসব করে চা বিনয় কম খেয়েছে। ষ্টোভ আছে, তেল নেই, স্পিরিট নেই। আর কাঠে উনুন ধরে না—জল করতে দুজনায় অসংখ্য বার হাসল আর পরিহাস করলে। আর শেষে খেল চা—সত্যি বিনা চিনিতে, বিনা দুধে।

তবু চা তো।—বল্‌লে সীতা।

হাঁ, তাতে সন্দেহ নেই। একেবারে নির্জলা। মানে, শুধু সজলা—চিনি-দুধের গন্ধও নেই।

এমন চা বিনয় আর খায় নি—এত আনন্দে, হাসিতে, আর তৃপ্তিতে।

কিন্তু সন্ধ্যা হয়ে আসছে। বিনয় বিদায় নেবে। সীতা বল্‌লে, আজ কিন্তু কথা হল না, ডাক্তার দা, আর একদিন আসবেন।

আমারও কিন্তু কথা হল না। আর একদিন না এলে হবে কেন?

দুজনাই হেসে উঠল—দরজায় দাঁড়িয়ে। একটু থেমে সীতা বললে গম্ভীর হয়ে, কিন্তু দ্বিজুর কি হল ডাক্তার দা? রাখতে পারবেন না এ-আর-পি'তে?

বিনয়ের মনে পড়ল। একটু গম্ভীর হল এবার সেও। বললে, দেখি। বুঝছি না ঠিক—পুলিশ রিপোর্ট করেছে, ওরা কমিউনিষ্ট।

শুনেছি তা। কিন্তু রাজেন কাকার একটু সুবিধা হত।

বিনয়ের মনে পড়ছিল দাশগুপ্তের কথা। সীতাকে কথা দিতে ইচ্ছা করছিল তার। কিন্তু দেওয়া কি ঠিক হবে? বললে, দেখি তো—

সীতা এগিয়ে দিতে এলে বড় রাস্তা পর্যন্ত। বল্‌লে, সত্যি, মানুষের কি হবে, ডাক্তার দা? ইস্কুল-কলেজ বোধ হয় আর টি'কবে না। চা'লের দর বাড়ছে, কাপড় নেই; এদিকে কাগজ নেই—বীরুবাবু নাকি তা কিনে নিয়েছেন। প্রমথকে বলে পাঠালাম, 'তুমি বীরুকে বলো না?' সে বলবে না। বলে, 'তার নিজের যদি জ্ঞানবুদ্ধি লোপ পেয়ে থাকে, তা হলে আমি বল্‌লে কি হবে?' বলুন তো, একি অভিমানের সময়?

সীতা একটু থেমে বল্‌লে, সোনাকান্দি গেছলাম সেদিন চিনুর সঙ্গে।

সোনাকান্দি?—বিনয় সবিস্ময়ে বল্‌লে, আমাদের গ্রামে?

হাঁ। দেখলাম আপনাদের বাড়ি। এখনো একজন ক্যাপ্টেন, না কে আছে। নদীর ধারে ছোট একদল ফৌজ থাকে। বাদ বাকী গ্রামে লোক-জন ফিরে এসেছে। ফৌজের কাজকর্ম পাচ্ছে। তবু তাদের কি যে অবস্থা,

তা আর বলব না। পাশের গাঁয়ের যোগীপাড়ায় সেদিনই একটা বউ বিষ খেয়ে মরেছে—হরিনাথ দালালের স্ত্রী। হরিনাথ কোথায় কেউ জানে না। যোগীরা সুতো পায় না, ওরও তাঁত বন্ধ হয়েছিল—খাবে কি করে? প্রথম প্রথম তবু তাদের যোগীরাই সাহায্য করেছে। পরে আর তাও পায় না। হরিনাথ গাঁজা খেতে লাগল। বাজারের আখড়ায় পড়ে থাকৃত; শেষে মাথাই খারাপ হয়ে গেল। দুটো ছেলে, বউটি দেখতে ভালো। নানা রকমের দালাল আস্‌ছে—ফৌজের জন্য তারা দালালি করে। জেলে মেয়ে-গুলোর তো অভাবে পড়ে আর মান লজ্জা কিছু রইল না। কিন্তু যোগীরা বল্‌লে, 'আমাদের যোগীর মেয়েরা কি তেমন? ধর্মজ্ঞান ছিল বউটার। মান-ইজ্জত রাখতে জানত। নইলে ও-ই কি বাঁচতে পারত না? কিন্তু আমাদের যোগীদের মধ্যে ওসব পাবেন না।' শেষ পর্যন্ত বউটি কিসের বিষ খেয়েছে—ছেলে দুটোকে আর অনাহারে দেখতে পারে না। আমরা গিয়ে দেখি—বড় ছেলেটা কাঁদছে। ছোটো ছেলেটা তখনো খুঁজছে—মায়ের বুকে কিছু খাদ্য মেলে কি না। যোগীরা বল্‌ছে, 'ওর দিদি আছে, হয়ত ছেলে দুটোকে সেই এসে নিয়ে যাবে।'—সীতার মুখ বেদনায় আচ্ছন্ন।—সেই হরিনাথের স্ত্রী, আর তার বুকের উপরে খাবার খুঁজছে তার ছোট ছেলে; কোথায় বেরিয়ে গেছে হরিনাথ উন্মাদ হয়ে। আমি আর এসব ভুলতে পারি না। ফিরে এসেই আপনাকে চিঠি লিখলাম। আপনার গ্রাম, আপনার জেলা—আপনি কই?

সত্যই তো, কোথায় বিনয়? তার সোনাকান্দি, তার সোনাপুর—এই তার দশা। তা দেখে সীতা বিচলিত হয়েছে; আর বিনয়? বিনয় কি করছে? সেই সোনাকান্দি—কোথায় তার চাঁদ মিঞা, কোথায় গফুর, কোথায় নবচন্দ্র ধুপী? তারা বিনয়ের কত আপনার।

সীতা বল্‌লে, দেখুন তো, ডাক্তার দা', কত কাজ আজ। আপনাকে লিখব না? প্রমথরই কি অভিমান করা চলে? কত কাজ আজ, কত

কাজ। প্রমথর অমনি ধারা—সবাই যেন ওর মত। বলে, 'দশজনে একত্র হয়ে কাগজ আদায় করো—ছাত্র আর শিক্ষকেরা মিলে।' প্রমথ বুঝবে না—সে কত শক্ত।

সীতার কণ্ঠে যেন আবার স্নিগ্ধ সরসতা এসে গেছে। 'প্রমথর অমনি ধারা—সবাই যেন ওর মত।' সামান্য তুটি কথা। কোনো বৈশিষ্ট্য নেই কি এ ভাষায়, এ বাক্য তু'টিতে? কিন্তু তার মধ্য দিয়ে একটা বিশেষ মানুষের বিশেষ মনেরও দৃষ্টি-ভঙ্গিমা বিনয় দেখতে পাচ্ছে না কি? হয়ত তাও বিশেষ কিছু নয়—বিনয়ই তাতে বিশেষত্ব আরোপ করছে। এইরূপই তো কেমন সহজভাবে সীতা বল্লে—বিনয়কে সে চেনে অপরের থেকে বেশি, তাই তাকে আসতে লিখেছে। সোনাকান্দি দেখে এল—বিনয়ের সোনা-কান্দি—দ্বিধা হল না আর সীতার লিখতে, 'ডাক্তার দা' আস্‌বেন না?' সত্যই বিনয়কে সীতা মিথ্যা দেখে নি। অন্তত সুধার থেকে, অমিতের থেকে বেশি চিনেছে। সীতা জানে, বিনয় কাজের মানুষ। কিছু জানে না আর বিনয়ের সে, তবু জানে বিনয় মানুষের তুঃখ বোঝে; জানে বিনয় এলে সোনাপুরের মানুষ একটা কাজের লোক পাবে। এ কি মিথ্যা বোঝা বিনয়কে? এমন করে বিনয়কে বোঝে আর কে? এমন করে বিনয়ই কি সব সময় নিজেকে বোঝে? বারে বারে ভুল করে, রাগ করে—ভাবে, ছেড়ে দিই সব। কিন্তু সত্যই, এই তো তার কাজ। 'জীবনে সার্থকতার পথ তো অবরুদ্ধ নয় কারো।' আর মিথ্যা বলে নি তো সীতা, 'কত কাজ আজ, কত কাজ'। কেরোসিন, তেল, চিনি, নুন, চাল, কাপড়, কাগজ—কাগজ পর্যন্ত শেষে—

বিনয়ের কত কাজ সাম্‌নে। 'অনেক কাজ সাম্‌নে'—বলেছিল সুধা। সে জানে কি বিনয়ের সাম্‌নে কত কাজ?

কত কাজ, কত কাজ আজ, কত কাজ।

কাজের মধ্যে বিনয় এগিয়ে যাবে না?

৪

একটু সকাল করেই কেরোসিন বিলি দেখে বিনয় ফিরছিল বাসায়। বাড়িতে ঢুকতে যেতেই বিনয়ের দেখা হল বৈকুণ্ঠবাবুর সঙ্গে। দেখেই তাকে বৈকুণ্ঠবাবু বল্লেন, এই যে এসে গেছ। যাক্, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। এসে তো গেছ—কলকাতা তো ছাড়তে পেরেছ। যা কাণ্ড! শুনেছি কিছু কিছু—লীলা এসেছে, লীলা, আমার মেয়ে।

বিনয় জানে তা। না জানবার কারণ নেই। বৈকুণ্ঠবাবুর ইঙ্গিতমত একদিন মহেশবাবুই এই লীলার প্রসঙ্গ বিনয়ের কাছে তুলেছিলেন। আর তার ভূমিকায় মহেশবাবু বলেছিলেন, বিনয়ের পক্ষে বিয়ে করা নিশ্চয়ই প্রয়োজন। নইলে একা সে চাকর নিয়ে এদেশে থাকবে কি করে? দেখবার একজন কেউ চাই তো। বিনয়ের অবশ্য শিক্ষিতা মেয়েই প্রয়োজন—শিক্ষিতা কার্যপটু মেয়ে কি নেই? এই তো লীলা—থার্ড ইয়ারে পড়ে। এখন এ কলেজেই পড়ে—বৈকুণ্ঠবাবুর মেয়ে। বৈকুণ্ঠবাবু অবশ্য বিনয়কে খুবই পছন্দ করবেন, ইত্যাদি। কাজেই বিনয়ের পক্ষে লীলার নাম অজ্ঞাত নয়।

বৈকুণ্ঠবাবু বিনয়কে বল্লেন, আমার বড় ছেলে শৈলেনের বন্ধু প্রমোদ, তোমাদের যশোদা চৌধুরীর ছোট ভাই। তার পেতে-না-পেতেই লীলাকে নিয়ে সে রওনা হয়। নইলে দেরী করলে আসতে পারত না। তবু প্রমোদ বলেই পেরেছে—রেল-ষ্টীমারে সব প্রমোদের চেনা: শেয়ালদ' থেকে সোনাপুর—টাকাকড়ি দক্ষিণা-বখশিস ওর কাছে না পায় কে? তাতেই লীলার বেশি কষ্ট হয় নি। আমি বল্লাম প্রমোদকে, 'তোমরা এলে, ডাক্তারের খবর কি?' প্রমোদ বল্লে, 'জানি না।' ভাবনা হল, এ সময়ে কলকাতা গিয়ে পড়লে তুমি। যাক্ এসে গেছ দশজনের ভাগ্যে।

বিনয় বৈকুণ্ঠবাবুর সংবর্ধনা কি করে করবে বুঝতে পারছিল না। ক্ষীরোদ ঘর-দুয়ার তেমন পরিচ্ছন্ন করে না—বিনয় আগে তাতে রাগ করত,—এখন

বিনয়ের প্রায় তা বরদাস্ত হয়ে গেছে। কিন্তু একজন ভদ্রলোক আসতেই নিজের সেই শৃঙ্খলাহীন ঘর-দুয়ার নিয়ে সবিব্রত বোধ করলে। বৈকুণ্ঠবাবু বড় উকীল, পশার এখনো উঠ্‌তির দিকে, বয়স পঁয়তাল্লিশ ছাড়িয়েছে, হিন্দু সভার সেক্রেটারি, নিজেই এসেছেন তিনি বিনয়ের সঙ্গে দেখা করতে,—এই কথা ভেবে বিনয় উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে, মনে মনে একটু সম্মানিতও বোধ করছে নিজেকে। ক্ষীরোদকে চায়ের জল বসাতে বল্‌ল।

চা?—বৈকুণ্ঠবাবু বল্‌লেন, চা? খেয়েছি একবার। তা দাও আর একবার। কিন্তু চিনি দিও না। হাঁ হে, ছাড়তে হয়েছে। ভালোই হয়েছে, নইলে এদিনে আর একটা মুশকিল হত। বেগমপুরায় নেই, আমাদের বাজারেও চিনি নেই। বজরংলালরা বলে, চালান আসে না, কি করব? তা আসবে কি? যা অবস্থা পথঘাটের দেখলে তো। ভাবনাই হয়েছিল তোমার জন্য, ডাক্তার।

আমার জন্য?

হাঁ হে, তোমার জন্য। তুমি নয় এখানে এখন মনে করো একা, আমরা তোমাদের কেউ নই। তোমার বাবা থাকলে জানতেন, সেই তোমাদের সোনাকান্দির বাড়ি নিয়ে কি মামলা হচ্ছিল একদিন সুরথ সেনের দাদার সঙ্গে। সেনদের কি ভাবে সেবার আমরা হারাই। আমি তখন নতুন উকীল—

বৈকুণ্ঠবাবু গল্পটা বল্‌লেন, বিনয়ও সকৌতুকে শুনল।

সেই বাড়ি তোমাদের পাকা করলেন, দীঘি কাটালেন, কত কিছু তার পরে। শেষে যাও বা তুমি দেশে এলে সেই বাড়িতে, আজ তা দখল করে বসেছেন হুজুরেরা—যুদ্ধ করবেন। এলে তুমি এখানে সোনাপুরে—পোড়া জায়গা সোনাপুর। এখানকার ভাগ্যে তোমার মত লোক জোটে? দশজনে মিলে মানুষকে পাগল করে তোলে! ভালো মানুষ শেষে পালিয়ে বাঁচে। তুমিও পালাই পালাই করছ—

না, না, পালাব কেন? কাজকর্ম থাকে কলকাতায়—

ওই তো, একই কথা। কাজকর্ম কি এখানেই থাকে না? এই তো জিলাবোর্ডের নির্বাচন এল। দেশের দশটা লোকের কাজ করতে হলে এই জিলাবোর্ড ছাড়া চলে না। তা কোথায় তুমি? সোনাকান্দির ওদিক থেকে তুমি দাঁড়াবে, আমরা ভেবে রেখেছি। তোমার দেখাই নেই। কি করি? দাঁড়ালাম আবার আমি বাধ্য হয়ে। একজন হিন্দু দাঁড়ানো তো চাই, হিন্দুসভার লোক ওদিকে আর পাই কই? যাক্, এসেছ এখন—কেদার ভৌমিক আর বাড়াবাড়ি করতে পারবে না।

কেদার ভৌমিক! কে?

সেই সোনাকান্দির যোগী হে। তুমি তো চেনো না। তোমাদের ওপাড়ার নয়—যোগীপাড়ার। হাঁ, যোগীরাও সেবার গাঁ ছেড়ে গেছল, তা ঠিক। খুব লাভ হয়েছে তো যোগীদেরও সকলের—ক্ষতিপূরণও পেয়েছে তখন খুব, এখন আবার জমিও ফেরত পেয়েছে। তাই কেদার ভৌমিকও খুব বাড় বেড়েছে—শহরে ওকালতি করে, সে একটা মেম্বর হবে না? কিন্তু তুমি গ্রামে গেলে আর কথাটি বল্‌তে হবে না। যোগী বল্‌লেই হল? তখন ছিলি কোথায় কেদার ভৌমিক তুই? তখন তো এই ভদ্রলোকের ছেলেরাই সকলের জিনিসপত্র বয়ে এনেছে—বাড়িঘরে পৌঁছে দাও তোমরাই তো, ডাক্তার। এখন বল্‌লেই হল, 'যোগীর ভোট যোগীর হবে।' দেখেছ তো হিন্দুর দুর্দশা? কি আর করব? তাই তো ভাবছিলাম তুমি দাঁড়াবে। যাক্, এখন যেতে হবে কিন্তু একবার সোনাকান্দি। প্রমোদকে বলে রেখেছি—সেও এখন এখানে আছে, থাক্‌বেও—সাম্‌নের মাসের একুশে ভোট হয়ে যাবে, তার মোটর আর তেল পাব। একবার এখনি যেতে হয় কাল-পরশু। তুমি গেলে তারা ভরসা পাবে। শোনে নি বোধ হয় তুমি এসেছ—তা হলে নিজেরাই এসে পড়ত। এখন যাবে কবে?

আমি! আমাকে দিয়ে কি হবে? ভোটের আমি কি বুঝি? আমি দেশে নতুন মানুষ, কাকে জানি?

বিনয়ের কথাটা যেন ধর্তব্যের মধ্যেই নয়—বৈকুণ্ঠবাবু হেসে বল্লেন, কি যে বলো তুমি, ডাক্তার, তুমি কাকে জানো।' না-ই বা জানলে? তোমাকে না জানে কে? সুরেশ দত্তের তো এমনি দুশ্চিন্তা ঢুকে গেছে। এখন ধর-পাকড় থেমেছে—শরীরও তাঁর ভালো হয়ে গেছে। কংগ্রেসের এম-এল-এ'দের শরীরের ওই নিয়ম। তবে মাঝে-মাঝে দু'একবার মুখ বদলাতে জেলে যেতে হয়। আর গেলেই ডাক পড়ে আমার, খাঁ বাহাদুরের—'জেল ভিজিট করতে আসুন।' তখনি শুনি, কি সত্যাগ্রহটা জেলে চালাচ্ছে, রুটি, মাখন, মুর্গী, ডিম, চা, এসব দিয়ে। তাতে, ভবিষ্যতের নির্বাচনটাও তাদের পাকা হয়ে থাকে—দেশসেবী, 'কারা-কৌলিন্য' ঠিক রইল, সময়মত তা কাজ দেবে।

সুরেশ দত্ত কংগ্রেসের এম-এল-এ। বিনয় তাকে সামান্য দেখেছে। বেশি চিনে না, মনে হয়েছে একটু দাম্ভিক। কিন্তু তাকে অত অন্তঃসারশূন্য বলে বিনয়ের মনে হয় নি। তার সম্বন্ধে বৈকুণ্ঠবাবুর মুখে এসব কথা শুনে বিনয় সন্তুষ্ট হল না। এ সব হিন্দুসভার কংগ্রেস বিদ্বেষ—কংগ্রেসকে বিনয় এত ছোট মনে করে না।

বৈকুণ্ঠবাবুও বিনয়ের মনোভাব লক্ষ্য করেছিলেন। তাই বলে চল্লেন, শুনো সুরেশ দত্তের কথা—তোমার শোনাও দরকার। এসেছিল সে আমাকে বলতে, 'আপনি কংগ্রেসের প্রার্থী হলেন না কেন?' আমি বললাম, 'সেটা কি 'অনেষ্ট' হত? কাজের সময় কংগ্রেসের কিছু করি না, এখন ভোটের সময় হঠাৎ হব কংগ্রেসের ভক্ত।' সুরেশ দত্ত বুঝলে, বল্লে, 'কিন্তু কাজ মানে জেলে যাওয়া নয় শুধু। কংগ্রেসের হয়ে জিলাবোর্ডে কাজ করা যায়।' আমি বল্লাম, 'সে তো একটা কথার কথা। খাঁটি কংগ্রেসম্যান্ কখনো কংগ্রেসের নাম ভাঙিয়ে পার পেতে চায় না। এই তো রয়েছে

আমাদের ডাক্তার।' হাঁ হে, বললাম তোমার নাম। বলব না কেন? তোমার থেকে কংগ্রেসের জন্য বেশি করেছে নাকি ওরা কেউ, সুরেশ দত্ত আর যাদব চক্রবর্তী ? বলব না, একশ বার বলব—আহা, কংগ্রেসের এখন আপিস নেই, তুমি মেম্বর হতে পারো নি। ওরাই বা কি মেম্বর ? আপিসই তো ছিল না। বুড়ো বরদা মিত্রকে ডিক্টেটর করে দিয়ে ওরা সরে পড়ল সব। যাক্ গে, সুরেশ দত্ত কি বলে জানো? 'সে তো কমিউনিষ্ট।' আমিও বল্লাম, 'তাতে হয়েছে কি ? কমিউনিষ্ট তো আমিও।'

বিনয় প্রথমেই প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল, কিন্তু এই শেষ কথায় সে কৌতুক বোধ করলে। মনে পড়ল মুসলিম লীগের জাহেদুদ্দীনও বলতেন—খাঁটি কমিউনিজম্ হচ্ছে ইস্লাম, আর আসলে কমিউনিষ্ট তারা মুসলমানরাই। কুতূহলী হয়ে বিনয় শুনতে লাগল, বৈকুণ্ঠবাবু কমিউনিষ্ট।

আমি কমিউনিষ্ট নয় তো কি ? আমরা হিন্দু; জানি 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম', 'আব্রহ্মস্তম্ভ' সব এক ; 'যত জীব তত শিব ;' 'নর আর নারায়ণ এক' —আমরা কমিউনিষ্ট না তো কি ? আমরা জানি, 'পিতা আমাদের মহেশ্বর, মাতা পার্বতী, সমস্ত মানুষ ভাই, পৃথিবী আমাদের গৃহ।' বল্লাম সুরেশ দত্তকে; আমি 'কমিউনিষ্ট।' জানি পৃথিবীতে ছোটলোক বড়লোক এসব ভেদ না দূর করলে হবে না। দূর হবেও। দেখছো তো রুশিয়া—লড়াই করছে কার জোরে ? তবে আমরা রুশিয়া নই—হিন্দুর সাম্যবাদ ওরকম হবে কেন ? তারও একটা নিজস্ব ধরণ আছে, বৈশিষ্ট্য আছে। 'এখনো হয়ত তা বুঝছ না তোমরা—কিন্তু ক্রমশই বুঝবে। ত্যাখো না, ষ্টালিন তার রুশ দেশের মতো করে সাম্যবাদ তৈরী করে নিচ্ছে। কি বলো ?—বিনয় মাথা নেড়ে বল্লে, নিশ্চয়।—ত্যাখো তো, বুঝলে তুমি। এসব কি সুরেশ দ'ত্ত বুঝবে ? ওটা তো একটা অকাট মূর্খ। এসব ওকে বলেই বা কি হত? ও ভেবেছে, ধমক দিলে কেদার ভৌমিকের মত আমি টাকা দিয়ে ওর কংগ্রেসের টিকিট কিনব। যোগী জোলা পেয়েছিস নাকি আমাকে ? আহাম্মক—

বলে হাসলেন বৈকুণ্ঠবাবু—'হিন্দু কমিউনিষ্ট' বৈকুণ্ঠবাবু, যোগী জোলার আস্পর্ধা দেখে হাস্‌বেন বৈ কি! বিনয় তার কথার রূঢ়তায় আঘাত পেল আবার। বৈকুণ্ঠবাবু কিন্তু বলে চললেন, সুরেশ দত্ত পাকা ঘুঘু। ভয় ঢুকেছে মনে—তুমি বুঝি তার এম-এল-এ চাকরি কেড়ে নেবে।

আমি? আমি তো এদেশের ভোটার নই।—সবিস্ময়ে বিনয় বললে।

হবে তো—দেশে যখন আছ। প্রমথরা তোমাকে সবরকমে লীডার করে তুলছে—আর দেশের লোক তোমাকে অত ভালোবাসে। অমনি সুরেশ দত্তের মাথায় টনক নড়েছে। মানুষ তোমাকে ভালোবাসে কেন? তবে তো তোমাকে এখনি জব্দ করতে হয়। আমিও বুঝলাম ওর মতলব। বললাম, 'না, সে জিলাবোর্ডে দাঁড়াবে না। তবে ডাক্তার যদি এ্যাসেম্‌ব্লি কাউনসিলে দাঁড়াতে চায়, তা হলে কথাটা আমাদের ভাবতে হবে। দেশের এমন উপকারী লোক আর কে আছে?' বুঝেছ, অমনি মুখখানা হাঁড়িপানা হয়ে গেল।

বিনয় একটু বিব্রত হয়েই বল্‌লে, আপনি কেন মিছিমিছি ওঁকে এ-সব বল্‌তে গেলেন?—বিনয়ের ভয় হল সুরেশ দত্ত কি ভাববেন? হয়ত বিনয়দের সঙ্গে কাজে আসতে চাইবে না আর, অথচ তাঁকে দরকার।

বৈকুণ্ঠবাবু তখনি বল্‌লেন, মিছিমিছি কেন ডাক্তার? তুমি কি মনে করেছ, ওকে আবার এ্যাসেম্‌ব্লিতে যেতে দোব নাকি? ওই ভাতা আর কমিটির টাকায় মোটা হতে?

সে তো পরের কথা; আর তা দেশের লোকে বুঝবে।

তারাই তো বল্‌ছে, 'কি আপনারা পাঠিয়েছেন সুরেশ দত্তকে?' বলেন আমাকে চাটগাঁয়ের যতীন রক্ষিত—এখানে তিনি একটা মামলায় এসেছিলেন, বল্‌লেন আমাকে, 'আপনারা আসতে পারেন না একজন?' আগামীবার আর ওসব হবে না, ডাক্তার; উপযুক্ত লোক যেতে হবে।

বিনয়ের বুঝতে বাকী রইল না, সে উপযুক্ত লোক বৈকুণ্ঠবাবুর মতে কে।

সে তা বুঝেই বল্‌লে, আপনারা যাবেন যে হয়। কিন্তু সুরেশবাবুকেও চটানো এখন উচিত নয়।

চট্‌ল তো বয়ে গেল। তোমরা ভয় পাও কেন; চটে ওরা কি করবে? দুর্নাম করবে? সে করতে কিছু এখনি বাকী রাখে নাকি? কি যে বলে তোমাদের নামে ঠিক নেই।

বিনয় আবার সজাগ হল।—উনি বলেছেন নাকি কিছু?

উনি নয় তো কে? যাদব চক্রবর্তী, গণেশ, গোকুল? তারা তো ওরই হাতধরা লোক। তোমাদের এখানে কবে মেয়েদের সভা হয়, গোরারা আসে তোমার কাছে, তাই সে কি কথা ওদের! প্রমথ, বিনোদ, বীরু—কাউকে ছাড়ে নি, যায় ওদের আত্মীয়স্বজনদের পর্যন্ত। তোমাকেই কি ছাড়তে চায়? আমি লীলাকে এজন্যই পাঠিয়েছিলাম কলকাতায় পড়তে। শৈলেনও যাবার কথা—বাসা ভাড়া করে রেখেছি। হাইকোর্টে বসবে—এদিকে ব্যবসায়েরও শখ, শোনে কিনা প্রমোদের কাছ থেকে। মিলিটারীর অসংখ্য কনট্রাকট্‌ যাচ্ছে। এখন তো বোমা পড়ছে, কি হয় দেখ—লীলাও এখন থাক্‌ছে। কিন্তু এখানে থাক্‌বে কি করে? দেখছ না, এইটুকু মেয়ে চিনু, তার নামে ওরা কি না বলে? কাউকে ছাড়ে ওরা—প্রমথ, প্রমথর দিদি শৈল, চিনুর মা—সেই আমাদের নারী-বিদ্যামন্দিরের শিক্ষয়িত্রী সীতা রায়—তুমি তো জানো? ইস্কুলটা বেগমপুরায় উঠে গেছে। বিদেশী মেয়ে সে, দশজনের কাজ করে অসুখে বিসুখে, সেবায় নানা ভাবে।

বিনয় উৎকর্ণ হয়ে উঠল—সীতার বিষয়ে কি বলতে চান বৈকুণ্ঠবাবু? তার সঙ্গে বিনয়ের সম্পর্ক নিয়ে ইঙ্গিত করছেন নাকি? বিনয় বল্‌লে, মিস্‌ রায়ের হয়েছে কি?

বৈকুণ্ঠবাবু বল্‌লেন, হবে কি?—হঠাৎ বৈকুণ্ঠবাবুরই যেন বয়স কমে গেছে। বল্‌তে বল্‌তে তিনি যুবক হয়ে উঠলেন।—বুদ্ধি আছে, এই তার অপরাধ। লিখতে জানে, পড়তে জানে, চলতে জানে, বলতে জানে—

তবেই তো সাংঘাতিক কথা!—হিন্দুস্বার্থের রক্ষাকর্তা বিচক্ষণ উকীল বৈকুণ্ঠবাবু আপনার অজ্ঞাতসারেই খুব সজীব ও সতেজ হয়ে উঠলেন; তাঁর বয়স যেন এখন মাত্র চল্লিশ।—আমার কাছে বলতে এসেছিল,—আমি বিদ্যামন্দিরের সেক্রেটারী,—সীতা তখন এখানে ছিল। বলে, 'প্রফেসর ভট্‌চাজের সঙ্গে গল্প করে সে রাত্রিতে।' খোঁজ নিলাম; সে ভদ্রলোক পড়াত, রাত্রিতে নয় বিকালে। সুরেশ দত্ত তবু কি ছাড়ে? বলে, 'সে পড়াবে কেন?' তবে কে পড়াবে? তুই সুরেশ দত্ত—পেটে বোমা মারলে যার কথা বেরোয় না? তারপর বলে আরও বাজে কথা। মহিম রায় জুটল সুরেশ দত্তের সঙ্গে—আমার কাছে বলে তোমার বিরুদ্ধে। সাহসটা দেখো! মহিম রায় একটা 'রোগ্'। আমার মক্কেল আছে, সময় কই? তবু একটা মেয়ের সুনাম-দুর্নামের দায়িত্ব আমার কাঁধে, ক'দিন সন্ধ্যায় সীতা রায়ের খোঁজ-খবর নিলাম। বেশ মেয়ে, আচরণে কোনো গোল নেই। এবার তো ইস্কুলই গেছে বেগমপুরায় —রাখা গেল না এখানে, ফৌজের দরকার। আমি বেগমপুরা বেশি যেতেও পারি না। ওরা এখন বলে, 'প্রমথ ওরা সেখানেও নাকি সীতার বাড়ীতে যায়, মজিদের সঙ্গে তার খুব পরিচয়, কবে একদিন প্রমথর সঙ্গে এক গরুর গাড়ী চেপে সীতা গেছল সোনাকান্দিতে—ফিরেছে অনেক রাত্রিতে।' খোঁজ নোব আবার। কিন্তু সীতা কিন্তু তেমন মেয়ে? কি বলো তুমি? তুমিও তো জানো তাকে। তবে সীতাকেও একটু সাবধান হতে হবে। এই তো সব মানুষ সুরেশ দত্তের মতো—বিদ্যামন্দিরের ক্ষতি করতে পারলে কি ছাড়বে? তোমাকে বলছি, ডাক্তার, তুমিও জানো সীতাকে। হিন্দু মেয়ে, হিন্দু ইস্কুলের শিক্ষয়িত্রী—এই মুসলমানদের সঙ্গে বেশি পরিচয় তার পক্ষে সঙ্গত কি? এটা কিন্তু মজিদেরও বোঝা উচিত, প্রমথেরও বোঝা দরকার। আমাদের হিন্দু-বিদ্যামন্দির, সীতার সঙ্গে তাদের অত পরিচয়টা কি? অতটা সইবে

কেন এখানকার মানুষ? যে জায়গা! দেখছ না, তোমাকে পর্যন্ত পারলে ছাড়ে না।

আমাকে আবার কি করবে?

করবে আবার কি? দেবে এক কথা তুলে। এই তো সেবার বলে দিলে, তুমি কেরোসিনের ব্যবসা হাত করেছ, তোমার সঙ্গে বিলিতী সৈন্যদের চেনা, তোমার বাড়িতে কমিউনিষ্টরা তাদের মেয়ে শুদ্ধ আড্ডা দেয়। এই তো ওদের কাজ। তা তুমিও বলো সীতাকে, যাবে তো তুমি বেগমপুরা—যাবে না? যাবে না কেন? সোনাকান্দির পথেই পড়বে। গেলে আমিও বলব সীতাকে। সোনাকান্দি গেলে যাব বেগমপুরা একসঙ্গেই, কেমন ডাক্তার? চলো তা হলে এই শনিবার সোনাকান্দি—সে তো আধঘণ্টার পথও নয় মোটরে।

বিনয় মনে মনে আশ্চর্য হয়েছিল বৈকুণ্ঠবাবুর চতুরতায়। বল্লে, শনিবার থাক্। সবে এসেছি আমি। কিন্তু শুনলাম সোনাকান্দির লোকদের ভারি দুর্দশা। জায়গা-জমি অনেকে ফেরত পায় নি, ধান্-চা'লও এবার ক্ষেতে হয় নি। তবে খাচ্ছে কি তারা? চাউলের দাম তো দেখছি তেরো টাকার উপর।

যা বলেছ। তবে বলি, চল্ছেও তো দিন মানুষের।

খেতে পাচ্ছে মানুষ?

খেতে পাবে না কেন? কেউ তো বসে নেই—অসুবিধা তোমার-আমার, ডাক্তার। আমাদের ফি বাড়ে না। নইলে সবারই মাইনে বাড়ে, আর সবারই আজ কাজ জুটছে। বসে আছে কে? যুদ্ধে যাচ্ছে, এদিকে কণ্ট্রাক্টের কাজ, এ-আর-পি'র কাজ। তুমি তো একজন এ-আর-পি'র কর্তা। বলো তো এ তোমাদের কি কাণ্ড? আমার চাকরটা গিয়ে জুট্‌ল তোমাদের এ-আর-পি'তে। পোষাক পায়, চা'ল পায়, বুক ফুলিয়ে চলে। তবে এবার কলকাতায় বোমা পড়েছে, এখন

টের পাচ্ছে। বল্‌লাম সেদিন, 'মহী, এবার করবি কি?' বলে, অদৃষ্টে যা আছে হবে। চা'ল পাচ্ছি, মাসিক সতের টাকা বেতন পাচ্ছি।' এই তো অবস্থা। তোমরা চা'ল দিচ্ছ না তো মাথা খাচ্ছ এদের; চাকর পাবে না আর দেশে।

বিনয় হেসে বললে, নইলে ওরাই বা খাবে কি?

আমরাই বা এখন খাই কি? সাড়ে তের টাকা মণ চা'ল। শহরে না কিনে উপায় কি? মুকুন্দ পাল আমার মক্কেল। সোয়া বারো টাকায় দিলে সেদিন, খুব আপ্যায়িত করলে 'আপনাকেই দিলাম।' আসলে তখন ওদের পাইকারি রেট্ বারো টাকাও নয়। মক্কেল হলে-হবে কি, ওরা বাপকেও ঠকাতে না পারলে শান্তি পায় না। আবার-বলে, 'গোপন রাখবেন কথাটা। ইব্রাহিমভাই'র ষ্টক থেকে দিচ্ছি আপনাকে।' কি করি বা আমি? এ সময়ে বছরের চাউল না রাখলে উপায় আছে আর? ভয়ে ভয়ে রাখলাম তো।

কত রাখলেন?—বিনয় জিজ্ঞাসা করলে।

রেখেছি, এক রকম হয়ে যাবে এখন। শত দেড় মণ এখানে। আর বাড়িতে ওরা ধান রেখেছে। পূজাপার্বণ আছে তো—হিন্দুর বাড়ি,—আত্মীয় কুটুম্ব আছে, বিয়ে ক্রিয়াকর্মও তো হতে পারে, সবই তো আছে। জিনিসের নয় দর বেড়েছে, কিন্তু সে সব তো আর বন্ধ করতে পারব না, কি বলো?

বিনয় স্বীকার করলে, ঠিকই তো। কিন্তু তার কৌতুকবোধ আর টিকছে না, সে শ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। অথচ কেরোসিনের জন্য বৈকুণ্ঠবাবুকেও চাই ডিপুটেশ্যানে। শুনে বৈকুণ্ঠবাবু তৎক্ষণাৎ রাজী হলেন। বিনয় বুঝলে প্রমথ এদের চেনে। বৈকুণ্ঠবাবু উঠলেন, তা হলে সোনাকান্দিতে শনিবারে যেতে পায় না? প্রমোদের গাড়ীটা আছে কিন্তু।

এখন থাক।

কিন্তু শীগ্‌গিরই যাওয়া চাই তোমার। বৈকুণ্ঠবাবু প্রস্থান করলেন।

বিনয় নিজের মনে একটা সবিষাদ হাসি হাসল—কোথায় প্রমথর দুর্ভিক্ষ আর কোথায় এদের ভোটের মহড়া।

বিফল-চিত্তে সেদিনও ফিরতে হল। খাঁ বাহাদুর, বৈকুণ্ঠবাবু বেরিয়ে এসে বার বার বলতে লাগলেন, বুঝছেন, ডক্টার মজুমদার, কিছু হবে না। মানুষ মরছে, এদের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। কিছু হবে না এদের কাছে—ডক্‌টর মজুমদার, শুধু শুধু যেচে অপমান। কেন এই অপমান সওয়া?

ডিপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মিষ্টার জে, পি, মিত্র এখন এ জিলার জন্য সিবিল সাপ্লাইর ভারপ্রাপ্ত লোক। বৈকুণ্ঠবাবু ও খাঁ বাহাদুরকে বেশ সাদরেই তিনি গ্রহণ করেন। বিনয়ের আর প্রমথর সঙ্গেও পরিচয় হল তাঁর, আপনিই ডক্‌টার মজুমদার? এসেছেন, ভালো হয়েছে। এত শীঘ্র আসবেন আমরা ভাবিনি। আপনি নেই, মিষ্টার জাহেদুদ্দীনও থাকেন না, নানা নালিশ আসছে নানাথান থেকে। সে সব আপনাদের জানাতে বলেছিলেন আমাকে ডি-এম।

বিনয় বেশ প্রসন্ন ভাবেই বললে, কি নালিশ বলুন না? নালিশ তো আমাদেরও আছে আপনাদের কাছে। তবে সে আবার আপনাদেরই নামে। আপনারাই আসামী, আপনারাই বিচারক।—বলে বিনয় একটু স্বচ্ছন্দ হাসি হাসল।

মিত্র সাহেবকে আপ্যায়িত করে বৈকুণ্ঠবাবু বললেন, নিন্, স্যর, এত কাল কথা ছিল আপনারাই ফরিয়াদী, আপনারাই বিচারক। এবার এঁরা এক ধাপ এগিয়ে গেছেন—আপনারাই আসামী, আপনারাই বিচারক।

মিষ্টার মিত্র হাসলেন না; গম্ভীর হলেন। বললেন, তা নালিশ করবেন।

বিনয় একটু অপ্রতিভ হল। সে আশা করেছিল মিষ্টার মিত্র পরিহাসকে পরিহাস বলেই গ্রহণ করবেন। তাই বিনয় তাঁকে স্বচ্ছন্দ করবার জন্য একটু মোলায়েম হাসি হেসে বললে, মিষ্টার মিত্র, ওটা কথার কথা। নালিশ আবার কি? মানুষের সুবিধা-অসুবিধা আপনাদের না জানালে আপনারা জানবেন কি করে? তাই বললাম 'নালিশ'।

মিষ্টার মিত্র তবু বিশেষ প্রীত হলেন না। 'স্যরে'র পরিবর্তে হয়ত 'মিষ্টার মিত্র' কথাটাও তাঁর ভালো লাগে নি। বললেন, বেশ, তা জানাবেন।

বিনয় বললে, সে জন্যেই এসেছি।

কই? কিছু লিখে এনেছেন—মেমোরেণ্ডাম্?

না, তা আনি নি। তবে শুনুন, খাঁ বাহাদুর বলবেন, তারপরে যদি বলেন একটা মেমোরেণ্ডাম চাই, তৈরী করে দোব।

আগে হাতে পেলে ভালো হত, বেশ বলুন, খাঁ বাহাদুর।

খাঁ বাহাদুর আকর্ণ বিস্তৃত হাসি হেসে বললেন, আমি বলব কি, স্যর? বলবেন ডাক্তার মজুমদার। আমরা খবর রাখি কি, স্যর। খবর রাখেন ডাক্তার মজুমদার, কম্‌রেড চক্রবর্তী।

মিষ্টার মিত্র তখনো বেশ হাকিমের মতই স্থির, মুখে হাসি নেই। বললেন, কিন্তু একজন মুখপাত্র আপনাদের ঠিক করে আসা উচিত ছিল, খাঁ বাহাদুর, যখন একসঙ্গে আসছেন।

খাঁ বাহাদুর তাঁর কথায় একটু সঙ্কুচিত হলেন, সে ঠিক, স্যর। সেদিক থেকে ডাক্তার মজুমদারই সব জানেন। কি বলেন বৈকুণ্ঠবাবু?

বৈকুণ্ঠবাবু গম্ভীরভাবে বললেন, নিশ্চয়ই।

বিনয় একটু বিব্রত বোধ করলে, কিন্তু উপায় নেই। বিনয়ের দিকে তাকিয়ে প্রমথও ইঙ্গিতে জানালে তারই এ ভার গ্রহণ করতে হবে।

বিনয় বললে, কথা তো আর কিছু নয়, এই শহরের আর সহরতলীর কেরোসিন তেল বিলি নিয়ে গোলমাল হচ্ছে।

হাঁ, সে খবর গবর্মেণ্ট পেয়েছেন।

তারই একটা সুব্যবস্থা করা দরকার।

গবর্মেণ্ট তা করছেন।

করছেন? কি ব্যবস্থা হয়েছে অনুগ্রহ করে যদি একটু জানান।

অর্ডার হয়ে গেছে। তবে ডি-এম্ না বলতে তা জানানো যাবে না।

মানে, একটা আইডিয়া পেতে পারি তো? আমাদের কিছু কিছু এদিকে সাজেশ্‌শান্ আছে।

বেশ, দেবেন তা। তার জন্যই তো বলেছিলাম, মেমোরেণ্ডাম এনেছেন কি না।

কিন্তু গবর্মেণ্টের প্রস্তাব কি, জানলে তার উপরই সাজেশ্‌শান্ দেওয়া কি ঠিক নয়? তাই বলছিলাম, প্রস্তাবটা কি যদি আইডিয়া দিতে পারেন।

সে আপনি হয়ত আজকালই পাবেন। আপনার এ-আর-পি'র পোষ্টে পাঠানো হবে। খাঁ বাহাদুর ওঁদেরও আমি একটা কপি দিতে বলতে পারি, যদি ওঁরা চান।

খাঁ বাহাদুর বললেন, আপনাকে ধন্যবাদ, স্যর, দেবেন দয়া করে।

বিনয় বললে, আচ্ছা, তা প্রস্তাবগুলো পেলে আমরা তখন লিখিত সাজেশ্‌শান্ পাঠাব। তার আগে এখন এমনি আলোচনা করতে পারি তো, তাতে বাধা কি?

কি বাধা? কি আলোচনা করবেন, করুন।

মানে, এটা সত্য, তেল ঠিক বিলি হচ্ছে না, সে ব্যবস্থা অসন্তোষজনক হয়ে পড়েছে, আমরাও তা বুঝছি।—বললে বিনয়।

ঠিক। তা নিয়ে বৈকুণ্ঠবাবু, খাঁ বাহাদুর প্রভৃতি উকিলেরা বার লাইব্রেরী থেকে একটা মেমোরেণ্ডামও দিয়েছেন।

বৈকুণ্ঠবাবু আমতা-আমতা করে বললেন, হা, মানে, তার কারণ ওরা ঠিক বলেনি হয়ত। বারের লেখায় একটু গোল আছে।

বেশ, তার কারণটা আপনারা কি বুঝেছেন, তাই বলুন?

বিনয় বিব্রত হল। বললে, অবশ্য আমাদের কথাও ভুল হতে পারে। কিন্তু দেখেছি এ ব্যবস্থা চালু হয়েছিল, কাজও দিয়েছে। তারপর নানা রকম বাধা আসে বাইরে থেকে, তাতেই গোল বাধে।

কি রকম, বলুন।

ধরুন আমাদের 'জনরক্ষা সমিতি'র সঙ্গে সহযোগিতার কথা ছিল, কিন্তু সে সহযোগিতা এ-আর-পি'র কর্তারা গ্রহণ করলে না।

'জনরক্ষা সমিতি'র নাম তো কোথাও নেই, আছে জনসাধারণের প্রতিনিধিদের কথা। তাদের সঙ্গে সংযোগ রাখা সরকার বাঞ্ছনীয় মনে করেন।

বিনয় কথাটার অর্থ বুঝল। বললে, হঁা, অর্ডারের ভাষা তা'ই বটে। কিন্তু এতো সবাই জানি, জনসাধারণের প্রতিনিধি নিয়েই আমাদের 'জনরক্ষা সমিতি' গঠিত হয়। কাজেই অর্থ দাঁড়ায় একই।

মিষ্টার মিত্র এবার হাসলেন, না, তা এক নয়। এক কথা হলে আপনাদের 'জনরক্ষা সমিতি'কে গবর্মেণ্ট স্বীকার করতেন। গবর্মেণ্ট তা করেন নি।

বিনয় বললে, না করুন, আমরা জনসাধারণের সব শ্রেণীর প্রতিনিধি নিয়ে এ সমিতি গঠন করেছি।

ডক্টর মজুমদার, এই পয়েণ্টটা ছেড়ে দিন। গবর্মেণ্ট তা মানে না।

অন্য কথা কি আছে বলুন।

বিনয় বললে, কিন্তু আসল পয়েণ্টই যে এখানে। সাধারণের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সংযোগ রেখে এ সব তেল প্রভৃতির বিলি-বন্দোবস্ত চলবে—শহরে এ-আর-পি'র মারফতে, গ্রামে হাটে বাজারের দোকানে।

ঠিক। তা রাখতে আমরা চেষ্টা করেছি। আপনি ও জাহেদুদ্দীন এ-আর-পি'তে আছেন, অনারারি চিফ্ ওয়ার্ডেন। কেন? জনসাধারণের প্রতিনিধি বলেই তো। আপনারা তেল বিলি করছিলেন; কিন্তু তা বরাবর তদারক করতে চান না, অন্য কাজকর্ম আছে। ঠিক কিনা? বোঝা যাচ্ছে —সর্বসময়ের কর্মীদের নিযুক্ত করা উচিত। এখন সেরূপ কথাই হচ্ছে। মাইনে-করা কর্মচারী না হলে কাউকে দায়ী করা যায় না।

বিনয়ের মাথা নিচু হয়ে গেল। সত্য-সত্যই তারা অনুপস্থিত থেকে এই আমলাতন্ত্রকে কি সুযোগই দিয়েছে তাদের ত্রুটি ধরবার।

এবার প্রমথ কথা বললে, তার মানে, গভর্নমেণ্ট এদের হাত থেকে এ ভার নিয়ে নিচ্ছে? এদেরকে এতটা বিশ্বাস করে না।

সে হবে অন্যায় সিদ্ধান্ত। ওঁরাই চিফ্ হিসাবে সব দেখবেন। ওঁদের পরামর্শ নেওয়া হবে—যেমন এ-আর-পি'র চিফের ক্ষমতা আছে, তা ওঁদের তেমনি থাক্‌বে। তবে জিনিসপত্র বিলির কাজে কর্মচারী রাখতে হবে।

আর জিলার অন্যত্র—গ্রামে, হাটে বাজারে?

প্রেসিডেণ্ট পঞ্চায়েৎরা তা দেখাশুনা করবে; বড় বড় হাটে গঞ্জে আমাদের লাইসেন্সওয়ালা দোকানদার থাক্‌বে।

সে তো আগেও ছিল, এখনো আছে।

আছে। আর তা যে অকেজো গবর্মেণ্ট তা মানেন না।

তা হলে সাধারণের সঙ্গে আপনারা কোনো সংযোগ রাখছেন না?

কে বলে? সে জন্য শহরে ও গ্রামে গবর্মেণ্ট একটা নতুন কন্‌সাল্‌টিং মেশিনারি তৈরী করবেন, ভাবেছেন।

কবে তা তৈরী হবে, কি মূলসূত্র অবলম্বন করবেন সেজন্য?

একটু দেরী হবে। তবে দিন পনের'র মধ্যে সব জানতে পারবেন।

দিন পনের! ততদিন মানুষ করবে কি?—বললে বিনয়।

বাঁকা হাসি হেসে মিষ্টার মিত্তির বললেন, বেঁচে থাকবে। অত ভাববেন না, ডক্‌টার মজুমদার। কেরোসিন তেল না হলেও মানুষ বাঁচবে।

এ প্রস্তাবের কোনো পরিবর্তন হতে পারে না?

সাজেশ্‌শান দেবেন—কিন্তু লিখে দেবেন, নইলে লাভ নেই।

কিছু ফল হল না। বিনয় তবু একবার বললে, আর একটা কথা—এ-আর-পি'তে কয়েকটি কর্মী ছিল; তাদের আপনারা কাজ থেকে জবাব দিলেন কেন?

মিষ্টার মিত্র হেসে বল্‌লেন, ওটা সিবিল ডিফেন্সের বিভাগ, আমরা সিবিল সাপ্লাই,—সেখানেই খোঁজ করবেন। ওর আসল ভার ডি-এস্‌-পি বোস্‌ সাহেবের ওপর। তার শেষ কর্তা ডি-এম্‌। আর এ-ডি-এম্‌ হয়ত সে ভার নেবেন এবার। আমাদের ও নিয়ে দোষী করবেন না।

কোনো লাভ হল না। বিনয় ফিরবার পথে বিশেষ কথা বলতেও চাইল না। খাঁ বাহাদুর ও বৈকুণ্ঠবাবু তখন কথায় মুখর হয়ে উঠছেন। বিনয়ের ভালো লাগছে না। এই সে আবার এদেশের হাকিম জাতীয় জীবদের দেখল। প্রথম দেখেছিল এদের একজনকে যখন সোনাকান্দিতে তার বাড়ি ছাড়তে হয়। তারপর এদের অস্তিত্ব প্রায় সে ভুলে গেছল। চাঁপাডাঙার ক্যাম্পে মিষ্টার সেনকে দেখেছিল পরিহাস-প্রিয় প্রবীণ লোক। তিনি বলতেন, 'আমরা গোলাম-বড় খেলার গোলাম—তবে রংএর গোলাম নই; বদরংএর গোলাম।' এদিকে বিনয় দেখেছে তারপর 'লাস্‌কির ছাত্র' কীনকে, 'কেমিষ্ট্রির ফার্ষ্ট ক্লাশ' দাশগুপ্তকে। বিকৃতচিত্ত দাশগুপ্তকে বিনয় বুঝতে পারে। তার চেয়ে এই মিষ্টার জে, পি, মিত্তিরএর মত লোকদের বোঝা বিনয়ের পক্ষে কঠিন। অথচ, সত্য কথা বললে চিত্তবিকৃতি হয়ত এদের আরও বেশি। নির্মল দাশগুপ্ত তবু একটা ট্রাজেডি; কিন্তু এরা কি? একটা বিকৃতি মাত্র। 'গোলাম-বড় দেশের দেশী গোলাম।' না এলেই বিনয় ভালো করত কি? প্রমথ তাকে নিয়ে এল, অপমান সইতে হল। সুরেশ দত্ত হয়ত ঠিকই করেন—এসব কাজে যান্‌ না।

প্রমথ বিনয়ের মনের অসন্তোষের কথা বুঝেছিল। সে সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি পর্যন্ত এল, বল্‌লে, ডাক্তার দা, খুব বিশ্রী লাগ্‌ছে, না?

বিনয় চাপা দেবার জন্য বল্‌লে, না, না, বিশ্রী কি?

প্রমথ মৃদু হাস্যে বল্‌লে, বিশ্রী সবটাই। তা আর গোপন করবার দরকার কি? আর শুধু কি এই? ভেবে দেখুন সুরেশ বাবুরা আবার দশখানে বাড়িয়ে বল্‌বে, আপনি সরকারের দুয়ারে আমাদের হয়ে হাঁটা-হাঁটি করছেন—আমরা টাকা পাই যে।

বিনয় একটু চম্‌কে উঠ্‌ল। এদিকটা সে ভাবে নি। বল্‌লে, সত্যি? একথা বল্‌বে ওরা?

আরও বল্‌বে। হয়ত মহিম রায় বল্‌বে আপনি খুব তেল চুরি করছিলেন। লোকে শুন্‌বে, বীরু সেনের হাত দিয়ে, মানে আমাদের হাত দিয়েই, তা কণ্ট্রোলের দোকানে আবার বিক্রী করেন। ভাবছেন, কেন এ অপমান সইতে এলেন?—কিন্তু মান-অপমান কি মানুষের থেকে বড়? একবার সন্ধ্যায় যাবেন আমার সঙ্গে এই গরীবদের মহল্লায়? যাবেন শহরের বস্তীতে? শহরতলীর গ্রামে? কেরোসিনের অভাবে মানুষ মরে না? দেখবেন মরেনি;—কিন্তু নিমাই কামারের হাপর আর কাজে করে না, সেই দুপুর রাত পর্যন্ত কাজ ওদের আর নেই। তাঁতী পাড়ায় রাতে আর তাঁত চলে না—সুতো নেই, তেলও আবার নেই। বিড়ির ফ্যাক্‌টরি চলে দিনে—বিড়িওয়ালারা রাতে দোকানই খোলা রাখতে পারে না এখন। রাত্রিতে ওদের মেয়েরা বিড়ি তৈরী করে সকালে ফ্যাক্‌টরিতে এনে দিত, তাদের সে পথ বন্ধ হয়েছে। মেথর পাড়ায় যাবেন? রাতে ওরা বেতের ঝাপি বুন্‌ত; এখত তা বন্ধ। এরা মরেনি—কিন্তু এভাবে বাঁচবে ক'দিন? চা'ল, ডাল, নুন, দেশলাই সবই চাই, কেরোসিনের চেয়ে বেশি তার দরকার। তবু তেল নেই, তাতেই কামারদের সেই লোহা পেটানো আওয়াজ বন্ধ, গ্রামে সেই গভীর রাতের ঠন্ ঠন্ শব্দ শুনবেন না; রাতভর তাঁতীদের তাঁতের ঠক-ঠকানি

শুন্‌বেন না ; দুপুররাত পর্যন্ত বিড়িওয়ালাদের দোকানে শুন্‌বেন না সেই গান আর ওদের স্বচ্ছন্দ ইয়ার্কী ; আর মেথর পাড়ায় শুন্‌বেন না ওদের কলধ্বনি —এই তো মানুষের অবস্থা। তেল না হলে মানুষ মরে না—কিন্তু মরার দিকে এগিয়ে যায়।

বিনয়ের মনে এই অপরিচিত বাঙলা দেশের একটা নিঃসাড়, নিঝুম চিত্র ফুটে উঠ্‌ল—ঘুমের দেশ, মৃত্যুর দেশ যেন তার সান্‌নে।

প্রমথ বল্‌ছে, তেলের অভাবে মানুষ মরে না। যার অভাবে মানুষ মরে, তার ব্যবস্থা কই ? বেগমপুরার হাটে কাল পনে চৌদ্দে উঠে গেছে চা'ল। মজিদ কৃষক সভার কাজ নিয়ে ঘুরছিল, ছুটে গেছে সর্ষেখালির মুখে—ধান সেখানে লুঠ হবে হয়ত। শৈলদি' লিখেছেন, সল্লাখালির জেলে আর মাঝির মেয়েরা মান ইজ্জত বিক্রী করতে শুরু করেছে। শুনেছেন সীতার থেকে সোনাকান্দির যোগীপাড়ার কথা, জেলে মেয়েদের দুর্ভাগ্য। শিবুদা' পাহাড়-খাড়ীর পূবে গেছেন। রেঙ্গুন ফের্‌তা মুসলমান ক'ঘর তাকে ঘিরে কাঁদতে শুরু করলে। গৃহস্থ কৃষক এবার ধান বিক্রী করে দিয়েছে সব, সপ্তাহে চার বেলা উপোস থাকছে অন্যেরা। হালের গরু এক-আধটা বিক্রী করছে লাউতলীর মুসলমান চাষীরা। মিলিটারি কিন্‌ছে। চাষীরা বলে, খড় কই ? খড় গেছে ফৌজের ছাউনিতে। গো-মড়কেও নইলে মরবে গরু—যে গো-মড়ক দেশে! এদিকে বসন্ত ছেয়ে গেল দেশ, জ্বর পেয়ে বসেছে, কলেরার দিন আস্‌ছে। ডাক্তারদা', মান অপমানের জায়গা কই আজ ?

এ-আর-পি' আপিসে কিন্তু তবুও ম্যাজিষ্ট্রেটের অর্ডার এল না বিনয় বুঝলে আমলাতন্ত্র মুখে যত কঠিন কাজে তেমনি ঢিলে। বিনয়ও তখন আর তেমন উৎসাহ পেল না কেরোসিন তেলের বিলি ব্যবস্থা করতে। কাজ চল্‌ছে—হয়ত তার তাড়নায় এ-আর-পি'ও একটু সাবধান হয়েছে।

সেদিন প্রভাত চৌধুরী এ-আর-পি'র পোষ্টে এলেন। করোনেশন ইস্কুলের মাষ্টার প্রভাতবাবু, বীরুরা তাঁর ছাত্র ছিল। বিদ্যার জন্য সকলে তাঁকে সম্মান করে, তাঁর তেজস্বিতার জন্য করে ভয়। বিনয়ের সঙ্গে আগে এক পাড়ায় থাকতেন। কিন্তু সে পাড়া ফৌজের জন্য সেবার সরকার নিয়ে নিলে। প্রভাতবাবু পরিবার বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। পশ্চিমদীঘি শহর থেকে বেশি দূরে নয়, মাইল তিন দূরে। সেখান থেকেই প্রভাতবাবু এখন আসা-যাওয়া করেন। গত বর্ষায় ম্যালেরিয়ায় পড়লে বিনয় তাঁকে এটেব্রিন দেয়। তাতে প্রভাতবাবুর মাথা একটু খারাপও হয়েছিল কয়েকদিন। হেড্‌মাষ্টার রাজেনবাবু বল্‌তেন, 'কবেই বা একেবারে ভালো ছিল? তারপরে যে দিন-কাল প ড়েছে।' এখনো বিনয়ের সঙ্গে দেখা হয় মাঝে-মাঝে প্রভাতবাবুর; একটা সৌহার্দ্যের সম্পর্ক দুজনায়। এবার দেখা হল এই মাস দেড়েক পরে। বিনয় সসম্মানে দাঁড়িয়ে বল্‌লে, এখানে যে আপনি, প্রভাতবাবু?

প্রভাতবাবু সহাস্যে বল্‌লেন, এলাম এখানেই। কাজ করছেন, না?

প্রভাত চৌধুরী যেন একটু বিষণ্ণ, একটু অবসন্নও। ইস্কুলের ফেরৎ বলেই শ্রান্ত বোধহয়, ভাব্‌ল বিনয়। বল্‌লে, কাজ? কাজ কোথায়? দেখ্‌ছেন তো—কেউ তেল পায়,—জোর বরাত; কেউ পায় না—গাল দিয়ে যায়—আমাদের।

প্রভাতবাবু হাস্‌লেন—তবুও তো পাচ্ছে কেউ-কেউ।

সে আপনারা জানেন,—পাচ্ছে, না, পাচ্ছে-না। আপনারা পাচ্ছেন তো?

প্রভাতবাবু বল্‌লেন, পাবার কথা ছিল না। গ্রামের ইউনিয়নের মারফৎ বিলি হয়—বুঝতেই পারেন। কিন্তু আমারও জোর-বরাত—ইস্কুল মাষ্টার। প্রেসিডেণ্টের ছেলে আমাদের ছাত্র ছিল, বাপের হয়ে ব্যবসাটা সে-ই চালায়, তেল বিলি করে। মাষ্টারমশায়কে মারত না। তবে আমি ইস্কুল থেকেই

নিই কেরোসিন ; আপনারা ভালো ব্যবস্থা করেছিলেন—সপ্তাহে দু-বোতল, কোনো রকমে চলে।

বিনয় দেখ্‌ল প্রভাতবাবুর হাসিতেও তার দৈহিক ও মানসিক শ্রান্তি ফুটে উঠছে। বিনয় বল্‌লে, তারপর আপনি আছেন কেমন বলুন তো? তারও আগে বলুন তো কেমন আছে ছেলে-মেয়েরা? আমার তাতাকাকু?

তাতা প্রভাতবাবুর তিন বৎসরের ছেলে। বিনয়কে সেই সপ্রতিভ বালক পেয়ে বসেছিল। কলকাতায়ও তার শিশু ভাগ্নে মনুকে দেখে তাতার কথা বিনয়ের মনে জেগে উঠত মাঝে-মাঝে। এ পাড়ায় কেশববাবুর মেয়ে টুনি আছে—বিনয়ের কাছে আগে মাঝে-মাঝে আসত। কিন্তু সেবার সেই তেলের ব্যাপারে কেমন বিসদৃশ কাণ্ড হল ; টুনি তারপর হতে বিনয়ের থেকে দূরে দূরেই থাকে! বিনয় বুঝেছিল তা। কিন্তু তখন তা দূর করবার মত সুযোগ তার ছিল না। শিশুসংস্পর্শের তেমন অভাব বিনয় জীবনে তত অনুভব করে নি। কলকাতা গেছে—পেয়েছে ইরাকে, মনুকে ; প্রভাতবাবুর সঙ্গে দেখা হলে জিজ্ঞাসা করেছে তাতার খবর।—কেমন আছে তাতা? —মনে পড়ে কি কাকাকে আর?

প্রভাতবাবু হেসে বল্‌লেন, না, একটা কুকুরের ছানা তার এখন সব চেয়ে বড় বন্ধু।

বিনয় হাসতে লাগল। জিজ্ঞাসা করলে, তারপর? অন্যান্য? তাঁরাও কি আমাকে ভুলে গিয়েছেন নাকি? আপনি আছেন কেমন আজ কাল? একটু রোগা-রোগা দেখছি।

প্রভাতবাবু বললেন, জ্বর আর হয় নি। তবে এই ছুটোছুটি, বুঝছেনই তো। তার জন্যই আপনার সঙ্গে একটা পরামর্শ আছে।

বিনয় উঠে দাঁড়াল। বল্‌লে, চলুন না, আমার বাড়িতে? একটু গল্প করব।

গৃহে পৌঁছে বিনয় দেখল, ক্ষীরোদ নেই। বিনয় কাজেই ষ্টোভে চায়ের জল চাপিয়ে দিলে।

প্রভাত চৌধুরী বললেন, খবরের কাগজ এসেছে, না? কাগজটা দিন পড়ি একবার। বিনয় কাগজ দিল। প্রভাতবাবু বললেন, কাগজের দাম দু' আনা হয়ে গেল। নিজেরা আর কিনতে পারি না। এখন ইস্কুল থেকেও খবরের কাগজ রাখা হয় না—লাইব্রেরীর টাকা নেই। কাগজও আর পড়তে পাই না।—এসব নেশা ছাড়াই ভালো।

বিনয়কে মহেশবাবুও বলছিলেন বাংলা কাগজ রাখতে। 'তা হলে টুনির মা-ও দুপুরটা ত উল্টেপাল্টে কাটাতে পারেন—অভ্যাস হয়ে গেছে। কিন্তু কি করি—দু'-আনা দৈনিক।'

বিনয় কথাটা ঘুরিয়ে দেবার জন্য সসংকোচে বললে, ছাড়লেই বা কি রাখলেই বা কি? সত্য-মিথ্যা কিছু পড়ি, সময় কাটে। তর্ক করি,—জার্মানি জিতছে, রুশিয়া মরছে; যার যেমন খুশি ভাবি—এই তো।

প্রভাতবাবু চুপ করে থেকে বললেন—যাক্। যে কথাটা আপনার কাছে বলব তা এই। ইস্কুলের অবস্থা বুঝছেন?

বিনয় জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ভয়ে ভয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকালে, ঠিক বুঝতে পারল না।

প্রভাতবাবু বললেন, নতুন বৎসর আরম্ভ হচ্ছে। আজ পর্যন্ত নতুন ভর্তি তিনটি ছেলে। গ্রামের ছাত্র আসবে না। এই দিনে তাদের পক্ষে টাকাকড়ি খরচ করে পড়াশুনা অসম্ভব। আর শহরের ভদ্রলোকেরা ছেলে-পিলে পাঠাচ্ছে নিরাপদ স্থানে। গত বৎসর প্রায় শ' খানেক ছাত্র চলে যায়। আমাদের ইস্কুল এখানেই টিকে রইল—অন্যত্র যেতে পারি না, অত রিজার্ভ ফণ্ড কই? মাইনে আমাদের খাতায় রইল পঞ্চাশ টাকা। প্রথম পেলাম চল্লিশ, তারপর পঁয়ত্রিশ, তেত্রিশ—এবার বুঝছি কাউকে কাউকে কাজ ছাড়াতে হবে। আমরা পুরনো মাষ্টার, থাকব; গ্র্যাজুয়েট পাই যদি পঁচিশ

টাকা পাব। সকলেরই প্রোভিডেণ্ড ফাণ্ডে এর পূর্বে হাত পড়েছে, এবার নিঃশেষ হবে। তা ছাড়া বিনা মাইনেয় ছুটি নিতে বলা হয়েছে অনেককে— ইস্কুলের আর পথ নেই। আপনি আমার সব অবস্থা জানেন—সে সব বলে লাভ নেই। একমাত্র উপায় প্রাইভেট টিউশুনি; কলেজ এখানে থাকতে তাও আমার ভালো জুটতো। তেমন অবস্থাই বা আজ আর কার আছে? যা টিউশুনি তা হাকিম পাড়ায়, তা করা চলে না। মানের কথা নয়, পশ্চিম-দীঘিতে থেকে সকালে-রাতে সোনাপুরে ওরূপ শিক্ষকতা করা অসম্ভব। হাকিমেরাই রাখবেন না।

বিনয় মাথা নীচু করে বসে রইল। অভিমানী প্রভাত চৌধুরী! প্রায় পনের বৎসর মাষ্টারি করছেন। বীরু ওদের কাছে তাঁর তেজস্বিতার অনেক কথা বিনয় শুনেছে অনেকবার নানা উপলক্ষে। শহরে সকলে তাঁকে ভয় করে, শ্রদ্ধাও করে এজন্য। আর প্রভাত চৌধুরী হাঁটেন সরল রেখায়; বেঁকেচুরে চলবেন না। এখনো বিনয় দেখছে তাঁর কথায় একটা স্পষ্টতা— একটা তীক্ষ্ণ সুস্পষ্টতা,—রিক্ততার স্বীকৃতি পর্যন্ত সুস্পষ্ট তাতে।

বিনয় বললে, তা হলে কি করবেন? অন্য কোনো ইস্কুলের খবর পেয়েছেন নাকি?

অন্য ইস্কুল? এ জিলায় আমাদের থেকে ভালো অবস্থা ক'টা ইস্কুলের ছিল?

তা হলে করবেন কি?

যা সম্ভব। মনে যা হয়েছে, তা বলছি। এ-আর-পি'তে আপনারা জন তিন লোক নিচ্ছেন? কি পোষ্ট তার নাম আমি জানি না। শুনেছি মাইনে চল্লিশ টাকা। আমাকে একটায় নিতে পারবেন আপনি?

আপনাকে!—বিনয় যেন সম্মুখে একটা বোমা পড়তে দেখল।

কেন? বয়স বেশি হয়েছে বলে। হাঁ, পঁয়তাল্লিশের উপরে আমার বয়স।

না, না, সে কথা নয়। আপনি এ-আর-পি'তে কাজ করবেন ?

কেন ?

আপনি এতদিনকার শিক্ষক!—আমি ভাবতে পারি না।

আমি আই বি'তে গেলে আপনি খুশি হতেন ?

বিনয় দেখল সেই অভিমানী প্রভাত চৌধুরী আহত হয়ে প্রদীপ্ত হয়ে উঠছেন। সে বললে, কি বলেন আপনি, প্রভাতবাবু ?

সত্য বলছি। আশ্চর্য হবেন না—হয়ত এজন্যই দ্বিজুরও চাকরি রইল না এদিনে। আমারই এক সহযোগী আজ তিন মাস ধরে আপনাদের কাজ-কর্মের খবর জোগায় আই-বি'তে। তিনি পাবেন একটা চাকরি এবার। কি উপায় ছিল তাঁর আর বলুন তো ? ঘরে বিধবা বোন—দুটি মেয়ে নিয়ে; স্ত্রী আছে, পুত্র কন্যা আছে;—মা আছেন শয্যাশায়িনী; আর পিতার চোখে ছানি পড়েছে—দেখতে পান না। কি অন্যায় হয়েছে তাঁর ?

বিনয় সংকুচিত হয়ে বললে, সে কথা বলছি না। কিন্তু আপনি এত চমৎকার লেখাপড়া জানেন—আমাদের শহরের একটা গর্ব আপনি।

প্রভাত চৌধুরী বিদ্রূপের হাসি হাসলেন, গর্ব হয়ে আর কাজ নেই। এবার আমাকে শুধু বাঁচবার অধিকারটুকু দিক্—আর আমাকে নয়, জন দুই অসহায় মেয়ে আর গুটিচার ছেলেমেয়েকে বাঁচবার অধিকার দিক্।

বিনয় স্তব্ধ হয়ে বসে রইল।

প্রভাত চৌধুরী শান্তস্বরে বললেন, কি, ডকটার মজুমদার? কথা বলছেন না ?

বলছি। আপনাকে এ ক'দিনের কথা আগে বলি, কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কি কথা হয়েছে। তারপর আপনি বল্‌বেন—আমার কি করা উচিত।

বিনয় সব বলল। প্রভাতবাবু তা শুনলেন। নীরব হয়ে রইলেন। পরে বললেন, জানি না কি করব? নির্মল দাশগুপ্ত যেচে এক সময়ে

আমার সঙ্গেও পরিচয় করেছিল। হয়ত তাকে বলতে গেলে আমিও অপমানিত হব। তবু সম্ভবত যাব। কিন্তু আপনি কি কিছুই করতে পারেন না?

যা বলবেন, তাই করব। বিনয় আন্তরিকতার সহিত এই প্রতিশ্রুতি দিলে। মানুষের অনেক দুঃখই সে দেখেছে। দুঃখের তাড়নায় মানুষ কতদূর বিচলিত হতে পারে তাও সে দেখেছে বর্মার পথে। কিন্তু এইখানে, সমাজ-বদ্ধ শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনযাত্রার মধ্যে, প্রভাত চৌধুরীর মতো মানুষ এমন ভাবে একটা আবেদন তার কাছে উপস্থিত করবে, সে তা ভাবতে পারে নি। অথচ সে আবেদনে আজও কোনো অহেতুক অভিমানের রেশ নেই—গ্লানি নেই, লজ্জা নেই।

প্রভাতবাবুর সঙ্গে বিনয় খানিকটা দূর পর্যন্ত এগিয়ে গেল পথে।

প্রভাতবাবু চলে গেলেন—শীতের সন্ধ্যায় দু' মিনিটে সেই মূর্তি মিলিয়ে গেল। বিনয় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল তার গতি—দ্রুতপদক্ষেপে চলেছে তেমনি একটি ঋজু দেহ। তেমনি সরলরেখায় সম্মুখে গেল, পথে কাঁটা আছে কি কাদা আছে, সাপ আছে কি বাঘ আছে, ভ্রূক্ষেপ নেই। এখনো তেমনি গতি প্রভাত চৌধুরীর। দুর্দিনের আঘাত পড়েছে, স্পষ্ট স্বীকার করছেন দুর্দশা,—অকপট সেই স্বীকৃতি। কিন্তু তাতে কোনো অপমানের লক্ষণ নেই। মনে পড়ল প্রমথর কথা, আর এই কথাই বলেছে সীতাও আবার প্রমথর সম্পর্কে,—'মান অভিমানের জায়গা কই আজ?' সত্যই তা নেই। এই আহত-আত্মা প্রভাত চৌধুরী আবেদনের থালা আজ মাথায় তুলে নিয়েছেন, কিন্তু তাঁর শির তাতে অবনত হয়েছে কি? বিনয়ের কেন তবে অপমান বোধ হয় মিষ্টার মিত্তিরের কাছে যেতে? মান-অভিমান সত্যই বড় কথা নয়। মানুষ তার চেয়ে অনেক বড়—মান-মর্যাদায় তার পরিমাপ করা যায় না।

আবার বিনয়ের মনে পড়ল পনর বছর শিক্ষকতা করেছেন প্রভাত চৌধুরী। তারপরে তাঁর এই পরিণতি? ইস্কুলের অবস্থা খারাপ; ছাত্র আসছে না,

মাষ্টাররা মাইনে পাবেন না। পঁয়ত্রিশ, তেত্রিশ, এবার পঁচিশ—যদি পান। পনের বছরের গ্রাজুয়েট শিক্ষকের এই অবস্থা, প্রভাত চৌধুরীর মতো মানুষের। কি হবে করোনেশান্ ইস্কুলের? সীতাও বল্‌ছিল তাই। উঠে যাচ্ছে হয়ত সীতার মেয়ে-ইস্কুলও। শহরের বড় বড় লোকেরা জানে না এসব কথা? গবর্মেণ্ট জানে না? ইস্কুল উঠে যাচ্ছে, তার মাষ্টাররা প্রাণধারণের পথ দেখছেন না, ছাত্ররা আর মাইনে দিয়ে পড়তে পারে না, তাদের কাগজ নেই, কাপড় নেই, পেটে ভাত নেই।

বিনয়ের ফিরতে ফিরতে মনে হল—এ কি দুর্দিন? দুর্ভিক্ষ? না, বর্বরতার সূচনা?

৫

বীরু এল। অনেকদিন পরে বীরুর সঙ্গে এই বিনয়ের দেখা—পূজার সময়ে সেই যে বীরু দেখা করে গেছে আর দেখা করে নি। 'এ শহরের সব কাগজ বীরু সেন হাত করে নিয়েছে; ছেলেদের লেখাপড়া বন্ধ'—এসে অবধি বারবার এই কথা বিনয় শুনেছে। তবু বিনয় তাকে দেখেই আনন্দিত হল, বীরু যে, এসো, এসো—দেখাই নেই এতদিন।

বীরু চিন্তিত সলজ্জ কণ্ঠেই বললে, একটা কাজ পড়েছে, ডাক্তারদা, তাই দেখা করবার কথা মনে পড়ল।

বিনয় তাদের পূর্বেকার সহজ সম্পর্ক বিস্মৃত হতে পারছে না। বলে ফেলল, নইলে? নইলে কথাটা মনে পড়ত না?

সলজ্জ সপ্রতিভ মুখেই বীরু বল্‌লে, মনে পড়লেও কার্যত দেখা করা হত না।

কেন? কাজ? খুব এখন কণ্ট্রাক্ট করছ বুঝি—আর লাভও না?

বীরু বললে, বন্ধুরা যত ভাবেন, তত পাচ্ছি না। তবে যশোদা দা' আমাকে নিজের ঝুঁকিতে ছোট ছোট কণ্ট্রাক্ট করতে দেন, তা করছিও। কিন্তু তত মুনাফা করা এখন সহজ নয়। পাঞ্জাবী, বাঙালী, মারয়াড়ী, হিন্দুস্থানী—সকল জাত এখন এদিকে এসে গেছে। এমনিতে তাতে কণ্ট্রাক্টে লাভ এখন কম থাকছে। তরেপরে যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে, কণ্ট্রাক্ট দাখিল করা থেকে তার টাকা আদায় করা পর্যন্ত প্রত্যেক দুয়ারে দক্ষিণা দিতে হবে—অর্ডালী, কেরাণী, লেফ্‌টেনাণ্ট, কাপ্তেন, সুবাদার—কেউ বাদ নেই। কর্ণেল রড্‌লি ছিল এতদিন আমাদের পক্ষে, তাই আমাদের বাঁচোয়া ছিল। কিন্তু এবার সে চল্‌ল—আসামের দিকে। কাদের হোসেন আর গাঙ্গুরামে মিলে হাজার পঁচিশ টাকা এই কর্ণেলকে সরাবার জন্য খরচ করেছে কলকাতার আর অন্যান্য আপিসে।

বিনয় একটু বিস্মিত হয়ে বল্‌লে, বলো কি, বীরু, খাশ যুদ্ধবিভাগেই এই কাণ্ড?

বীরু হেসে বলল্‌, আগে জানতাম না—এখনি বা কি জানি? শুধু পড়েছিলামই—একই ভিকার্স আর্মষ্ট্রংয়ের কামান দুপক্ষেই ছোঁড়ে। দুপক্ষকে সমানে বিক্রী করে জাহারফের মারফৎ অস্ত্র কারখানার মালিকেরা। যুদ্ধই হচ্ছে মালিকদের বড় ইনডাষ্ট্রি। কত কিছু এবার দেখেছি, তা বলে বোঝাতে পারব না। একই কণ্ট্রাক্টি বছরের পর বছর চলছে। ইট আসছে, তৈরী হচ্ছে এরোড্রোমের ঘর; পরের মাসে হুকুম হচ্ছে, আরও শক্ত করো—ভেঙে ফেলে গড়ো। সেই ইট দিয়েই গড়া হল আবার সেই 'শক্ত' ইমারত। ছাউনি তৈরী করছি। দু'দিন চলল, তৃতীয় দিন হুকুম হল, ফের তৈরী করো। একই খাটিয়া, একই জুতো, কাপড় চপ্পল, কলস—বার বার আসছে, বেরিয়ে যাচ্ছে। রিপোর্ট হল ভেঙে গেছে; নতুন দামে ফিরে আসছে সেই

সব। আর সব চেয়ে মজা কি জানেন? যত ব্যাটা এদের যত ঘুষ খাওয়ায় আর যত পেয়ারের লোক, তারাই তত মনে করে একবার জাপান এলেই হয় —আরও লুঠ, আরও মজা! অন্তত জাপান বোমা-টোমা না ফেললে ওরা ভয়ানক বিরক্ত হয়—বোমা ফেললেই আবার পথ তৈরী হবে, ঘর তৈরী হবে; আরও কণ্ট্রাক্ট পাওয়া যাবে।

বিনয় বললে, তুমিও তাহলে তা’ চাও বীরু—বোমা পড়ুক?

চাইতাম। কিন্তু এ জেলার লোক আমি। জাপান এলে আমি যাব কোথায়? আর তাছাড়া, ভালো হোক মন্দ হোক, জাপান এলে আমার নিস্তার নেই—আমি তো কমিউনিষ্টই।

বিনয় গম্ভীর হয়ে গেল। বীরু এখনো নিজেকে কমিউনিষ্ট বলে পরিচয় দেয়? বিনয় বললে, এখনো?

এতে, এখন আর তখন, কি ডাক্তার দা’?

বিনয় একটু চুপ করে থেকে বললে, তা হলে কিন্তু, বীরু, প্রমথদের সঙ্গে তোমার আরও একটু পরিষ্কার করে নেওয়া উচিত নিজের কথা।

বীরু একটু সংকুচিত হয়ে পড়ল, বললে, কি ভাবে বলুন?

ওদের সঙ্গে প্রায় তুমি দেখা-সাক্ষাৎ করো না আজকাল।

বীরু সংকোচ কাটিয়ে উঠতে পারল না। নিজের সমর্থনে বললে, আগেকার মতো বেশি দেখাই বা করি কি করে? এমনিতেই মহেশবাবু আই-বি’র মারফৎ নানা রিপোর্ট গিয়েছেন আমার বিরুদ্ধে।

মহেশবাবু?

হাঁ। যশোদা দা’ ওঁকে তার কণ্ট্রাক্টের ব্যবসায়ে অংশীদার করলেন না, তাতে উনি চটে গেলেন। যশোদা দা’র বিরুদ্ধে বিশেষ কিছু করতে পারলেন না। আমাকে নিয়েই শেষে আই-বি’র বেশি বাড়াবাড়ি হয়। তবে এই কর্ণেল সেদিকে ঠিক করে গেছে।—বলতে বলতে বীরু উৎসাহিত হয়ে উঠল মিলিটারি কণ্ট্রাক্টারের মতোই।—সেবার ব্রিগ্রেডিয়ার এল। আমাকে বলে,

তুমি এসো দেখা করতে। যেতেই বলতে লাগল, 'হ্যালো সেন, তুমি টেররিষ্ট? তুমি কমিউনিষ্ট? আচ্ছা, কয়টা ফ্যাট আই-সি-এস্‌কে মেরেছ, বলো তো? আর রেড পার্টিজ্যানের মতো কয়টা বেঁটে 'এনিমিকে' মারবে বলো তো?' তারপর ব্রিগেডিয়ারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললে, 'ডেম্‌ড্‌ সিবিল কর্তারা বলে, ওকে কণ্ট্রাক্ট দিয়ো না। ওয়েল, সেন, গোলমাল করবে নাকি তুমি? আমাদের সলিউশন ওরকম কলমে আঁচড় কেটে নয়—উইথ্‌ এ বুলেট। এণ্ড ইউ এপ্রিশিয়েট ইট্‌, ডোনচ্যু?' এই হল কর্ণেল রড্‌লির মেজাজ।—বলতে বলতে এবার বীরুর সঙ্কোচ কেটে গেছে অনেকটা। সে বললে আবার, তাতেই আই-বি'রা চুপ করে গেছে। কিন্তু আমার সঙ্গে বেশি মেশা কি ভালো হবে প্রমথদের পক্ষেও? আপনি তো জানেন যাদববাবু, বরোদাবাবু ওঁদের; এখন সুরেশ দত্তও এসেছেন। আমি কণ্ট্রাক্টের কাজ করি, সেটা দলের হুকুমে, এসব কথা তো আছেই। তারপরে তারা বলে, প্রমথ মজিদদের পকেট থেকে নতুন ছাপা নোট বেরোয় গাদা-গাদা—আসে কোত্থেকে তা? এজন্যে আপনার সঙ্গেও দেখা করতে চাই না বেশি।

বিনয় জিজ্ঞাসা করলে, তার মানে, বীরু?

আপনি আজ এখানকার দলের প্রকাশ্য একজন নেতা—

বিনয় বাধা দিলে, না, বীরু, না—আমি দলের, একথা কে বললে?

বীরু একটু বিস্মিত হল।—আপনি পার্টির সভ্য হন নি?

বিনয় বললে, না, নিশ্চয়ই না। কেন হতে যাবো বলো তো?

বীরু নীরব হয়ে ছিল একটুকু। বিনয় যেন আপনার মনেই উত্তেজিত হয়ে উঠল, তুমি কি করে মনে করো আমি কমিউনিষ্ট পার্টির একজন? কেন? আমি কমিউনিষ্ট হতে যাব কেন?

বীরু সংকোচের সঙ্গে বললে, সবাই দেখছে, কাজ করছেন, তাই মনে করে।

কাজ করছি? কি কাজ করছি? কার কাজ করছি? আমার দেশের কাজ করছি, আমার জাতের কাজ করছি। 'তাদের বাঁচতে দাও, তাদের মেরো না; তাদের খেতে দাও, পরতে দাও; স্বাধীন হতে দাও, মানুষ হতে দাও'—বড় জোর এই তো আমার কথা। আমি তোমাদের রুশিয়া চিনি না, কমিউনিজম্ জানি না, পার্টি বুঝি না। আমি সাধারণ মানুষ, সাধারণের পথে চলি—

বীরুর চোখে হঠাৎ হাসি ফুটে উঠল। বললে এই যথেষ্ট।

বিনয় থমকে গেল, কি যথেষ্ট?

সাধারণের পথ—'পিপলস্ ওয়ে'। এ পথে যদি আপনি চলেন—তারপর পথই আপনাকে পৌঁছে দেবে—

কোথায়? রুশিয়ায়? প্রাণ গেলেও না। আমি ভারতবর্ষের ছেলে—এই আমার পৃথিবী—এ দেশ আমার দেশ।

বীরু এবারও মৃদু হাসল, কিন্তু আর উত্তর দিলে না। একটু পরে বল্লে, তবু আপনার সঙ্গে আমি বেশি মিশলে অমনি আপনার নামে নানা কথা উঠ্‌বে। এমনিতেই উঠেছে—জানেন তো?

বিনয়ের মনে পড়ল। বল্লে, হাঁ বীরু। কিন্তু এ কি জ্বালা বলো তো? তোমাতে-আমাতে সম্পর্ক—ব্যক্তিগত সম্পর্ক; তাও কেন মানুষ এমন গুলিয়ে দিতে চায়? পৃথিবীতে মানুষের সঙ্গে মানুষের এই সম্পর্ক কি কিছুতেই সহজ হয়ে উঠতে পাবে না, সহজ হয় না?

বিনয়ের কথার মধ্যে একটা করুণ অভিযোগের ক্ষীণাভাস দেখা দিল। তার মন চিন্তাসূত্রে অনেক দূরে চলে গেছে—এ মিমেষে তা দেখবার মতো তার সময় ছিল না। তবু সে অস্পষ্ট দেখছিল—সেই ডিসেম্বরের রাত্রিতে এক বিলীয়মান মূর্তি; তার শুষ্ক স্বর—'অনেক কাজ সাম্‌নে, বিনয়, চলি আমি'। দেখছিল সে ক্লান্ত, পীড়িত, কঠিন মুখ অমিতকে—শোনাচ্ছে তার নির্দয় ঘোষণা—'একটা বৃহৎ সত্যের সামনে আমরা, বিনয়,' এখন সময় নেই,

বাড়ী যাও'। বীরুর সঙ্গে কথাসূত্রে বিনয়ের প্রাণের সেই বেদনার স্থানটিই যেন আবার অনাবৃত হয়ে পড়ছিল। তার অন্তরের বেদনা ইতিমধ্যে সে আপনার নিকটই গোপন করতে আরম্ভ করেছিল। বীরুর সঙ্গে তার স্নেহের সম্পর্কটি উপলক্ষ্য করে সেই বেদনাই এই ক্ষণাভাসে জেগে উঠবার সুযোগ পেল।

বীরু কিন্তু অত বুঝল না। সহজ ভাবে বললে, উপায় কি, ডাক্তার দা'? মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক যে একটা সামাজিক জিনিসও, শুধু ব্যক্তিগত ব্যাপার তো নয়। সমাজ যখন সহজ নেই, তখন আমি আপনার কাছে এলে গেলে তা সহজ ভাবে সমাজের দশজনে নেবে কি করে?—বলে বীরু একটু হাসল।

একটু নীরব রইল বিনয়। ব্যক্তিগত সম্পর্কেরও কি একটা দাবি নেই? তারও কি একটা রাজ্য নেই? এ প্রশ্ন ঠিক মত ভাববার বা জিজ্ঞাসা করবার সময় বিনয়ের হল না। সে সহাস্যে বললে, যাই বলুক দশজনে, এ ভাবে নিজের সাফাই তুমি গাইলেও আমি তোমার এ যুক্তি বিশ্বাস করব না, বীরু। তুমি আমার সঙ্গে দেখা করতে পারতে।

বীরু হেসে ফেলল।—পারতামই তো। কিন্তু তখন তো গরজ বুঝি নি।

বিনয় যেন বীরুকে খুব ধরে ফেলেছে, বললে, তবে? তবে অত বড় বড় থিওরি আওড়াচ্ছিলে কেন? ওই তোমাদের কমিউনিষ্টদের অভ্যাস। সহজ কথা, তার পিছনে মস্ত একটা বড় যুক্তি না দিলে তোমরা শান্তি পাও না।

স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠল দু'জনার কথাবার্তা। বীরু হেসে বললে, যুক্তি যখন আছে, তখন না দিলে চলবে কেন?

বিনয় হেসে বললে, বেশ, এখন বলো—হঠাৎ তোমার কি সামাজিক যুক্তিই বা জুটল আজ আমার সঙ্গে দেখা করবার।

বীরু হেসে বললে, 'স্বার্থের গরজ—পেটি বুর্জোয়ার সব চেয়ে বড় তাগিদ', —সামাজিক ভাষা হল এই।

বিনয় বললে, বুঝ্‌লাম না। তোমাদের ওই 'জার্গন' তো দেশের লোকে কেউ বুঝবে না। দেশের লোকের ভাষায় বলো তো ব্যাপারটা কি?

বীরু বল্‌লে, রেণুকে আপনি দেখেছেন—

বিনয় বল্‌লে, রেণু? কে? কই, মনে পড়ে না তো।

দেখেছেন—সোনাকান্দিতে। নীহার সেনের বোন—মানে,বেণুর দিদি।

তোমার শ্যালী তাই বলো না? অত ঘুরিয়ে বলছ কেন?

বীরু একটু সলজ্জ ভাবে বল্‌লে, হাঁ, তাই। তাঁকে দেখেছেন সোনাকান্দিতে, কিন্তু আপনার মনে নেই। বিধবা—একটি ছেলে হয়েছিল একবার, বাঁচে নি। তারপরেই আশু দাশ মারা যায়। রেণুও এসে পড়েন মায়ের ঘাড়ে। কিন্তু মামারা রাখতে চাইত না। একবার ব্যাচারী শ্বশুর বাড়ি যেতেন, আবার সেখান থেকে তারা চালান দিত সোনাকান্দিতে; আবার সোনাকান্দি থেকে ওরা চালান দিত বোসপাড়ায়। যাক্, এখন আর সে গোলমাল নেই। মায়ের কাছেই থাকেন—আর আমাদের বাড়িতেই আমি ওদের সকলকে নিয়ে গেলাম। সে একটা গোলমাল গেছে—সেজন্যই গত পূজার সময় আপনার পরামর্শ চাইছিলাম। কিন্তু আপনাকেও ঠিক মত পেলাম না, আমিও বাইরে ঘুরি। তখন থেকে ওঁরা দু'বোন আর ওঁদের মা আমাদের বাড়িতেই আছেন।

বিনয় জানত এসব। বীরু তো ভালোই করেছে। বললে, এতে আর পরামর্শের কি ছিল, বীরু?

বীরু হেসে বল্‌লে, পরামর্শের ছিল দাদা, তা বল্‌ছি পরে। বাড়িতে তো আমি একা নই, মা-বাবা আছেন, বৌদি আছেন, দাদা নেই, তাঁর ছেলেমেয়েরা আছে,—সে সব তো আপনি দেখেছেন। আমার শ্যালী-শাশুড়ী বাড়িতে এনে রাখা কি রকম ব্যাপার? রেণু আর তাঁর মা—এমন কি বেণু পর্যন্ত—নানা দ্বিধা করেছিলেন। কিন্তু আমিই বা করি কি? খরচ নয় দোব, কিন্তু রাখি কোথায়?

বিনয় বললে, যাক্, সে তো হয়েই গেছে। এখন আর কি ?

এখনও আছে গোলমাল। যা ভেবেছি তা একেবারে মিথ্যা হয় নি। রেণু বিধবা মানুষ, ছেলেপিলে খুব ভালবাসে, বেশিই ভালবাসে। আমাদের বাড়িতে বৌদির ছেলেপিলেরা আছে। সেদিক থেকে ওর মস্ত একটা কাজ জুটে গেল। মাণিক তো খুবই ছোট—মোটে দু' বৎসর পেরিয়েছে। রেণু তাকে একেবারে নিজের করে নিলে। প্রথম প্রথম তাতে সবাই খুশি হয়েছিল। মাণিকও খুব পেয়ে বসেছে তাকে। কিন্তু এখন একটু গোলমাল হচ্ছে। মাণিকের মাও আর মাণিকের নাগাল পান না। মাণিক খুব দুষ্টু হচ্ছে। কিন্তু কেউ তাকে কিছু বলবার জো নেই—অমনি 'রেণু মাসী' আস্‌বে এগিয়ে। এই নিয়ে বৌদি'তে আর রেণুতে কেমন একটু মন কষা-কষিও শুরু হয়েছে। মাণিক তার থেকে বেশি হবে আর 'কারুর, একি সম্ভব ? রেণুর তা সয় না। তার জন্য সে জামা সেলাই করবে, দুধ জ্বাল দেবে, তাকে সে ভাত খাওয়াবে, তাকে স্নান করাবে, সাজাবে, গুছোবে, ঘুম পাড়াবে—আর ঘুমুলে বল্‌বে, 'থাক্, দিদি, আমার কাছেই।' বৌদি বলেন, 'না বোন্ তোমাকে জ্বালাবে'। তাই রেণু আবার মাণিককে তুলে দিয়ে আসবে তার মায়ের কাছে। বৌঠান বলেন, 'প্রতিদিন এ টানাটানি তোমার কেন রেণু ? ওকে অত বাড়িয়ে দিও না। শুক্‌গে আমার ঘরেই।' কিন্তু মাণিকও মাসীর কাছে ছাড়া ঘুমুবে না। সকালে জেগেও কাঁদতে শুরু করবে—'মাসী যাই, মাসী যাই।' বৌঠান রেগে যান, 'লক্ষ্মীছাড়া ছেলে তোর কি হয়েছে ? মানুষকে ঘুমুতে দিবি না ? সে পরের মেয়ে ; ছেলে-পুলে নেই, তাকে তোর বোঝা ঠেলতে এখানে এনেছে নাকি রে ?' ওদিকে রেণু রাগ করে, 'কেন দিদি তোমার অত বাড়াবাড়ি' ? তাতে রেণুদি রাগ করে, 'আমি তোদের গলগ্রহ'। এমনি সব মেয়েদের কাণ্ড। কাকে বোঝাই আমি বলুন ? রেণুদি' তো ক্ষেপে যায়—'বীরুদা, আমাকে সবাই মিলে কোনঠাসা করছে—তুমি বুঝবে না, বুঝবে না।' তাকে থামানো

আরও শক্ত। ভয়ানক ওর অভিমান আর অসম্ভব অবুঝপনা! করি কি?

বিনয় বুঝছে, যতই সাধারণ সহজভাবে বীরু কথা বলুক, তার মনে একটা ব্যথা জমে আছে রেণুর জন্য। খুবই তা স্বাভাবিক। বিধবা সে, সে যেন মনে না করে বীরুদের ওপর সে বোঝা। বিনয় বললে, বীরু, এখন কি করতে চাও?

বীরু যেন সচেতন হল।—আপনার কাছে এসেছি কিন্তু এ কারণে নয়। রেণুদি'র চোখটা খারাপ হয়েছে। কেমন হঠাৎ কি হয়, চোখে কম দেখে; আবার চোখের কোন দিয়ে সামান্য রক্তও পড়ে। ওকে একবার আপনার দেখতে হয়। এজন্য আজ আসা।

বিনয় বললে, বীরু, আমি তো চক্ষু বিশেষজ্ঞ নই।

কথা হল বীরু কি তাকে নিয়ে আসবে—সময় করে? তাদের থাকতে হবে—দু'চারদিন ওরা বিনয়ের বাড়িতে উঠতেও পারে—সোনাকান্দির মজুমদারেরা সেনেদের একেবারে অচেনা নয়।

বীরু বললে, ভাবছিলাম, আপনাকে বাড়ি নিয়ে যাব। সেবার দাদার মৃত্যুর সময় গেলেন বর্ষা-বাদলে, তখন কষ্ট পেয়েছেন। এখন তেমন কষ্ট পেতে হত না, শীতকাল, যশোদাদা'র গাড়ীও আছে।

বিনয় পরিহাস করে বল্‌তে গেল, কেন, তুমি একটা গাড়ী করো না, বীরু? নিজেও ঠিকাদারী করছ এখন—বল্‌তে বল্‌তে বিনয়ের কথাটা মনে পড়ল। একটু গম্ভীর হয়ে সে বল্‌লে, কিন্তু বীরু, একটা কথা, তুমি এই জেলার কাগজ সব কিনে নিয়েছ নাকি? এদিকে স্কুল-কলেজের ছেলেপিলেরা পর্যন্ত লিখতে কাগজ পায় না?

বীরু যেন এবার সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল। তার স্বচ্ছন্দ মনোভাব ঘুচে গেল। বীরু বললে, আপনাকে কে বললে?

বলছে সবাই—মহেশবাবু বলেন, প্রমথও জানে। ওদিকে মেয়ে টিচাররাও বললেন।

প্রমথও বলছে ?—বীরু একটু কুণ্ঠিত হল। পরে অভিমানের সঙ্গেই বললে, একবার প্রমথ আমাকে জিজ্ঞাসা করতেও পারত ?

বিনয় বললে, কি হয়েছে, বীরু, কথাটা মিথ্যা, না ? আমারও মনে হয়েছিল, একথা ঠিক নয়।

বীরু আরও অপ্রতিভ হয়ে বললে, ঠিক তা নয়, ডাক্তার দা', তবে—বীরু সেন পরিষ্কার করে বলতে পারছে না। জানালে, সে বুঝেছিল কাগজের কন্‌ট্রোল হবে—তার মানে, বাজার থেকে কাগজ উবে যাবে। তাই বাজে লোকের হাতে পড়বার আগে সত্যই বীরু এখানকার সব কাগজ কিনে ফেলে। বুদ্ধি আর তৎপরতা এতে সামান্য লাগে নি। সে সব কথা বলতে বলতে বীরুর মনের সঙ্কোচ কেটে গেল, সে বেশ প্রফুল্ল হয়ে উঠল। বিনয়কে সবিস্তারে বললে, কি করে এক এক ব্যবসায়ীর কবল থেকে সে বুদ্ধি করে কাগজ কিনে নিলে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সব। বলে বীরু তারপর আবার একটু বিমর্ষ হল।—আমি ছাত্রদের উপর সেদিন রেগে গেছলাম—ওদের দাবি শুনে! এজন্মে যাদের লেখাপড়ার জন্য মাথা-ব্যথা দেখিনি, সেদিন সে সব ছোঁড়ারাই তেড়ে এসে বলে, 'আমাদের প্রত্যেক ছেলের মাসে দশ দিস্তা করে কাগজ চাই; কন্‌ট্রোল দরে দিতে হবে।' এক দিস্তা নয়, দু' দিস্তা নয়, দশ দিস্তা! মাসে ওরা এক পাতা লেখে না। ভালোভাবে বুঝিয়ে বললাম। শোনে না। শেষে রাগ করে বললাম, দোব না এক তা'ও, যাও। ভেবেছিলাম, প্রমথর সঙ্গে কথা বলে সব ঠিক করব। আমি বাইরে বাইরে ঘুরি; এদিকে প্রমথ কি শুনেছে না শুনেছে, এসব বলে বেড়াচ্ছে।—অভিযোগ ফুটে উঠল বীরুর স্বরে।

বিনয় বললে, প্রমথ কিছু বলে নি। তুমি এখন ঠিক করো সব।

এবার বীরু আরও মুষড়ে গেল।—ঠিক করবার পথে এখন বাধা জুটে গেছে। প্রমোদ কলকাতা থেকে এসে খোজ পেল আমি কাগজ রেখেছি। অমনি বলে, এ কাগজ কেনা হয়েছে যশোদাদা'র টাকায়, অতএব কাগজ

তো যশোদাদা'র—মানে, প্রমোদের। কথা ঠিক। কাগজও যশোদাদা'র গুদামেই রয়েছে। এ নিয়ে আমার সঙ্গে প্রমোদের ঝগড়া চলেছে। এখন যশোদাদা' আমাকে কাল বললেন, 'বীরু, আমি সব বুঝি। কিন্তু তুমিও তো প্রমোদকে জানো। তুমি, ভাই, এটা ছেড়ে দাও—আমার অংশের লাভ না হয় তোমাকেই দোব।' আমি রাজী হই না ; প্রমথদের নানা প্রচারপত্র ছাপতে হয়, ছাত্রদের লেখাপড়ার জন্যও কাগজ চাই। শেষে যশোদাদা' বলছেন, বেশ, 'ওদের জন্য বিশ রীম কাগজ তুমি নিয়ে রাখ।' এখনো আমি রাজী হই নি—কিন্তু রাজী হতে হবে, পথ কই তা ছাড়া? প্রমোদ যেরূপ শয়তান! তা হলে বুঝছেন, আমারই বা কতটুকু হাত আছে এই কাগজের কারবারে?

বিনয় বললে, সে তো আমি বুঝলাম বীরু, কিন্তু লোকে মানবে কেন?

বীরু চুপ করে রইল। তারপরে বলল, তা না মানুক, পার্টির আর ছাত্রদের জন্য বিশ-পঁচিশ রীম কাগজ যদি আমি রাখতে পারি, তা হলে এ গালাগাল আমার সইবে।

বিনয় মনে মনে একটু আশ্বস্ত হল। বীরু সেন প্রমোদ চৌধুরী হয়ে উঠতে পারবে না। যশোদা চৌধুরীও তা হতে পারেন নি—তাঁরও মনে মনে একটা সচেতনতা আছে—একদিন তিনি স্বদেশী ছিলেন। সে গর্ব তাঁর অনেক টাকার লাভের থেকেও বেশি বড়। আর বীরুর পক্ষে তো ওই তার পরিচয়। সে-পরিচয় বিসর্জন দিতে সে এক নিমেষের জন্যও তৈরী নয়, আজই বীরু তা বলেছে। সে কি করে তা হলে টাকার মোহে আপনার পরিচয় খোয়াবে? প্রমথ, মজিদ ওরা বড় অসহিষ্ণু। তাতেই এত বড় ভুল তারা করে, নিজেদের বন্ধুদেরও তারা চেনে না।

বিনয় বললে, বীরু, তুমি এ সব কথা প্রমথর সঙ্গে বুঝে নাও না?

নোব, ডাক্তার দা', সময় পাই না যে। এই তো রেণুদি'র জন্য না হলে কি আপনার সঙ্গেই দেখা করতে পারতাম আজ?

বীরু বিদায় নিলে। রেণুকে তার মাকে শুদ্ধ নিয়ে আসবে ডাক্তার দা'র কাছে দেখাবার জন্য ; তখনি প্রমথ ওদের সঙ্গেও সব কথা পরিষ্কার করে যাবে।

সীতাকে বলতে যাবে না বিনয় কাগজের জন্য আর ভাবনা নেই ? বলতে যেতে হবে বৈকি !

ক'দিন পরে বিনয় গেল মীরপুরে শাহেদুদ্দীন সাহেবের বাড়ি। তাঁর মেয়ে রাবেয়ার খুব জ্বর। খবর পেয়ে বিনয় দেরী করলে না। মীরপুরে লোক জ্বরে ভুগছে, বলেছিল তাকে প্রমথ। মীর সাহেবও বাদ যান নি, সে শুনেছিল। কুইনাইন এম্পূল ও মোটামুটি ওষুধ পত্র নিয়ে বিনয় চলল।

সানন্দে অভ্যর্থনা করলেন তাকে শাহেদুদ্দীন। আগেকার থেকেও তিনি একটু রোগা হয়েছেন। তবু চোখ সকৌতুক দৃষ্টিতে নেচে উঠল, রাবেয়ার খবর পেয়েছ বুঝি ? কিন্তু আমি আর তোমার ভাবীজী ভেবেছিলাম— এবার জোড়ে আসবে তুমি, ডাক্তার।

এমনি স্বচ্ছ অভিনন্দনই বিনয় প্রত্যাশা করেছিল। বিনয়ের মনে তা আঘাত করল। তবু সহজ ভাবেই বিনয় বললে, ভাবীজী কিছুই করেন না, তাই বে-জোড়েই এসেছি। কিন্তু বলুন তো রাবেয়া কেমন এখন ?

শাহেদ নিরাশ হলেন শুনে। বললেন, রাবেয়ার জ্বরটা আছে এখনো বেশ। তবে ম্যালেরিয়াই হবে।

রক্ত পরীক্ষা করা হয়েছে নাকি ?

সবিষাদ হেসে শাহেদ সাহেব বললেন, ওর মায়ের বিশ্বাস মোটেই রক্ত নেই রাবেয়ার। যা আছে তা থেকে আরও রক্ত আবার না নিলেই কি নয় ? আমিও রাজী হলাম। কারণ মোটেই টাকা নেই, রক্ত পরীক্ষার খরচ করতে হল না। তোমারও যন্ত্রপাতি নাকি এখানে নেই।

আপনি পাঠালেন না কেন? সে আমি বুঝে দেখতাম।

একটি ছোট ছেলে বেরিয়ে একবার দেখল কে এসেছেন—হয়ত তার মায়ের ইঙ্গিতে। রাবেয়ার ভাই মঞ্জনু। বিনয় ডাক দিলে, মঞ্জনু। মঞ্জনু ভেতরে পালাল। বিনয় দেখলে রোগা মঞ্জনু আরও যেন রোগা হয়ে পড়েছে। বিনয় বললে, কাণ্ডটা কি বলুন তো, মীর ভাই? রোগ পীড়া হঠাৎ বেড়ে গেল কেন?

সে তো তোমরা বলবে ভাই—কতটা খোরাকে কতটা রোগ আটকানো যায়, কত দিনের অখাদ্য খেয়ে কতটা রোগ বাড়ানো যায়, কতটা ওষুধ না পেলেও মানুষ ভালো হয়, আর কতটা ওষুধের নামে বিষ গিলেও মানুষ বাঁচে। এ সবের ল্যাবরেটরি হচ্ছি আমরা; তোমরা এখন করো না তার গবেষণা? এমন সুযোগ আর পাবে না, ভাই, বৈজ্ঞানিক গবেষণার—খাদ্যের, পুষ্টির, রোগের, দেহের। আরে গো মড়কের পর্যন্ত রিসার্চ চালাতে পার। বাড়িতে গুটি দুই গাই গরু ছিল—তা ছাড়া একটা বলদ আর একটা ষাঁড়। হালের বলদও গেছে, গরুও গেছে একটা। এখন দেখ বাদ-বাকীই বা ক'দিন থাকে। সাম্‌নে আসছে চাষের দিন। এদিকে অসুখ-বিসুখ, গরুর দুধও তেমন বেশি নেই। জাহেদেরও গোয়াল তো প্রায় শূন্য হয়ে গেছে।

বিনয় না বলে পারল না, তাঁর গোয়াল শূন্য হচ্ছে, গোলা ভরে উঠছে; ইব্রাহিমভাইদের দালালিতে এখন সিন্দুক ভরে উঠবে।

ম্লানমুখে শাহেদ সাহেব হাস্‌লেন। কথাটা চাপা দেবার জন্য বললেন, চলো, এখন দেখ তো রাবেয়াকে আগে।

রাবেয়ার ম্যালেরিয়া, বিনয়ের তাতে সন্দেহ রইল না। বললে, একটা ইন্‌জেক্‌শান্ দিই, কি বলেন? অবশ্য রক্ত-পরীক্ষা করা হয় নি,—সে তো হবেও না শীগগির।

যা ঠিক মনে করো, করো। এদেশে আমাদের অবস্থা নেই, ডাক্তারী যন্ত্রপাতিরই বা ব্যবস্থা কই? তোমাদের বিজ্ঞানের ওদেশী ষ্ট্যাণ্ডার্ডের

পুরোপুরি প্রয়োগ এখানে করবে কি করে? একটু আন্দাজে আর অভিজ্ঞতায় মিশিয়ে চালাতেই হবে, তবু মানুষ বাঁচবে।

ইন্‌জেক্‌শান্ হয়ে গেল। শাহেদুদ্দীন হঠাৎ উৎসাহ দেখিয়ে বললেন, বল তো এবার তোমার সেই প্রিয়তমাটির খবর কি? সব ঠিক করে এসেছ তো?

এই কথার জন্যই বিনয় অপেক্ষা করছিল। সীতার সঙ্গে আবার দেখা করবার পরে তার আরও মনে হল, সে সুধাকেও বড় বেশি করে তুলেছিল না কি নিজের মনেই? কিন্তু শাহেদের সঙ্গে একবার সে কথা না বুঝলে বিনয় নিশ্চিন্ত হতে পারছে না—একজন বন্ধুর পরামর্শ চাই।

বিনয় যথাসম্ভব হাসি বজায় রেখে বললে, সে আপনার বিচার্য।

শাহেদুদ্দীন নড়ে-চড়ে বসলেন, বাপ্, এখনো বিচারের বিষয়বস্তু নাকি? তোমরা পারও, ভাই, আচ্ছা নাকাল করতে মানুষকে। নাকাল হও-ও তাই। এখন বলো তোমার ব্যাপার, সব ঠিক তো?

সেইটাই তো আপনার বিচার্য—সব ঠিক, আবার সব বেঠিকও।

—এ যে একেবারে কমিউনিষ্টদের ডায়েলেক্‌টিক্‌স্ চালাচ্ছ।

বিনয় সংক্ষেপে বলে গেল—কেন সে ফিরে এসেছে সোনাপুরে। একটা পর্বান্ত হয়ে গেছে বলেই তার ধারণা। তা' নয় কি?

শাহেদুদ্দীন শুনে একটু চুপ করে রইলেন। পরে বললেন, উঁহু, হয় নি। তোমরা ওস্তাদী তালে সিদ্ধ হয়েছ, ঝাঁপতালে না হলে চলতে পার না। এগিয়ে যাবে দমকে দমকে। এক দমক ফুরোলেই আর এক দমকের জন্য তৈরী হতে হয়! তৈরী হও আবার।

বিনয় হেসে বললে, না, অত দম নেই আমার। আমি সাধারণ মানুষ—ওরা কাজে দম-নেওয়া মানুষ, কাজের কল।

শাহেদুদ্দীন বিনয়ের মুখের দিকে তাকালেন, মুচকি হাসলেন।—অভিমান! ঠিক হচ্ছে, ভাই, ঠিক হচ্ছে। আর-এক দমকের জন্য ষ্টিম তৈরী হচ্ছে। তারই নাম অভিমান।

কিন্তু বিনয়ের মনের পাশে সুধার মতো আরও একটি মূর্তিও ক্রমেই ভেসে উঠছিল—সীতা। তবু বিনয় এ কথা শুনে এখন আবার উৎসুক হয়ে উঠল। আশ্চর্য! এরূপ কথার জন্যই সে অপেক্ষা করছিল না কি? শুনতে চাইছিল এইরূপ একটা আশা ও আশ্বাসের কথা? কলকাতা ছাড়বার সঙ্গে সঙ্গেই কি এরূপ একটা গোপন আশা মনে তার সঞ্চারিত হয়ে উঠতে থাকে,—সুধা তাকে ছাড়তে পারে না? পর্বান্ত আসলে পর্বান্তরেরই সূচনা? অথচ এ ক'দিন সীতার মুখচ্ছবি পরিষ্কার ছিল বিনয়ের মনে। বিনয় সীতার কথা আর তুলবে না তবে আজ শাহেদুদ্দীনের কাছে। কৌতূহল ও উৎকণ্ঠা গোপন করে সহাস্যে সে বললে, অভিমান নয়, দাদা, সত্যই ওরা কাজের মানুষ, কাজই চেনে, কাজই চায়। আমি সাধারণ মানুষ, মানুষকেই চিনি, মানুষকেই চাই।

শাহেদ সাহেবের হাসিতে এবার কৌতুক প্রস্ফুট হয়ে উঠল, অভিমান নয়, ভাই? তবে যে বলব, ঔদ্ধত্য।

কি করে? বিনয় একটু চমকিত হল।

ভালো করেই জানো কাজের প্রতিযোগিতায় কেউ তোমাকে হারাতে পারবে না; সেদিকে তোমার গর্ব আছে। তাই বার বার বলছ, ওরা কাজের মানুষ, কাজ চায়।

সত্য কথা বলেছেন শাহেদুদ্দীন। তবু নিজেকে সমর্থন করবার জন্য বিনয় যুক্তি খুঁজতে লাগল, আমরা ওদের চোখে ডিফিটিষ্ট।

সুহৃদ্ রায়ের কথাও শুনে শাহেদ সাহেব হাসতে লাগলেন।—খুব লেগেছে মনে কথাটা, না? কথাটায় খানিকটা সত্য আছে বলেই কি? না, কথাটা ওই সুহৃদ্ রায় বললে বলে?—বিলাত-ফেরতা, ধনী-সন্তান, সুপুরুষ, বেরিয়ে যাচ্ছে সুধার সঙ্গে কাজে, যখন তুমি রয়েছ দাঁড়িয়ে—সুধার সঙ্গে কথা বলবারই সুযোগ পাচ্ছ না। 'জেলাসি' নয় তো ডাক্তার? ঈর্ষা, সেই 'সবুজাক্ষী দানবী'?

বিনয় হাসতে চেষ্টা করল। হাসল। কিন্তু তেমন স্বচ্ছন্দ হল না তার হাসি। সে বলল, আপনি যখন দেখেন নি সুধাকে, তখন তার স্বপক্ষে অজস্র যুক্তি আপনি দিতে পারেন। কিন্তু বলেছি তো হাজার যুক্তির থেকে অভিজ্ঞতা অনেক সত্য।

শাহেদ সাহেব হেসে বললেন, আর সে অভিজ্ঞতায় আমি তোমার থেকে বড়। না মানো, আরও বড় যিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করছি। ডাকব—তোমার ভাবীজীকে?

বিনয় হেসে বললে, তাঁকেই জিজ্ঞাসা করবেন—আপনার আলীগড়ী বিদ্যায় এসব কুলোবে না।

শাহেদ হেসে বললেন, সাধ করে আবার সমস্ত পুরুষ জাতের অপমান সইতে যাই কেন? সেবারই বলেছেন তোমার কথা শুনে, 'বিধাতা পুরুষ জাতকে শুধু মেয়েদের গোলামই করেছেন, কিন্তু এমন নির্বোধ গোলাম নিয়ে মেয়েদের যে কি দুর্দশা হচ্ছে, তা বিধাতা দেখতে চান না।' আমি বললাম, 'তা কি আর দেখেন না? খুব দেখেন। দেখে একটু মজা পান। আর তার জন্যই পুরুষ জাতকে নিজের বুদ্ধি গোপন করে থাকবার মত বুদ্ধিও জুগিয়ে থাকেন। রাবেয়ার মা বলেন, 'বটে'—

স্বচ্ছ গল্পে শাহেদুদ্দীন জমে উঠলেন। সেই মীর শাহেদুদ্দীন—যিনি সেদিনকার আলীগড়ের গ্র্যাজুয়েট—বেরিয়েছিলেন খেলাফতের যুগে কংগ্রেসের ডাকে, আজ 'মুস্‌লিম কংগ্রেসম্যান' বলে জাত খুইয়েছেন,—তাঁর ঘরে দারিদ্র্য সুস্পষ্ট, ছেলে মেয়ে স্ত্রীর চিকিৎসাও সহজসাধ্য হয় না; এই পঁয়তাল্লিশ বছরের পারে পৌঁছে হয়ত এই রয়েছে তাঁর সম্বল—এই গৃহকোণের মাধুর্যময় সম্পর্কটি।

নানা প্রশ্ন বিনয়ের মনে, তবু সে সানন্দে শাহেদ সাহেবের গল্পে যোগ দিল।

শীতের বেলা পড়ে আসছে। শাহেদ বললেন, কিন্তু ডাক্তার, যাবে একবার গ্রামে? অন্তত দু'একটা দেখে যাও—কাছাকাছি এ পাড়ার।

বড় গ্রাম মীরপুর। আট দশটা পাড়া—হিন্দু মুসলমান সবই আছে। বিনয় তার দু'একটা পাড়া মাত্র দেখে এল ঘুরে। মাত্র দু'একজনের এদের জমি-জেরাত আছে, তারা অবস্থাপন্ন চাষী। বাকি লোক কিছু চাষ করে, কিছু মজুরী খাটে ; কিন্তু অধিকাংশই ক্ষেত-মজুর। অনেকে তার ফৌজে চলে গেছে ; বাড়ি থেকে অনেকে শহরে 'বদ্‌লা' দেয় ; কাছাকাছি ফৌজের ছাউনিতেও কাজ করে। কিন্তু এখন মিলিটারির রাস্তা ঘাট, বাসা, ঘর দুয়ারের কাজ হচ্ছে খুব। তাতেই দিন-মজুর খাটে বেশি লোক। অনেকে আগেই কলকাতার ওদিকে রবারের কারখানা বা অন্য কলে গেছল। তারা এতদিন বাড়িতে টাকা পাঠিয়ে দিত, চল্‌ত একরকম। কিন্তু এখন তাতেও বাড়িতে কুলায় না। সে টাকায় চা'ল-ডালই কিনতে পারে না।

দেখতে দেখতে একটা অবসাদ বিনয়কে চেপে ধরেছিল আস্তে আস্তে,—তীব্র বেদনাবোধ তা নয়। এ গ্রামের দু-একটা পাড়াতে ঘুরেই সে দেখলে সব নিরানন্দ, হতশ্রী—সবারই আজ দুর্দশা। অথচ পথ কই ? কোথায় খাবার ? কোথায় কাপড় ? কোথায় পথ্য ? কোথায় ঔষধ ?

শীতের সন্ধ্যা না নামতেই বিনয় ফিরে যাবে। চা এল। শাহেদুদ্দীন বল্‌লেন, মিষ্টি পেয়েছ ? যাক্, ভায়া, তোমার ভাবীজীর দেখছি তোমার উপর নজর আছে, আমাকে তো চিনি ছাড়িয়েছেন। অন্য কোথাও হয় নি—এ বাড়িতে কিন্তু রেশনিং। চিনি পাবে মজনু আর রাবেয়া—আর সবাই বাদ। দেখছি, তোমার বেলা আবার সে ব্যতিক্রমেরও ব্যতিক্রম হয়েছে।

বিদায় নেবার আগে বিনয় বললে শাহেদুদ্দীনকে, আপনি আসছেন তো ? আপনাকে যে প্রেসিডেন্ট হতে হবে জিলা খাদ্য কমিটির।

অপরাধ ?

নইলে আমি থাকব না। আপনি কংগ্রেস মুস্‌লিম্ ; থাকতেই হবে।

শাহেদুদ্দীন এবার গম্ভীর হলেন।—আর কোনো কংগ্রেস মুসলিম্ আছে, তুমি চেনো, এ জেলায় ?

না।

তবে? কার প্রতিনিধি হয়ে আমি যাব তোমাদের এই ভার নিতে? মুসলমানের নয়—আমি তাদের কেউ নই। কংগ্রেসের নয়—আমি তাদের কাছেও ব্যর্থ, তবু দরকার পড়লে আমাকেই তাঁরা দাঁড় করাতে চান 'মুসলিম ওপিনিয়ন' বলে, এভাবে বানচাল করতে চান আসলে মুসলিম ওপিনিয়নের কংগ্রেস-বিমুখতা। তাতে নিজেরাই ঠক্‌ছি,—অন্য কেউ ঠকে না।

কিন্তু আপনি কংগ্রেসম্যান্ তো?

নিশ্চয়।

তা হলে হবেন না কেন প্রতিনিধি?

কার প্রতিনিধি হব? বললাম না সে কথা? আমি সৈনিক হতে পারি, নায়ক হ'তে পারি না—সে অধিকার নেই। আমি মুসলমানের চোখে জাত খুইয়েছি, কংগ্রেসের পক্ষেও শুধু একটা অকেজো খেলনা,—ডাক্তার, এই আমরা মুসলিম্ কংগ্রেসম্যান্—

বিনয়ের হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল। ধীরে ধীরে বললে, আপনি মজিদদের মুরুব্বি জানি, আপনি কি কমিউনিষ্ট?

নিশ্চয়ই না।—বলে শাহেদুদ্দীন হাস্‌লেন—যতদিন ভারতবর্ষ পরাধীন ততদিন আমার এই একমাত্র পরিচয়—আমি কংগ্রেসম্যান—

শাহেদের মুখে এবার এক শান্ত গর্বের হাসি ও ঔজ্জ্বল্য। বিনয় তা তাকিয়ে দেখল। এমন সুন্দর শান্ত বিষণ্ণ মুখশ্রী সে আর দেখেনি—এই বুঝি আজকের ভারতবর্ষের অন্তরাত্মার রূপ—এই বিষণ্ণ শ্রী।

বিনয়ের সমস্ত মন উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে বলতে গেল, মীর ভাই, আমি এ দেশের জন্য কিছু করি নি, কিছু জানি না। বুঝি না এদেশে আমার পরিচয় কি? সেবার লাউতলীর খালিকুজ্জমানের মাকে দেখেছিলাম—মজিদদের 'বাঈ আম্মা' তিনি। এক ছেলে তাঁর খালিকুজ্জমান সাগর পারে আন্তর্জাতিকের দলে,—কোথায় সে, কে জানে? মহুরুজ্জমানকে সেবার

দিয়ে দিলেন এদেশে সে দলের কাজে, সঙ্গে সঙ্গে দিলেন তাঁর বাড়িঘর। মেদিনীপুরের ঝড়ের সাহায্যে আমি চাইলাম দান। কিছু নেই তখন বাঙ্গি আম্মার। খালেকের দেওয়া গরম-দোলাইখানাই খুলে দিলেন, মেদিনীপুরের ছেলেদের জন্য পাঠালেন তার দোয়া। মনে হয়েছিল, এই বুঝি আমি প্রথম সত্যাগ্রহী দেখলাম—কমিউনিষ্টদের বাঙ্গি আম্মা। তবু কিন্তু বুঝি নি—আমার পরিচয় কি? সে কিন্তু জানলাম আপনার মুখে এবার এই কথায়। আমার কাছে আমার পরিচয় এবার পরিষ্কার হয়ে উঠেছে।

বাধা দিয়ে শাহেদুদ্দীন হেসে বললেন, ওটা আমার পরিচয়, ডাক্তার; তোমার পরিচয় তা নাও হতে পারে। তুমি আমার থেকে বছর পনের-কুড়ি পরে এসেছ। নূতনতর পরিচয়ের সুযোগ তুমি পাচ্ছ। তাকে মানবে না কেন—যদি সত্য বুঝতে পার?

বিনয় আবেগময় কণ্ঠে বল্‌তে গেল, না, না, ভারতবর্ষের মানুষের এ ছাড়া অন্য কোন পরিচয় নেই—

এ ছাড়া না হোক, এ শুদ্ধই আরও বৃহৎ পরিচয় তার হতে পারে। চলো এখন। ডাক্তার, চলো, রাবেয়া আর তোমার ভাবীজী নইলে শুনবেন না।

পরিহাসে আবহাওয়া সহজ করে দিয়ে শাহেদুদ্দীন গেলেন বাড়ির ভিতরে। ততক্ষণ একা ঘরে বিনয় আপনার উদ্দীপনায় আপনি চঞ্চল হয়ে উঠল। সে আজ তার নিজের পরিচয় জেনেছে। যা-ই বলুন মীর শাহেদুদ্দীন, তাঁর মুখের কথায় নয়, তাঁর মুখের বিষণ্ণ মুখশ্রীতে বিনয় দেখেছে তাঁর রূপ,—দেখেছে ক্লান্ত, বিষণ্ণ ভারতবর্ষের যুগযুগের দৃষ্টি।

বিনয় ঘরের মধ্যেই উত্তেজনায় পায়চারি করতে লাগল।

জামিনে বেরিয়ে এসেছেন শিবুদা'। পাহাড়খাড়ীর দিকে বাজারে দু'গাড়ী চা'ল লুঠ হচ্ছিল, ওরা লুঠ করছিলেন—পুলিশের এই অভিযোগ। এবার তদন্ত হবে অভিযোগের।

চা হতে লাগল। বিনয় বললে, আপনি ফিরছেন কবে পাহাড়খাড়ী? আজই? একবার সীতার সঙ্গে দেখা করে যাবেন না বেগমপুরায়?

শিবুদা' বললে, দেখা করব?—পরক্ষণেই মনে পড়ল,—কিন্তু প্রমথ যে বলেছে এখনি পাহাড়খাড়ী যেতে। সেখানে লোকজন ভয় পেয়েছে।

শিবুদা' বয়সে বড়, তবু প্রমথ ও মজিদকে তিনি ভয় করেন। ওরা রাজনীতিক বুদ্ধিতে পাকা, শিবুদা'র সেই বালাই নেই। কাজেই প্রায়ই তাঁকে জবাবদিহি করতে হয়—কেন পথ ভুল করলেন। বিনয় তাতে মনে মনে হাসে, দুঃখও পায়। শিবুদা'র পথে শিবুদা' চলেন; কমিউনিষ্ট দৃষ্টিতে তা ভুল পথ হলে উপায় কি? তিনি পথের মানুষকে ধরে 'কমিউনিষ্ট পথ' বোঝাতে বসে যান, ততক্ষণে তাঁকে দেওয়া কাজ পণ্ড হয়। তাঁকে পেলেই তাই সীতা আর বিনয় তাঁর সঙ্গে উল্টো তর্ক করে; তিনিও তাদের বুঝোবেনই। গ্রাম ছাড়াবার সময় শিবুদা' সেবার গান্ধীভক্ত ভূতনাথবাবুর সঙ্গে গিয়ে হঠাৎ জুটলেন। পুলিশও তাঁকে ধরে চালান দেয়। কি করবেন শিবুদা'? 'একজন কংগ্রেসের নেতা জেলে যাবেন, কেউ 'কংগ্রেস জিন্দাবাদ'ও বলবে না?' এই হল শিবুদা'র সহজ কৈফিয়ৎ। এবারই বা হয়েছিল কি? বিনয় জিজ্ঞাসা করলে।—শিবুদা', প্রমথবাবু কিন্তু চটে গেছেন। আপনি কেন চা'লের গাড়ী লুঠ করলেন।

শিবুদা তখনি আপত্তি করলেন, আমি লুঠ করলাম কি করে?

তা হলে আপনাকে ধরলে কেন?

ধরলে সেই সয়তান এ-এস-আই'টা—শরৎ চক্কোবর্ত্তী। আসল 'ফিফ্থ্ কলাম' হচ্ছে এই শরৎ চক্কোবর্ত্তী। বহুবার নিজে জব্দ হয়েছে ; সুবিধা পেল, এবার তাই জব্দ করলে।

সুবিধাটা করে দিলেন কেন ?

আমি করে দিলাম কি করে ? ভুখ-মিছিলের কথা ছিল আগে, আমরা তা থামিয়ে দিই। মাষ্টার মশায়, সুধীর বোস, বলেন সবাইকে, 'গ্রামের চা'ল গ্রামে রাখো।' হাটে সেদিন অত চাউল, গাড়ী-ভরতি চালান যাচ্ছে—কিনেছে ইব্রাহিভাইর লোকেরা। কিন্তু হাফেজ মোক্তার শরৎ চক্কোবর্ত্তীদেরও ঘুষ দেয় নি ;—ইব্রাহিমভাইর লোকেরা ওসব ছোট পুলিশ কর্মচারীদের তোয়াক্কাই করে না। বলে, আমাদের কারবারে লাট সাহেব আর তাঁর স্ত্রী অংশীদার। গরীব ব্যাপারীরা তাদের এ সব যা তা ধমকে ভড়কে যায় ; সব চা'ল ভয়ে ভয়ে বিক্রী করে ফেলে। দারোগাদেরও তাই ওদের ওপর রাগ আছে—এক পয়সাও পায় না। এদিকে লোকজন চা'ল কিনতে পারে না, একবেলা খায় অনেকে—অসহ্য হয়ে উঠছে তাদের। পিছন থেকে এই ছোট দারোগা আর সেপাইরা তাদের উস্কে দিলে, 'গাড়ী-ভরতি মাল বাইরে চালান যায়, করিস কি তোরা ?' ক্ষেপে গেল হাটের লোক। আমি গিয়ে দেখি সঙ্গিন অবস্থা। ফিরাই কি করে ? ওদের নিয়ে রেবতী মহাজনের ঘরে গেলাম। বললাম, 'এদের চাউল দিন, মহাজন। ওরা পরে খেটে শোধ দেবে'। লোক জন দেখে রেবতীরা কেমন ভয় পেল। তা ছাড়া ওরা খুব ধর্মভীরু, মচ্ছোব দেয়, গরীব-দুঃখীদের রোববারে রোববারে চা'লও দিত। বাড়ির ভেতর থেকে ওর মা বললেন, 'দিয়ে দে রেবতী'। এক সের করে চা'ল মহাজন দিলে সবাইকে—প'নে তিন শ' মণ। বল্‌লে, 'মোচ্ছবের জন্য ছিল। নিক্, নারায়ণই নিক।' ওরাও নাম-ধাম হিসেব লিখে আমার কাছে দিয়ে গেল, অকাল গেলে দেড় সের করে ফেরৎ দেবে। আমি রেবতীকে সে কাগজ দিলাম।

দারোগাদের মতলব খাটল না—ফিফ্থ্ কলমের মুখ চুণ। রেবতীর উপর চাপ দিয়েও দারোগা আমার বিরুদ্ধে কিছু বলাতে পারলে না, রেবতীর ধর্মজ্ঞান আছে। শরৎ চক্রোবর্ত্তী শেষে বল্লে আমরা বে-আইনি মিছিল করেছি, চা'লের গাড়ী লুঠ করিয়েছি। 'মিছিল কৈ? লুঠইবা কোথায়? ফিফ্থ্ কলামের প্ররোচনা ব্যর্থ করেছি—মাষ্টার মশায়ও তা মানেন। সেবার তাঁকে দেখেছিলেন—মনে আছে? আমাদের প্রোফেসার সুধীর বোস, সত্যাগ্রহ চালাবার চেষ্টা করছিলেন—

বিনয়ের সে সব মনে ছিল। মাস দু'তিন আগে সুধীরবাবু বিনয়ের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, বিনয় যখন কংগ্রেসের ভক্ত তখন তাঁকে সমর্থন করবে, তাঁদের সত্যাগ্রহের প্ল্যানে যোগ দেবে। বিনয়ের তার পূর্বেই সন্দেহ হয়েছে—এ আন্দোলন কংগ্রেসের নয়। তাই বিনয় সুধীর বাবুর কথায় তখন পাশ কাটিয়ে যায়, জানিয়ে দেয় সে রাজনীতিতে নেই। শিবুদা'র অসীম শ্রদ্ধা এই প্রোফেসর মশায়ের উপর, আর মাষ্টার মশায়ের যথেষ্ট মায়া তাঁর এই অদ্ভুত ছাত্রটির উপর। আগে এক সঙ্গে জেলে গেছেন, আর এখন একই পাহাড়খাড়ীতে দু'জন দু'পক্ষে কাজ করছেন। বিনয় তা জানত।

বিনয় ইচ্ছা করেই শিবুদা'কে খুঁচিয়ে বললে, আসলে যাই বলুন, প্রোফেসর বস্থ ফিফ্থ্ কলাম।

শিবুদা' দুঃখিতভাবে বললেন, কি যে বলেন আপনি ডাক্তারদা', মানুষও চেনেন না।

বিনয়ের হাসি পেল। শিবুদা' তাকে বলছেন. মানুষ চেনেন না। যেন মানুষ চিনতে শিবুদা'ই ওস্তাদ।

গম্ভীর ভাবে বিনয় বললে, মানুষ চেনা যে শক্ত শিবুদা'। এই তো শরৎ চক্রোবর্ত্তীর কথা বললেন। পুলিশের কাজ করে, ওদিকে আবার সে-ই চায় জাপানের জয়।

তৎক্ষণাৎ শিবুদা' বললেন, ওরা তাই তো চাইবে। ওরা চেনে চাকরি। 'এখন ইংরেজের চাকরি করছি, আসুক জাপান, তখনো আমার চাকরি থাকবে ;—আরও বড় চাকরিও হয়ত বাগাতে পারি।'

শিবুদা' এবার দলের শান-বাঁধানো পথে চল্‌ছেন, বিনয় বুঝলে। এইটা বিনয়কে পীড়া দেয়। সে বললে, তাই তো বলি শিবুদা', মানুষ চিনব কি করে ? আপনাদের চিন্ময় না মৃন্ময়, আপনাদের লীলা,—কি রকম ভাবে বে-দল হয়ে গেল।

শিবুদা' একবার বিষণ্ণ হলেন। দেখুন চিন্ময়কে প্রমথ ওরা চেনে না। সে আগুন। তবে গণেশ বা প্রমোদের সাধ্য নেই—চিন্ময়কে তারা ঠকাবে। সে তো আর লীলা নয়, সহজে কারুর কথায় চলবে।

বিনয় বললে, কিন্তু লীলাই বা গেল কেন প্রমোদ গণেশের দলে ?

শিবুদা' একটু চুপ করে থেকে বললে, দেখুন, লোকে যাই বলুক, লীলাও মেয়ে মন্দ ছিল না। লীলা বোঝে শোনে কম ; মন কিন্তু ওর ভালো, তবে মনে জোর নেই। বীরু তো বিয়ে করে স্বদেশী ছেড়ে দিলে, কিন্তু চিন্ময় বাইরে থাকলে হয়ত লীলার ক্ষতি হ'ত না। অন্তত কলকাতায় প্রমোদের খপ্পরে গিয়ে পড়ত না।

বিনয় দেখলে সরল শিবুদা' যেন কি একটা আশঙ্কা করছেন, আর সসঙ্কোচে তাঁর সে সংশয় গোপন করতে চান। অথচ শিবুদা' মানুষটি এমনি সরল যে গোপন করবার কৌশলও তাঁর জানা নেই। বিনয় একটু কুতূহলী হল, কৌতুকও বোধ করলে, বললে, কিন্তু প্রমোদই বা লোক খারাপ কি ?

শিবুদা' বললেন, দেখুন, লীলা বোঝে কি ? প্রমোদ তার দাদার বন্ধু,—চতুর, চালবাজ। প্রমোদ তাকে নানাস্থানে নিয়ে যায়,—থিয়েটারে, বায়স্কোপে, রেষ্টুরেণ্টে, আউটিংএ। প্রমোদের স্ত্রীও ওখানে নেই। তাই নানা কথা বলবার সুবিধা পেয়ে গেছে মানুষ। তবে লীলা ছেলে মানুষ, সে

ভুলে যেতে পারে ; কিন্তু বৈকুণ্ঠ কাকা, শৈলেনেরা তো প্রমোদকে আগেও চিনত। তারা সাবধান হল না কেন ? প্রমোদের টাকা দেখে ?

বিনয় এবার কথাটা বুঝল, একটু চমকিত ও আহত হল। এই না রাজনীতিক শত্রুতা-সাধনের সনাতন বাঙালী নীতি ?—যা অমিত বরাবর বিনয়কে বলেছে। ওরা নিজেরাও সে অস্ত্র ব্যবহার করছে নাকি এখন ? শিবুদা' করবেন এমন হীন কাজ ? বিনয়ের তা বিশ্বাস হল না। সরল শিবুদা' দলের যন্ত্র হিসাবে তাদের কথাই আউড়ে যাচ্ছেন বোধ হয়। কিন্তু আর ওকথা নিয়ে কথা বাড়াতে বিনয়ের প্রবৃত্তি হোল না। বিনয় প্রসঙ্গান্তরে গেল, বললে, কিন্তু সুধীর বোস কেন লোকদের ধান লুঠ করতে বলেছেন ?

শিবুদা'ও সেই প্রসঙ্গে তখুনি গেলেন,—তা বলবেন কেন ? লুঠ করে কি হবে ?

বিনয় বললে, কেন ? চা'ল ডাল পাবে মানুষ ?

পেত না। দু'শ লোকে মিলে লুঠতে গেলে দেড় শ' মণ নষ্ট করত, বাকী পঞ্চাশ মণ নিয়ে নিজেদের মধ্যে মারামারি বেধে যেত। গরীবগুলো তাতে মরত, বদমায়েসগুলো দু-চার মণ ঘরে তুলত। তারপর গরীবের পেছনে থানা-দারোগা লাগত। তখন দেশবাসী, মহাজন, ভদ্রলোক, প্রেসিডেন্ট-পঞ্চায়েৎ সব তাদের বিপক্ষে সাক্ষী দিত—চোর-ডাকাতের দমন না হলে ভদ্রলোকেরা প্রাণ নিয়ে থাকবেন কি করে দেশে ?

বিনয় বুঝল যুক্তিটা অসার নয়। কিন্তু এ যুক্তি শিবুদা'র নিজেরও নয়। শিবুদা'কে ক্ষেপাবার জন্যই বিনয় বল্‌লে, তাহলে বিপ্লব হবে কি করে—দেশের লোক খেতে না পেয়েও যদি ক্ষেপে না যায় ?

শিবুদা' খুব বুদ্ধিমানের মত উত্তর দিলেন, ক্ষেপে গেলেই তো বিপ্লব হয় না—বিপ্লবের একটা সায়েন্স আছে।

বিনয় ছল-গাম্ভীর্যের সহিত বল্‌লে, সায়েন্স! তবে আর হল না।

শিবুদা' বল্লেন, না ঠাট্টা করবেন না। বিশৃঙ্খলা মানেই বিপ্লব নয় তো। বরং তা প্রতিবিপ্লব হবারই বেশি সম্ভাবনা।

বিনয় কথাটা বুঝলে, কিন্তু বুঝলে এ কথাও শিবুদা'র নিজের নয়। বল্লে, তা হবে।

শিবুদা' সপ্রতিভভাবে তাকে বোঝাতে লাগল, লুঠ করলেই যদি বিপ্লব হত তাহলে তো ঠগী-পিণ্ডারীদের নিয়ে দল করলেই দেশোদ্ধার করা যেত—মানুষকে সচেতন করবার জন্য ঘুরে মরতে হত না।

বিনয় পরিহাসের কণ্ঠে বল্লে, বুঝলাম। কিন্তু তা হলে ভুখমিছিলটাও ছিল আপনাদের ভুয়ো মিছিল। শুধু লোকজনকে ঠাণ্ডা করে রাখা, যাতে লুঠতরাজ না করে।

শিবুদা' উত্তেজিত হলেন,—কি যে আপনি বলেন? লোকজনকে সংগঠন না করলে তারা শক্তি পাবে কোথায়? বিপ্লবের পথ তো বিশৃঙ্খল লুঠতরাজ নয়—সংগঠিত বিদ্রোহ।

ভাষাটা বেশ বিশুদ্ধ; শিবুদা'র নয়, তা বিনয় বুঝল। হাসল। বললে, আপনি তা' বুঝি করছিলেন? তবে শরৎ দারোগার দোষটা কি?

শিবুদা' বললেন, না আপনি বুঝছেন না। ভুখ-মিছিল কই? আমরা মাত্র জন তিন ছিলাম খাদ্য কমিটির লোক। পিছনে পিছনে আরও জন কয় লোক জুটেছিল। তাকেই পুলিশ বলছে বেআইনী ভুখ-মিছিল। মাষ্টার-মশায় বল্ছেন, 'গ্রামের খাদ্য গ্রামে রাখো, দরকার হয় সত্যাগ্রহ করো।' তাতেই ওদিককার লোক সেদিন ইব্রাহিম ভাইদের গাড়ী আটকাতে গেল।

আপনি গেলেন সে লোকদের আটকাতে?, আর পুলিশ গেল আপনাকে আটকাতে?

শিবুদা' হেসে বললেন, কিন্তু ইব্রাহিমভাইদের সে চা'ল সে বাজারে আটকা পড়েছে। গাড়োয়ানরা সেদিন তা নিতে চাইল না। সব রেবতী মহাজনের গুদামে এখনো।

তা হলে তো আপনাদেরই হাতে, কি বলেন?—প্রচ্ছন্ন পরিহাস করে বিনয় বললে।

শিবুদা' পরিহাস বুঝলেন না, বললেন, অতটা দেবে কি মহাজনেরা?

বেশ কাটল সমস্ত দুপুরটা বিনয়ের।

ডাক-পিয়ন একটা রেজিষ্টার্ড পার্সেল নিয়ে এল—বিনয়ের নামে বই আছে। কে পাঠাল? হস্তাক্ষর বিনয়ের চেনা, প্রেরকের নামও সুস্পষ্ট লেখা—বিদ্যুৎরেখার মত এ হস্তাক্ষর, এ নাম। বিনয়কে তা তাড়িৎস্পর্শে সচকিত করে দিলে। তবু যেন বিনয় বিশ্বাস করতে পারলে না। পিয়ন চলে গেল, বিনয় চোখের সামনে মোড়ক-শুদ্ধ পার্শেলটি ধরে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইল সেই লেখা আর প্রেরকের নামের দিকে—সুধা গুপ্তা!

জীবনের এক পার থেকে আর এক পারে যেন একটি সুপরিচিত অদৃশ্য সূত্রে বিস্তৃত হয়ে পড়ছে।

অনেকক্ষণ, অনেকক্ষণ—বিনয় তেমনি বই হাতে নিয়ে বসে রইল। তারপর মোড়ক খুলল সাবধানে—লেখার একটুকুও না ছিঁড়ে। একখানা বই বেড়িয়ে এল—'সোশ্যালাইজ্‌ড্ মেডিসিন্ ইন্ সোভিয়েট ইউনিয়ন'। বই'র নাম বিনয়ের নিকট বিশেষ অর্থসূচক নয়। তবু মনে পড়ল, বিনয়ই একদিন এরূপ বই চেয়েছিল সুধার কাছে। সেদিন বিশে ডিসেম্বর,—সেদিন কি মনে আছে সুধার? বিনয় বই খুলল—স্পষ্ট অক্ষরে বাংলায় লেখা রয়েছে, "বিনয়কে—বিশে ডিসেম্বরের স্মৃতি—সুধা।"

বিনয় নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইল।

আপনা থেকেই সুধা তাকে স্মরণ করেছে। অভিমান, গর্ব, সঙ্কোচ, কিছুই সে মানে নি, মানে না। সে সব মানবার মত মেয়ে সে নয়। সে সহজভাবে আপনাকে প্রকাশ করতে জানে, অকুণ্ঠভাবে অপরকে গ্রহণ করতে পারে। বিনয় পারত কি এরূপ সহজে নিজেকে প্রকাশ করতে?

সে একটা সংবাদও সুধাকে দেয় নি, দিতে পারে নি—নিজের দ্বিধায়, নিজের দুর্বলতায়? ···কিন্তু সুধাই বা তাকে দেয় নি কেন কোন চিঠি? এই তো এল এই বই—এই কি যথেষ্ট নয়? এই কি যথেষ্ট?···'বিশে' ডিসেম্বরের স্মৃতি।' শুধু স্মৃতি? বিদায় দক্ষিণা—অতীত বলে? না, সংবর্ধনা—সমাগত বলে?

বিনয়ের শাহেদুদ্দীনের কথা মনে পড়ল—অভিমানের বশে বিনয় কলকাতা থেকে পালিয়ে এসেছে, নিজেকে পীড়িত করেছে, মিথ্যা সুহৃদ্ রায়ের উপর দোষারোপ করেছে—এইরূপ বলেছিলেন শাহেদুদ্দীন। ঠিক বলেছেন কি শাহেদ? ···সুধার লেখার দিকে আবার বিনয়ের চোখ গেল—স্পষ্ট তার অক্ষর, স্পষ্ট তার স্বাক্ষর, স্পষ্ট তার স্বীকৃতি।

একি মিথ্যা? একি সত্য?

শিবুদা' এসে বললেন, বেগমপুরা যাবেন না? উঠুন, গাড়ীর সময় হয়েছে।

যাবার কথা ছিল, কিন্তু ইতিমধ্যেই বিনয় তা ভুলে গেছে।

বিনয় যেন একটু চমকিত হল, আপনিই যান শিবুদা'।

বিনয়ের মন আজ একা থাকতে চাইছে।

যে হৃদয়াবেগ আজ বিনয়কে পেয়ে বসল, বিনয়ের কাছে তার স্বাদ আজ যেমন গুরুতর, তেমনি মাদকতাপূর্ণ। অনেকদিন ধরে সে যেন এরই পিপাসা নিজের হৃদয়ে পোষণ করে চলছিল। আর তাই বিনয় এই আবেগের অভিনব আস্বাদনে আবার ভীতও হয়ে পড়ল। সে কি অসম্ভবকে আবার বড় করে তুলবে নাকি? আবার অসহ্য করে তুলতে যাচ্ছে তার দিনরাতকে? তার মনে পড়ল—সেই ডিসেম্বর রাত্রির বিলীয়মানা সুধাকে, তার দৃষ্টি শুষ্ক-কঠিন, তার কথা ও গতি উত্তেজনা-মথিত। বিনয়ের জীবন, চিন্তা, স্বভাব—কোনো কিছুর সঙ্গেই তো তার তাল নেই। আবার চোখ পড়ল তার সেই কথা কয়টির দিকে—'বিনয়কে—বিশে ডিসেম্বরের স্মৃতি—সুধা'। বিনয় সেই

দিনটিকে ভুলতে চায়। অমনি তার মনে পড়ল আবার শাহেদ্‌জীনের কথা—'ভুলতে চায়' ! এই কি সত্য ? এই কি মিথ্যা ?

বিনয়ের মন কোন প্রশ্নের কুলকিনারা পেল না। সঠিক কিছুই সে বুঝতে পারে না। সে আসলে বুঝতে চায় না। কিছুতেই সে স্বীকার করতে চায় না—সে আপনার অভিমানে সুধার প্রতি অবিচার করেছে। স্বীকার করলে তার মন আরো অস্বস্তিতে ভরে উঠবে। আবার কিছুতেই বিনয় বিশ্বাস করতে পারে না—সুধা তাকে বিদায় জানিয়েছে। বিশ্বাস করলে তার সমস্ত জীবন এখনো অসহ্য হয়ে উঠবে।

বিনয় বেরিয়ে পড়ল। একা একা কোন একটা পথে চলতে পারলে সে আজ খানিকটা স্থির হতে পারবে। একটা আনন্দ আর অস্থিরতা তাকে আজ স্বস্তি দিচ্ছে না। এ-আর-পি. পোষ্টের কাছ দিয়ে সে গেল না ; দূর থেকে দেখতে পেল তেমনি সেখানে ভিড় জমেছে। শহরের বাইরের পথে চলল, লোকজন কম হবে। মিলিটারির প্রয়োজনে নতুন পথ হয়েছে। মসৃণ প্রশস্ত পথঘাট সমস্ত অঞ্চলটাকে নতুন করে তুলছে। তারই উপর দিয়ে ছুটছে ফৌজের নানা জাতীয় গাড়ী। পাশ কাটিয়ে বিনয় অনেকটা চলল। শীত শেষ হয় নি, মাঘের শেষ, সন্ধ্যা এগিয়ে এল—কুয়াসা নামছে। চারিদিকে শস্যশূন্য মাঠ। মাঝে মাঝে দু'-একটা রবি ফসলের ক্ষেত। মাঠের শেষে চারিদিকে শিমুলের ডালে লাল শিমুল ফুলের আভাস—আশ্চর্য মনে হল আজ বিনয়ের চোখে সোনাপুরের এই পরিচিত আবেষ্টন। বেশ ত! বিনয় যেন নিজে থেকেই বললে—অথচ চোখ মেলে আমি দেখিও নি। বিনয়ের মনে পড়ল আজ প্রায় এক বৎসর সে এদেশে এসেছে—তার নিজের দেশে। এ দেশের ফুল-পাতা-গাছ-মাঠ-নদী-খাল-বাস-বন-জঙ্গলময় রূপের দিকে সে তাকাবার অবসর পায় নি। অথচ এত অন্ধ তো বিনয় ছিল না। কত জ্যোৎস্না রাত গেল, আর কত অন্ধকার রাত্রি যায়! শরৎ-হেমন্ত গিয়েছে,—বাঙলা দেশের আশ্চর্য ঋতু তা,—বিনয় তা দেখবার অবসর পায়

নি। এই তো দিনান্তের সন্ধ্যা আসছে—হঠাৎ এমন বেরিয়ে না পড়লে তার আগমন-বার্তাও বিনয় সম্ভবত জানতে পারত না। নিজের কাছে নিজেকে বিনয়ের আজ আশ্চর্য মনে হল—সে কি নিয়ে মেতে গেছে? দেশ নিয়ে? দেশের মানুষকে নিয়ে? না, নিজেকে নিয়ে? একটু সকৌতুক কৌতূহল বিনয়কে পেয়ে বসল কিছুক্ষণের জন্য—কি হয়ে উঠেছে সে—পৃথিবীকেও দেখে না একবার চোখ খুলে!

উত্তেজনা অনেকটা শান্ত আনন্দে পরিণত হচ্ছিল। বিনয় চমকে দেখল—তাই তো, সে বেগমপুরার পথেই এগিয়ে চলছে নাকি!

পরদিন কাগজ হাতে পড়তে বিনয় চমকে উঠল—মহাত্মা গান্ধী উপবাস করছেন। আজ থেকেই তা শুরু হচ্ছে। মুহূর্তমধ্যে তার সমস্ত মন জাগ্রত হয়ে উঠল, অন্য সব চিন্তা দূর হল। কিছু করতে হবে—কিছু করতে হবে।

কি করবে বিনয়?

প্রমথর সঙ্গে তাদের আপিসে দেখা হল। বিনয় বল্‌লে, কি করবেন এখন?

সকলকে একত্র করে একটা সভা করা যায় কিনা দেখি, গান্ধীজীর মুক্তি দাবী করে। সব দলে মিলেই করতে হবে—যা-ই করি।

বিনয়ের কথাটা মনঃপূত হল। এতবড় গুরুতর ভবিষ্যতের সামনে আমরা এক হতে পারব না?

প্রমথ বল্‌লে, চলুন, যাবেন একবার খাঁ-বাহাদুরের আর কাজীর কাছে।

বিনয় বল্‌লে, চলুন। তার আগে সুরেশবাবুর কাছে যাই না?

প্রমথ একটু চিন্তা করলে, পরে বল্‌লে, আমাকে দেখলে তিনি খুশী হবেন না। কিন্তু না দেখলে তিনি আরও অসন্তুষ্ট হবেন। চলুন।

সুরেশবাবু কাগজপড়া শেষ করেছিলেন। দু-একটি মক্কেল রয়েছে,

তাদের কাজে হাত দিয়েছেন। কিন্তু বোঝা যাচ্ছিল, মন দিতে পারেন নি। বিনয় ও প্রমথ যেতেই সে-সব কাগজপত্র রেখে দিয়ে বললেন, আসুন।

বিনয় বললে, কাগজ দেখছেন? প্রথমেই আপনার কাছে এলাম। কি করা যায় বলুন।

সুরেশ দত্ত শান্ত ও সন্তুষ্ট হয়ে আজ কথা বললেন, আমিও তাই ভাবছি। যাদববাবু বরদাবাবুদের খবর পাঠিয়েছি, তাঁরাও এসে যাবেন এখনি। বসবেন তৎক্ষণ? একটু ভেবে দেখা যাক।

প্রমথ বললে, মহাত্মাজীর চিঠিগুলো পড়েছেন?

সুরেশবাবু বললেন, হুঁ, কিন্তু সব বেরোয় নি এখনো মনে হচ্ছে।—বোঝা গেল তাতে সুরেশবাবু খুব সন্তুষ্ট হন নি। তিনি বললেন, বোধহয় কাল পর্যন্ত সব চিঠি পাওয়া যাবে।

বিনয় বললে, কিন্তু এতদিন ধরে চিঠিপত্র চলেছে, সরকার তা জানতেও দেয় নি কাউকে।

সুরেশবাবু হাসলেন, আপনাদের তারা কোনো কথা জানায় নাকি?

প্রমথ বললে, জানাতে বাধ্য না করলে জানাবে? নোকরশাহী আর শাহানশাহীর স্বভাবই এমন হয়।

অন্যদিন বলে হয়ত এ নিয়েই তর্ক বাধত। সুরেশবাবু বলতেন, 'তবু আপনাদের মতে এ যুদ্ধ জনযুদ্ধ'। আর অমনি প্রমথ বলত, 'আপনারা দেখছেন না—জনতার সুযোগ এসেছে। তাকে কাজে লাগাতে পারলেই জনমুক্তি হয়।' এমনি করে আরম্ভ হত প্রথম তর্ক। পরস্পরে আক্রমণ শুরু হত তারপরেই—কিছুই আলোচনা হত না। আজ কিন্তু তা হল না। সুরেশবাবুও তর্কে যেতে চাইলেন না। বললেন, সে তো পুরানো কথা, প্রমথবাবু। কিন্তু কথা হল—আমরা এখন কি করব?

মুক্তির আন্দোলন।—তা ছাড়া আর কি করতে পারি?

আন্দোলন? কি ভাবে তা করবেন মনে করেন?—একটু শঙ্কিত-ভাবে সুরেশবাবু জিজ্ঞাসা করলেন।

প্রথম না হয় একটা সাধারণ সভা ডাকি?—প্রমথ বললে।

সভা কি করে করবেন? বন্ধ তো সব। সরকারের অনুমতি নিয়ে? আমি তার মধ্যে নেই। —এক মুহূর্তে সুরেশ দত্ত বিরূপ হলেন।

অনুমতি না নিয়ে ডাকলে যে আইনভঙ্গ হয়—

সে কি আমাদের দোষ? কিন্তু অনুমতি নিয়ে সভা আমি করতে পারব না। আর কিছু বলুন—রাজী আছি।

আর কি করা যায় তা হলে বলুন। যেখানে অনুমতি লাগবে না, সেখানে সভা তো হবেই। একটা বিবৃতি দেবেন আপনি?—আপনি কংগ্রেসের এম্-এল-এ।

তা দোব। একটু অপেক্ষা করুন, সমস্ত চিঠিটা আসুক। কলকাতার নেতারা কি করে দেখুন।

দেরী হয়ে যাবে না? তা ছাড়া চিঠির যতটুকু এসেছে তা তো স্পষ্ট —এবার গবর্মেণ্টের আর কোনো মিথ্যা প্রচার চলবে না। গান্ধীজী দেশের দুর্দশা দেখছেন, বাইরে আসতে চান। তিনি এসব গোলমালের জন্য দায়ী নন।

সুরেশবাবু কিন্তু এ কথা স্বীকার করতে প্রস্তুত নন। এতদিন তিনিই বলেছেন—এ আন্দোলন কংগ্রেসের ও গান্ধীজীর। তাই বললেন, সমস্ত চিঠিপত্র বেরুক— দু'দিন অপেক্ষা করুন।

যাদববাবু এসে গেলেন। তাঁর সঙ্গে এল প্রমোদ আর গণেশ। ঘরের অন্যদিকে তারা বসল। সুরেশবাবু বললেন, সব তো দেখেছেন—বলুন তো কি করা যায়?

যাদববাবু বললেন, কি করা যাবে? আমরা কি করতে পারি?—ব্যর্থতার ও নিষ্ক্রিয়তার স্বর বৃদ্ধ যাদববাবুর মুখে বরাবর।

তা'ই তো বলছি। কিন্তু কিছু করতে হবে। বিনয়বাবুরা বলছেন, করবেন—মুক্তির আন্দোলন। কি করবেন তাঁরা? মিটিং?—অনুমতি নিয়ে, না, না-নিয়ে? অনুমতি নিয়ে মিটিং-এ আমরা কংগ্রেসম্যান্ যাই কি করে? বিনা অনুমতিতে করা মানে সত্যাগ্রহ।

প্রমথ পরিষ্কার করে বললে, সত্যাগ্রহ গান্ধীজী আরম্ভ করেন নি। করতেও বলেন নি। আজ গান্ধীজীর চিঠি থেকে তা অনুমান করতে পারি।

প্রমোদ তৎক্ষণাৎ বল্‌লে, কি করে অনুমানটা করলে প্রমথ? কি আছে চিঠিতে?

চিঠিতে আছে—এই গোলমালের জন্য তিনি দায়ী নন। তার মানে, গোলমাল আরম্ভ করেছে আমলাতন্ত্র, আর তাতে না বুঝে, ভুল করে অন্যেরা যোগ দিয়েছে। কিন্তু গান্ধীজীর তাতে মত ছিল না, নেইও।

তাঁর চিঠির এ ব্যাখ্যা মিথ্যা। —প্রমোদ বল্‌লে—যেন আক্রমণ করবার জন্য সে উন্মুখ হয়ে ছিল।

প্রমথর মুখে বিদ্যুৎ খেলে গেল, বিনয় শঙ্কিত হল দেখে। কিন্তু প্রমথ নিজেকে সংযত করলে। পর মুহূর্তে সে বললে, এবার তর্ক আরম্ভ হবে। তাতে কি লাভ হবে, সুরেশ বাবু? কি করব তা ঠিক করুন।

বিনয় প্রমথকে মনে মনে প্রশংসা করলে তার আজকার ধৈর্য দেখে।

সুরেশবাবু সহজভাবে বল্‌লেন, না, তর্কে কাজ নেই, তার সময়ও এখন নয়। কিন্তু কি কাজ হবে বলুন? সভায় আমি যেতে পারব না—ওটা আমাকে আপনারা ক্ষমা করবেন। যাদববাবু যেতে চান—যান।

যাদববাবু বল্‌লেন, সে কি কথা! অনুমতি নিয়ে সভা—আমরা যাব তাতে!

প্রমথ বললে, না হলে সব দলে মিলে একটা ম্যানিফেষ্টো গোছের দিন।

সুরেশবাবু বল্‌লেন, "সব দল কে-কে? লীগ? মহাসভা? আপনারা? দেখুন, আমার মোটেই মন চায় না। কিন্তু এ ব্যাপারে তাতেও আমি রাজী হব—যদি লীগওয়ালাদের সই আনতে পারেন—'মহাত্মাজীর মুক্তি চাই।'

গণেশ এবার বললে, কিন্তু মুক্তি চাইবেন কেন? এ ভিক্ষা কেন?

বিনয় বললে, ভিক্ষা নয়, দাবী।

তার মানে ভিক্ষাই। দাবী হলে জোর করে আদায় করুন।

প্রমথ বললে, জোর ছাড়া তা আদায় হবে না। কিন্তু জোরের রকমফের আছে। যে জোরে মাথায় লাঠি মারা যায় তা স্পষ্ট—লাঠির জোর। কিন্তু যে জোরে ইঞ্জিন চলে, তা মানুষ দেখে না—ষ্টিমের জোর। সে জোরটা তাই বলে কম নয়!

ষ্টিমটা কি, আর লাঠিটাই কি?

লাঠিটা বেশ স্থূল জিনিস—গাছ কাটলেই পাই। আর ষ্টিম? একটু-একটু করে সঞ্চয় করতে হয়, তৈরী করতে হয়। সংগঠন করতে হয় দুর্বার সেই ক্তি, তারই নাম জনশক্তি।

আবার তর্ক বাধে আর কি! বিনয় বাধা দিয়ে বললে, এসব তর্ক যাক। আমরা মহাত্মাজীর মুক্তি কামনা করছি—এ বিষয়ে তো সবাই একমত?

গণেশ বললে, না।

সকলে চমকিত হল—এ বিষয়েও সন্দেহ আছে নাকি কারুর?

গণেশ বললে, মুক্তি দরকার বুঝলে মহাত্মাজী তা নিজেই অক্লেশে আয়ত্ত করতে পারতেন। আমাদের সুপারিশের অপেক্ষা করবেন না।

তিনি জনশক্তির জোরে মুক্তি চান—মুক্তি ভিক্ষা চান না।

আবার তর্ক প্রায় বাধে। গণেশ বললে, আপনাদের এত মাথাব্যথা কেন গান্ধীজীর মুক্তির জন্য? তিনি বেশ আছেন। যতক্ষণ তিনি জেলে ততক্ষণ তাঁর শক্তি তো কম নয়। ইংরেজ জোর করে আমাদের মুখ বন্ধ করতে পারে, কিন্তু ইংরেজের মুখও বিদেশে থাকে না কথা বলবার। আর দেশের লোকের মনও বিরুদ্ধ, তিক্ত হয়ে থাকে।

প্রমথ বলল, তার মানে, আপনি বলেন—মহাত্মাজীর মুক্তিও আমরা চাইব না?

গণেশ বলল, হাঁ, আমার তা'ই মত!

প্রমথ হাসল। সুরেশবাবু বুঝলেন, বললেন, তা নয়, গণেশ, মহাত্মাজীর মুক্তি আমাদের দাবী করতেই হবে। এখন আর কি করা যায়, দেখি। কাল-পরশু সব খবর পাওয়া যাবে। আবার একবার আসবেন কি বিনয়বাবু?

বিনয় একটু নিরাশ হল, কিন্তু দমল না।

সে অবাক হয়েছিল প্রমোদকে এ সব আলোচনায় দেখে। প্রমথ হাসল, বললে প্রমোদের জন্য ভাবনা নেই—টাকাকড়ি দেবে গণেশদের দু-একটা, তার বেশি নয়। এখন চলুন লীগের নেতাদের কাছে। খাঁ বাহাদুরের কাছে চলুন—হয়ত সেখানে বেশি অসুবিধা হবে না—এত তর্ক নেই তো।

খাঁ বাহাদুর সহজেই স্বীকৃত হলেন, বিবৃতিও দিলেন। পরে খাঁ বাহাদুর বললেন, কিন্তু হাকেজ থাকলে ভালো হত। আর প্রমথবাবু, ওই জেলাবোর্ডের ব্যাপারে বৈকুণ্ঠবাবুর সুরেশবাবুর ঝগড়াটা মিটিয়ে দিন—আমাদেরও নইলে হিন্দু ভোট নিয়ে গোলমাল হবে। সুরেশবাবুরা একটা ফজলুল হকের মুস্‌লিম মজলিস্ দল দাঁড় করিয়েছে। এসব গোলমাল কি এখন ভালো?

বিনয় বুঝলে, আসলে খা বাহাদুরের মনে মহাত্মাজীর অনশনের গুরুত্ব স্পষ্ট নয়, জেলাবোর্ডের চিন্তাই সেখানে প্রধান।

প্রমথ পথে বেরিয়ে বিনয়কে বললে, কিন্তু উনি লীগের প্রেসিডেণ্ট, ওর নামের জোর আছে। জিলাবোর্ডের প্যাঁচে পড়েছেন। এখন উনি ও বৈকুণ্ঠবাবু বুঝছেন যে, এত সহজে কংগ্রেসকেও কুপোকাৎ করা যায় না।

বিনয়ের মনে পড়ল, বললে, কি করবেন?

মহাত্মাজী অনশনে। এখন্ আবার এসব কথা নিয়ে গোলমাল চলে না। একটা মীমাংসা করতে হবে সুরেশবাবুতে বৈকুণ্ঠবাবুতে।

পারবেন?

সহজ হবে না, কিন্তু পারতেই হবে। অন্তত দু-দলকে বোঝাতে হবে—দেশের সামনে জেলাবোর্ড বড় কথা নয়। কথা দু'টি—গান্ধীজীর মুক্তি-আন্দোলন, দেশের খাদ্যসমস্যা। সুরেশবাবুকেই বাগানো শক্ত; কিন্তু এ অবস্থায় হয়ত তিনি একথা মানবেন। হাজার হোক—কংগ্রেসম্যান, গান্ধীজীর কথা ভুলতে পারবেন না। বৈকুণ্ঠবাবুকে মানাব—ধমকের জোরে। 'গান্ধীজী উপবাস করছেন—এ সময়ে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ভোট দেবে আপনাকে কোন হিন্দু?'

শহরেই প্রথম মিটিং হচ্ছে। খাঁ-বাহাদুরই প্রেসিডেণ্ট হবেন সভায়। বৈকুণ্ঠবাবুও এগিয়ে এলেন—'ভোট জোগাড়ে বেরুতে হবে আবার। তবু একটা দায়িত্ব তো দেশের প্রতিও আছে।' কাজী যোগ দেবে, সে মিটিংএর জোগাড়যন্ত্র করছে। শিবুদা' বললেন, যাব একবার মীরসাহেবের কাছে?

কিন্তু নিজেই এসে গেলেন এমন সময় মীর শাহেদুদ্দীন। বললেন, অন্তত এবার আর পারলাম না—যা হোক বলব সভায়।

প্রমথর কথাও সার্থক হল—কিন্তু দিন কয় পরে। গান্ধীজীর অবস্থা তখন শঙ্কাজনক—মানুষের মনে অন্য চিন্তা আর নেই। সুরেশবাবুও সে অবস্থায় স্বীকৃত হলেন—বৈকুণ্ঠবাবুকে নির্বাচন করবেন। কিন্তু বাদবাকী সর্বত্র কংগ্রেসের হিন্দু প্রতিনিধিরাই যাবে; অবশ্য ভাইস চেয়ারম্যান কে হবে, সে পরে দেখা যাবে।

মনঃক্ষুণ্ণ বৈকুণ্ঠবাবু বললেন, ডাক্তার, কাজটা কি ঠিক হল? সুরেশ দত্তকে চিনছ না।

বিনয় বললে, মহাত্মাজীর অবস্থার কথা দেখছেন। এখন কার কাছে পাবেন ভোট? আর আপনিই বা হিন্দুসভার নাম করে কোন্ মুখে বলতেন কথা? দেখছেন আপনাদের সাভারকরের কথা। গান্ধীজীর মুক্তিও সে চায় না। একথা শুনে কোন্ হিন্দু আর আপনাদের হিন্দুসভার লোকদের উপর আস্থা রাখত?

বৈকুণ্ঠবাবু তাড়াতাড়ি বললেন, আমি সাভারকরকে মানি না, তা সবাইকে বলেছি। শ্যামাপ্রসাদ আমাদের বাঙলার হিন্দুর মুখ রেখেছেন। সুরেশ দত্তও তাঁর প্রশংসা করতে বাধ্য হল। আসলে কি জানো, ডাক্তার বাঙলায় খাঁটি জাতীয়তাবাদী তো আমরাই। কংগ্রেস ওরা দখল করে আছে, কিন্তু জাতীয়তাবাদের মর্যাদা ওরা রাখছে কই?

বিনয় তর্ক করলে না, বুঝল—জাতীয়তাবাদের দোহাই না পাড়লে বাংলায় হিন্দুমহাসভাও দাঁড়াতে পারবে না, বৈকুণ্ঠবাবুও জেলাবোর্ডে নির্বাচিত হতে পারবেন না। কিন্তু আজ তর্কের সময় নেই। গান্ধীজীর মুক্তি চাই। লাটপরিষদের ওসব মহাপুরুষরা পর্যন্ত বিচলিত, আর ঝগড়া করব আমরা এসব নিয়ে?

মহাত্মাজীর চিঠিপত্র শিবুদা'রা ছেপেছেন, সবাইকে বিলি করেছেন। ওরা বোঝাচ্ছে, গান্ধীজী গোলমাল চাননি—গোলমাল বাধিয়েছে আমলাতন্ত্র। তাঁকে অন্যায়ভাবে আটকে রেখেছে আমলাতন্ত্র। খাঁ বাহাদুরের নামেও বিবৃতি গেছে। নানাখানে সভা হচ্ছে; বিনয় তার ব্যবস্থা করতে লাগল। প্রমথর দিদি বাড়ি বাড়ি যাচ্ছেন—মেয়েদের সভা করবেন। সীতা বেগমপুরায়। নইলে তাকে দিয়ে এখানে কাজ হত, তিনি বললেন।

বিনয় সীতাকে বললে, তোমার কাছেই তো আসছি, তবে পথে গেছলাম একবার প্রিন্সিপাল চক্রবর্তীর কাছে।

অথচ আমি বসে আছি আপনার জন্য।—একটু অভিমানের সুর সীতার কণ্ঠে।

বললেই হল? জানলে কি করে আমি এসেছি?—পরিহাসে তাকে সহজ করে তুলবে বিনয়।

ভাবছেন কি করে? আমি তা জানব না?—এবার কৌতুক সীতার মুখেও।

বিনয় এবার হেরে গেল। অমনি বললে, বুঝব কি করে, তুমি চলে যাও নি সোনাকান্দি কি পাহাড়খাড়ী?

সীতা বুঝলে, ইতিমধ্যে বিনয় একদিন এসে ফিরে গেছে, সীতা ছিল না। সেই কথা বিনয় ভুলতে পারে নি। সীতা বললে, খুব কিন্তু অন্যায় দোষ ধরছেন, ডাক্তারদা'। মোটে তো রবিবার ছুটি, ভাবলাম চিনুর সঙ্গে একটু ঘুরেই আসি মেয়েদের কাজে। আপনিও আবার সেদিনই এসে ফিরে গেছেন। কিন্তু একটিবার খবর পাঠালেন না কেন—আসবেন?

বিনয় বোঝে খবর পাঠালে সীতা যেত না? কিন্তু সেও ছাড়বে না। বললে, থাকতে?

সীতা বললে, খবর দিয়ে দেখতেন না।

বিনয় বললে, আমি ভেবেছি, বেগমপুরার বাইরে যাবে কোথায়? বিদ্যামন্দিরের হেড্ মিস্ট্রেস্। বড় জোর, এখানেই প্রিন্সিপাল চক্রবর্তী, কি প্রোফেসারদের কারো বাড়ি যেতে পার। তুমি যে কাজে বেরুবে কোথায়-কোথায়, তা কি আমাকে বলেছ কোনো দিন?

'কাজে বেরুব'? টিচারি করি। তার ওপরে ইস্কুলের অবস্থা তো এই। গুটি ষাট মেয়ে মাত্র আছে এখানে। ইস্কুলটাকে টিঁকিয়ে রাখতেই হবে। ইচ্ছা থাকলেও কি কাজ করতে পারি নাকি?

ইচ্ছা তা হলে আছে?

একটু সলজ্জ ভ্রূভঙ্গে সীতা বললে, তা ছিল বটে একটু।

বিনয় বললে, ইচ্ছা থাকলেই নাকি পথ হয়, লোকে বলে।

লোকে আবার বলে, 'তুমি মেয়ে টিচার, আর তোমার ইস্কুল হিন্দু বিদ্যামন্দির, তোমার পক্ষে এসব করা কি ভালো?' এ সবও লোকে বলে, বলে না?

তুমি কি বলো?

আমি? আমাকে বলতে দেয় কে? আমার ভালো নিয়েই এত লোকের ভাবনা। আমার বাড়িতে আমার মাকে পর্যন্ত তারা ভাবিয়ে তোলে—এখন রাজেন কাকার কাছে আমি নেই, কে জানে বেগমপুরায় কি ভাবে চলছি আমি।

শুধু পরিহাস নয়, বিনয় তা বুঝলে। বললে, তা হলে কি করবে সীতা?

করব? কিছু করব না—তা হলেই ভালো হয়ে যাব সকলের কাছে।

সত্যি? কিন্তু কাল তা হলে এখানে মেয়েদের সভা করলে কেন তোমার ইস্কুলে?

কে বললে? ডাক্তার চক্রবর্তী বুঝি? সে আমি কি করেছি?—মৃদুহাস্যে বললে সীতা।

তবে কে করেছে?—হেসে জিজ্ঞাসা করলে বিনয়।

সভা দশজনে মিলে করে,—দশজনে ডাকে, দশজনে শোনে। একজনে সভা হয় নাকি?

একজনে সভা হয় না, কিন্তু তবু একজনেই আবার মিলিয়ে তোলে। থাক সীতা, সে কথা। বলো এখন কি করবে? শুধু মেয়েদের সভা করলেই তো হবে না। একটা আন্দোলন তৈরী করতে হবে। প্রথমেই চাই একটা বড় সভা সকলে মিলে—এখানেও।

সে জন্যই বুঝি এসেছেন?

বিনয় স্বীকার করলে, হাঁ। বেগমপুরায় পুরুষের সভাও ডাকতে হবে।

আমাকে ডাকতে হবে সভা?

বিনয় জানাল, হাঁ, প্রিন্সিপাল চক্রবর্তী বললেন, কাল তাঁর স্ত্রী তোমাদের সভায় হয়েছিলেন সভানেত্রী। সাধারণের সভায় তাই ডাক্তার চক্রবর্তী প্রথম সভাপতি হতে চান না। বলেন, এখানকার বড় ব্যবসায়ীদের কাউকে ধরুন।

নাম বললেন—সুরেন চৌধুরীর। বি-এ পাশ, যুবক মানুষ, ব্যবসায়ী সমিতির প্রেসিডেণ্ট নাকি তিনি।

সীতা হাসল, সব ঠিক। কিন্তু তিনি রায় সাহেবিরও উমেদার।

সে তুমি জানো, তুমি বুঝবে।

সীতা একটু চুপ করে থেকে ভাবল। বলল, চা খাবেন? এবার চিনি-দুধ আছে। ফিরে এসে খাবেন? বেশ, চলুন—

বেরিয়ে পড়ল সীতা—জামা-কাপড় বদলাতেও হল না। এক মুহূর্তে প্রস্তুত।

বাজার পেরিয়ে গিয়ে একেবারে সুরেন চৌধুরীর গদিতে বিনয়কে শুদ্ধ সীতা উপস্থিত হল। নিজেই প্রথম বললে, ডাক্তার মজুমদার, এই সুরেনবাবু—যাঁকে আপনি চান, ব্যবসায়ী সমিতির প্রেসিডেণ্ট, হিন্দুসভার ভাইস প্রেসিডেণ্ট। আমি আছি ওরই একটা বাড়ির অংশে, আর আমাদের ইস্কুল এখন বসে ওরই পাটের গুদামে বিনা ভাড়ায়।

সুরেন চৌধুরী হাতকাটা শার্ট পরে চেয়ার-টেবিলে বসে ছিলেন—বুদ্ধিমান্ লোক, বছর পঁয়ত্রিশ বয়স। নিজে চেয়ার এগিয়ে দিলেন, 'বসুন।'

বসছি।—বললে সীতাই—কিন্তু তার চেয়ে দরকার কথা শেষ করা—আপনাদের বিজনেস ম্যানদের সময়ের দাম আছে। বেশি কথার দরকার নেই। গান্ধীজীর কথা পড়েছেন। এখন বলুন কি করবেন?—সীতা কথায় সহজ, পরিচ্ছন্ন। বিনয়কে দেখিয়ে সুরেন বাবুকে সে বললে, এজন্য এসেছেন উনি।

সুরেন চৌধুরীর ভেবে দেখবার অবকাশ হল না। বেশিক্ষণ আপত্তি করাও সম্ভব হল না। তাঁকেই সভাপতি হতে হবে। সীতা তার সম্মতি আদায় করে নিলে নিজের আত্মীয়তার সুরে আর প্রীতিকর কৌশলে। বিনয় মনে মনে সীতার প্রশংসা করলে, সীতা মানুষকে বাগাবার কৌশল জানে। বিনয়ের মনে পড়ল সুধাকেও। এমনি নিজের শক্তিতে সেও মানুষকে বয়ে নিয়ে যায়।

সব ঠিক হয়ে গেল। কাল সভা, সুরেনবাবুরা সব আয়োজন পত্র ঠিক করবেন।

আরও দু'-একজনার সঙ্গে দেখা করে ফিরতে ফিরতে বিনয় বললে, তোমাকে হিংসা হয়, সীতা।

কারণ?

এমন করে মানুষকে তুমি বাগাতে পার—একটা হবু রায় সাহেবকে?

ম্লান হাসি হাসল সীতা।—সে জন্য আমার উপর হিংসা হয়, না, আমার জন্য লজ্জা হয়।

সে কি সীতা?

কি বেহায়া মেয়ে—একেবারে লজ্জা-সরম নেই।

বিনয় মনে মনে নিজেকে একটু অপরাধী বোধ করলে। সে এরকমই কতকটা ভেবেছিল না কি? নিজের কাছেই তা সে স্বীকার করলে। তাই বেশ জোরে সে হাসল, আর বললে, আমি যে বর্মায় মানুষ, তোমাদের বাঙালী লজ্জা-সরমের কি পরোয়া রাখি?

চলুন। স্নান করবেন, ভাত খাবেন এখন, না, চা খাবেন? আমি ইস্কুলে যাব—বেলা হয়ে গেছে।

বিনয় বললে, আমি প্রিন্সিপাল চক্রবর্তীর ওখানে খাব, তিনি বলে দিয়েছেন।

সীতা এক মুহূর্ত চুপ করে রইল। পরে হাসল, বললে, বর্মায় মানুষ হয়েছেন, কিন্তু বাঙালী পুরুষ বাঙালী পুরুষই। সেদিনও শিবুদা' এলেন, আপনি এলেন না। যাক্, বিকালে থাকবেন তো? কাল এসে চা খাবেন? সভায় যাব? যাব বৈকি। দু'-একটি মেয়েকে জোগাড় করে নিয়ে যাব—প্রিন্সিপাল চক্রবর্তীর মেয়ে মৈত্রেয়ীকে পাবই, দেখি আর কাকে পাই।

বেগমপুরার সভায় বিনয় শুনল সীতার বক্তৃতা—কোথাও বাধা নেই, পরিচ্ছন্ন ওর কথা। বিনয়ের মনে পড়ল সুধাকে। অবশ্য সুধাকেও

বিনয়ের আর এখন তত কঠিন মনে হচ্ছে না। কিন্তু সুধা বড় বেশি তীক্ষ্ণ, বড় বেশি জোরালো ও ধারালো। সীতার কথায় এখনো রয়েছে শ্রী আর মাধুর্য—সে কমিউনিষ্ট মেয়ে নয়, কাজের কল নয়, কথার কল নয়। মানুষ সে, মেয়েই। কাল বিনয়ের উপর অভিমানও তার ছিল। কিন্তু আজ তা মুছে গেল বিকেলের দেখায়, কথায়, গল্পে। বিনয়ের অবশ্য সুধার উপরও তত ক্ষোভ নেই; সেও হয়ত এমনি ব্যস্ত এখন।

গান্ধীজীর অবস্থা ক্রমশই উদ্বেগজনক হয়ে উঠছে।

বিনয় শহরে ফিরে এল। দেখল ঝড়ের মত সমস্ত শহর ও বড় বড় গঞ্জে ফিরছে প্রমথ ও মজিদ—গান্ধীজীর অবস্থা যেন তাদের মুখেও চিন্তার কালি ঢেলে দিয়েছে।

দিনসাতেক একটা আশঙ্কা চেপে রইল সকলের বুকে। শাহেদুদ্দীন বসে আছেন, বাড়ি যান না। আরো দু'-একটা সভা হল। খাঁ বাহাদুরের এবার সভাপতি হতে কেমন দ্বিধা হচ্ছে—আজও তো কায়দে আজম একটি কথা বললেন না। দিন দুই আগে হাফেজ এসেছে শহরে, সে-ই সভার প্রেসিডেন্ট হল—আগুনের মত বক্তৃতা দিলে। মহাত্মাজীর অনশনে এবার সেও বিচলিত হয়েছে। জেলা লীগ সেক্রেটারি হিসাবে সে তার করে দিয়েছে লীগ সেক্রেটারীর কাছে, কায়দে-আজমের কাছে—গান্ধীজীকে মুক্ত করো। সুরেশবাবু তা শুনে হাসল—ওটা ভোটের তার। নইলে জেলাবোর্ডের ভোটে হিন্দুর ভোট আর পেতে হয় না। বিনয়ও ভাবলে তাই। কিন্তু বিনয় সবিস্ময়ে দেখ্‌ল লীগনেতাদের দেরী দেখে হাফেজ ক্ষুব্ধ হয়েছে। তারপর জিন্না সাহেবের কথা শুনে সে ভয়ানক রুষ্ট হল।

আমি লীগ ছেড়ে দোব—হাফেজ বললে এসে সেদিন শাহেদ সাহেবকে।

সে কি!—শাহেদ সাহেব সবিস্ময়ে বললেন, পাগল!

হাঁ, মীর সাহেব। ভুলবেন না আমি স্বরাজ-খেলাফতের জন্য জেল খেটেছি। আমি নবাব-নাইটদের মতো গোলামীর আখড়ায় থাকব না।

শাহেদ সাহেব তাকে ঠাণ্ডা করে বোঝালেন, লীগকেই আজাদীর আখড়া করো। হাফেজ প্রায় শুনতে চায় না; বললে, ভেবে দেখব।

আজ সমস্ত ভারতবর্ষের মন কতটা বিচলিত—তা বিনয় যেন হাফেজের আচরণ থেকে বেশ বুঝতে পারল। সঙ্গে সঙ্গে হাফেজের সম্বন্ধে বিনয়ের একটু নতুন জ্ঞান লাভ হল। হাফেজ নিতান্ত স্বার্থান্ধ নয়, শুধু সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতাবাদীও নয়। তার প্রাণে একদিন আগুন জ্বলেছিল, আজও একেবারে তা নিবে যায় নি। শাহেদ সাহেবকে বিনয় বললে: কাজটা কি ঠিক হল, মীর ভাই? ওর মনে আগুন ছিল। তা ছাই-চাপা পড়ছে—এদিকে লীগ আছে, আর ওর লোভও আছে। তবু সে আগুনকে নেড়ে দিয়ে জ্বেলে তুললেন না?

শাহেদ মৃদু হাসলেন, বললেন, সে আগুন এই খড়কুটোয় বেশিক্ষণ জ্বলত না, ভাই। ধপ্ করে আজ তা জ্বলত, কিন্তু ধপ্ করে কাল তা নিবে যেত—'ইস্লাম ইন্ ডেঞ্জার' শুনে। মানুষের এমন হঠাৎ-জ্বলা মনোভাবে সব সময়ে জোর দেওয়া যায় না, ডাক্তার।

বিনয়ের মনে হ'ল শাহেদ খাটি কথা বলছেন, কিন্তু তিনি খাঁটি অবস্থাটা আজ বুঝছেন না। আজ দেশের সকলের মনের ছাই উড়ে যাচ্ছে। নইলে বড়লাটের সভার ওসব লোকেরাও চাকরি ছাড়ে!

কিন্তু তখন আশঙ্কায় অন্ধকার দিনগুলোও ক্রমশ কেটে আসছে। মনে হচ্ছে, হয়ত গান্ধীজী আপনার প্রাণশক্তিতেই মৃত্যুকে পরাস্ত করলেন। মানুষ একটু একটু করে আবার আশ্বস্ত হতে লাগল, প্রকৃতিস্থ হতে লাগল। শ্রান্ত মানুষ যেন বিশ্রাম করবার অবকাশ পেল। বিনয়ের মনও শ্রান্ত হয়ে আসছিল। অনেকটা সে সত্যই আরামও পাচ্ছিল। এই দিন-রাত্রি

ছুটোছুটির মাঝখানে সে এ আন্দোলনে নিজের মনে কখন একটা তৃপ্তির সন্ধানও পেয়েছে—সে নিজেকে মিথ্যা হতে দিচ্ছে না।

গান্ধীজীর অনশনে বিনয়ের চিত্ত সত্যই মথিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু ক্রমাগত এবার দিন-রাত্রি সে পাচ্ছিল প্রমথ, শিবুদা', মজিদ, নীরদদের আন্তরিক সহায়তা। আর বিনয় এবার সমস্ত যুক্তিতর্ক আয়োজনের মধ্যে দেখল প্রমথর ব্যক্তিত্বের আরেক রূপ। সত্যই প্রমথ তো অসহিষ্ণু নয়—এ কয়দিন কংগ্রেসের লোকদের সঙ্গে, লীগের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে, হাটে-বাজারে ব্যবসায়ী বণিক সকলের সঙ্গে প্রমথকে কত কথা বলতে হয়েছে। কথা বলতে গিয়ে বারবার প্রমথ যে ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছে, তাতে বিনয় যেন নিজেই অবাক হয়েছে। এত আত্ম-সংযম প্রমথর আছে তা বিনয় আগে ভাবে নি। সে তাকে দেখেছে ইস্পাতের মত—সবল ও আত্ম-সচেতন; কিন্তু তার আত্মসংযত রূপ বিনয় দেখল এবার।

বিনয়ের অন্য এক সন্দেহ ছিল—ওরা কংগ্রেস ও গান্ধীজীকে সত্য সত্যই শ্রদ্ধা করে কিনা। তার সে সংশয়ও কখন এবার ধীরে ধীরে কমে এল। বিনয় ওদের সঙ্গে একত্র হয়ে সর্বত্র ঘুরেছে, মিছিল করেছে, সভা করেছে, মানুষের সঙ্গে দেখা করেছে, কথা বলেছে;—ওদের আন্তরিক চেষ্টায় ওদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। প্রমথরাই প্রথম মুহূর্তটি থেকে তার পার্শ্বে এসে দাঁড়িয়েছিল। অন্য সমস্ত কাজ ওদের তখন চুকে গেল—ওদের কর্মীদের, ছাত্রদের, মেয়েদের—সকলেরই ছিল এক কাজ।

শাহেদ বিদায় নিচ্ছিলেন সেদিন। বিনয়ের সঙ্গে কথায় কথায় বললেন, এ তোমার ভুল, ডাক্তার। প্রমথ, শিবু, মজিদ কংগ্রেসকে ভালোবাসে না তো বাসে কে?—যারা কাউন্সিলে কর্পোরেশনে ভোট নিয়ে মাতামাতি করে তারা?

বিনয় বললে, ওরা যে কমিউনিষ্ট।

কমিউনিষ্টই যদি হয় তবে তো সমস্ত জাতেরই সমস্ত রকম স্বাধীনতা চাইবে।

সীতা সেদিন শহরের সভায় এসেছিল। বৈকুণ্ঠবাবু সভাপতি। বেগমপুরার সভার কথা শুনে তিনিই খবর দিয়েছিলেন, 'তুমি এসো, সীতা, সভায় বলতে হবে।' বিনয়ের এ সব সংশয়ের কথা শুনে তখন সীতা তাকে বলেছিল, সে কি ডাক্তার দা', প্রমথ শিবুদা'রা নয় গান্ধীভক্ত নয়, তা বলে দেশের নেতাকেও ভক্তি করবে না ?

দেশের নেতা, কিন্তু তিনি তো ওদের নেতা নন।—বিনয় বললে।

দেশের নেতা যখন তখন ওদের নেতাও। নইলে তো ওরাই দেশের কেউ নয়।

সুন্দর বলেছে সীতা। সত্য কথা। কিন্তু সীতা তো বলবেই; সে তো কমিউনিষ্ট মেয়ে নয়—সুধার মতো। সীতার মধ্যে যে দেশের মাটি কথা কয়—তার মধ্যে যে দেশের মেয়ে মিশিয়ে আছে। এইবারকার এই কাজকর্মের মধ্য দিয়ে সীতাকেও বিনয় আরও নিজের নিকটবর্তী বলে বুঝেছিল। শাহেদও কি তা লক্ষ্য করেছিলেন ? কিছু বোঝা গেল না।

কিন্তু শুধু বিনয় কেন, শিবুদা' ও প্রমথের সঙ্গেও তো সীতার পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। তা উঠবেই তো। একত্র ওরা যে আশঙ্কাময় দিন যাপন করেছে, যে কাজকর্ম করেছে, তাতে পরস্পরকে নিকট মনে করবে না ? বিনয়ই তো কখন প্রমথকে 'প্রমথ' ও 'তুমি' বলতে শুরু করে দিয়েছে।

তারপর যখন গান্ধীজী অনশন-ভঙ্গ করলেন তখন সকলে যেন আশ্বস্ত হল। বিনয়ও একটা আরাম পেল—বাঁচা গেল।

৭

বিনয় নিশ্চিন্ত হয়েছিল। সে বই পড়ছে। ভালো লাগে ও-হেনরির গল্প, কিন্তু সীতা তা পড়তে নিয়ে গেছল। তাই সীতাকে মনে পড়ছিল—আর বারবার তার মনে পড়ছিল সুধাকেও। সুধা বই পাঠিয়েছে, কিন্তু চিঠি দেয় নি বিনয়কে, বোধ হয় আর দেবে না। কিন্তু কেন সুধা চিঠি দিলে না? না, বিনয় কিছুতেই সুধাকে বুঝতে পারে না। সুধার পাঠানো বইটা বিনয় আবার দেখে, কিন্তু পড়ে না। সুধাকে কি বিনয়ের বই পড়ে বুঝতে হবে?

সকাল বেলা এসে বীরু উপস্থিত, সঙ্গে তার শাশুড়ী আর শালী—সেই রেণু। বিনয় বীরুকে পেয়ে খুশী হল। বিনয় এবার রেণুকে দেখল। একটি কড়া টানে বাঁধা তারের মত সে নারী সামনে—এই রেণু। শ্যামাঙ্গী দীর্ঘাকৃতি একটি নারী। বয়স বেশি হবে না—হয়ত বাইশ-তেইশ। বিধবা, কিন্তু চোখে-মুখে বিধবার সেই ম্লান শ্রান্ত দৃষ্টি নেই। সে মুখভাব শান্ত বা সংযতও নয় অথচ তাতে চাপল্য নেই। চোখে একটা অদ্ভুত দৃষ্টি—যাকে বলা যায় ইন্‌টেন্‌স্‌। অদ্ভুত রকমের একটা ব্যাহত আবেগ ও সংযমের যেন সংগ্রাম-ক্ষেত্র সেই মুখ—যে সংগ্রামে ক্ষয় হয় প্রাণশক্তি, মনের জ্বালা চোখের জ্বালায়ও জ্বলে ওঠে। কড়া বাঁধা তারের মত এই নারী—বেজে উঠবে কি খান খান হয়ে ছিঁড়ে পড়বে, ঠিক নেই। বিনয় তাকাতে পারল না বেশিক্ষণ সেদিকে, বীরুর সঙ্গেই কথা বলতে লাগল।

বিনয়ের মনে পড়ল, বলল, কাগজের কি হয়েছে, বীরু?

বীরু যেন অভিযোগ শুনে ক্ষুব্ধ হল, বিশ্বাস করবেন না—এসব প্রমোদের কাণ্ড। দশ রীম কাগজ সে দিচ্ছে বিদ্যামন্দিরে—মানে, বৈকুণ্ঠবাবু নিচ্ছেন।—খানিকটা নীরব থেকে বীরু বললে, এ নিয়ে যশোদাদা'র ও প্রমোদের সঙ্গে

অনেক ঝগড়া-ঝাঁটি করতে হয়েছে। আমি পার্টির জন্যও কাগজ পেলাম না। অথচ প্রমোদ কে? ন্যায় বলুন, অন্যায় বলুন, কাগজটা তো আমার যোগাড় করা—প্রমোদ তো তখন কলকাতাতে ফুর্তি করে বেড়াচ্ছে।

বিনয় বুঝলে বীরু অসন্তুষ্ট হয়েছে; আর অসন্তুষ্ট হওয়া তো এ ক্ষেত্রে তার পক্ষে স্বাভাবিক। বীরু আবার বললে, কি জানেন, ডাক্তারদা', পরের সঙ্গে কারবার করা সত্যিই ঝকমারি। যশোদাদা'র কথা বলছি না, তিনি পর নন। কিন্তু তাঁর ব্যবসায়ে তাঁর অর্ধেক তাঁর ভাই—আর সে ভাই প্রমোদ চৌধুরী। তখন সে এখানে রইল না, গেল কলকাতায়। এখন কলকাতায় বোমা পড়ছে, এসেছে এখানে। বলে, এখানেই সে থাকবে। যশোদাদা'কে বলে কলকাতায় অন্য লোক পাঠাতে। মানে, আমাকে পাঠাক। যশোদা দা' বলেন, বীরু, তা হলে তোরই যেতে হয়। আমি যাই কি করে? ছোট-খাটো কণ্ট্রাক্ট নিজে করছি, যশোদাদা'ই আমাকে তা জুটিয়ে দিয়েছেন, সবে আরম্ভ করেছি। আসলে সেইটেই হয়েছে প্রমোদের হিংসার কারণ। এদিকে বাড়িতে ওরা থাকছে একা—একটা কার্যক্ষম পুরুষমানুষ কেউ নেই আর।

রেণুর চোখ দেখে বিনয় কিছু বুঝতে পারল না। আরও দিন দুই দেখতে হবে। দিন তিন পরে বিনয় বললে, বীরু, তুমি রেণুকে কলকাতা নিয়ে দেখাও।

বীরু একটু শঙ্কিত হল, বললে, কেন, কোন কঠিন রোগ বলে সন্দেহ হল নাকি?

মোটেই নয়। তার জন্যেই বুঝা দরকার—সত্যিই রোগটা কি?

বীরু কাজে চলে গেল। রেণু তার জন্য বারবার এতক্ষণ খোঁজ করে গেছে—চৌকাঠের ওপার থেকে; বিনয়েরও তা এক আধবার চোখে পড়েছে। এবার হঠাৎ এসে বীরুকে না দেখে রেণু চমকিত হল। বিনয়কে জিজ্ঞাসা করলে, বীরু গেল কই?

চলে গেল আপিসে।

চলে গেল? খেয়ে গেল না? এত করে বলেছি, 'কথা আছে শুনে যেয়ো,' তবু খেয়াল হল না।

বিনয় দেখল রেণুর মুখে একটা আহত অভিমানের ভাব। বিনয় বললে, এ বেলা ওখানেই খাবে, বলেছে ; রাত্রিতে আসবে।

রাত্রিতে !—বোঝা গেল এ কথায়ও রেণু সান্ত্বনা মানল না। তার অভিমান-আহত মুখ চোখ যেন তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। সে ভেতরে গেল।

বিনয় ভাবতে লাগল এই দুর্ভাগ্যগ্রস্ত তরুণীর কথা।

ইতিমধ্যে নীরদ এসেছিল, বিনয়ের কাছেই সেও রয়েছে। গান্ধীজীর অনশনের কথা পড়ে অবধি সে অস্থির হয়ে উঠেছিল বাড়িতে, 'প্রমথদা' কাজ দাও।' কিন্তু প্রমথ বিনয়কে বলেছে, নীরদ কি সেরেছে ঠিক মত? তা' দেখতে হবে বিনয়ের, নীরদ থাকবে তার গৃহে ততদিন।

বিনয়কে এবার দেখে প্রথম নীরদ তাকিয়ে রইল। ততক্ষণে বিনয় তাকে চিনে ফেলেছে, সানন্দে এগিয়ে গেছে, নীরদ না? এলে কখন?

নীরদ তখনো চিনতে পারে নি, চিনবার চেষ্টা করছে, তার চোখে মুখে সেই প্রয়াসের চিহ্ন। বিনয় তাতে আহত হল, চুপ করে দাঁড়াল। হঠাৎ সেই বিভ্রান্ত চোখে একটু আলো এলো? ডাক্তারদা'? রাত্রিতে এ আলোতে চিনতেই পারছিলাম না।

যা বলেছ, কি সব বাল্‌ব আজকাল—আলোই হয় না।

বিনয় জানে, একথা সত্য নয়। আসলে নীরদ এখনো সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠতে পারে নি ; তাই নীরদ পুরনো কথা মনে আনতে পারে না।—অবশ্য বিনয়ও আশা করে নি যে এত শীঘ্র নীরদ সুস্থ হবে। অসম্ভব ওর স্বাস্থ্য ও প্রাণসম্পদ—তাই ছ'-মাসে এতটা সেরে উঠেছে। ফৌজের সেই দেশী দস্যুগুলোর কথা বিনয়ের আজ আবার মনে পড়ল। তাদের কামরায় উঠেছিল বলে নীরদকে তারা মারে! মনে পড়ল প্ল্যাটফর্মে তখনো আহত

নীরদ বলছে, 'শিবুদা' পাহাড়খাড়ী গেলেন না? কাজ পড়ে রইল যে।' তখনো ওর মনে ছিল ওদের পাহাড়খাড়ী যেতে হবে কাজে। আর এখন কোনো কথা ওর মনে করতে কত বেগ পেতে হয়। সেদিন সে মুহূর্তে মৃত্যু যে ওর এত কাছে এসেছিল নীরদ তাও বোঝে নি, বুঝলেও হয়ত এমনি কথাই বলত। বিনয়ের মনে বড় গর্ব নীরদকে সে বাঁচিয়েছে। মেডিকেল কলেজের ডাক্তাররাও স্বীকার করেছে—প্রথম দিকে ভালো ডাক্তারের হাতে না পড়লে নীরদ বাঁচত না, অন্তত সেপ্‌টিক্ হত।

নীরদ ফিরে এল বাইরে থেকে। বিনয় বললে, কোথা থেকে নীরদ?

আপিস থেকে। কাজকর্মের কথা হচ্ছিল।

নীরদ কাজ করতে চায়। কিন্তু গুছিয়ে সে কোনো কাজ করতে পারে না, প্রমথ দু'দিনেই তা বুঝেছে। কি করবে প্রমথ? বিনয় প্রমথকে বলেছে, আরও একটু অপেক্ষা করুন। উপায় নেই। সেই সম্পূর্ণ নীরদ তো এখনো ফুটে বেরুতে পারছে না—এই যে পেরেছে এইটাই আশাতীত।

বিনয় ভাবতে লাগল এই দুর্ভাগ্যগ্রস্ত যুবকের কথাও।

বাড়ির ভেতরে ততক্ষণ শুনতে পেল বিনয় নীরদের কণ্ঠ, ও রেণুদি,' ওঠো, আমার ধুতি কাল রোদ থেকে কোথায় এনে রেখেছ বলছ না। স্নানের জন্য গরম জলও কর নি; আবার নিজেই রাগ করবে, 'ঠাণ্ডা জলে কেন চান করলে।' নীরদের স্বর দাবীর ও অনুযোগের, একই কালে কোমল আর আগ্রহ-সমন্বিত; বিনয়ের কানে তা নূতন লাগল। সেই নীরদ যার কথা ছিল তীক্ষ্ণ ও স্পষ্ট, সেই আগেকার কথার ভঙ্গীও সে ফিরে পায় নি। কেমন ধীরে অনুযোগের সুরে আজ সে কথা বলে। কয়টা দিন এই দুর্ভাগা ছেলেকে রেণু কাছে পেয়ে একেবারে উঠে পড়ে লেগে গেছল; তার নাওয়া-খাওয়া, তার যত্ন-পরিচর্যা বিশেষ করে সে আপনার হাতে গ্রহণ করেছে। নীরদ কোনো দিন তেমন শান্ত ছেলে নয়। বিশেষত এ অসুখে ওকে আরও অস্থিরচিত্ত করেছে। কিন্তু রেণু হয়ত তা বুঝে ফেলেছে, আর

তার সহানুভূতি ও যত্ন নীরদকে তাই একটু পরিবর্তিত করছে। নীরদ আব্দারের সুরে দাবী করতে শিখছে। আজ বোধহয় রেণু বীরুর ওপর রাগ করে এখন শুয়ে ছিল। নীরদ আত্মীয়হীন বালকের মত একটা ব্যর্থ বেদনায় অনুযোগ করছে রেণু তা শুনছে না।

রাত্রিতে বীরু একটু সকাল করেই এল। এবার রেণুর আহত অভিমান ফেটে পড়ল। বীরুকে নিয়ে সে তুমুল কাণ্ড করে আর কি? বীরু তাকে বোঝাতেই পারে না—সকালে তার কাজ ছিল, তাড়াতাড়ি না গেলে চলত না। খাওয়া-দাওয়া ওখানেই সেরেছে। পরে এসে খেতে গেলে সে কাজই হত না। কিছুতেই রেণু সে সব কথা শুনবে না। বীরু তাকে সন্তুষ্ট করবার জন্য বললে, এ জন্যই তো এ বেলা সকাল করে এলাম, কি দেবে দাও খেতে এখন, রেণুদি।—অনেক কষ্টে বীরু আর তার শাশুড়ী রেণুকে শান্ত করলে। তবু শেষবারের মতো বিনয়ের দরবারে নালিশ করতে রেণু ছাড়ল না, বরাবর ওর এমনি কাণ্ড, ডাক্তারদা'। বলে—আসছি; আর তারপরে ওর দেখাই নেই।

বিনয় হেসে বললে, আপনিও এক কাজ করবেন না? এলে পরে আর কথাও বলবেন না, খেতেও দেবেন না।

রেণু এ পরিহাসে একটু খুশী হল। নূতন করে রান্নার ব্যবস্থা করতে লেগে গেল। আর নানা রান্নায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

আহারের পরে বিনয় ও বীরুতে গল্প হতে লাগল। নীরদ শুয়ে পড়ল, ঘুমুতেও লাগল। তার মশারি ফেলে দিয়ে তবু তাকে আর একবার দেখে গেল রেণু। বিনয়ের বিছানা ও মশারি ঠিক করে দেবার জন্য একবার দাঁড়াল। বিনয় বললে, তার মানে শুতে হবে? অনেক দিন পরে বীরুর সঙ্গে গল্পের সুযোগ মিলছে, অত ঈর্ষা করবেন না তাতে।

রেণু একটু লজ্জিত ও একটু সন্তুষ্ট হল। বললে, তা হলে গল্প শেষ হলে

ডাকবেন। আমি পাশের ঘর থেকে আসব। বীরু, ডেকে দিও যেন—নইলে ডাক্তারদা' হয়ত আবার ডাকবেনই না।

রেণু চলে গেল। বিনয় তার দিকে তাকিয়ে ছিল, চলে গেলে বিনয় বীরুকে বললে, ওর অসুখের কথা বলছিলে না, বীরু? অসুখ ওই।

বীরু বুঝতে পারল না। জিজ্ঞাসা করলে, কি?

বিনয় বললে, বুঝতে পারছ না?

বীরু চুপ করে রইল; সে বোঝে নি, এই কথাই বলতে চায়। বিনয় খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে বললে, হিষ্টিরিয়া। আশ্চর্য হয়ো না। এ বয়সের এরূপ মেয়েদের পক্ষে তা খুবই স্বাভাবিক। তবে তার রূপটা একটু নতুন ঠেকছে। নতুনই বা কি? তার কত রূপ যে আছে আমরা জানি না। যখন মনের মধ্যে সংঘাত বেড়ে ওঠে, তখন স্নায়ুশক্তির বিপর্যয় ঘটে। তাতে যার দেহের যেখানটা দুর্বল, তার সেখান দিয়ে সে দুর্বলতার প্রকাশ ঘটে। আমার রোগী এসেছিল একজন ভাটিয়া মেয়ে। কিছুতেই বুঝি না তার গলা দিয়ে কেন রক্ত পড়ে। কত এক্সরে, কত কিছু হল। শেষে বুঝলাম ওই কারণ, এমনি হিষ্টিরিয়া। তবে রেণুকে কলকাতা নিয়ে গিয়ে বিশেষজ্ঞদের দিয়ে দেখানো উচিত। যদি অন্য অসুখ থাকে সেটা দূর করা চাই। কিন্তু আসল চিকিৎসা তাতে হবে না।

বীরু বললে, তা কি?

বিনয় চুপ করে রইল। পরে বললে, না বললেও তুমি তা জানো। কিন্তু আমাদের দেশে তা হবে না।—একটু নীরব থেকে বিনয় আবার বললে, হবেই বা না কেন? বীরু, তুমি তো কমিউনিষ্ট?

বীরু সাশ্চর্যে বললে, হাঁ, তাতে কি?

বিনয় আবার একটু নীরব থেকে বললে, তোমার শাশুড়ী আছেন; তিনি বাধা দেবেন, না?

কি, তা না বললে বুঝব কি করে?

বীরু, তুমি বেশ বুঝছ, বলে লাভ নেই। রেণুর ঘর চাই, গৃহস্থালী চাই, স্বামী চাই, সন্তান চাই—এ দেশে তার উপায় হয় কি ? তুমি কমিউনিষ্ট, তুমিও কি পার না কিছু ব্যবস্থা করতে ?

বীরু চুপ করে রইল। বিনয় উত্তরের জন্য অপেক্ষা করছিল, বললে, জবাব দিলে না, বীরু ?

বীরু তবু নীরব। বিনয় হতাশ হচ্ছিল। বললে, ইজমই দেশে বাড়ছে, অভ্যাস কেউ ছাড়ছে না।

বীরু এবার মুখ তুলল। ম্লান হাস্যে বললে, বলছেন যখন সবই আপনার জানা দরকার। যা বলছেন, তা আমিও বুঝছি, চেষ্টাও করতাম। কিন্তু সেদিক দিয়ে মস্ত একটা ভুল হয়েছে। এখন কিছু করা যায় কি না, বুঝি না।

সংক্ষেপে সরলভাবে বীরু বলে গেল।

রেণু ছিল একটু অদ্ভুত প্রকৃতির মেয়ে। নীহারের বন্ধু বলে বীরুদের সে খুবই ভালোবাসত। আর ভালোবাসত রেণু তার বোন বেণুকে। বীরুকে সে এত পছন্দ করে ফেলল যে বেণুর সঙ্গে তার বিয়ে না দিয়ে ছাড়ল না। তার পীড়াপীড়িতেই এ বিয়ে; কিছুতেই সে নইলে শান্ত হবে না। বিয়ের পর আবার এই মুশকিল হল। কিছুতেই রেণু বুঝবে না বীরুর পার্টির কাজ আছে। 'কবে আসবে ?' বীরুর কথা দিতে হত, না এলে রেণু আবার প্রলয় কাণ্ড বাধাত। মজিদরা বীরুর ওপর রাগ করত—বীরু অত শ্বশুর বাড়ি যাচ্ছে বলে। তারপর কথাটা কিন্তু ক্রমশ বুঝে উঠল বীরু—রেণু না বুঝে নিজেকে প্রতারিত করেছে। রেণু বোন্‌কে ভালবাসত, তাই বোন্‌কে বীরুর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে খুশী হতে বৃথা চেষ্টা করেছে। সে আত্ম-প্রতারণা রেণুর কাছে এখনো শেষ হয়ে যায় নি—এইটুকুই বীরুর সৌভাগ্য। বীরুও ক্রমে বুঝলে, ভুল তারও হয়েছে। তাই বেণুর প্রতিও কোথাও-না-কোথাও তার টানের ঘাটতি পড়বেই। একটু পরেই বীরুর এ বোধ জন্মে। সে বুঝল,

নিজেকে সেও আগে ঠিক বোঝে নি। কিন্তু এখন বীরু বুঝছে, তার নিজের তবু অভাব হবে না—তার অন্ত কাজ আছে, তাঁর সময়ই থাকবে না।

এই আমি সকালে চলে গেছি কাজে। দেখেছেন তা নিয়ে কি কাণ্ড বাধাচ্ছিল ? বীরু চুপ করলে।

বলে বিনয়ের চোখের সামনে থেকে যেন একখানা পর্দা সরে গেল—অজ্ঞাত এক ট্রাজেডির এক অঙ্ক সে দেখতে পেল।

বীরু একটু পরে তাকে বললে, আপনার ব্যবস্থা যে ঠিক, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু ভুল নানা দিকে হয়ে গেছে। আমি সাম্‌নে উঠেছি; বেণুও বোধ হয় আর কোনো কিছু বুঝবে না। কিন্তু রেণুই নানা কাণ্ড বাধাবে—যদি আপনি যা বলছেন সেদিকে চেষ্টা করি। তার মায়ের কথা তো ছেড়েই দিলাম। হয়ত তখনি রেণু সত্যই সচেতন হবে যে, সে নিজেকে এতদিন প্রতারিত করছে,—এবং প্রতারিত করতে পারেও নি। আর একবার রেণু তা বুঝলে জটিলতা আরও বাড়বে।

বীরু থামল। বিনয় জিজ্ঞাসা করলে, কি করবে তা হলে ?

কিছুই জানি না। ওর মা ঠাকুর-দেবতা, স্নান-আহ্নিক, উপবাস-শুচিবাই নিয়ে এক রকম আছেন। ভাবলাম—রেণু যদি ধর্মের দিকে যেতে চায় ভালো হয়। আমার নিজের কোনো বিশ্বাস নেই গুরু; সাধু-সন্ন্যাসীদের উপর। আমি জানি অল্প-বয়স্কা শিষ্যা দেখলে দশ ব্যাটা সাধু জুটে যাবে। কিন্তু দেখা গেল রেণুরও ধর্মে উৎসাহ নেই ভাবলাম—নীহারের বোন, যদি স্বদেশীতে উৎসাহ থাকে। কাজ তো করতোও—সে যুগে আমরা যখন পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতাম, কত সাহায্য করেছে আমাদের। কিন্তু দেখলাম, তা করত সে তার দাদাকে সে ভালোবাসে বলে। সত্যি বলেছেন, সে চায়, ঘর-দোর, গৃহস্থালী। এই আনাজ কুটছে, রাঁধছে; কবে কে আসবে, তার জন্ত কত রকমের আচার করবে, চিঁড়া কুটবে; কোন্ ছোট ছেলের জন্ত জামা তৈরী করবে;—এ সবে তার অদম্য উৎসাহ। এখন ভাবছি যদি

লেখাপড়ায় রেণুর মন যায়। সেদিকে বেণুরও একটু ইচ্ছা আছে। তার পক্ষে দরকারও সব জানা—নইলে আমাদের পার্টির কাগজপত্র পড়ে কিছুই বুঝছে না। ভাবছি, বেণুর সঙ্গে সঙ্গে যদি রেণুও পড়াশোনা করে। তবে এ বয়সে রেণু ইস্কুলে কি পড়বে? যদি কোনো মেয়েদের ইন্‌ডাষ্ট্রি শেখার ইস্কুলে টিস্কুলে হয় তাতে বরং হয়ত উৎসাহ সে পেতে পারে। এ শহরে তা হয় না। বেণুরও এখানে পড়া মুশ্‌কিল। তা হলে ওদের দু'জনকেই কলকাতায় নিয়ে যেতে হয়—অবশ্য মা বাবা তাতে দুঃখিত হবেন। আপনি জানেন কোনো ইন্‌ডাষ্ট্রিয়াল ইস্কুল রেণুর জন্য কলকাতায়?

বিনয় বললে, নিশ্চয়ই কলকাতায় আছে। খোঁজ করলে তুমিও পাবে, আমিও দেখব'খন। কিন্তু আমি বলি—ওঁকে নার্সিং শিখতে দিতে পারা যায় না?

বীরু একটু সংকুচিত হল, বললে, যাবে না কেন? তবে ওর মা আপত্তি করবেন।

আপত্তির আর শেষ নেই। যেন অন্য কাজ ভালো, নার্সিংই খারাপ। অদ্ভুত আমাদের দেশ। যাক্, আমি বল্‌ছিলাম, কারণ দেখছিলাম তো ওঁকে। এই তো নীরদকে কিরূপ যত্ন করছেন। হয়ত ওসব কাজেই রেণু উৎসাহ পাবেন, তৃপ্তি পাবেন, কতকটা ওঁর মনের ক্ষুধা মিটবে।

ঠিকই।—বলে বীরু চুপ করে ভাবতে লাগল।

বিনয় বললে, যা হয় ঠিক করো, বীরু। তারপর কলকাতা চলে যাও। মনে হয় নার্সিংএ ঢুকতে আমি ওঁকে সাহায্য করতে পারি।

রাত্রির মত বীরু বিদায় নিচ্ছে। রেণুকে ডাকতে সে ঘুম থেকে উঠে এসে বিনয়ের বিছানা পাততে লেগে গেল, বীরুকে বিদায় দিলে। বীরু বলে গেল কাল সন্ধ্যায় তারা বাড়ি ফিরবে।

শুয়ে শুয়ে বিনয়ের অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঘুম এল না। অদ্ভুত মনে হল সমস্ত। বীরুর আর রেণুর জীবনের একটা পর্ব উদ্‌ঘাটিত হয়ে গেল এই মাত্র। কত

করুণ আর কত তা নির্মম। অথচ কত বড় মিথ্যার চাপে তা কেমন পিষ্ট হয়ে যাচ্ছে। একজন তো তা ভালো করে জানেও না, আর একজন তা জেনেও বীরের মতই সংগ্রাম করছে, নিজেকে উদ্ধার করছে। সে তুলনায় কত ক্ষুদ্র মনে হয় প্রমথ মজিদের বিচার বীরুর কাজকর্মের। বীরুর রোজগার আর ওদের প্রোগ্রামের মাপকাঠি দিয়েই ওরা বীরুকে যাচাই করেছে। রাজনীতিক বিচার এমনি হয়; তাই ওরা দেখে বীরু ছোট হয়ে যাচ্ছে। অথচ কতখানি বীরত্ব যে এই সংগ্রামে তা ওরা জানেও না। মজিদও জানে না। বিনয়ের মনে পড়ল বিশেষ করে এই কথা, মজিদও জানে না—যে মজিদ আমিনার কথা জানে, বোঝে···আমিনা তার স্ত্রী, ইদ্রিস কণ্ট্রাক্‌টরের মেয়ে। ইদ্রিস চেয়েছিল মজিদের থেকে তালাক নিয়ে আমিনা বিয়ে করুক সওদাগর বাড়ির ছেলেকে—মজিদ তো একটা অকেজো মানুষ, স্বদেশী করে। কণ্ট্রাক্‌টারের সব আশা বরাবরই নষ্ট করেছে মজিদ। কিন্তু পাঁচ বছরের চেষ্টায়ও আমিনাকে ইদ্রিস ও তার বিমাতা হারাতে পারে নি। আমিনা তার পিতা আর বিমাতার সঙ্গে সমানে যুদ্ধ চালিয়ে গেছে। শেষে জিতেছেও— বিনয়ও জানে সে কথা।

আহত মজিদের শয্যাপার্শ্বে আমিনা এসে দাঁড়াল, কণ্ট্রাক্‌টার আর তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারে নি। আমিনা তার শহরের বাড়িতে ফুফির কাছে থেকে গিয়েছে।

মজিদ জানে আমিনাকে কি গঞ্জনা আর বেদনা কাটিয়ে উঠতে হয়েছে। অথচ মজিদও বিচার-কালে বোঝে না বীরুকে। বিনয় জানে, এদেশে কি শাস্তি সইতে হয় অকারণে মেয়েদের—আমিনার বা রেণুর; এখন দেখছে সে, তাই এদেশের পুরুষদের জীবনও হয়েছে বাধায় ভরা—এই তো যেমন বীরু ও মজিদ। সে কাল নেই, সে সমাজ নেই, সে মিথ্যা নিয়ম তবু রয়েছে। মানুষ তাতে বেঁকেচুরে যাচ্ছে— রেণুর মত মেয়ে হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত হয়ে পড়ে, আমিনা তিলে তিলে স্বাস্থ্য দিয়ে

নিজেকে রক্ষা করে। সব ঘুণধরা। বিনয় দেখছে সেই কাঠামোও আর বজায় নেই। এই তো দেখছে বিনয় জাহেদুদ্দীনকে হাফেজকেও; সব যেন কেমন হয়ে গেল—লাভের নেশায় ছুটছে। মানুষের জীবনে এদেশে কোথাও কোন স্পষ্ট রূপ নেই—কেবলই নানা ভাবে তা টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে যাচ্ছে—সমস্তই ঘুণধরা।

অথচ মানুষও তবু আছে—এই তো সে বীরুকে দেখল। যা বলুক প্রমথদের রাজনীতিক বুদ্ধি, বিনয়ের সহজ বুদ্ধি জানছে বীরুকে সত্যই মানুষ বলে। আর মানুষই আসল কথা।

৮

আপাতত মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলা গেছে।

কিন্তু প্রমথ বললে, গান্ধীজী রক্ষা পেয়েছেন, মুক্তি পান নি, ডাক্তার দা। কাজে ঢিলে দিলে চলবে কেন? দেখছেন মানুষের অবস্থা?

চারিদিকে তাকাতে গিয়ে বিনয় চমকিত হল—সত্যই তো, একটি মাসের মধ্যে বেগমপুরায় চালের দর এসে গেল সতের টাকায়—ধানের দর উঠেছে এগার টাকায়। মানুষের দুর্দশা বাড়ছে। কিন্তু তবু দেশের সামনে মানুষের দুর্দশা স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারেনি। সকলেরই চোখ ছিল আগা খাঁর প্রাসাদের দিকে, কিংবা দিল্লীর দিকে; লাট-পরিষদে বা নেতৃ-সম্মেলনে কি হয় তারই প্রত্যাশায় তারা বসে থাকত। এ শহরে আবার জেলাবোর্ডের ভোটযুদ্ধও ছিল; সবাই তা নিয়েও ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। তাই এম-এল-এ'রা

আইন সভার অধিবেশনেও এবার নিশ্চিন্ত মনে কলকাতায় থাকতে পারেন নি; কোন্ চালে কে কাকে মাত করবে ঠিক কি? কিছুতে বিশ্বাস নেই কাউকে। গান্ধীজীর অনশনে যে একটা চেতনা গড়ে উঠেছিল—যা বিনয়ের কাছে তখন ছিল নূতন আশার রেখা—বিনয় এখন দেখলে, তা যেন এভাবে আবার কোথায় চাপা পড়ে গেছে।

বিনয় তাকিয়ে দেখল—সে ভুলে ছিল এতদিন অন্য সব কথা; কিন্তু অন্যেরা ভুলে থাকে নি তাদের ব্যবসা। আইন সভায় মন্ত্রীরা আগেই বলেছিলেন এবার দেশে চাল চার আনা কম ফলেছে। কি মুকুন্দ পাল, কি ঢাকা পট্টির মোহন বাঁশী, কেউ তারা গান্ধীজীর অনশন বলে চুপ করে ছিল না। অন্যদিকে দূর দূর গ্রামে ব্যবসায়ীরাও চা'ল কিনতে আসে ব্যাপারীদের থেকে। চা'লের দর অমনি বাড়তে থাকে আরো। পাহাড়থাড়ীর সেই আটক-পড়া চা'ল কখন রেবতী মহাজনের গোলা থেকে চলে গেছে কেউ টের পায় নি—গাড়োয়ানরা রাত্রিতে-রাত্রিতে পার করে দিয়েছে। ভাড়ার উপরেও গাড়ী প্রতি দু'টাকা তারা বখশিস্ পেয়েছে।

হাফেজও শহরে এসে লীগের উপর রাগ করে একেবারে চুপ করে থাকে নি। বিনয় ভাবছিল, সে বুঝি গান্ধীজীর অবস্থা চিন্তা করে বিচলিত ও আত্মবিস্মৃত হয়েছে। একবার বিচলিত হয়েছিল সত্য, কিন্তু বসে বসে তারপর কি করবে হাফেজ? নিজের কাজকর্মই আবার দু'দিন পরে দেখতে থাকল। সে জরুরি কাজে শহরে এসেছিল।

আবদুল মালেক হঠাৎ ফৌজদারীতে জড়িয়ে পড়েছে। মালেক তার অঞ্চলে প্রেসিডেন্ট-পঞ্চায়েৎ; বড় জোৎদার; তার উপর এম-এল-এ হয়েছিল। অতএব সে তো প্রায় সে-থানায় রাজা। হঠাৎ কৃষিঋণের গোলমালে তার ইউনিয়নে কি গোপন তদন্তে মিষ্টার দাশগুপ্তকে পাঠানো হয়। দাশগুপ্ত দেখলে মালেকের নিজের দোকান ছেলের নামে চলছে; লোকে কেরোসিন পায় না, আর মালেকের ঘরেই ইউনিয়নের কেরোসিন

মজুদ আছে। কেঁচো বেরুল, সাপও বেরুল—মালেক কৃষিঋণের নামে বহু লোকের টাকা আত্মসাৎ করেছে। নিজের চাকর-বাকরের নামে টিপসই করে সেই ঋণ বিলি করেছে। তারা কেউবা যুদ্ধে গেছে, কেউ খেতে না পেয়ে বাইরে গেছে, কেউ জাহাজডুবিতে মরেছে। পাগল দাশ-গুপ্ত আর যাই হোক এসব সইবার মত মানুষ নয়। সদর থেকে হুকুম বেরিয়ে গেল, মালেক তাতে গ্রেপ্তার হয়। জামিন তখনি পাওয়া গেছে, এখন মামলা হবে। তাই মালেক হাফেজকে ধরেছে, 'যদি এ মামলা থেকে তোমরা আমাকে না ছাড়াতে পার তাহলে এসেম্‌ব্লিতেও লীগ ছেড়ে আমাকে হক্‌ সাহেবের দলে যেতে হবে। বাঁচতে তো হবে।' তাই হাফেজ শহরে এসেছিল—মালেকের উপর থেকে মামলা তুলে নেওয়াতে হবে। সে চেষ্টায় ফল হচ্ছিল না, বিনয় তা শুনল। দাশগুপ্ত আর মিষ্টার ব্যানার্জি কিছুতেই এসব অন্যায়ের প্রশ্রয় দেবে না। ওদিকে আরম্ভ হল গান্ধীজীর অনশন। বিনয় এখন শুনলে, মুকুন্দ পালের সঙ্গে হাফেজ তখনি হিসাব-পত্র করে নিয়েছে; আর শুনল হাফেজের শহরে আসবার কারণও ছিল এসব, শুধু জেলা বোর্ডের ভোট নয়। বিনয় মনে মনে বুঝল, শাহেদুদ্দীন হাফেজ মহম্মদ সম্বন্ধে ভুল করেন নি।

বিনয়ের মনে হল সবই এদেশে রূপহীন। আবার মনে হল, না, মানুষ অত রূপহীনও নয়, এই তো শুনল দাশগুপ্তের কাজ।

সেদিনও শহরে চিনি ছিল না। অবশ্য বিনয় নিজে চিনি পেয়েছিল, কিন্তু সাধারণ চায়ের দোকানেও চিনি ছিল না। তখনও বিনয় জানে নি, পরে শুনেছে,—বজরংলালরা বলে, 'নেই। চিনি চালান আসে নি।' তারই অধীন ছোট খুচরা দোকানীরা বলে, 'বজরং বাবু চব্বিশ টাকা মণের কমে আমাদের চিনি ছাড়ছেন না, আমরা কি করি?' দাশগুপ্তের উপর মিষ্টার ব্যানার্জি এর খোঁজ করবার ভার দেন।

বিনয় জানত না—বজরংএর গুদামে দু'শ মণ চিনি ধরে দাশগুপ্ত তা

শীলমোহর করে এসে তখন এস-ডি-ওকে তাঁর রিপোর্ট দিচ্ছিলেন—এমনি সময়ে বিনয় সেখানে গিয়েছিল। গান্ধীজীর অনশন, সভা-সমিতির অনুমতি নিতে হবে। নির্মল দাশগুপ্ত কিন্তু গান্ধীজীর নাম, তাঁর মুক্তির আন্দোলন সহ্য করতে পারল না। সে তখন গায়ে পড়ে কথা বলেছিল, আর বলেছিল বিনয়দের আক্রমণ করে, 'একজন লোক সখ করে না খেয়ে আছে, আপনাদের ঘুম নেই তাই চোখে। লক্ষ লোক যে না খেতে পেয়ে আজ মরছে, সে কথাটাও তাই আপনাদের কাছে কিছু নয়, না?'

বিনয় বিরক্ত হয়ে বলেছিল, কি করতে হবে তা হলে?

কেন? গান্ধীজী খেলেই পারেন—

বিনয়ের পক্ষে সেদিন দাশগুপ্তের কথা অসহ্য হয়েছিল। ঘৃণায় সে আর কথা বলে নি। কিন্তু এবার মালেকের ও বজরংলালের ব্যাপার শুনে দাশগুপ্তের উপর বিনয়ের বিরক্তি লুপ্ত হল। মানুষ এই দাশগুপ্ত, বেঁকেচুরে গেলেও সে এখনো মানুষ রয়েছে।

মানুষ সে থাকতে পারত। বেঁকেচুরে না গেলে নির্মল দাশগুপ্ত বিনয়ের মতোই বুঝতে পারত—একজন অসাধারণ মানুষের কথাই তখন দেশের সমস্ত মন জুড়ে ছিল। কারণ, এদেশের সাধারণ মানুষেরও তিনিই যে পরম আশা। অবশ্য সেই সাধারণ মানুষেরা যে মরছে বিনয়ও তখন তা বুঝতে পারে নি, দেখতে চায় নি—অথচ সেই অসাধারণ মানুষের জেলের চিঠিতেও এই তথ্য ছিল পরিষ্কার—তাঁর দেশের মানুষ খেতে পাচ্ছে না। কিন্তু দাশগুপ্তও এই সত্যটা বুঝেছিল, আর বারে বারে বিনয়কে এ কথা বলছিল প্রমথ, মজিদ, শিবুদা।

আত্মহত্যার খবর প্রতি সপ্তাহেই দু'-চারটি আসছিল; তা আর নতুন নয়। অনাহারে মৃত্যুর খবরও এখন আসছে। প্রথম এল সর্ষেখালি ও সন্নাখালির দিক থেকেই। তারপর খবর এল, শহরের কাছাকাছি হাকিমহাকার আশে পাশেও নাকি মানুষ মরছে। সর্ষেখালি শহর থেকে

দূরে—কেউ যেতে চায় না। মজিদ যায়, বরাবর থাকতে পারে না, এদিককার কাজেও আবার তাকে ফিরে আসতে হয়। একা দয়ারাম দাস ওদিকে কি করবে? তার বাড়ি সেখানে। দয়ারাম হেলে দাস। অবস্থা মন্দ ছিল না। সে বলে, 'আপনারা একজন আসুন। শিবুদা', মজিদ মিঞা, যে হয় আমার বাড়িতে থাকবেন—দেশটা বাঁচান। নইলে যে মানুষ মরছে।' মজিদ রিপোর্ট নিয়ে আসে, সব সত্য। সল্লাখালিতে একবার যাবে কি বিনয়? দয়ারাম বলে গেছল, 'আপনি চলুন, ডাক্তারবাবু, মেয়েদের কি দশা হল বুঝবেন।'—'বেগমপুরায় বেশ্যাপাড়ায় মেয়ে বিক্রী হচ্ছে,' বলেছিল সীতা। কথাটা মিথ্যা নয়, বৈকুণ্ঠবাবুও জানেন; তিনি বলেছেনও, 'তবে ওসব বৈরাগী-বোষ্টমের মেয়ে এমনিই তো হয়, নতুন আর কি?' সোনাকান্দির দিকেও সেই কদর্য দুর্ভাগ্যই দেখা দিয়েছে—অন্নজল যাদের নেই সেই হতভাগিনীরা মানইজ্জত রাখবে কতদিন আর? সোনাকান্দির লোক এসে বিনয়কে জানিয়েছে—তারা কলেরায় মরছে, জ্বরে তারা অনেকে ধুকছে। একবার ডাক্তারবাবু দেখবেন না তার পুরনো গ্রামের লোকদের?

বিনয় গেল সোনাকান্দি—তার নিজের গ্রাম সোনাকান্দি। ফৌজের জন্য এ গ্রাম আর বাড়ি তাদের ছাড়তে হয়েছিল মাস দশেক আগে।

গ্রামের মাত্র নদীর দিকটা জুড়ে ছোট একদল ফৌজ এখন রয়েছে। তাদের লরী গাড়ী যাচ্ছে, রাস্তাঘাট তাই আজ চমৎকার। অন্য দিকটা ফৌজ ছেড়ে গিয়েছে, লোকজন ফিরে এসেছিল। কিন্তু ক্ষেত-মাঠ-ঘাট নেই, কি করবে তারা? অনেকেই ফৌজের কাজকর্ম করে, তাতেই বেঁচে আছে। মুসলমানদের অনেকে আগেই লড়াইতে চলে গেছল—তা বিনয় জানে। ওরাই বিনয়ের নিকট সব থেকে বেশি কৃতজ্ঞ। গ্রাম ছাড়ার ব্যাপারে ও ক্ষতিপূরণের ব্যাপারে বিনয় তখন ওদের খুব সাহায্য করেছিল, তা ওরা ভোলে নি। আসলে যুবক ও সমর্থ পুরুষ এখন কেউ গ্রামে নেই—কেউ গেছে ফৌজে, কেউ গেছে নানা কাজের খোঁজে, বেগমপুরার বাজারে

কিংবা সহরে। তারা চাল নিয়ে এলে গ্রামের এরা খায়। শ'খানেক ঘর মুসলমান ছিল—শ'চারেক লোক; কিন্তু তারা আট আনা লোক আজ আধ পেটা খায়—কচু, গাছের ফল, মূল, পাতা যা পায় তা দিয়ে উদর ভরতি করে। চাঁদ মিঞা বুড়ো শাদা দাড়ি নিয়ে এগিয়ে এসেছে খুঁজতে—বিনয়ের পিতাকে পর্যন্ত সে চিনত এক সময়ে। বিনয় জিজ্ঞাসা করলে তাদের মালী কাসেম কোথায়, 'কাসেম চাচা?' চাঁদমিঞা বললে, 'গত আষাঢ়ে মরে গেছে'। অনেক কাজ করেছে বিনয়দের বাড়িতে কাসেম। তখন তার জায়গা-জমি ছিল, শেষে কিছু ছিল না। 'একটা নাতি ছিল মরে গেছে। কি জ্বর হল, ছাড়ল না।' চাঁদ মিঞার ব্যাটারা ক্ষেতের কাজ করত; কিন্তু ক্ষেত আজ কই? ফৌজের কাজ? সেও তত বেশি নেই এদিকে। দু'একজন সাহেবদের বাবুর্চি-খানসামার কাজ করে, তারা আছে এক রকম। মারধোর খায়—টাকা-কড়িও পায়। 'কিন্তু আমরা খাই কি করে, বল?'—বললে চাঁদমিঞা—'এ আকাল। তিন কুড়ি বয়স হয়ে গেছে, আমার জীবনে বারো টাকা ধান শুনি নি।' কি করে দিন চলে তার?—বিনয় জিজ্ঞাসা করল। 'চা'ল পাই তো খাই এক বেলা—নইলে খাই শটীর মূল, কচুর 'মুড়া' সিদ্ধ।' রবিশস্য উঠলে আবার কিছুটা সুবিধা হত। তার আগে এল এই বর্ষা। বিনয় শুনল—এটা-ওটা যা পায় ওরা খায়, আর মরে। পাড়ার ছেলেরা বিনয়কে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে—উলঙ্গ, শীর্ণ, ক্ষুধার্ত ওরা। মেয়েরা একটু আড়ালে থেকে দেখছে; কাপড়-চোপড় তাদের বেশি নেই। বিনয় জিজ্ঞাসা করে জানল—গফুর নেই গাঁয়ে। তার স্ত্রী দুটো ছেলে নিয়ে অন্য গাঁয়ে রয়েছে। কুদ্দুস গেছে ফৌজে, যাবার আগে স্ত্রীকে তালাক দিয়ে গেছল—বলেছিল 'তুই আবার নিকে করিস'। আল্‌ফাজান তবু নিকা করে নি, এতদিন। অনেকে বলেছে আল্‌ফাকে। আল্‌ফার ছোট একটা মেয়ে আছে। আরিফ গরুর গাড়ী চালায়, বেশ এমন কেরায়া পায়, নিকে হবে এবার। আরিফই বাঁচাল ওদের।

জগৎ সেন—সেনেদের বাড়ির শেষ কর্তা—আছেন গ্রামে। বললেন, 'এই লাউ দেখছ, রাখতে পারি এদের জন্য? এখানে-ওখানে যা পায় চুরি করে পালায় ওই মুসলমানদের ছেলেগুলো। কিছু রাখবার জো নেই। কদ্‌বেলগুলো পর্যন্ত গাছ থেকে পেড়ে চুরি করে খায়। এত চুরি বেড়েছে, বলব কি? গোলার ধান প্রতি রাত্রে চুরি হচ্ছে। সেদিন এক নৌকা ধান লুঠ হয়ে গেল বিনাবেতির খালে। বৈকুণ্ঠ বাবুকে, খাঁ বাহাদুরকে বলি—আপনারা করছেন কি? গ্রামে থাকা অসম্ভব হল।'

বিনয় বেশি ঘুরতে পেল না। একবার তবু গ্রামটা দেখে এল। একটা ছন্নছাড়া দৃশ্য।

জেলেরা শক্ত কাজ করতে পারে না, করতে চায় না। মুসলমানরা তবু এরই মধ্যে খাটছে—কিন্তু এদের সে চেষ্টাও নেই যে। জগৎ সেন জানালেন—'ফৌজের মালপত্র বইবার জন্য জেলেদেরও নিয়েছিল। পাঁচ সাত মাইল পথ ওরা দৌড়ে যায় মাছের ঝুড়ি কাঁধে নিয়ে। কিন্তু এমনি মাল আধ মণ বইতে দিলেও বলে, পারি না। ওদের ওই মেয়েগুলো বেশ্যা হয়ে গেছে, ওরাও তাই বসে বসে খেতে চায়—কাজ করবে না।' বিনয়ও রাগ করছিল জেলেদের উপর মনে মনে। শেষে চোখ পড়ল তার,—মধু দাস বললে বলে, 'আমাকে কাজে নেবে কেন? বারে বারে জ্বরে ভুগছি। বললে সুবাদার সাহেব, 'তুই চলে যা তোকে দিয়ে কাজ হবে না।' তখন ইদ্রিস কণ্ট্রাকদারের মাল বইতে গেলাম। এক মণ বোঝাও আর তুলতে পারি না। অসুখ তো লেগেই আছে। কার শরীরে কি আছে যে কাজ করব?'—বিনয়ের এবার চোখ পড়ল—সত্যিই তো; শক্ত কাজ করবার মত স্বাস্থ্যই তো এদের নেই আজ। হয়ত কোনো কালেই এদেশের গরীবদের তেমন স্বাস্থ্য ছিল না।

বিনয় দেখল যোগীদেরও। ওরা মাছ খায় না বেশি, মাংস খায় না, দুধ পায় না। শরীর পূর্বেও ছিল দুর্বল, মন ওদের হাজার বছরের চাপে

পঙ্গু; তার ওপরে এসেছে আজ অনাহার—কাজ করবে কি করে এরা?

বিনয় গাড়ীতে ফিরছে। জগৎবাবু বলছিলেন, 'ওই বলেছি—যোগীদের কথা যা শুনেছ ঠিকই। দেখলেও তো বাঁচবার পথ দেখি না। জেলেরা তবু বসে বসেও খায়, নৌকা নেই, জাল নেই, জালের সুতাও নেই যে বসে জাল বুনছে। ওরা বাঁচবে—ওদের মেয়েগুলি যা তা করে রোজগার করে আনে তাই। কিন্তু যোগীরা করবে কি? মুসলমানদের মত লড়াইতেও যাবে না, মজুরও খাটবে না। কেবল বলবে, 'বাবু কিছু ধার দিন। দশ সের চা'ল দিন গোলা থেকে—সুদ দেব দেড়ী।' আমি বলি, 'কোথা থেকে দিবি? আর আমিই বা এত পাই কোথায় যে ধার দোব তোদের? গোবিন্দ মহাজনের কাছে যা না?'

গাড়ী চলল। বিনয় চুপ করে বসে রইল।

বসে বসে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইল—তার সোনাকান্দি—এই তার সোনাকান্দি। মানুষ তার এক পা এক পা করে আজ কোথায় এসে পৌছুল?

মজিদ বললে, চলুন একবার সর্ষেখালি—সন্নাথালি। গরুর গাড়ীতেই যাব। কষ্ট হবে কিছু, সইতে পারবেন না?

বিনয় হাসল, বললে, বর্মার পথের থেকেও বেশি কষ্ট হবে?

মাইল পঁচিশ পথ। খানিকটা এগিয়ে যাওয়া গেল রেলে; তারপর এক রাত্রি যেতে হল গরুর গাড়ীতে। সকালে বিনয় পৌছুল সর্ষেখালি। বড় থানা সর্ষেখালি। চৌকি সর্ষেখালিতে, সন্নাথালিতে তার গঞ্জ, কাছাকাছিই দু'জায়গা। খাল, নদী ও পথে এ অঞ্চলের যোগাযোগ বাইরের জেলার সঙ্গে,—জাহাজমারা ও সূর্য্যিপুরের সঙ্গে, ওপারে নেওয়াজপুরের সঙ্গে, আর

এদিকে বেগমপুরা হয়ে সদরের হাট-বাজারের সঙ্গে। চৌকিতে ইস্কুল রয়েছে, হাসপাতাল রয়েছে, মুন্সেফি আছে—ভদ্রলোকও আছে। এক সময় এ চৌকি বেগমপুরার মত একটা শহর হতে চলছিল। এখন কিন্তু তা বাড়তে পারছে না, থেমে পড়ছে। সল্লাখালি পাটের গঞ্জ; সুপারি নারকেলের বড় হাট। কিন্তু পাটের দর নেই, ওদিকে সুপারি নারকেলের গাছ ঝড়ে নষ্ট হয়েছে। সল্লাখালির গঞ্জে আবার নৌকোই এখন আর বেশি নেই, সব সেবার সরকার নিয়ে নিয়েছে—এসব নৌকো যা দেখা যায়? সরকারের কোনো ঠিকাদারের, কিংবা স্বথ্যিপুরের ইব্রাহিমভাইদের—তাদের এদিক থেকে চা'ল কেনা প্রায় শেষ হয়েছে।

চা'ল নৌকোয় গেছে, গরুর গাড়ীতেও গেছে, এখনো যাচ্ছে—সব স্বথ্যিপুরে গিয়ে ঠেক্‌ছে,—হাসপাতালের ডাক্তার জানালেন ;—আর আমরা? আমরা এখানে মরছি—চাল কোথায় এ অঞ্চলে? দাম এখন বাইশ টাকা মণ—যদি পান।

চা'ল কোথায় আমাদের গোলায়?—বললে গঞ্জের ব্যাপারী লালমিঞা। —সে তখন কিনেছিলাম—হাফেজ মিঞা যখন এসেছিলেন। আমি কিনেছি, তাঁরা নিয়ে গেছেন। এখন চাল কোথায়?

নকুল সাহা বললে, 'চাল কোথায়? এই তো জানেন মজিদ মিঞা। বলুন তো—কিছু রাখল আর এদিকে ইব্রাহিমভাইরা?'

চা'ল নেই। সামান্য ধান বাজারে ওঠে। এবার পাটের দরও পায়নি কেউ, পাঁচ টাকা ছ'টাকা করে পাট বিক্রী হয়ে গেল। ব্যাপারীরা বলেছে, 'গবর্মেণ্ট বলে যুদ্ধে পাট চাই ; এর বেশি দর হবে না।' চাষীরা সে দরেই বিক্রী করতে বাধ্য হয়েছে। অথচ ধানের দরই এখানে ষোল টাকা। খায় কি ওরা যারা পাট চাষ করেছিল?

খায় কি ওরা? পথের ওপরে দু'পাশে বিনয় দেখল মানুষ বসে আছে, ঘুরছে দয়ারামের সঙ্গে; তারা ভিক্ষা চায়, 'বাবু, ক্ষুধায় মরছি, ক্ষুধা।'

কাছাকাছি গ্রামে বিনয় যাবে কি? দরকার নেই, তবু দেখতে গেল। সন্নাখালির ওদিককার জেলেদের অবস্থাও দেখল। সূতো নেই, জাল নেই; নৌকো আগেই গেছল; এখন কর্মশক্তি নেই, উত্তম নেই। ঘরে বসে বসে থাকে, মেয়ে বৌ যেভাবে পারে রোজগার করে আনে। এদিকে ফৌজ কম। কিন্তু তবু আজ নানাসূত্রে মানুষের হাতে টাকা আসছে। মেয়ে-মানুষের ব্যবসা করবার লোকের অভাব নেই। ইতিমধ্যেই তার ছাপ এদের মেয়েদের দেহের উপরে, আচরণে, চলাফেরায় রূঢ় হয়ে ফুটে উঠেছে।

দয়ারাম নিজের গ্রামে লোকদের ডাকল, তাদের জড়ো করলে। বিনয় শুনল নানা আত্মহত্যার কাহিনী। এখন অবশ্য এ পর্বও পুরনো হয়ে আসছে। এখন মানুষ অনাহারেই মরছে। ঘরে চুপ করে অনাহারে আছে দরিদ্র ভদ্রলোকেরা, গরীব ছোটলোকেরা বাইরে পথে বেরিয়ে এসেছে। ছেলে, বুড়ো, মেয়ে বসে গেছে; হাতে নারকেলের 'মালা' কি টিনের পাত্র—ভিক্ষা চাই। শহরে বিনয় যা দেখেছিল, এই চৌকিতে গঞ্জে তাই যেন চতুর্গুণ ভয়ঙ্কর হয়ে দাঁড়িয়েছে। পথের পার্শ্বে বসে পড়ছে, শুয়ে পড়ছে, অস্থিচর্মসার দেহ। মরছেও। হাসপাতালের ডাক্তার বললেন, 'মরবে না? দু'একটা করে মরছেও। দেখছেন তো? ওষুধপত্র দিই—কিন্তু কি দোষ ওষুধ? খেতে পায় না, ওষুধ খেলে কি হবে? থানার দারোগা ইন্স্পেক্টর কেউ তো বলবে না মানুষ মরছে। অনাহারে মরছে, একথা তো তারা রিপোর্ট লিখবেই না। মৃত্যুরই হিসাব এখন তারা রাখে না। উল্টো নানা প্রশ্ন করে, 'মরেছে কে বলে?' ভয়ে মৃত্যুর খবর আর কেউ থানায় দিতেও চায় না।' মৃত্যুর খবর মজিদ দয়ারাম বললেই বা কি? থানার খাতায় তার কোনো উল্লেখ থাকবে না, সরকারও তা মানবে না।

অথচ সমস্ত সর্বেখালির বাতাসে যেন মৃত্যুর নিঃশ্বাস।

বৈশাখ শেষ হয়নি—আকাশে প্রচণ্ড সূর্য। আর তার তলায় মানুষের পৃথিবী যেন ক্ষুধায় শীর্ণ-বিশীর্ণ—নিষ্প্রভ চোখ তুলে তাকিয়ে আছে তার

হাত মেলে। কোথায় অন্ন? কোথায় অন্ন? প্রাণ কি ওদের এভাবে যাবে?

সমস্ত মনে আগুন জ্বলছে বিনয়ের।

শহরে ফিরে এল বিনয়। প্রায় তখনি মিষ্টার ব্যানার্জির নিকট গেল। এ-ডি-এম্ মিষ্টার ব্যানার্জি এখনো যুবক, মাত্র পাঁচ-সাত বছরের চাকরি, তিনি কাজকর্ম করতে উৎসাহীও। তিনি সব শুনলেন। বললেন, মৃত্যুর খবর আপনারা হয়ত বেশি বেশি শুনছেন। তবে লোকে বরাবরই তো আধপেটা খেয়ে থাকে; এখন খেতে পাচ্ছে না তাতে আর আশ্চর্য কি? আর, আস্তে আস্তে নানা রোগে তা হলে মরবেও।

সব তিনি বোঝেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বোঝাতে চান—করবার কিছু নেই, কারুর কিছু করবার সাধ্য নেই।

বিনয় বলেছিল, এখন করবেন কি, বলুন।

মিষ্টার ব্যানার্জি বললেন, কিছু করবার পথ রেখেছেন আপনারা? চমৎকার আপনাদের মন্ত্রী, মেম্বর, নেতারা সব। একটা ঘাটতি জেলা, তাকে বাড়তি জেলা বলে বলা হল—মন্ত্রীরা দেখলেনও না। এখনো আমরা যত লিখি, তারা বড় ব্যস্ত—আইন-সভা চলেছে। কলকাতাকে সামলাতে না পেরেই মন্ত্রীরা বিপদে পড়েছে। সিবিল সাপ্লাই'র কর্তারা সেখানেই ব্যস্ত। আমরা আমাদের এখানকার অফিসারদের সস্তা চাউল দিচ্ছিলাম। বড় কর্তারা তাই আমাদের উল্টো বলেন, 'তোমাদের বাড়তি জিলা। সেখান থেকেই জিলার চা'ল সংগ্রহ করে নাও।'

ওরা তা হলে আছে কেন?

সে কথা কি আমার বলা উচিত?—ব'লে মিষ্টার ব্যানার্জি হাসলেন।—দশজনের প্রতিনিধি ওঁরা, দেশের মন্ত্রী!—মুখে তাঁর সব্যঙ্গ হাস্য।

বিনয় ক্ষুব্ধস্বরে বললে, মন্ত্রী! দেশের প্রতিনিধি! আজ দাঁড়াক এসে সর্ষেখালিতে—হক্ সাহেব, কি নবাব সাহেব। দাঁড়াক এসে সল্লাখালিতে, সোনাকান্দিতে, বাঁড়ুজ্জে সাহেব আর বোস সাহেব। মানুষ মরছে—মন্ত্রী দিয়ে তারা করবে কি? মিষ্টার ব্যানার্জির মুখে ব্যঙ্গহাসি জেগে রইল।

আবেগ সংযত করে স্থির কণ্ঠে বিনয় বললে, মিষ্টার ব্যানার্জি, কি দুঃখে এদেশের মেয়ে মান বিক্রী করে, ছেলে বিক্রী করে, তা আপনি বুঝবেন। আপনার-আমার সামনে তা ঘটছে। না, না, আপনি প্রমাণের কথা তুলবেন না। আমি জানি, প্রমাণে এসব কথা আপনাদের সামনে টেঁকানো দায়। আমরা যতই বলি—চৌকিদার বলবে, 'না'; প্রেসিডেণ্ট বলবে, 'না'; দারোগা বলবে, 'না'; আপনারা বলবেন, 'না'; হোম মিনিষ্টার বলবেন, 'না'; আর এমেরিরা তো বলবেনই 'না'। এই একটানা 'না'তেও তবু মিথ্যা হবে না এই কথা—কৃষ্ণচন্দ্রের স্ত্রী কেন মরেছে; মিথ্যা হবে না—সোনাকান্দির জেলের মেয়েরা কোথায় চলেছে; মিথ্যা হবে না সর্ষেখালির, সল্লাখালির, হাকিমহাকার, মেহেরপুরের অনশনে মেয়ে-পুরুষের মৃত্যু। 'প্রমাণ' হবে না জানি, তা বলে মিথ্যা হবে না। আপনার কাছে আমি প্রমাণ করবার জন্ম আসি নি। এসেছি বলতে—মানুষকে বাঁচান।

মিষ্টার ব্যানার্জি যুবক, একটু বিচলিত হলেন। বললেন, আমাদের কি করতে বলেন, ডক্টর মজুমদার?

চা'ল দিন।

কিন্তু চা'ল কই?

নেই? তা হলে আনান; সুর্য্যিপুরের নাখোদাদের গুদামে আছে।

বলেছি, সে জন্ম সরকারের অনুমতি চাই। আগে এজন্ম লিখেছি, তার করেছি—গবর্মেণ্টের জবাবও পাই নি। বেশ, আজ আবার তার করব কমিশনার সাহেবকেও।

যা হয় করুন। কিন্তু চা'ল দিন, বাঁচান মানুষকে।

সনির্বন্ধ নিবেদন জানিয়ে বিনয় বিদায় নিয়ে বাসায় এল।

পথের দু'ধারে লোক বসে আছে হাত মেলে। বাসায় হানা দিচ্ছে—'বাবু ভাত, বাবু ভাত, বাবু ভাত।'

বেলা দশটা হয়ে গেছে। লোক আপিসে যাচ্ছে। ইস্কুলের ছেলেরাও চলেছে—শহরের ছেলেরা অনেকেই খেতে পেয়েছে। তবু এরই মধ্যে বিনয় যেন অর্ধভুক্ত শ্রান্ত মুখ দেখতে পাচ্ছে। শিবুদা' লিখেছেন, 'বসতে বসতে ছেলেরা ক্লাশে শুয়ে পড়েছে, ক্ষুধায় ঝিমোতে ঝিমোতে আর বসতে পারে না। পড়া বলতে দাঁড়ালে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। শুধু শাদা আলু সিদ্ধ খেয়ে এসেছিল তিনদিন ধরে ইস্কুলে।' এরই মধ্যে তেমন ছেলেও আছে কি—ওই যারা যাচ্ছে পথে? আছে তাদের অর্ধভুক্ত পিতা? হয়ত দোকানে সে পিতা বসে আছে, হয়ত আপিসেই চলছে, হয়ত কলম নিয়ে বসে গেছে সেখানে। আর ঘরের মধ্যে? উনুন জ্বলছে কি তাদের? কতদিন কি খাদ্য তাদের জুটছে?—শাক? কচু? সেই ওল সিদ্ধ?—আর বুকের শিশুরা সেই মায়েদের? শুষ্কবুকে শুষ্ককণ্ঠ শিশুরা একটু একটু করে মৃত্যুর দিকে যাচ্ছে?···বিনয় পথের দিকে তাকাল—দলে দলে আজ পথে অন্নহীন নারী চলছে—বালিকা, বিগত-যৌবনা, বর্ষিয়সী, বৃদ্ধা; আর বালক ও বৃদ্ধ। হাতে মাটির ভিক্ষাপাত্র, পরিধানে কি ওদের তার ঠিক নেই। বাড়ির দুয়ারে দুয়ারে এক কথা,—মা, ক্ষুধা, ক্ষুধা, ক্ষুধা, বাড়ির ভেতরেও হয়ত মৌন মায়ের রক্তস্রোত হৃদ্‌পিণ্ডে এই কথাই জানাচ্ছে ক্ষীণাঘাতে—'ক্ষুধা, ক্ষুধা, ক্ষুধা।'

কিন্তু বিনয় স্থির থাকতে পারল না। বাজারে বেরিয়ে গেল—মুকুন্দ পাল, ঢাকাপট্টি, শিলেটপট্টির ব্যবসায়ীদের কাছে। গান্ধীজীর মুক্তির আন্দোলন উপলক্ষে তারা সকলেই বিনয়ের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে। তাকে বেশ শ্রদ্ধা করে—সে 'মীর শাহেদুদ্দীনের বন্ধু ডাক্তারবাবু'।

বিনয়কে তারা খুব সমাদর করলে। মানুষ সত্যই ডাক্তারবাবু, তাঁরা তা মনে মনে স্বীকার করে, মুখে আরও বেশি বললে।

বিনয় বললে, আপনারা এবার মানুষকে বাঁচান।

চা'ল কই ডাক্তারবাবু?

যা আছে তা' দিন মানুষকে সস্তায়। আপনারা তো ইব্রাহিম-ভাইয়ের এজেণ্ট হিসাবে অনেক কিনেছেন।

সে খুদকুঁড়োটি পর্যন্ত ইব্রাহিমভাইরা বুঝে নিয়েছে। বাবা, আসল ব্যবসায়ী।

কিছু তো নিজেরাও রেখেছেন?

কোথায়? আপনারও আমাদের কথা বিশ্বাস হল না? চলুন, দেখবেন, আমাদের গুদাম।

বিনয় দরকার দেখল না। ওঁরা মিথ্যা বলবেন কেন?

তা হলে কি করতে হবে বলুন?

সুরেন্দ্রবাবু এসেছিলেন ব্যবসায়ীদের সমিতির সভায়। বললেন, কণ্ট্রোল তুলে দেওয়ান, বাজারে চা'ল আসুক।

বিনয় একটু চিন্তিত হল। সে বললে, দেখুন, একথা তো ইস্পাহানি সাহেব বলেন দেখলাম আইন সভায়। আপনারাও বলেন?

সুরেন্দ্রবাবু বললেন, ডাক্তার মজুমদার, কারবার যারা বোঝে তারা সবাই বলবে, সে ইস্পাহানিই বা কি, আর আমরাই বা কি?

বিনয় চুপ করে রইল। পরে বললে, কিন্তু আমরা যে সমিতি থেকে কণ্ট্রোল চেয়েছি, রেশনিং চেয়েছি।

ওই তো আপনাদের দোষ। আপনারা জীবনে ব্যবসাপত্রের খোঁজ রাখেন না, এক-একটা কাজ করে বসেন। আমরা বল্‌লে বল্‌বেন—আমরা বুঝি এক-একটা মতলব হাসিল করতে চাই।

বিনয় সত্যই দোমনা হয়ে পড়ছিল। বল্‌লে, কিন্তু আমাদের এ জিলায় তো চা’ল এবার হয়েছেই কম। এখন আর বাজারে নতুন উঠবে কি?

তার জন্যই তো বল্‌ছি সুযি্যপুর থেকেই চা’ল আনাবার অনুমতি আদায় করুন।—ঢাকাপট্টির মোহন বাঁশী বল্‌লে।

শিলেটপট্টির ব্যবসায়ীরা অমনি বল্‌লে, ফেচুগঞ্জ সায়েস্তাগঞ্জ সিলেটের সঙ্গে বন্দোবস্ত করলে আপনারা আরও সস্তায় চা’ল পাবেন, তা’ই করুন।

মুকুন্দপাল ও মোহনবাঁশী বল্‌লে, দূর। শিলেট কত দূর। গাড়ী পাবে না, অনেক অসুবিধা, সুযি্যপুরেই সুবিধা।

দু’দলে এ নিয়েই তর্ক চল্‌তে লাগল। বিনয় বুঝলে এদের পরস্পরের গদি বিভিন্ন স্থলে। সে বল্‌লে, এ তর্কে কাজ কি? সিলেট তো আসাম সরকারের এলেকা, তাদের অনুমতি পাওয়া আরও দুঃসাধ্য। বাঙলারই এক জিলা থেকে আর জিলায় চা’ল আনা-নেওয়ার অনুমতি পাচ্ছি না।

সিলেটের ওরা বল্‌লে, আসাম সরকারের অনুমতি না পেলে বাংলা দেশই বাঁচবে না। বাংলায় এবার চাল কম হয়েছে। তা ছাড়া, আমাদের সোনাপুরে আবার বর্মা’র চা’ল নেই, এদিকে ইব্রাহিমভাইও চা’ল কিনে নিয়ে গেছে,—সিলেটের চালও যদি না আসে তা হলে কি করে বাঁচবেন?

বিনয় বুঝলে, এ যুক্তি মিথ্যা নয়। কিন্তু এখন সরকার রাজী হলে তো? বিনয় বল্‌লে, আপনারা ব্যবসায়ী মণ্ডল থেকে দেখা করুন ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে। আমাদের যা করবার করছি—আপনারাও চাপ দিন। চা’ল চাই, মানুষকে বাঁচান।

বাইরে থেকে চা’ল আনানো দরকার এ বিষয়ে ব্যবস্যায়ীরা একমত, তাদের এদিকে খুব আগ্রহ। তারা সরকারকে বলবেই তো। ‘তবে

আপনারাও পাবলিক, না বললে সরকার শুনবে না।' একত্র চাপ দেবে সবাই। ওদিকে মিষ্টার ব্যানার্জিও সুখিয়াপুরের জন্য তার করছেন বারবার।

মজিদ শুনে বললে, চা'ল এখানে নেই বুঝি? শহরের গোলায় নেই। বজরংলালরা ধরা পড়ার পর আড়তদাররা সবাই সাবধান হয়েছে—শহরের কাছাকাছি গুদামে আর চা'ল রাখে না।

বিনয় কথাটা বিশ্বাস করলে না। ব্যাপারী-ব্যবসায়ীর উপর মজিদের বরাবরই রাগ আছে, তাই আক্রোশের বশে এরূপ ভুল করছে।

দিনের পর দিন চা'লের দর বেড়ে গেল। চা'ল বিশ টাকা হল। পরদিনই বেগমপুরার হাটে একুশ টাকা, পরদিন চারদিকের বাজারে চব্বিশ টাকা পঁচিশ টাকা! সমস্ত দিকে হাহাকার—আর পথ নেই, উপায় নেই।

চারদিকে শুধু একটি ক্রন্দন—ক্ষুধা, ক্ষুধা, ক্ষুধা।

বিনয় অস্থির হয়ে পড়ল। লাউতলী হাকিমহাকা হয়ে ফিরল মেয়েরা; তারা মুসলমান মেয়েদের নারী-সমিতির সভ্য করতে গেছল। এমাসে মেয়েদের সম্মেলন হবে দুদিন পরেই। তারা বল্‌লে, 'সে গ্রামের পরেই মেহেরপুর। হাকিমহাকা, লাউতলী, মেহেরপুর এক গ্রাম বল্‌লেও চলে। সেখানে এ কয়দিন আরও চারজন মরেছে অনাহারে।' মেহেরপুর খুব বড় গ্রাম নয়,—শত তিনেক মাত্র মানুষ, সবই প্রায় মুসলমান। বৃদ্ধা বাঈ আম্মা বলছিলেন, 'তোমরা করছ কি? মুলুকের মানুষ উজার হল মরে—তোমরা উপায় করো। খেতে দাও—বাঁচাও ওদের।'

প্রমথ মেয়েদের বল্‌লে, কথায় তো হবে না, তোমরা হিসাব নিয়ে এসো। গ্রামে কত ঘর, কতজন মানুষ—হাকিমহাকায় মেহেরপুরে লাউতলীতে কে কে মরেছে, কি হয়েছিল অসুখ, কতদিন খেতে পায় নি, কার কার অবস্থা খারাপ। সব দুদিনের মধ্যে পারবে তো আনতে? আনতেই হবে।

বিনয়কে প্রমথ বল্লে, আর উপায় নেই। এসব প্রচার করতে হবে।

কাগজে রিপোর্ট পাঠিয়েছ?

পাঠাব, তবে কাগজে ছাপবে না।—বললে প্রমথ।

কাগজে ছাপবে না?—তুমি পাঠিয়েছ 'হিন্দুমেলায়'? 'স্বদেশী'তে?

পাঠিয়েছি। ছাপবে না। কেন? সে অনেক কথা। গত নবেম্বর থেকে কাগজে এসব খবর যাচ্ছে, বাঙলার সব জেলা থেকেই যায়; কিন্তু বেরুচ্ছে না। 'হিন্দুমেলার' সংবাদ বিভাগে কাজ করে আমাদের বন্ধু মধু; তাকে আমি নিজে পাঠিয়েছি খবর এখান থেকে। মধু সে সব খবরের একটা আধ-ছাপা পৃষ্ঠা পাঠিয়ে দিয়েছিল—দেখলাম কেমন করে দুর্ভিক্ষের খবর চাপা দেওয়া হচ্ছে। সে সব খবর ছাপা হবে না; কাটাকুটি করেও তা আর কর্তারা খুশী হন না ছাপ্‌তে। এসব খবর বেরুলে লোকে নাকি সন্ত্রস্ত হবে, শত্রুরা নাকি আমাদের দুর্বলতা টের পাবে। অতএব কাগজওয়ালা শুধু এক খবর ছাপবে—'সব ঠিক হ্যায়।' তারাও আপত্তি করে না। মতীশবাবু, মুরারি সেন, তারাও পেয়েছে লাভ—পাশ-করা খবরই ছাপে। তার বিনিময়ে তারা পাচ্ছে—কাগজের দাম দ্বিগুণ বাড়াতে, কাগজের সাইজ্‌ ছোট করতে; বিজ্ঞাপনের দাম দ্বিগুণ বাড়াতে, আর যুদ্ধের নানা বিভাগের বিজ্ঞাপনে দ্বিগুণ মুনাফা করতে। এই তো খাঁটি 'স্বদেশী' আর 'সংগ্রাম'।

বিনয় হতাশ হল, বল্লে, তা হলে তুমি প্রচার করবে কি করে?

এ্যাসেম্‌ব্লিতে প্রশ্ন করিয়ে—জাহেদ সাহেবকে তা তৈরী করে পাঠাব; হক সাহেবকে ওরা ঠেসে ধরবে। সুরেশবাবুকে পাঠাব—ওঁরাও ছাড়বেন না। আর এখানে দোব বিবৃতি—আপনার নামে, আমার নামে। হয়ত তা নিয়ে গোলমাল হবে—প্রেসে ছাপতে চাইবে না সহজে; সে ব্যবস্থা আমি করব। কিন্তু মামলা মোকদ্দমাও হতে পারে। রাজী আছেন তো?

বিনয় একটু চমকিত হল। কিন্তু তার উত্তেজিত মন বেশি দ্বিধাও করলে না। সে বলল, ঘটনা সত্য হলে নিশ্চয়ই রাজী আছি। কিন্তু খাঁ-বাহাদুর, বৈকুণ্ঠবাবু ওঁদের আমাদেয় সঙ্গে নেওয়া যাবে না?

প্রমথ হাসল, বল্‌ল, তাঁরা মামলার উকীল হবেন, আসামী হবেন না। দরকার মনে করেন নারী-সমিতির থেকে সীতাকে নিতে পারি—সেবার সে সোনাকান্দি দেখেছে।

বিনয় একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে প্রমথকে দেখে নিয়ে বল্‌লে, এ বিপদে তাকে টানবে? সে চাকরি করে।

তা সত্য। কিন্তু চাকরি তার থাকবে কি? যাবে না? ইস্কুলের যা অবস্থা। অথচ চাকরি না করলেও তার চলবে না। ঢাকার গ্রামে বিধবা মা, আর ছোট দু'ভাই পড়ে ইস্কুলে; বোন কলকাতায় পড়ে থার্ড ইয়ারে—গীতার খরচপত্র সীতাকেই দিতে হয়। মাইনে-পত্র সে কি পায় জানি না। কিন্তু ইস্কুলটাকে সে তবু টিঁকিয়ে রাখবে, তার প্রতিজ্ঞা। তা হলেও তার নাম দিতে বাধা দেখি না, এখানকার লোকেও তাকে ভালো জানে।

একজন মেয়েকে বিপদে জড়াতে আমার বাধে।

এ শিবাল্‌রি বা মিথ্যা সুপিরিয়রিটি কম্‌প্‌লেক্‌স্‌ আপনাকে সাজে না। মেয়েদের 'অবলা' বলা যে যুগের নিয়ম ছিল সে যুগেই এসব মানাত। যাক্‌গে, সীতা নিজে থেকে ঠিক করুক সে কি করবে—আমাদের কিছু ব'লে কাজ নেই। নইলে শৈলদি'র নাম দেওয়া যাবে মেয়েদের পক্ষ থেকে। আপাতত আমি চললাম—ছাপাখানা, কাগজপত্র ঠিক করতে, ইস্তাহার লিখতে, ছাপতে। একবার থানার বড় দারোগার কাছেও যেতে হবে—আমানুল হক মীরসাহেবের শ্বশুরবংশের আত্মীয়, লোকটার আত্মমর্যাদা জ্ঞান আছে।

এ-ডি-এম্ মিষ্টার ব্যানার্জি বিনয়কে ডাকিয়ে পাঠালেন।

একি কাণ্ড, ডক্টার মজুমদার ?

কি ব্যাপার ?

এই বিবৃতি আপনি বের করেছেন ?

হাঁ। তার সব কথা সত্য।

মিষ্টার ব্যানার্জি বল্লেন, বিপদে ফেলেছেন। ওই মেয়েটির নামও আছে—সীতা রায়। যাক্ আমি আর বেশি গড়াতে দোব না সহজে। কিন্তু সাহেব গ্রেফ্তার করতে ও প্রোসিকিউট করতে চান আপনাদের। অবশ্য তার আগে আমরা সত্যাসত্য অনুসন্ধানও করব, থানার পুলিশ রিপোর্টও আবার চেয়ে পাঠিয়েছি। ওদিকে পাবলিক প্রোসিকিউটারের মতামতও চাইব।

কি বলেছে আপনাদের পুলিশ রিপোর্ট ?

এখনো তা জানি না। কিন্তু বুঝছেনই তো, প্রমথ মজিদ ওদের পেলে পুলিশের কর্তারা সহজে ছাড়বে ? আপনি কেন এ সবে জড়িয়ে পড়তে গেলেন ?

সত্য কথা যে।—বিনয় বেশ দৃঢ়স্বরে বললে।

না, আপনারা বড় বেশি উত্তেজিত হন। সত্য হলেই বা কি করতে পারছেন ? ওই তো এ্যাসেম্‌ব্লিতে দেখছেন—কত কথাই হচ্ছে। কিন্তু হচ্ছে কি তাতে ? না কিছু হবে ?

না হলে যে মানুষ মরবে।

তাতে মন্ত্রীদের কি ? তাঁরা বাঁচলেই হল।—মিষ্টার ব্যানার্জি সহজভাবে গল্প করতে লাগলেন।—হাসির গল্প শুনবেন ? জাহেদুদ্দীন বলে গেলেন। জেলাবোর্ডের ভোটের শেষে আমাদের কাছে এসেছিলেন বুঝতে—কি হবে ভবিষ্যতের বোর্ডে ওঁদের অবস্থা। গল্পে গল্পে বললেন—সেদিন্ হাজার দশ মেয়ের এক জলসা গিয়ে হাজির এ্যাসেম্‌ব্লিতে। চব্বিশ পরগণার,

হাওড়ার গ্রামের মেয়ে সব। তারা খেতে পায় না। এ্যাসেম্‌ব্লির বারান্দায় এসে মেম্বররা সব দেখছেন। হক সাহেব হৈ-হৈ করেন—যেমন তাঁর স্বভাব, 'আমার দেশের মা বোনে খেতে পায় না! আজ থেকে আমি এক বেলা খাব।' জাহেদ বলেন, 'সবাই শুনে হাসে—হক সাহেবের কথা তো।' একজন বললে, 'কিন্তু তাতে এত লোকের কি হবে? আপনি এক বেলা না খেলে বড় জোর দু'জন লোকের দু'বেলার খোরাকী বাঁচবে। তাতেও এত লোকের খোরাক তো হবে না।' হক সাহেব বললেন, 'কি তবে করব? আমি অর্ডিন্যান্স করাব—হোটেলে একবেলার বেশি আর খাওয়া পাবে না কেউ।' 'তাতেই বা হবে কি?' হক সাহেব ক্ষেপে গিয়ে বলেন, 'এত মানুষ না খেয়ে মরছে, আর ওদের চৌরঙ্গীর হোটেলে এত খানা-পিনা? মিষ্টির দোকানে, খাবারের দোকানে এত খাবার?' সকলে হাসল, বুঝল, ফজলুল হক নাটক করছেন। একজন বললেন, 'এরা চা'ল চায়, হক সাহেব, রসগোল্লা চায় না, মটন-চপও চায় না।' হক সাহেব বলেন, 'চা'ল আমি পাব কোথায়? ইস্পাহানি সাহেবের চা'ল আছে; দিন না?' জাহেদুদ্দীন বললেন, 'তখন আমাদের ইস্পাহানি সাহেব বলেন, আমি তো দিতেই রাজী, সরকার বললেই হয়।' কিন্তু সরকারটা কে? হক্ সাহেবের পাশে দাঁড়িয়ে সাদামুখো কর্তারা; তারা চুপ। কে একজন বললে, 'কোথায় যাবে সরকারী এজেন্টের চা'ল?' সাদামুখো কর্তা বলেন, 'সে আমি বলব না। এ চা'ল এখানে বিলির জন্য নয়।' অমনি হক সাহেবও চুপ।' এই তো আমাদের মন্ত্রী।

ক্ষুব্ধকণ্ঠে বিনয় বললে, তবে ওরা আছে কেন মন্ত্রী হয়ে?

জাহেদুদ্দীন বলছেন, 'হক সাহেবকে এ যাত্রা ইস্পাহানি সাহেবই খুব বাঁচিয়েছেন। প্রত্যেকটি মিছিলের মেয়েকে দেড় সের করে তিনি চা'ল দিইয়ে দেওয়ান। হক সাহেব তাদের বিনা খরচে ট্রামে-ট্রেনে ফিরে যাবার বন্দোবস্ত করে দেন। হক সাহেবের তবু মান রক্ষা হয়েছে।'

কিন্তু তাঁর মান দিয়ে কি হবে আমাদের? মানুষের প্রাণ বাঁচাবার কি ব্যবস্থা করেছেন?—ক্ষুব্ধকণ্ঠে বললে বিনয়।

আবার কি? মন্ত্রীরা বলেন, ঠিক ঠিক ভালো কর্মচারী তারা পাচ্ছেন না। সব কর্মচারীর দোষ!—ব্যঙ্গভরে বললেন মিষ্টার ব্যানার্জি।

মিষ্টার ব্যানার্জি একটু থামলেন, পরে বললেন, বজরংলালের ব্যাপারটা শুনেছিলেন? দু'শো মণ চিনি ধরা পড়ল, মনে আছে? বজরংলালদের এখানে ধরাধরি করে সুবিধা হল না। মিষ্টার দাশগুপ্ত বরাবর বেঁকে রইলেন। কাল বজরংলালের লোক একেবারে কলকাতার থেকে 'বড় মিঞা' আর-আর 'বড় সাহেবদের' চিঠি নিয়ে এসে হাজির। ডি-ও —'ও চিনি ছেড়ে দাও।' ভাবলাম, একটু ব্যাপারটা জেনেই নিই। বজরংবাবুকে ডাকালাম। বললেন, তাঁদের বেশি কষ্ট পেতে হয় নি—সুরুজ মিঞা এম-এল-এ'কে পঞ্চাশ—দালালির জন্য; আর একশ' খোদ, বুঝলেন?—এই আপনাদের দেশের ব্যবস্থা।

বিনয় চুপ করে রইল। পরে বললে, জাহান্নামে যাক ওরা। অন্য দেশ হলে আজ ওদের হিন্দু-মুসলমানে এক সঙ্গে 'লিঞ্চ' করত।

বিনয়ের মনে পড়ল, এই হক সাহেবকে দেশের লোক ভালোবাসত; বলত, লোকটার প্রাণ আছে। বিনয় নিজেও তাঁকে মনে করেছে তেমনি মুক্তপ্রাণ লোক, বাংলাদেশকে চেনেন, বাঙালীকে ভালোবাসেন।—তবে কেন তিনি মন্ত্রিত্ব আঁকড়ে আছেন আর?

মিষ্টার ব্যানার্জি হেসে বোঝালেন, নইলেই নাজিমুদ্দীন সুরাহবর্দী মন্ত্রী হবে।

বিনয় বললে, থাক্ এসব 'হাই পলিটিক্স্'। এখানে আপনারা কি করছেন? আমরা হাকিমহাকা-মেহেরপুরের জন্য দশদিনের মতো একটা কার্যপদ্ধতি নিচ্ছি। দশদিনে ওদের কথা বলে সাহায্য তুলব—শহর থেকে, বেগমপুরার হাট থেকে।

মিষ্টার ব্যানার্জি বল্‌লেন, আপনাদের যে পুলিশের প্যাঁচে পড়তে হবে, তা মনে রাখবেন। আর ইতিমধ্যে এই জিনিসপত্র বিষয়ে আমি আবার তার করেছি। কমিশনার সাহেব গেছলেন কলকাতা। ওদের কন্‌ফারেন্স ছিল—এই ধান চাল নিয়েই। জেলার বাইরে থেকে ধান-চা'ল যাতে আমরা পাই তার অনুমতি আবার চাইছি। দেখুন কি হয়—সুযি্যপুরের চাল পাই কিনা। বুঝছেনই তো সব পচা, ঘুণধরা; এরই নাম আপনাদের প্রভিন্সিয়াল অটোনমি। ফোর্থ ক্লাশে যে আমাদের সঙ্গে তিনবার ফেল করেছে, সেই হবে এখন আপনাদের মন্ত্রী—আর মন্ত্রিত্ব তো নয়, এ একটা বাণিজ্য।

বিনয় বুঝলে—এককালে কৃতী ছাত্র ছিলেন মিষ্টার ব্যানার্জি, পরে হয়েছেন বড় চাক্‌রে। তাঁর কাছে অসহ্য ঠেকছে ডেমোক্র্যোসি, মানে তাঁর নীচেকার ছাত্রদের আজ তাঁর উপরওয়ালা হয়ে বসা—শুধু ভোটের জোরে। এমনি বিনয় মিষ্টার মিত্তিরকেও এজন্য ক্ষুণ্ণ হতে দেখেছিল। অনেক কৃতী বড় চাকুরেরই এই দুর্ভাগ্য; আর তাদের এই ব্যাধি দুরারোগ্য।

বিনয় বিদায় নিলে। শহরে গ্রামে ছোট ছোট মিছিল করে চা'ল তুলবে, পয়সা তুলবে—মেহেরপুরের দুঃস্থদের বাঁচাবার জন্য।

সন্ধ্যা না হতেই থানার দারোগা আই-বি'র দারোগার সঙ্গে এসে হাজির—বিনয়ের নামে একটা হুকুম আছে।

"যেহেতু তুমি ডাক্তার বিনয়কুমার মজুমদার, রেঙ্গুন ও বর্মার পূর্বতন অধিবাসী, বর্তমানে সোনাপুরের অধিবাসী, কোনো কোনো অঞ্চলের অনশনে মৃত্যু প্রভৃতি নাম করিয়া নানাভাবে জনসাধারণকে উত্তেজিত করিতেছ, এবং যুদ্ধের সুপরিচালনায় বাধা জন্মাইতেছ বা বাধা জন্মাইতে পারে এমন কার্য করিতেছ," ইত্যাদি,—"অতএব তোমাকে আদেশ করা যাইতেছে যে আজ হইতে পুনরাদেশ পর্যন্ত এই শহরের বাহিরে তোমার যাতায়াত বা কোনোরূপ বিবৃতি লেখা, প্রচারপত্র প্রভৃতি প্রকাশ বা স্বাক্ষর করা এবং শহরে

কোনরূপ সভা, সমিতি, মিছিল প্রভৃতি কার্যে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের বিনা অনুমতিতে যোগদান করা ভারত রক্ষা আইনের বলে নিষিদ্ধ হইল।"

নীরদ উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে উঠল। বিনয়েরও চোখেমুখে উত্তেজনা সুস্পষ্ট। জীবনে এই সে প্রথম এ জাতীয় আদেশ পাচ্ছে। সই করতে গিয়ে উত্তেজনায় তার হাত কাঁপছিল—ভয়ে নয়, অভিনব এক অভিজ্ঞতায়।

থানার দারোগা বল্‌লেন, ডক্‌টর শাহেব, মজিদ মিঞা কোথায়?

শোনা গেল প্রমথেরও উপর এইরূপ নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে; মজিদেরও উপর জারি হত, ভাগ্যক্রমে সে এখানে নেই। প্রমথ একটু পরে এল। সে খবর জেনেছে সীতার উপর এরূপ আদেশ নেই, একটা সাবধান বাণী গেছে। তার এক কপি অবশ্য পাঠানো হয়েছে ইস্কুলের সেক্রেটারিকে—মানে, বৈকুণ্ঠবাবুকে। তিনি সেদিন শহরে নেই।

বিনয় একটু নিশ্চিন্ত হল—উপস্থিত সীতা বিপন্ন হয় নি। বৈকুণ্ঠবাবুকে একটু হাতে রাখতে পারলে সীতার ইস্কুলেও গোলমাল হবে না।

সমস্ত শহরে খবর ছড়িয়ে পড়ল। দেখতে না দেখতে দু'একজন করে লোক এসে গেল বিনয়ের বাড়ি। জিজ্ঞাসা করলে, কি করবেন আপনারা?

কংগ্রেসের মতাবলম্বীরা বললেন, দেখলেন তো ডাক্তারবাবু, এই গবর্মেণ্ট কিছু করতে দেবে না—মানুষকে বাঁচতে দেবে না, বাঁচাবার কথাও বলতে দেবে না।

প্রমথই তাদের উত্তর দিলে, তা তো জানা কথাই। কিন্তু মানুষেরও বাঁচতে হবে, আর বাঁচবার অধিকার আয়ত্ত করতে হবে।

মহেশবাবু উকিল মানুষ—এখন অবশ্য কণ্ট্রাক্টার সাহেবের সঙ্গে কাজ করেন। বিনয় তাঁর পুরানো পড়শী, তাই এসেছেন। তিনি বললেন, কিন্তু এ তর্ক থাক। আমরাও যাই—এও তো সভা হয়ে উঠেছে। রিপোর্ট হবে, ওঁদের আবার ফ্যাসাদ হবে।

সবাই যেমন এসেছিলেন তেমনি উঠতে ব্যস্ত। বিনয় বল্‌ল, আপনারা

ব্যাপারীরা সাড়ে দশ মণ চাল দিলে। এক টিন কেরোসিন তেল আর লবণও কিছু কিছু তারা তুলে দিলে। বেগমপুরার ব্যবসায়ীরা সেখানকার খাদ্যসমিতিকেও অমনিতর সাহায্য করবে, সীতা ও প্রিন্সিপাল চক্রবর্তীকে সুরেনবাবু কথা দিলেন। ভদ্রলোকেরা দুরবস্থায়ও দু-আনা, চার-আনা, এক টাকা যে যা পারে দিলে। মেহেরপুরের জন্য মেয়েরা একমুঠো করে চা'ল দিলেন ঘর থেকে—এক মুঠো তাঁরা কম খাবেন প্রতিদিন—যতদিন এমন দুর্দশা থাকে।

জনমতের এমন জাগরণ বিনয় আশা করে নি; তার মন এক নূতন সম্ভাবনা যেন দেখতে পেল।

দিন দুই পরেই সংবাদ এল—হক সাহেব পদত্যাগ করেছেন। অর্থাৎ, লাটসাহেব তাঁকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করেছেন।

প্রমথ বললে, উল্টে গেল সব।

বিনয় বললে, কেন ?

দেখছেন না, যে হক এত অকর্মণ্য, মানুষ যার উপর ক্ষেপে উঠেছিল, আজ সে এক মুহূর্তে একটা সহানুভূতির পাত্র হল। এভাবে চললে কালই গবর্ণরের চালে সে হবে দেশের উদ্ধারকর্তা, হেরো—

বিনয় কিছুতেই মানবে না—প্রমথদের সঙ্গে তার কিছুতেই মত এবার মিলছে না। কাল রাত্রিতে তর্ক গেছে দু'জনায়। আজ চা খেতে খেতেও তর্ক হচ্ছিল আবার দু'জনায়।

প্রমথ বলছে, মুস্‌লিম লীগ মন্ত্রিত্বে আসুক। তা হলে সাধারণ মুস্‌লিমের কথা আজ সুরাহাবর্দীর না ভাবলে চলবে না—এভাবেই মুসলিম লীগের সঙ্গে একযোগে মন্ত্রীত্বে সাধারণের ক্ষমতা বাড়তে পারে।

এবার হাকিমহাকা, মেহেরপুরের এই লোকগুলোর ব্যাপার নিয়ে একটু তৎপর হবেন, এইটাই আমার প্রার্থনা। লোকগুলো যেন বাঁচে।

পরদিন মেয়েরাই বেরিয়ে পড়ল শহরে—পাড়ায়-পাড়ায় সাহায্য চাই। সেই বিবৃতিটা তারা সকলকে দেখায়—বেশি ছাপা সম্ভব নয়, কাগজ নেই। কিন্তু পুলিশের হুকুমের কথা সবাই শুনেছিল; মেয়েরা কিছু না বললেও আজ নিজ থেকেই মানুষ এগিয়ে এল। সমস্ত শহর জুড়ে সাড়া পড়ে গেল— 'হাকিমহাকা ও মেহেরপুরকে বাঁচাও।' ছাত্রদের ছোট ছোট দল বেরিয়ে পড়ল।

দু'ঘণ্টার জন্য সীতাও নিজে এসে গেল কাল থেকে বেগমপুরায়ও এমনি চেষ্টা করতে হবে। তার চাকরির কথা? সে এখনো তা ভাবে নি।

কিন্তু সীতা করবে কি?—জিজ্ঞাসা করলে বিনয়।

সীতা হেসে বল্‌লে, সে ভাবনা যখন আপনারাও ভাবছেন, তখন আমি নয় কমই ভাবলাম।—সে লেগে যেতে চায় আবার কাজে।

কিন্তু ইস্কুল কি তোমার না ছাড়লেই নয়?—বিনয় জিজ্ঞাসা করলে।

আমি অন্তত তা ছাড়তে চাই না, তাতো জানেন।—বললে সীতা।

বিনয় বললে, বৈকুণ্ঠবাবুকে বুঝিয়ে বললে হয় না? কি বলো প্রমথ?

প্রমথ ভাবল একটু, বললে, আমাদের কারুর না বলাই ভালো। অবশ্য আপনি বলতে পারেন, ডাক্তারদা।

সীতা বললে, বলতে পারব আমি নিজেই—দরকার হলে। বলব কিনা তাই আপনারা বুঝে দেখুন। আমার ইচ্ছা, আমি ইস্কুল ছাড়ব না কিছুতেই।

বিনয় একটু আশ্বস্ত বোধ করলে সীতার কথায়। সত্যি, সীতা বুদ্ধি রাখে, বিভ্রান্তও হয় নি উত্তেজনায়।

যা বিনয় প্রমথ অনেক কষ্টেও করতে পারে নি আগে খাদ্য-সপ্তাহে, মনে হল তাই তাদের উপর এই নিষেধাজ্ঞায় সুসম্পন্ন হল। বাজারের

বিনয় কিছুতেই একথা মানতে পারবে না—সে রীতিমত বিরক্ত হল।

অসম্ভব, প্রমথ, অসম্ভব। এদেশে এমন কোন্ মানুষ আছে যে লাটের তৈরী মন্ত্রীদের বিশ্বাস করবে? মুসলমানরা অনেকে করবে—অনেকটা লীগের দায়ে, অনেকটা হক-হিন্দু-মন্ত্রিত্বের ভয়ে। কিন্তু এ মন্ত্রীসভা লীগের প্রতিনিধি হবে না, হবে লাটের আমমোক্তার—একথা মুসলমানরাও মনে মনে বোঝে।

আমরা সকল দলে মন্ত্রীদের সমর্থন না করলে তারা তাই হবে, হবে আমলাতন্ত্রের পুতুল।

সকল দলের সমর্থন তো তারাও চায় না, তারা লাটসাহেবের ও বড় সাহেবদের সমর্থন চায়। হক সাহেব তবু লাটের বদমায়েসি ফাঁস করে দিত, এরা লাটের বদমায়েসিকেই এখন সাম্প্রদায়িকতার ধোঁয়া দিয়ে ঢেকে দেবে।

বিনয় বেশ বুঝছে, এ-মন্ত্রিত্ব একদিকে লাটসাহেবের আর দিকে ইব্রাহিমভাই'র হাতে-ধরা পুতুলনাচ।

এদিকে পথের উপরে সে দেখছে—দুর্ভিক্ষের শিকার—মৃত্যুর পথিক নিরন্নের ক্রন্দন—ভাত, ভাত, ভাত।

কিন্তু বিনয় বোঝে না হিন্দুদের এই হঠাৎ হক্ সাহেবকে নিয়ে বাড়াবাড়ি।

মুসলমানদের মুখে দেখে উৎসাহ, দুর্ভাবনাও—যদি আবার হক্ মন্ত্রী হয়? জাহেদুদ্দীন কলকাতায় মন্ত্রী হবার চেষ্টা করছে, কোন্ দলে যাবে, তাও নাকি ভাবছে। যারা মন্ত্রী হয় তাদের দলেই এবার সে যাবে ঠিক।

'হতভাগ্য বাংলা, আর হতভাগ্য বাংলার মুসলমান'—শাহেদুদ্দীনের এই কথাই বিনয়ের মনে পড়ছে আজ বারবার। বিনয় তাকিয়ে দেখল, বেলা হয়েছে, পথ দিয়ে লোক চলছে। লোক কই? আজ সবই তো প্রায় ভিখারী। ভিখারী নয় তো, এরা ক্ষুধার যাত্রী, যুদ্ধের ব্যবসায়ীদের

হাটে এরাই 'কেজুয়্যালটি'। আর এ শহরে এ পথে এরা বারো আনাই মুসলমান—মুসলমান পুরুষ, মুসলমান মেয়ে, আর অসংখ্য মুসলমান বালক-বালিকা, শিশু। সেই এক কথা তাদের মুখে, এক কান্না—'ভাত', 'ভাত', 'ভাত'।

অথচ বড় বড় মুসলমানরা ভাবছেন—কে হবে মন্ত্রী?

৯

নতুন বৎসর বুঝি আজ—১৩৫০! দু'একটা রঙ-বেরঙের খেলনা ও কাগজের ফুল নিয়ে এক-আধটি ফেরিওয়ালা যাচ্ছে। বৈশাখের মেলা বসবে বিকালে। কেশববাবুর মেয়ে টুনি আর তার ছোট ছেলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তা দেখছে। এরা এবছর এসব জিনিস আর কিনতে পারবে না। তবু এরা তো খেতে পায়—সরকারী রেশন পান আজ কেশববাবু, তাই টুনি আর তার ভাই খেতে পায়। ওদের চোখ লুব্ধ হয়েছে এ জিনিসের জন্য। কেমন সেই দেশী ভেপু বাজছে, পুরনো জাপানী ঝুম্‌ঝুমির শব্দ হচ্ছে। কিন্তু এবার আর ওরা তা কিনবার কথা ভাবতে পারে না। অবশ্য অভ্যাস হয়ে গেছে এই না-পাওয়া ও নিরাশা ওদের কাছে। কিনে দেবে কি বিনয় একবার ওদের একটা করে কিছু? ছ'মাস আগে হলেও সে তা দিত। আজ ভাবছে—কি হবে? ওই তো পথের উপরে চলেছে কত টুনি, কত মনু, ওদের পেটে ভাত নেই, দেহে কাপড় নেই—সখ নেই, সাধ নেই; আছে শুধু একটি প্রার্থনা—'মা ভাত, মা ভাত, মা ভাত।'

হঠাৎ সাইরেন বেজে উঠল—অনেকদিন পরে আজ এ শহরে আবার এই আর্তনাদ—উ-উ-উ। বিনয়ের মনে পরে গেল, মানুষের পাপ কত ভাবেই না আজ তাকে পাশবদ্ধ করেছে। ক্ষুধা আছে, যুদ্ধ আছে—অভাব নেই মানুষের মৃত্যুদণ্ডের।

সে উঠে দাঁড়াল। এ-আর-পি'র পরিচ্ছদ পরে এখনি তাকে তার পোষ্টে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। হয়ত কিছু নয়—নিকটের বা দূরের কোনো বিমান-ঘাঁটিতে হয়ত জাপানী বিমান হানা দিতে এসেছে। কিন্তু তার পোষ্টে তো তাকে যেতেই হবে—কর্তব্য তার এই। বিনয় তাড়াতাড়ি জামাকাপড় পরে নিলে। ত্রস্ত একপাল নরনারী তার ঘরের দিকে ছুটে আসছিল। তারাও ভিখারী, অন্নহীন, ওদের পেটে ক্ষুধা, প্রাণে তবু বোমার ভয়। ক্ষীরোদ তাড়িয়ে দিচ্ছিল। বিনয় বললে, থাক না, ক্ষীরোদ, ওদের আসতে দে।

বড় নোংরা বাবু। আর চোরও। জিনিসপত্র ওরা কি নেয়, না-নেয় ঠিক নেই।

তবু, বাইরে যাবে কোথায়? একটু চোখ রাখিস তুই। বরং ভেতরের ঘরটায় নিয়ে যা—বসোগে তোমরা ওঘরে।

সাইকেল নিয়ে বিনয় বেরিয়ে পড়ল। পথে লোকজনদের যেতে যেতে তাড়া দিলে, 'ঘরে যাও, গর্তে ঢোকো।' তারই এলাকা—সবাইকে পথ থেকে সরিয়ে দিতে হবে তো।

কিন্তু এসে গেল নাকি? বিদ্যুদ্বেগে ছুটে আসছে কয়েকখানা বিমান—একদল তাড়া করেছে আর একদলকে। মেশিনগানের শব্দ হচ্ছে, গুলি ছিটকে পড়ছে চারদিকে—যেমন রেঙ্গুনে পড়েছিল। বিমান তাদের দিকে আসছে। বিনয় পথের পাশে একটা কাঁচা গর্ত পেয়ে লাফিয়ে তাতে ঢুকে পড়ল। আরও জন তিন লোক সেখানে রয়েছে আগে থাকতেই।

শব্দ হচ্ছে না মেশিনগানের? যুদ্ধ হচ্ছে বুঝি।

হুঁ, পোষ্ট পর্যন্ত যেতে পারলাম না আর।

ত্রস্ত এক ভিখারী মেয়ে ছোট একটি ছেলে কোলে নিয়ে ছুটে এল গর্তের দিকে। কাছে এসে সে থমকে দাঁড়াল, গর্তে লোক আছে। মাথার উপরে বিমান প্রায় দেখা যাচ্ছে তখন—মেশিনগান চলছে, বোমাও পড়ছে, শব্দ হচ্ছে বেশি দূরে নয়। শহরেই পড়ছে নাকি বোমা এবার? বড় কাছে মনে হয় যে। ভীত ত্রস্ত সেই মেয়ে দাঁড়িয়ে। বিনয় চীৎকার করে বললে, 'এসো, এসো, গর্তে এসো শীঘ্র।'

সে ভিখারী নয়, গ্রামের গরীব মুসলমানের স্ত্রী। ক্ষুধার তাড়নায় নতুন শহরে এসেছে—যদি এক মুঠো ভাত পায়। আজ বৈশাখের মেলা—কিছু পাবে না খেতে? কিন্তু মুসলমান মেয়ের স্বাভাবিক লজ্জা সে এখনো হারায় নি। এই গর্তে এতগুলো পুরুষের মধ্যে সে মেয়েছেলে হয়ে আসে কি করে? ত্রস্ত, বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে ছুটল সে পথের উপর দিয়ে অন্য দিকে। গর্ত থেকে বিনয় ডাকতে লাগল—এদিকে এসো, এদিকে, এদিকে।

ডাক শেষ হবার পূর্বেই শোঁ-ও শব্দ নেমে এল উপর থেকে নিচে, তারপর তাদেরই হাত পঞ্চাশ দূরে এক বিকট বিস্ফোরণ। মুখে আর কারুর কথা ফুটল না—সমস্ত বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গ্রাম যেন নিঃসাড় হয়ে গেল। মাথার উপর দিয়ে মেশিনগান চালাতে চালাতে একটা বিমান তাড়া খেয়ে চলে গেল—দূর থেকে আরও শব্দ শোনা গেল।

ভিখারিণী আর নেই—কি পড়ে আছে যেন খানিক দূরে—মানুষ না আর কিছু?

চারদিকে শব্দ মেসিনগান ও বোমার। কতক্ষণ? কত ঘণ্টা? কত প্রহর? হয়ত মিনিট পাঁচের মত, হয়ত মিনিট পনেরর মত। কিন্তু অন্তহীন সেই ক'মিনিটই।

তারপর শান্ত মনে হল সব। তবু যেন কি শব্দ শোনা যাচ্ছে—

মানুষের বহুমিশ্রিত কণ্ঠস্বরের। কিছু অনুমান করা যায় না—ক্রন্দন, না আর্তনাদ, না আহ্বান?

দীর্ঘ অপেক্ষার পরে অল্-ক্লিয়ার বাজল। বিনয় ট্রেঞ্চের বাইরে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল। শহরের দু'এক পাড়ায় আগুন জ্বলছে নাকি? নিকটের একটা ভদ্রপাড়ায় আগুন দেখা যাচ্ছে, ক্রন্দনের রোল শোনা যাচ্ছে। সেই মেয়েটা কই? বিনয় ছুটে গেল হাত পঞ্চাশ দূরে। কাছে যেতেই থম্‌কে দাঁড়াল। কিছু নেই! শুধু তারা দেখেছে বলে বুঝছে বক্ষলগ্ন সেই রক্তমাংসের পিণ্ড তার ক্ষুদ্র শিশু, আর ছিন্নবিচ্ছিন্ন সেই দেহ এক নারী-দেহ। তবু বিনয় একবার কাছে এগিয়ে গেল—প্রাণ আছে কি? বৃথা তার সেই আশা। হতভাগিনী! এল না কেন সে তাদের ট্রেঞ্চে? এত ডাকল বিনয়। অসহায়া নারীর লজ্জা? মরণ মাথার উপরে, তবু লজ্জা। মরণের পথে সে তো পূর্বেই পা বাড়িয়েছিল—অন্ন নেই, বস্ত্র নেই; অনশনে মৃত্যু তার সামনে ছিল; আর মরতে চায় নি বলেই সে এসেছিল শহরে, সে বাঁচতে চাইছিল। ট্রেঞ্চে যদি বিনয়রা না থাকত—সে গ্রামের মেয়ে বাঁচত। বাঁচত মা, বাঁচত শিশু। তার বাঁচবার সাধ শেষ হয়ে গেল।

অসহায় মেয়ে মারা গেল—মারা গেল তার আরও অসহায় শিশু—যে যুদ্ধের কিছু জানে না, লজ্জার কিছু বোঝে না,—যার কাছে নারী-পুরুষের মানে নেই, শত্রু-মিত্রের অর্থ নেই। কার শিকার সে?—এ কি অর্থহীন আত্মহত্যা মানুষের? একি নরমেধ—শিশুবলি?

বিনয় ডাক্তার মানুষ, নিজেকে সংযত করলে। নিকটের হাঁসপাতালে সংবাদ দিতে হয়, তাকে তার নিজের পোষ্টেও যেতে হবে। সাইকেল তুলে নিলে বিনয়। আশ্চর্য, সাইকেলটার কিছু হয় নি—অথচ অদূরেই দুটো মানুষের প্রাণ কেমন এক নিমেষে শেষ হয়ে গেল।

বিনয় সাইকেলে চলল। ক্রন্দনে, চীৎকারে, ত্রস্ত বিভ্রান্ত নরনারীর হাহাকার কানে আসছিল। গাছ পাতা বাড়ি টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে গেছে।

প্রকাণ্ড বটগাছ পড়ে তার পথ বন্ধ হয়ে আছে। বিনয় নেমে পড়ল। শহরের ছ'-সাতটা পাড়ায় বোমা পড়েছে। এক আধটা করে নয়, অনেকগুলো করে বোমা পড়েছে এক-একটা পাড়ায়। অধিকাংশই কাঁচা বাড়ি। আগুন দাউ-দাউ করে জ্বলছে। বিনয় বিস্ফারিত চোখ তুলে দাঁড়াল— সামনে সমস্ত পাড়াটায় আগুন ছড়িয়ে পড়ছে। এ-আর-পি'র আগুন-নেবানো দল এসেছে। বিনয়ের এলেকায় এ পাড়া। ওদিকেও ছুটছে তারই অধীনের লোকজন,—এ-আর-পি'র যুবকেরা, ফার্ষ্ট এডের দল—গফুর ও গণি।

ডাক্তারবাবু!

বিনয় এক আর্তস্বরে চম্‌কে উঠল। পরিচিত মুখ—কে? গণেশ না? গণেশ আর্তস্বরে বলছে, ডাক্তারবাবু, শীগ্‌গির চলুন—তার হাত ধরে গণেশ টানতে লাগল।

বিনয়ের হাতে সাইকেল। সে বললে, কোথায়? কি?

গণেশ ক্রন্দনবিকৃত কণ্ঠে বললে, আমার বাবা, ডাক্তারবাবু। একটা স্প্লিণ্টার না কি লেগেছে কাঁধে—ডাক্তার পাইনি কাউকে।

বিনয় বিনা বাক্যব্যয়ে অগ্রসর হয়ে গেল। তার সাইকেল কাকে দিলে মনে রইল না।

পাকাবাড়ির বাইরের ঘরে একটা অংশ ধ্বসে পড়েছে। সে অংশেরই একটা কোণে ছিলেন গৌরীপদবাবু। তিনিও উকীল। কিন্তু তাঁর সম্পত্তি ও মহাজনী ব্যবসায়ই বেশি। দু'একটা ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর। এসব বিনয় জানত, কিন্তু তখন তার সে কথা মনে পড়ল না। দেখল—গৌরীপদবাবুকে। হাতের একটা অংশ উড়ে গেছে কাঁধে লেগে, মুমূর্ষু গৌরীপদবাবু সংজ্ঞাহীন। বিনয় ত্রস্তভাবে একবার দেখতে গেল তার পিছন দিক। চমকে উঠল। পিছনের দিকে একটা গভীর ক্ষত কিসের? একি ফুসফুস পর্যন্ত গিয়েছে নাকি? বাড়িতে আরও অনেক আহত রয়েছে। কার আঘাত গুরুতর

কার সামান্য, তা বলবার সাধ্য নেই—সকলেই সমভাবে চিৎকার করছে। কে একজন ওদিকে 'জল' 'জল' করে কাঁদছে—মেয়ের কণ্ঠ যেন।

বিনয় তাড়াতাড়ি বললে, গণেশবাবু, শীগ্গির আপনার বাবাকে হাসপাতালে নেবার বন্দোবস্ত করুন।

হাসপাতালে?—ভীত বিচলিতকণ্ঠে গণেশ বললে।—এখানে ফার্ষ্ট এড দিলে হয় না?

ফার্ষ্ট এডের কেস নয়। যে করেই হোক একটা ষ্ট্রেচারের মত কিছু দেখুন—নিয়ে যেতে হবে। ভয় নেই, আমি সঙ্গে যাচ্ছি। আপনি ব্যবস্থা করুন, আমি ততক্ষণ অন্যদের দেখছি।

বিনয় দেখে নিলে অপরদের। অনেকের আঘাত সামান্য। কিন্তু 'জল, জল' করে যে কাঁদছে তাকে অস্ত্র করতে হবে; তার পায়ের একটা অংশে হয়ত স্প্লিণ্টার বিঁধেছে। আর একজনকেও হাসপাতালে নিতে হবে। বাকী তিনজনের ফার্ষ্ট এড্ পেলেই হবে আপাতত। এদের ফার্ষ্ট এড্ কেন্দ্রে নিয়ে যাবে—এ-আর-পি'র বাহকেরাও তৈরী হয়ে এসে গেছল। বিনয়ের কথার অপেক্ষা করছে।

বিনয় বললে, গণেশবাবু, এদের সাহায্যে আগে আপনার বাবাকে ওঁদের হাসপাতালে নিন্। চলুন।

বিনয় সে বাড়ির বাইরে এসে দাঁড়াল। একটি ছোট মেয়ে 'ঠাকুমা, ঠাকুমা' বলে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এল তার কাছে।

ডাক্তারবাবু!

বিনয় ফিরে তাকাল।

মেয়েটি বললে, আমার ঠাকু'মা। বাড়ীতে কেউ নেই আমার মা ছাড়া। ঠাকুমার পায়ে কি বিঁধেছে—এখন আর কথা বলছেন না। মা কাঁদছেন, আমাকে পাঠালেন।

বিনয় দ্বিরুক্তি না করে বললে, কোথায় চলো।

খড়ের ঘর, পুড়ে শেষ হয়ে গেছে। তারই এক পাশে একটু দূরে এক নারীমূর্তি শায়িত। একটা মাতুর ভেসে যাচ্ছে তার রক্তে। অদূরে জনকয় মেয়ে ও ছেলে। বিনয় তাড়াতাড়ি দেখলে—কাঁধের দিকে একটা ছোট আঘাত। তা ছাড়া পায়ের ঊরুতেও নিশ্চয় লেগেছে, সেখান থেকে রক্ত পড়ে মাতুর ভিজে উঠেছে। এ রোগী বাঁচবার মতই হয়ত নয়, কিন্তু তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নিতে হয়। কে একজন বললে, নেবে কে? সুখময় আজ শহরে নেই, চিন্ময় কোথায় কে জানে? বউ তো শাশুড়ীকে বাঁচাতেই পুড়ে গেছে।

বিনয়ের কানে গেল, 'চিন্ময়।' সেই চিন্ময়,—শিবুদা' যাকে বলেন, 'আগুনের মত ছেলে', ওদের দল ছেড়ে রেল লাইন তুলতে লেগে গেছল? তারপর আসামে না বর্মায় গিয়েছে, "স্বাধীন ভারতে" ফিরবে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ উচ্ছেদ করে দাঁড়াবে জাপানের বিরুদ্ধে বিনয় জিজ্ঞাসা করলে, এ চিন্ময়দের বাড়ি নাকি?

হাঁ, তারই মা ইনি।

তাদের অবস্থা অসচ্ছল, বিনয় তা বুঝতে পারছে। যা ছিল তাও সামনেই পুড়ে যাচ্ছে। বিনয় ব্যস্ত হয়ে উঠল, ডাকো তো এ-আর-পি'র লোকদের। এঁকে এখনি হাসপাতালে নিতে হবে।

একজন ফিরে এসে বললে, এ-আর-পি'র দু'দল গণেশবাবুর বাবা আর বোনকে নিচ্ছে। আর তো কেউ নেই।

বিনয় তাড়াতাড়ি গেল। বললে, দু'জন গৌরীপদবাবুকে নিয়ে যান আগে, আর দু'জন এই চিন্ময়ের মাকে নিন্—

গণেশ উন্মাদের মত বললে, না, না, ডাক্তারবাবু, সে হবে না।

বিনয় বললে, সবকে নেওয়াব এখনি, কিন্তু চিন্ময়ের মায়ের আঘাত আরও গুরুতর।

সে হবে না।—গণেশ কোন কথা শুনবে না। একটু পরেই সে হতাশায় ও আক্রোশে বলে উঠল, সুবিধা পেয়ে আজ আপনিও আমাদের শত্রুতা করছেন—আপনি ডাক্তার, তবুও—

বিনয় তার কথায় ও কাজে বিমূঢ় হয়ে গেল।

কি বলছেন আপনি, গণেশবাবু? উনি যে আপনাদের চিন্ময়ের মা—ওঁদের বাড়িতে কেউ নেই।

তবু গণেশ শুনবে না। শুনবার মত তার অবস্থা তখন নেই। সে উন্মাদের মত বলছে, সত্যি বলছি, ডাক্তারবাবু, যা ভেবেছি, যা করেছি, সব বলব আপনাকে—এত করেছি তবু আমাদের উপরই বোমা ফেললে বেইমানেরা—

গণেশবাবু, ওসব কথা এখন থাক্। আগে চলুন, ওদের হাঁসপাতালে পাঠাই।

তাই তো বলছি। দোহাই, আমার বোন্‌কে পাঠাতে দেরী করবেন না। পরে পাঠালে সে পড়ে থাকবে, কেউ তাকে দেখবারও থাকবে না।

আমি দেখব বলছি।

কিন্তু গণেশ ষ্ট্রেচার ছাড়ল না। বিনয় বিব্রতভাবে এদিকে সেদিকে তাকাচ্ছিল।

একটি যুবক এসে বললে, ডাক্তারবাবু, আমরা আছি। মণিদা' ও আমরা ছাত্ররা। কি করব বলুন—আগুন তো যা জ্বলবার জ্বলছেই, নেবানো আর বৃথা।

বিনয় যেন পথ দেখতে পেল। তাদের বললে একটা খাট বা ষ্ট্রেচার যা কিছু হোক তাতে করে ওই চিন্ময়ের মাকে নিয়ে যেতে। কিন্তু সেই মেয়েটির মাকেও হাসপাতালে নিতে হবে—চিন্ময়ের ভ্রাতৃবধূকে।

আপনি কি যাবেন? হাত পুড়ে গেছে শুনলাম। বেশ, পরে আসুন। কিন্তু মাকে আমি নিলাম—আপনি ভাববেন না।

একবার বউটি দ্বিধাভরে বললে, আর কেউ বাড়ি নেই—নিয়ে যাবেন হাসপাতালে ?

—হা নোব। আমরা যা সাধ্য করব—আপনি বিশ্বাস করুন।

কোথা থেকে কি তৈরী করে ছাত্রেরা চিন্ময়ের মাকে নিয়ে চলল। আরও অনেক আহত রয়েছে। বিনয় এ-আর-পি'র লোকদের বললে, সকলকে হাসপাতালে নিয়ে আসুন, আমি সেখানে চললাম।

সেই দগ্ধ গৃহের নিকটে ভিড় করে সকলে কি বলাবলি করছে। বিনয় এগিয়ে গেল, কি ব্যাপার ?

রান্নাঘর পুড়ে শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু হাড়িতে হয়ত রান্না হচ্ছিল, কিংবা ভাত ছিল। বাড়ির কারুর লক্ষ্য করবার সময় ছিল না, এরই মধ্যে কোথা দিয়ে এক ভিক্ষুক রমণী সেখানে ভাতের খোঁজে এসে গেছে—পোড়া হাড়ির পোড়া ভাত সে পিছন ফিরে দুহাতে গিলছে, তারও কোলে এক ক্ষুদ্র শিশু, কে জানে জীবিত না মৃত। সবাই হৈ চৈ করছে, কিন্তু তার ভ্রূক্ষেপ নেই। সে মুখে গ্রাসের পর গ্রাস পুরে দিচ্ছে। বিনয় বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল, মনে পড়ল সেই নিহত ভিখারিণীকে—আর মনে হল, কি দুর্বার তবু মানুষের বাঁচার আকাঙ্ক্ষা।

হাসপাতালে দারুণ ব্যস্ততা। ষ্ট্রেচার-ভরা রোগী আসছে, বারান্দায় তাদের সার-সার রাখা হচ্ছে। নানা গল্প ও সংবাদের টুকরা কানে শোনা যায়। ম্যাজিষ্ট্রেটের নিজের বাড়ির মাঠে বোমা পড়েছিল, তাঁর গাড়ী জ্বলে গেছে। গ্যারেজের উপরে ড্রাইভার আহত হয়েছে; তার মুমূর্ষু অবস্থা। তারই এখন অপারেশান চলেছে। সরকারী কর্মচারীরা আরও দু'-একজন আহত। একজনার স্ত্রীও সামান্য আঘাত পেয়েছেন—বিনয় শুনল মিসেস্ দাশগুপ্ত না কে! একে-একে যদি অপারেশান ঘরে আহতদের দেখতে হয় তা হলে আজ দেখাই হবে না। কিছু লোক অবশ্য চালান যাচ্ছে মিলিটারি হাসপাতালে। এখানে আহত সবে আসতে আরম্ভ করছে,

তবু এখনি তাদের শুইয়ে রাখবার জায়গাও হচ্ছে না। বারান্দায় শুধু খড়ের উপর তাদের শুইয়ে দিয়ে ষ্ট্রেচার নিয়ে আবার শুশ্রূষাকারীরা ছুটছে।

সিবিল সার্জন এগিয়ে এলেন। বয়স্ক বাঙালী তিনিও, আশঙ্কায় উত্তেজনায় উদ্বিগ্ন—ডক্‌টার মজুমদার, আপনাকে দরকার। এ সময়ে নিশ্চয়ই পাব?

নিশ্চয়। কি করতে হবে বলুন?

যা পারেন। আরম্ভ করুন, যদি বোঝেন কাউকে বাঁচাতে পারেন, চেষ্টা করুন।

বিনয় হাত ধুয়ে তৈরী হল। কাজ আরম্ভ করে দিলে। গৌরীপদবাবুর কাছে গিয়ে বিনয় দেখল তাঁর সময় বেশি নেই। বুঝলে, তাঁকে বাঁচানো সম্ভব ছিল না। গণেশ কাঁদতে লাগল। বিনয় তাকে থামতে বলে চিন্ময়ের মাকে নিয়ে এল ঘরে—তার প্রথম চেষ্টা এই।

কাজ শেষ হলে কে একটি ছেলে বললে, আপনার বাড়ির কাছে বোমা পড়েছিল। বাইরের ঘরটার দেয়াল উড়ে গেছে।

বিনয় একবার চমকিত হয়ে দাঁড়াল।—কে কেমন আছে?

ভালো আছে সবাই। প্রমথদা' আপনাকে বলতে বললেন। ঘর-দুয়ার ক্ষীরোদ গুছিয়ে রাখছে।

ভালো আছে সবাই—বিনয় নিশ্চিন্ত হল। আবার কাজে হাত দিলে বিনয়।

একটির পর একটি রোগী আসছে। সামান্য আঘাত যাদের তাদের আঘাত ধুয়ে ওষুধ দিয়ে একজন কম্পাউণ্ডার বিদায় দিচ্ছেন। সিবিল সার্জন নিজে তবু তাদের একবার দেখে দেন। এক-একবার তিনি বিনয়কে ডাকেন, দেখুন তো এটা আগে নেবেন কিনা?

নিচ্ছি।—বিনয় হাতের কাজ শেষ করেই আবার সেদিকে মনোযোগ দেয়।

বারান্দা ভরে গেছে। ম্যাজিস্ট্রেট তদারক করছেন। বাইরে তাঁবু উঠছে—আহত আসছে এখনো। যারা মরছে তাদের নিয়ে যাচ্ছে আত্মীয়রা।

বিনয় কাজ করে চলল। কে তার রোগী তা আর মনে নেই; কে সে তাও মনে নেই। ক্ষীরোদ একবার বাইরে থেকে কি জিজ্ঞাসা করতে এসেছিল। বিনয় বলে পাঠাল, বলোগে, যা হয় আমি ফিরে দেখব। তখন বুঝব যা দরকার। অপরাহ্নে কে তার কাছে দাঁড়িয়ে ইংরেজিতে বললে, ডক্‌টার মজুমদার, চা আর এই টোস্ট খেয়ে নিন।

বিনয় মুখ তুললে। সেই পুরনো জিলা ম্যাজিস্ট্রেট আর তার সঙ্গে একটি নতুন সাহেব—হয়ত মিলিটারির কেউ।

বিনয় সহকারীদের নিয়ে বারান্দায় গেল। সেখানে চা শেষ করলে। ফিরে এল কাজে—বারান্দায় সারি সারি এখনো আহত শুয়ে। তাড়াতাড়ি করো, তাড়াতাড়ি করো। কে জানে, আরো কত লোক বাঁচানো যেত, তারা মরছে। তাড়াতাড়ি করো, তাড়াতাড়ি করো—

সন্ধ্যা হয়ে গেল, আলো জ্বলল, কাজ চলছে। এখনো অনেক বাকী, অনেকের প্রাণ বুঝি নষ্ট হয়ে যায়। রাত্রিতে কে এসে বললে, 'খানা'। বিনয় বললে, 'পরে'। কাজ চলল। রাত্রি অনেক হল। ছোট ছোট কাজ এতক্ষণ বাকী রয়েছে, এবার আরম্ভ হয়েছে তা। কে আবার একবার তাগিদ দিলে, 'খানা'। বিনয় বিরক্ত কণ্ঠে না তাকিয়েই বললে, 'না'। কে এক পেয়ালা চা দিলে। বিনয় নিঃশ্বাস ফেলল না, খেয়ে ফেলল। বিনয় দেখছিলও না। ফ্লাস্ক ভর্তি কে আবার চা রেখে গেল, কিন্তু এবার বিনয় চমকে উঠল, সীতা!

উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার মুখ—সীতা! তুমি কখন এলে?

এই তো।—মৃদু হেসে সীতা বললে।

তোমরা ভালো সবাই?

হ্যাঁ।

এলে যে হঠাৎ?

সীতা মৃদু হাসল।—এলাম। মনে হল আমার আসা চাই—তাই—

বিনয় তাকিয়ে রইল একটু স্নিগ্ধ নয়নে। পরে একটু স্নিগ্ধ স্বরে বললে, কাজ শেষ করে নিই, পরে শুনব সব, সীতা। কেমন?

আবার সে কাজে লাগল। আর কখন সকাল হয়ে গেল।

সিবিল সার্জন ফিরে এসে বললেন, ডক্‌টার মজুমদার, বাড়ি যান। আমরা সামলাব এবার।

যাচ্ছি। একেবারে শেষ করে নিই।

বেলা হল। বাইরে লোকজন বাড়তে লাগল। কালকের রোগীদের খোঁজ নিতে হয় এবার। তাদের বিনয় দেখতে লাগল একে একে। চিন্ময়ের মা যেন বাঁচবেন বলে মনে হল! সেপ্‌টিক না হলেই হয়। সামান্য ছোটখাটো আঘাত শুদ্ধ কাল যাদের বিদায় দেওয়া হয়েছে আজ তাদেরও একবার দেখা দরকার। সিবিল সার্জনের সঙ্গে দাঁড়িয়ে বিনয় দেখতে লাগল, মাঝে মাঝে এক-আধবার ছুরি ধরতে হয়। দু'জনে চা ডিম খেয়ে নিয়েছে—লোক দেখছে আর দেখছে। বেলা গড়িয়ে যাচ্ছে।

নীরদ এসে দাঁড়াল। ডাকল, ডাক্তারদা'—

বিনয় মুখ তুলে বললে, নীরদ! কি খবর?

পিছন থেকে সীতা এগিয়ে এল, এখন বাড়ি চলুন—

চলুন—আঠাশ ঘণ্টা হয়ে গেছে, আর নয়।—বললে নীরদ।

আঠাশ ঘণ্টা! বলে কি? তাই তো! চলো।

আধ ঘণ্টা পরে বিনয় বেরিয়ে পড়ল। ছন্নছাড়া পথঘাট তখনো পরিষ্কৃত হয় নি। এখানে-ওখানে চালার টিন পড়ে, কাঠ পড়ে, ডাল পড়ে আছে। কোন্ তুফান যেন সব উল্টে রেখে গেছে,—বড় বড় গাছ উপড়ে রেখে গেছে, খণ্ড খণ্ড করেছে তার প্রকাণ্ড ডাল, পথঘাট এখনো তাতে বন্ধ হয়ে রয়েছে।

এক-আধটা বড় গর্ত এদিকে-সেদিকে, হয়ত সেখানে ছোট বোমাই পড়েছিল, বড় নয়। আগুনে বোমাও ছিল, এদিকে সেদিকে পোড়া বাড়িঘর। শহরে গাড়ী কম ; তা ভরতি করে লোকজন পালাচ্ছে।

বাড়ির কাছে আসতে বিনয় দেখল, তাই তো, বাড়িটায় লেগেছিল !

নীরদ বললে, হাঁ, কিন্তু পাড়াটায় আর বোমা পড়েনি। আশ্চর্য ব্যাপার ! বোমা পড়েছে পুকুরের কাছাকাছি। তার একটা ঝাপটায় আপনার বসবার ঘরটার দেয়াল খসে গেল। সাজিয়ে গুছিয়ে রেখেছি ক্ষীরোদ ও আমরা ; সীতাদিও এসে গেলেন। বেশি কিছু নষ্ট হয় নি। ওদিকের বারান্দায় বসা যাবে—একটা ডেক চেয়ার বেঁচেছে।

বিনয় স্নান করল। এইবার প্রথম সে বুঝল এই এত ঘণ্টার মধ্যে সে দৈনন্দিন কোনো কাজ করে নি ; শুধু বার কয় চা খেয়েছে।

ক্ষীরোদ আহার নিয়ে এল—গরম ভাত, আলুভাতে, ঘি একটুকু, আর তরকারী, হাঁসের ডিম সিদ্ধ।

একি কাণ্ড রে !

ও বাড়ির মা এইমাত্র করে দিয়েছেন—সব গরম।

সীতা আর নীরদকে আগেই টুনির মা খাইয়ে দিয়েছেন। টুনির মা অন্তরালে থেকে এতদিন বরাবর এই দৃষ্টি রেখেছেন বিনয়ের উপরে ; কেশববাবুকেও এদিকে তিনি তাড়না দিতে ছাড়েন না—বিনয়ের এবার তা মনে পড়ল। আশ্চর্য ! টুনির মাকে বিনয় একরকম দেখেই নি। তাঁর বড় ছেলে শিবুদা'র সহপাঠী ছিল। আসামে চাকরি করতে গিয়ে সে অকালে মারা যায়। সেই থেকে শিবুদা' মাসীমার বিশেষ আদরের। হয়ত বিনয়ও তাই তাঁর স্নেহপাত্র। হয়ত তিনি বিনয়ের মায়ের বয়সীই হবেন। বরাবর তিনি আড়াল থেকে বিনয়ের খোঁজ নিতেন। বিনয়ের অজ্ঞাতে বিনয়ের উদ্দেশ্যে আজও তিনি বসে বসে আহার্য প্রস্তুত করেছেন। অথচ

বিনয়ের তো তাঁর কথা একটিবার মনে পড়ে নি! মনে হয়নি টুনু কেমন আছে, কেমন আছেন তার মা, কেমন আছেন কেশববাবু? বিনয় শুনেছেও তো—এ পাড়ায় বোমা পড়েছে, তার ঘরের একাংশ ধ্বসে গেছে। আশ্চর্য মানুষ বিনয়!—ভাবল সে নিজেই,—পৃথিবীতে যারা তাকে ভালোবাসে তাদের বুঝি সে এমনি উদাসীন ভাবেই প্রতিদান দেয়—মুখ তুলেও তাদের দিকে তাকায় না।

বিনয়ের হেনাকে মনে পড়ল, মনে পড়ল সুধাকে। দুদিন ধরে হেনার চিঠিও এসে রয়েছে। টেবিলের ড্রয়ারে ছিল, হয়ত তা নষ্ট হয়ে গেছে। কলকাতায় ওরা কি শুনেছে সোনাপুরে বোমা পড়ার খবর? শুনেছে তিনশ' লোক আহত হয়েছে; শেষ পর্যন্ত বোধ হয় আর একশ' লোককে বাঁচানো যাবে না। কাগজে বেরিয়েছে এ খবর? না, এত সকালে বেরুবে না। কিন্তু লোকমুখে এখবর কলকাতা এতক্ষণে পৌঁছে যাবে। তারপর তাদের দুশ্চিন্তার শেষ থাকবে না। বিনয় একটা খবরও তাদের দেয় নি। হয়ত দিলেও তারা পাবে দেরীতে। কিন্তু বিনয় খবর দেয় নি—দেবার কথাও এতক্ষণ তার মনে ওঠে নি। আপনার লোককে এমনি বিনয়ের অবহেলা। অথচ তারা কি বিনয়কে ভুলে থাকে?

সীতা বেগমপুরা থেকে সেদিনই এসেছে। সে উদাসীন থাকতে পারে নি—বিনয় তাকেও খবর দেয় নি।

এরই মধ্যে সীতা ক্ষীরোদকে নিয়ে রান্না ও শয়নঘর ঝাড় দিয়ে ফেলেছে; বিনয়ের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে খাবার সময়। জিজ্ঞাসা করেছে, হাসপাতালের আহতরা কে কেমন আছে?

বিনয় খেয়ে উঠলে সীতা বললে, ডাক্তারদা', আমি এবার যাই।

কোথায় সীতা?

চিন্ময়বাবুদের পাড়ায়। যারা সামান্য আঘাত পেয়েছে তাদের ভার নিয়েছি।

বিনয়ের চোখে সপ্রশংস দৃষ্টি ফুটে উঠল। ইচ্ছা হল বলে, সীতা বসো, গল্প করি। কিন্তু বিনয় মানা করতে পারল না।

১৭৯ তেরশ' পঞ্চাশ

অনেকক্ষণ ভাবল বিনয় বসে বসে। পরে নীরদকে বললে, দুটো তার দিয়ে আসবে, নীরদ, আমি ততক্ষণ ঘুমোই তা হলে।

দিন। কিন্তু চারটা বাজছে—এখন ঘুমোবেন?

দু'খানা তার বিনয় লিখে দিলেঃ 'হেনা,—রাসবিহারী এভিন্যু। বেশ ভালো আছি।' 'সুধা, কেয়ার অমিত,—আপার সার্কুলার রোড। সকলেই ভালো আছি।'

নীরদ তার দেখতে দেখতে গেল। 'সুধা, কেয়ার অমিত', তাকেও ভাবাচ্ছে, বিনয় তা জানে। কিন্তু আজ বিনয়ের দ্বিধা নেই। এ দু'দিনের কাজের মধ্য দিয়ে কি যেন এক আত্মবিশ্বাস তার মনে জন্মগ্রহণ করেছে। সে ঠিক তার কারণ বুঝছে না, বুঝতে চায় না। বিনয় অনুভব করছে—'আমি আছি'। এই পৃথিবীতে বিনয়ের কাজ আছে, স্থান আছে, সে নিরর্থক নয়, নিজের কাছেও সে নিরর্থক নয়। জীবনে তার মানে আছে, সে বুঝেছে তা। মানে আছে তার নিজের কাছে, কারণ বিনয়ের মানে আছে তার চারদিকের পৃথিবীতে—হেনার কাছে, সীতার কাছে, সুধার কাছে, টুনির মায়ের কাছে।...বিপর্যস্ত ঘরের দিকে বিনয় তাকাল—এই একটু আগে সীতা তা গুছোচ্ছিল। এরই এক কোণে বিনয় থাকে; এরই মধ্যে রয়েছে হেনার চিঠি; সুধার সম্ভাষণ,—তার প্রিয় হাতে লেখা সেই উপহৃত বই—এখনো বিনয় তা পড়ে নি। কিন্তু বই পড়েই বা তার কতটুকু মানে জানত বিনয়? জানা যেত তাতে সুধাকে? জানা যেত তাতে কি বিনয়কে? ডাক্তার হিসাবে, মানুষ হিসাবে?...

ভাঙা ডেক্ চেয়ারে শুয়ে বিনয় তুলে নিলে খবরের কাগজ। কালকের তারিখের কলকাতার খবর—মানে, ১৩৫০এর পয়লা বৈশাখের কাগজ :

পরাহত রোমেলের বাহিনী টুনিসিয়ায় শেষ ঠাঁইও আর পাচ্ছে না; ম্যাকআর্থার ব্যাখ্যা করছেন জাপানের সমুদ্রাধিপত্য নিষ্কণ্টক নেই আর। (কিন্তু এখনো বাঙলার মাথায় বোমা পড়ছে যে!) রাধাকান্ত মালব্য জানাচ্ছেন সেই গত বৎসরের অশান্তি ও উপদ্রবে গান্ধীজীর কিছুমাত্র সম্মতি ছিল না। (মিথ্যা বলেনি শাহেদুদ্দীন!) আরাকানে জাপানীরা এখনো ওৎ পেতে বসে আছে। লেলিনগ্রাদ আর একবার পরিবেষ্টিত করবার জন্য চেষ্টা করছে হিটলারের নাৎসি-বাহিনী।

আশ্চর্য পৃথিবী! এই সোনাপুর বাঙলা ছাড়াও কত বড় সংসার চলেছে কত বিচিত্র ধারায়। কত বিচিত্র, কত বিক্ষুব্ধ সে পৃথিবীও।

নমস্কার জানাচ্ছে প্রথম পৃষ্ঠা থেকে মিষ্টার মুরারি সেনের ব্যাঙ্ক আর এক ব্যবসায়ী মহাপ্রতিষ্ঠান মূলরাজের : 'শুভ নববর্ষ! বন্দেমাতরম্'!

পাতা উল্টাল বিনয় অলস হস্তে :

নাট্যভারতীতে 'দুই পুরুষ', মিনার্ভায় 'খুন', রঙমহলে নববর্ষ উপলক্ষে অহীন্দ্রকুমারের 'মাইকেল', শ্রীরঙ্গমে যোগেশ রূপে শিশিরকুমার 'প্রফুল্ল', রূপমে 'শেষ উত্তর', নিউ পূর্ণতে 'নিশানী', ইটালি টকিজে 'স্বামীর ঘর', পূর্ণতে 'মীনাক্ষী', ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটে এক সখের দলের অভিনয় 'নদেরনিমাই', চিত্রায় 'কাশীনাথ', উত্তরায় 'স্বামীর ঘর', রূপবাণীতে 'অভিসার', সিটি সিনেমায় 'ইস্কুল মাষ্টার', রক্সিতে 'বসন্ত', পূরবীতে 'প্রিয়বান্ধবী', চিত্রলেখায় 'ওয়ার্লড্ ওয়ার (১৯৪২)', মিনার ও ছবিঘরে 'সমধর্মিণী', শ্রীতে 'আলেয়া'—

অথচ এ সবের একটাও বিনয় দেখে নি—সেবারও কলকাতায় সিনেমায় থিয়েটারে যাওয়া হয় নি, এখানে সোনাপুরেও তার যাওয়া হয় না। তখন কলকাতায় সময় পেল কই?—বিনয় ফিরে এলেই অধ্যাপক সরকার

বলেছিলেন, 'কি সিনেমা দেখলেন, বলুন কলকাতায় ?' কলকাতায় গিয়ে সিনেমা দেখে না, এমন জীবও আছে ?—অধ্যাপক সরকার বিনয়কে দেখে ভাবেন। বিনয়ও লজ্জিত হয়েছে। তার ঠিকমত উত্তরও জোগায় না। আজ বিনয়ের কৌতুক বোধ হল এসব পড়তে। অদ্ভুত পৃথিবী !— সেই মামুলি নিয়মের জের টেনে চলেছে মরণ উৎসবের মধ্যেও।

চোখ পড়ল : এই বুঝি মিষ্টার সেনের সেই চালের কারবার ? চেতলার এক পুরনো কারবারীর ধানকল প্রভৃতি তাঁর কোম্পানীতে বাঁধা পড়ে। সে সব কিনে মিষ্টার সেন এই নতুন কারবার শুরু করেছিলেন। সুন্দর তাদের নববর্ষের সম্ভাষণ—হয়ত কোনো সাহিত্যিক পাঁচ টাকা পেয়েছেন এই প্রচারের লেখনের জন্য :

"হে নববর্ষ !
চির সুখশান্তি ও প্রসন্নতার সমুজ্জল মূর্তিতে
আবির্ভূত হয়ে আমাদের অর্ধশতাব্দীর
সেবাব্রত সার্থক কর।

বিনীত—
সোনার বাংলা রাইস্ মিল্স্

বাঙ্গালার চাউল বাঙ্গালী না রাখিলে বাঙ্গালাকে বাঁচাইবে কে ?"

সত্যই তো, সে চা'ল কি যাবে ইব্রাহিম ভাইর হাতে !

'চির সুখশান্তি ও প্রসন্নতার মূর্তিতে আহ্বান করছে 'সেবাব্রত' জাতীয় প্রতিষ্ঠান „এই,' 'নববর্ষকে'। সুন্দর, সার্থক আহ্বান। হায়, তারা কি জানে—সোনাপুরে কি মূর্তিতে নববর্ষ আবির্ভূত হয়েছে ? অগ্নিবেশে, মৃত্যুবেশে। শুধু কি তাই ? অন্নহীনা ভিখারিণী ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল বোমার আঘাতে, অন্নহীনা ভিখারিণী অগ্নিদগ্ধ গৃহে দুই হস্তে দগ্ধান্ন মুখে পুরছে—চারিদিকে আগুন, মৃত্যু, আহতের ক্রন্দন,—কিন্তু ক্ষুৎপিপাসা সর্বজয়ী !

কাগজে নববর্ষের উৎসবের আহ্বান পাতায় পাতায়। মন্ত্রিত্বহারা মন্ত্রীরা ও সংবাদ-প্রকাশের কর্তা সম্পাদকরা সে সব উৎসবে 'পৌরহিত্য' করছেন—শ্যামাপ্রসাদবাবু পৌরহিত্য করছেন রবীন্দ্র পরিষদের নববর্ষের উৎসবে। সংবাদপত্র-কর্তৃপক্ষও তাদের হালখাতার নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

চারিদিকেই 'শুভ নববর্ষের অরুণ প্রভাত।' অদ্ভুত দেশ!

বিনয় পড়তে পেল সম্পাদকীয় প্রবন্ধে—

"লিখিতে বসিয়া দেখিতে পাই, সেই মামুলি হিসাবই পংক্তির পর পংক্তি সাজাইয়া চলিয়াছি। অন্ন এবং বস্ত্রের মূল্য তেমনি আছে। দুই মুঠো অন্নের জন্য লাইন-বন্দী যাহারা দাঁড়াইয়া থাকে, তাহারা তেমনি দাঁড়াইয়া আছে। জীবনের গুরুভার বিন্দুমাত্র কোথাও লঘু হয় নাই।"

না, বিরোধের ভারও লঘু হয় নি!

দেখল বিনয়,—নূতন মন্ত্রিত্বের ছকসাজানোও চলেছে। স্যর নাজিমুদ্দীনই প্রথম ঘুঁটি চেলেছেন। তিনি উদার গলায় হেঁকেছেন 'ন্যাশনাল এ্যাপ্রোচের' বার্তা; ভালো ভালো কথার প্রোগ্রাম দিয়েছেন। কাগজের হিন্দু সম্পাদকের চোখে কি তাতে ধূলি দেওয়া যাবে? লীগ্ মন্ত্রিত্বের আয়োজন হচ্ছে, এই সন্দেহ করেই তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে উদ্যত-খড়্গ হয়ে উঠেছেন।

অদ্ভুত পুরনো মন্ত্রীরাও। নববর্ষ উৎসব করছেন, সামনেই নববর্ষের কণ্ট্রোলের লাইন তাঁদের পুরনো কীর্তি ঘোষিত করছে! অদ্ভুত অনাগত মন্ত্রীদের শতরঞ্চ খেলাও—দু'হাত পেতে অপেক্ষা করছে বাঙলার কণ্ট্রোলের দোকানে নরনারী, দেখছেন না তা তাঁরা?

কিন্তু, কে বলে কর্তৃপক্ষ তৎপর নয়? শাস্তি পাচ্ছে অতিলোভী দোকানীরা: এই তো—বেলেঘাটায় চিনির জন্য চারজনকে ধরা হয়েছে, ঢাকায় নবাবগঞ্জে একজনের পঞ্চাশ টাকা জরিমানা হয়ে গেছে।—কে বলে গবর্মেণ্টের দৃষ্টি নেই? অসামরিক কর্তৃপক্ষ জানাচ্ছে, 'এপ্রিল মাসে কলকাতায় অন্তত ৬০ হাজার মণ আটা ছাড়া হবে।' গড়ে দিনে দু'হাজার

মণ, প্রায় চার হাজার লোকের দৈনিক আটা তা হলে তখন জুটে যাবে। চব্বিশ লক্ষ লোকের শহর কলকাতা, ভাগ্যবতী তুমি!

গম ও চা'লের আর একদফা পাইকারী দরও ঘোষণা করা হয়েছে।

এবার বিনয়ের হাসি পেল দুঃখে। আরও এই মিথ্যা পরিহাস? দেখেছে বিনয় সোনাকান্দি, দেখেছে সল্লাখালি সর্ষেখালি, জানে হাকিমহাকার লাউতলীর কথা—চা'লের দাম পঁচিশ টাকায় উঠে গেছে—মানুষ মরছে ভাত না পেয়ে। আর কেন এ ঘোষণা? মানুষ মরছে, এ জিলায় মরছে, চাটগাঁয়ে মরছে, সমস্ত বাংলা দেশেই বুঝি মৃত্যু হানা দিয়েছে।

মৃত্যু আর মিথ্যা নিয়ে এল কি এই ১৩৫০?

১০

একদিনের মধ্যে এতবড় একটা ওলট-পালট হল, যা ভাবতেই পারে নি কেউ। বিনয়কেই সকলে চায়, সরকারী ডাক্তারদের উপর তাদের আস্থা নেই। সীতাও সহরে রইল ক'দিন; নারী সমিতি নার্সিং হাতে নিলে। সরকারী নার্স যথেষ্ট নেই। বিনয় সুরেশবাবুকে বললে, আপনারা কংগ্রেসের থেকে নার্সিংয়ের ব্যবস্থা করুন। বাঁচতে হবে তো।

বৈকুণ্ঠবাবু বললেন, ঠিক ডাক্তার। আমি তাই সীতাকে বললাম, 'এক সপ্তাহ তোমার স্কুল দেখতে হবে না। এখানে থাকো। আমাদের হিন্দু নার্সিং সোসাইটি করব এর পরে।'

বিনয় জানে, সীতা এসে গেছে নিজের প্রেরণায়। 'বুঝলাম আসা আমার চাই,' বলেছে সীতা, 'এলাম।' প্রথম দিনেই এসে সে প্রমথদের সঙ্গে কথা কয়ে তার কাজ ঠিক করে নেয়। বিনয়ও তাকে এবার প্রধান শুশ্রূষাকারিণী রূপে পেল। সীতা তার আগে চিনুকে, লীলাকে, মজিদের স্ত্রী আমিনাকে জুটিয়ে নিয়েছে। গ্রাম থেকে পরে শৈলদি' এলেন।

চিন্ময়ের মাকে শুশ্রূষায় সীতাই বেশি করে লেগে গেল। চিন্ময় বাড়ি নেই। সে কেমন ছেলে, তা কি সীতা বহুবার শোনেনি শিবুদা'র কাছে?

তবু চিন্ময়ের মাকে নিয়ে দুর্ভাবনার কারণ ছিল—বারবার তাকে রক্ত দিতে হল। গণেশের বোনের সেপ্‌সিস্ দেখা দিল, তবে তা ভয়ানক হল না।

বিনয় ভাবছে, কাউকে বাঁচানো বড় সহজ কথা নয়। তবু বাঁচছেও মানুষ।

কিন্তু বোমার সঙ্গে সঙ্গে চা'লের দর পঁচিশ টাকা থেকে এক লাফে সাতাশ-ত্রিশ টাকায় পৌঁছুল। বিনয়ের মনে পড়ল সেই কলকাতার কথা। সে বুঝলে এবার অবস্থা কি হবে। বাজারের একটা পট্টিতে বোমা পড়েছিল, দু'একটা ছোট গুদাম তাতে জ্বলে গেছে। তাই সব ব্যবসায়ী একবাক্যে বলছে, তাদের যার যা ছিল তা ওসব গুদামেই ছিল—শেষ হয়ে গেছে, কিছু নেই এখন আর—চা'ল নেই, ডাল নেই, চিনি নেই, কেরোসিন নেই, লবণও নেই। সকল জিনিসের দাম রাতারাতি বেড়ে গেল। ডিসেম্বর মাসের শেষে কলকাতায় বিনয় যা দেখেছিল আবার সে জিনিসই এখানে দেখতে পেল—বাজারে জিনিস চাইলে পাওয়া যাবে না, দ্বিগুণ দামে না হলে দোকানীরা জিনিসপত্র বের করবে না। শহরের বস্তিবাসীরা ও ভদ্রলোকেরা সমভাবেই চিৎকার করতে লাগল, 'কিছু পাচ্ছি না, কিছু পাচ্ছি না।' প্রমথ বললে, 'ডাক্তারদা, এই কর্মচারীদের দিয়ে চাপ দিয়ে শীগগির জিনিসপত্র বের করাতে হবে। নইলে বোমা খেয়ে যে ক্রোধ জাপানীদের উপর জমে

উঠছে, ভাত খেতে না পেয়ে সে ক্রোধই জাপানীদের প্রতি দ্বিগুণ অনুরাগে রূপান্তরিত হবে।'

কাজীকে নিয়ে বিনয় তাড়াতাড়ি গেল সিবিল সাপ্লাইর মিষ্টার মিত্রের সঙ্গে দেখা করতে। মিষ্টার মিত্র এবার কিন্তু সরকারী চাল কমিয়ে বিনয়ের সঙ্গে কথা বললেন। বিনয় তার কারণও বুঝলে। এই দুর্যোগের সময় বিনয়ের কাজ তাদের উপরওয়ালা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের চোখে পড়েছে।

মিষ্টার মিত্র ভদ্রভাবে বললেন, ডক্‌টার মজুমদার, আপনিও তৎপর হোন। দেখুন, কোথায় ধানচা'ল আছে। আমরা আপনাকে সাহায্য করব।

বিনয় বললে, আপনাদের এত কর্মচারী—এত সি-আই-ডি, আই-বি, এত সিবিল সাপ্লাইর ইন্‌স্পেক্টার। তারা চেষ্টা করলে খবর নিশ্চয়ই জানতে পারবে।

তারা তো জানছেই। কিন্তু আপনারা বলছেন, ব্যবসায়ীরা ঠকাচ্ছে। আমাদের রিপোর্ট—ব্যবসায়ীদের মাল বোমায় জ্বলে নষ্ট হয়ে গেছে—

বিনয় স্তব্ধ হয়ে গেল। বললে, একবার দেখুন না ব্যবসায়ীদের গুদাম।

তাদের ঘাটালে এখন আরও গোল হবে, কিছু আর পাওয়া যাবে না।

বিনয় হতাশ হল, বুঝল কার্যত কিছু হবে না।

বিভাগীয় কমিশনার কিন্তু দুদিন পরেই এসে গেলেন। বোমার পরে এ সহর তাঁর দেখা দরকার। তিনি শহরের প্রতিনিধি স্থানীয়দের নিয়ে বৈঠক করবেন। বিনয়ও খাদ্য-কমিটির লোকদের ডাকালেন। খাঁ বাহাদুর শেরোয়ানি পরে নিলেন; বৈকুণ্ঠবাবুও পাৎলুন পরলেন; গলবন্ধ কোট ও সোনার চেন ঝুলিয়ে রওনা হলেন সুরেন্দ্র চৌধুরী; মুকুন্দ পাল ধুতির উপর খোলা-বুক কোট চাপিয়ে এসে গেলেন।

কমিশনার সাহেব বললেন, আপনাদের সকলের মারফত আমি শহরের লোকদের সরকারের সমবেদনা জানাচ্ছি। দেখেছেন তো, শত্রুরা কি করলে?

বৈকুণ্ঠবাবু, খাঁ বাহাদুর, সুরেন্দ্রবাবু ওঁরা বললেন, লোকে ভয় পেয়েছে। তাদের রক্ষার কোনো ব্যবস্থা না করলে তারা ভরসা পায় না।

সাহেব বললেন, সে বিষয়ে আপনারা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। মিলিটারী কর্তৃপক্ষ তা দেখছেন। কিন্তু আমরা বেসামরিক লোকেরা কি করব, তাই প্রশ্ন। এ-আর-পি খুব ভাল কাজ করেছে। আপনারা বেসরকারি লোকেরা, ডাক্তার ও শুশ্রূষাকারীরাও খুব নিজেদের পৌরনীতি-বোধের পরিচয় দিয়েছেন। সেজন্য গবর্মেণ্ট আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছেন। যারা হতাহত তাদের জন্য যা করবার সরকার তা করবেন। কিন্তু এখানে এখন আর কি চাই আপনাদের তাই বলুন?

বিনয়ই বললে, চাই প্রথম চা'ল-ডাল, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র। বাজারে তা মোটেই মিলছে না।

সাহেব বিপদে পড়লেন, বললেন, কিন্তু তা সরকার কোথায় পাবে?

বিনয় ও সুরেন্দ্র চৌধুরী বললেন, হুবিাপুরের নাখোদাদের গুদামে এত চা'ল রয়েছে; সেখান থেকে চা'ল সরবরাহের ব্যবস্থা হোক।

সাহেব ভাবনায় পড়লেন। একি সত্যি? বললেন, বেশ। তা আমরা ব্যবস্থা করছি। আপনাদের স্কিম আপনারা ইতিমধ্যে ঠিক করুন।

ব্যবসায়ীরাও উৎসাহিত হল এবার। সকলে মিলে একটা সাময়িক ফুড্ কমিটিও গঠিত করে ফেলল। তাড়াতাড়ি একটা সম্মেলন ডেকে তা পাকা করে ফেলতে হবে। ব্যবসায়ী, উকিল, মোক্তার, সবাই মিলিত হল—বড় বিপদ মাথার উপর। বিপদ চারিদিকে—এদিকে জাপানীরা বোমায় মারছে; ওদিকে ধান চা'ল না পেয়েও মরতে হচ্ছে।

বিনয়দের উপর পুলিশের নিষেধাজ্ঞাও রদ হয়ে গেল।

দেখা হতে মিষ্টার ব্যানার্জি বললেন, ডক্‌টার মজুমদার, খুব কিন্তু জিতেছেন।

কিসে ?

হুকুম রদ হল কেন জানেন ? বোমা-পড়া আর আপনাদের কাজ দেখে নাকি শুধু ? সদরের পুলিশ ইন্‌স্পেক্টার আমানুল হক ঠুকে রিপোর্ট দেন—আপনাদের ইস্তাহারের প্রত্যেক কথা সত্য, হাকিমহাকায় মেহের-পুরে মানুষ মরছে। ম্যাজিস্ট্রেট তা নিয়ে ফাঁপরে পড়ে। দু'বার আমানুল হককে বলে, 'তুমি আরও সন্ধান করো, রিপোর্ট বদলে দাও।' সে কিন্তু ঠিক রইল, রিপোর্ট পাল্টাল না।

প্রমথ বিনয়কে আগেই এ খবর বলেছিল। আমানুল হক নিজে থেকেই খবর পাঠিয়েছিল তাদের, 'ভাববেন না। জীবনে সত্য কথা বেশি বলতে পারি না। কিন্তু পুলিশ হলেও আমার ইমান আছে। আমার দেশের লোক না খেয়ে মরবে, আর আমি বলব, না, তারা খেয়ে মরেছে ? তেমন বান্দা আমানুল হক নয়।

মিষ্টার ব্যানার্জি বললেন, আমানুল হক মুসলমান। তাকে বেশি ঘাটাতে কেউ চাইবে না। তবে তাকে বদলি হতে হত। কিন্তু ইতিমধ্যে কমিশনার এলেন। হকের সঙ্গে কথা হল; তার রিপোর্টও দেখলেন, বুঝলেন আপনারা দিচ্ছেন। কি ভাবে এখন আপনাদের বিবৃতি অপ্র-মাণিত করবেন, তাই হচ্ছে ম্যাজিস্ট্রেটের চেষ্টা।

বিনয় বললে, কি লাভ হবে তাতে ? মানুষের অবস্থা তো আরও খারাপ হচ্ছে। আগেও মরেছে, এখন আরও মরছে। প্রমথরা বেরিয়েছে, তারা আরও প্রমাণ সংগ্রহ করে নিয়ে আসবে হয়ত।

বিনয় জেনে খুশি হল—তার কথা মিথ্যা হয়নি।

কমিশনার সাহেব কাউকে কিছু না বলে গেছল সেদিন হাকিমহাকায় ও মেহেরপুরে। সঙ্গে এ-ডি-এম্ আর সেরেস্তাদার। খোঁজ করছিল—সত্যই মানুষ অনাহারে মরেছে কি না, না বিনয় ওরা মিথ্যা করে বলছে। আমিনুদ্দীন প্রেসিডেণ্ট পঞ্চায়েৎ, সে তো ভয়ে অস্থির। বলে, 'হাঁ, না

খেয়ে মরেছে বলে লোকে বলে, আমি ঠিক দেখি নি।' আমিনুদ্দীন বুঝতে পারছিল না কোন্ কথায় সাহেব খুশী হবে। সাহেব বলে, 'তুমি দেখো নি। কিন্তু তোমার রিপোর্ট কি?' আমিনুদ্দীন বলে, 'মরেছে।' সাহেব বলে, 'সে আমিও জানি। কিসে মরেছে, তাই কথা।' আমিনুদ্দীন বলে, 'নানা জনে নানা কথা বলে।' সাহেব বললে, 'বেশ, চলো, কোন্ বাড়িতে কে মরেছে, কিসে মরেছে, দেখি।'

একে-একে সাহেব সব বাড়িতে গেল। ভাগ্যিস্, প্রথম যে বাড়ি যায় সে বাড়ির পাশেই ছিল বুড়ী বাঈ আম্মার এক আত্মীয়দের বাড়ি। সেও আম্মাদের খুব দরদী, সাহসও আছে। আম্মাও তখন সেখানেই গেছেন। আম্মা খুব জোর করে বলে দিলেন, 'না খেয়ে রয়েছে কতদিন ওরা, মরবে না? আগে কচুর 'মুড়া' পেলে খেত। তারপর তাও পায় নি। মরেছে একজন প্রথম, আর ক'জন তিনদিন পরে মরে। এখনো তো না খেয়ে ছিল ওরা, কেবল আমাদের খাদ্য-সমিতি এক বেলা করে ক'দিন খাইয়েছে ওদের। তারাও এখন আর পারছে না—আবার এরা মরবে।' সাহেব অনেক জেরা করলে—আম্মা দমলেন না। তারপর আর কথা নেই। যে বাড়িতেই সাহেব যায় লোকে আর ভয় পায় না। সবাই সাহস করে সত্য কথা বলে। সাহেব গম্ভীর হয়ে গেল। আমিনুদ্দীন কথা বলে না আর। সাহেব উঠে চলল হাকিমহাকায় লাউতলীতে বাঈ আম্মার বাড়ি।

সাহেব ডাকল আম্মাকে। বললে, বুড়ী কি চাই তোমাদের?

ভাত দাও, সাহেব, ভাত দাও। ফ্যান দাও, ফ্যান।

কোথা থেকে সরকার তা দেবে? লড়াইয়ের টাইম্—

শুনেই আম্মা ক্ষেপে গেলেন, 'লড়াইয়ের টাইম তোমাদের কোথা, সাহেব? তোমাদের হাকিম চলছে, হুকুম চলছে; আলো জ্বলছে, পাখা চলছে, গাড়ী চলছে, ফুর্তি চলছে। লড়াইয়ের টাইম তো আমাদের। আমাদের ছেলে গেছে লড়াইতে, আমরা পাই না ভাত। হালিম গেছে

ফৌজে, আর তার বাচ্চারা আজ না খেয়ে মরছে। ওমরালী মরেছে ফৌজে —তার আউরাৎ সেদিন পেটের জ্বালায় ফাঁসি দিতে গেল। মোহনদাসের ব্যাটা গেছে লড়াইতে—তার মা বাপ খেতে পায় না, বিধবা বোন্ যাবে কোথায়? আমরাই লড়াইতে গেছি আর আমরাই না খেয়ে মরছি—লড়াই তোমাদের কি, সাহেব?'

সাহেব চুপ করে গেল।—এ দু গ্রাম থেকে জন ত্রিশ লোক যুদ্ধে গেছে। শেষে সাহেব বললে, 'আচ্ছা বুড়ী, কি চাও তোমরা?'

চাই সাহেব ফ্যান, ফ্যান। জান্ দিয়েছে লড়াইতে আমাদের ব্যাটারা: তোমরা ফ্যান দাও,—চাট্টি করে ফ্যান-ভাত।

সাহেব উঠে দাঁড়াল, বললে, তাই হবে বুড়ী, তোমরা ফ্যান-ভাত পাবে। রান্নার জোগার করো। গুড্ বাই—সেলাম।

মহোৎসাহে প্রমথ বললে, বাঈ আম্মা মুখ রেখেছে সমস্ত গ্রামের।

বিনয়ের মনে আবার সেই পুরনো আলোড়ন দেখা দিল। সেই বাঈ আম্মা—মন্সুরজ্জমানের মা, খালেকুজ্জমানের মা—প্রথম দিনেই যাঁকে বিনয় বাঈ আম্মা বলে মেনে নিয়েছিল। তখন বেলতলার দিকে লোককে গ্রাম ছাড়া করছে সরকার—আম্মা আসতেন মেয়েদের নিয়ে। বলতেন তাঁর ছেলে খালেকুজ্জমানের কথা।—জানে কি বিনয় তাকে? জাহাজে কাজ করত সে। মজুর-কিসানের দলের মানুষ—মুলুকে-মুলুকে ঘুরে বেড়ায়। কখনো জাহাজে, কখনো জেলে। সেবার বলে গেল, মজুর-কিসানের মুলুকে হানা দিয়েছে দুশমন। সে যাবে সে মুলুকে লড়াই করতে। তারপর আর খবর নেই তার।

'ভারী লড়াই। কিন্তু জিতব সে লড়াইতে আমরাই দেখো—ইমান আমাদের সাফ।' বলেছিলেন বৃদ্ধা মা।

বিনয় ভাবতে লাগল, কোথায় খালেকুজ্জমান—কোথায় আজ কে? তার বুড়ী মায়ের কাছে লড়াইয়ের দিনে আজ সমস্ত গাঁয়ের লোকেরা তাঁর

আপনার হয়ে উঠেছে ; সমস্ত মজুর-কিসান তাঁর আপনার ছেলে হয়ে উঠেছে—সব মানুষ হয়েছে আপনার। অথচ এ পৃথিবীতে সেই যুদ্ধের দিনেই শিক্ষিত মানুষের দল ফিরছে মানুষের শিকারে—আর ফিরছে মুনাফার নেশায়।

১১

বৈকুণ্ঠবাবু বললেন, বিদ্যামন্দিরের জন্য কিছু টাকা তোলো ডাক্তার ?

বিনয় শঙ্কিত হয়ে উঠল। বললে, আমি কাকে চিনি ?

কি যে বলো ? তুমি নিজেই তো দিতে পার। আর তুমি দিতে বললে কেউ টাকা না দিয়ে পারে ? আমি তো প্রমোদের থেকে সেদিন আদায় করেছি এক হাজার টাকা ; আর ছ' রীম কাগজ—মাসে আধ রীম করে। কিছু না বলে ওকে নিয়ে গেছলাম ইস্কুল দেখাতে। তা এক কাণ্ড ! কে জানত সীতা নেই ? হাঁ, মেয়েদেরও নাকি সম্মেলন হচ্ছে ?

বিনয় শুনেছিল। কিন্তু বললে, কিছু জানি না।

এই দ্যাখো তুমি জানো না, আর সীতা এসবের মধ্যে গিয়েছে কেন ?—বৈকুণ্ঠবাবু জানালেন, রবিবার আমি গেছলাম বেগমপুরা—প্রমোদের গাড়ীতে। প্রমোদকে ইচ্ছা করেই কিছু বলিনি। কিন্তু গিয়ে দেখি সীতা নেই, বেরিয়েছে কোথায় কাদের সঙ্গে। যাক, প্রমোদকে অমনি ইস্কুল দেখালাম—অন্যান্য টিচার ছিল। সোমবার সকালে ওখান দিয়ে ফিরছি—ইস্কুলের কাছে খবর নিয়ে জানলাম সীতা ফিরেছে। সময় নেই তখন—কোর্ট তো আছে আবার। প্রমোদও গাড়ীতে ষ্টার্ট দিয়েছে, দেখি সীতার কোয়ার্টার্স্ থেকে লোক ছুটে বেরিয়েছে, 'কাকাবাবু ! কাকাবাবু !'—লীলা ওকে ডাকে 'সীতাদি'। প্রমোদ ষ্টার্ট বন্ধ করলে, দাঁড়ালাম। গাড়ীর

কাছে এসে সীতা বললে, ‘আপনি চলে যাচ্ছেন? আমি যে কাল বাড়ি ফিরে অবধি আপনার গাড়ীর অপেক্ষায় বসে রয়েছি। দফতরীকে বলেছি দেখলেই যেন থামাতে ইসারা করে।’ বললাম, ‘কি কারণ বলো তো?’ বলে, ‘নামবেন না?’ ‘সময় নেই’, বললাম। গাড়ীর সাইড ধরে বললে, ‘কিন্তু কথা ছিল যে।’ বললাম, ‘বেশ, বলো না? প্রমোদ? তা, প্রমোদ আমার ছেলের মত—প্রমোদ চৌধুরী।’ ‘ও:’, বলে নমস্কার করে প্রমোদকে বললে, ‘আপনাকেও খুঁজতাম—যাক্ এক সঙ্গে পেয়ে গেলাম। আমাদের মেয়ে সম্মেলন হচ্ছে—জিলা নারী সমিতি, শুনেছেন তো?’ বললাম, ‘শুনি নি। কিন্তু তুমি এ সবে যাচ্ছ কেন?’ খুব চমকিত হয়ে গেল সীতা। বললে, ‘কেন?’ আমি বললাম, ‘হাজার হোক পলিটিক্স্ ঠিক মেয়েদের জিনিস নয়। বাজে পার্টির ব্যাপার বলে আমি তা বলছি না। কিন্তু পলিটিক্স্ বড় বিশ্রী ব্যাপার। এই তো আমার লীলা এখানে ঝুঁকেছিল সেদিকে। এখান থেকেই তাই সরিয়ে দি তাকে কলকাতায়। এখন বেশ বুঝে-শুজে চলে, কি বলো প্রমোদ?’ প্রমোদ বললে, ‘রক্ষা পেয়েছে।’ জানোই তো প্রমোদ তোমাদের বীরু ওদের উপর খাপ্পা—সে নানা কথা বললে বীরুর সম্বন্ধে। ‘যাক গে’—আমি চাপা দিলাম—‘প্রমোদ, ওসব ছেড়ে দাও। তবে কি জানো, সীতা? তোমার ভালোমন্দ তো আমারই তোমাকে বলতে হবে। ওসবে না গেলেই ভালো।’ সীতা মুস্ড়ে গেল, ‘কিন্তু কাকাবাবু, আমি যে কথা দিয়ে ফেলেছি। কেউ আমাকে কিছু বলে নি। আর আমি দেখলাম, আপনি নিজেই সেদিন শহরের সভায় আমাকে ডাকলেন, বক্তৃতা করতে বললেন। বোমা পড়লে নার্সিংএর কাজেও আপনি আমার ছুটির ব্যবস্থা করলেন। তাতেই অন্য রকম ভাবি নি। দেশের মেয়েরাও খেতে পায় না—কি যে করে আমাদের বাড়ী এসে ছেলেপিলে শুদ্ধ, কাকাবাবু, দেখলে বুঝতেন। তাই আমি ওদের সঙ্গে যোগ দিলাম। আরও বলেছি, বেশ, কাকীমাকে আমি নিয়ে আসব,

লীলাকেও। ওরা কাকীমাকে প্রেসিডেন্ট ভাইস্-প্রেসিডেন্ট করবে, ভাবছে। আমি তাঁকে রাজী করানোর ভার নিয়েছি।' আমি তো অবাক্। বললাম, 'ভালো করো নি। তাঁর ওসবে যাবার ইচ্ছা নেই। পূজো-অর্চা পছন্দ করেন, সৎসঙ্গ বা রামকৃষ্ণ মিশনের কেউ এলেও বা হত।' সীতা বললে, কাকীমার সঙ্গে আমি বুঝব। কিন্তু একটা কথা, শহরে যেখানে-সেখানে আমি থাকতে পারব না। থাকতে হয় থাকব আপনার ওখানে। কোথায় যাব অন্য কার বাড়ি—সে আমি ঠিক ভালো বুঝলাম না। কি বলেন, ঠিক করেছি না?' ছাখো, ডাক্তার, মানলাম মেয়েটার বুদ্ধি ও কাণ্ডজ্ঞান আছে। সেবার কেশববাবুর বাড়ি সে ছিল—শিবু নিয়ে তুলেছিল সেখানে। তোমার বাসা কাছে। তবু লোকে কথা বলতে পারে তো? শিবু বলেই বা কি? লোকে সীতার সঙ্গে তার অত আত্মীয়তা পছন্দ করবে কেন? আমি বলেছিলাম তখন, সীতাও তা পরে বুঝেছে। কাল তাই আমি বললাম, 'সে ঠিকই করেছ। থাকবে যেমন হয় আমাদের ওখানে—তোমার জন্য কথা নেই।' সে বলে, 'কিন্তু লীলা ও কাকীমাকে চাই যে। না হলে আমি যে বড় অসুবিধায় পড়ব। ওঁর মত একজন মুরুব্বি কেউ না থাকলে আমিই বা কি করে ওসব কাজে যাব?'

বৈকুণ্ঠবাবু গল্প শেষ করে বললেন, এত কথা—বুঝলে। আর তুমি জানো না সম্মেলন কবে? তোমাকেও জিজ্ঞাসা করে নি সীতা? আশ্চর্য তো।

না, আমার সঙ্গে ইতিমধ্যে দেখাও হয় নি।

কিন্তু, ছাখো, একটাবার জিজ্ঞাসা তোমাকে করলে পারত—দেখা হয়ত তোমার সঙ্গে প্রায়ই। আমি নয় দেখতে শুনতে পারি না। জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান, ভাইস্-চেয়ারম্যানের ব্যাপারটা চুকে যায় নি তো। প্রমথরা সেই সুরেশবাবুর দিকে তাকিয়ে আছে। তুমি সীতাকে বোঝাতে পার না, ডাক্তার?

আপনি আছেন ; আপনার থেকে ওর কে বেশি আপনার ?

এমন নিরেট কথাটাও কিন্তু চতুর বৈকুণ্ঠবাবু গলাধঃকরণ করলেন অনায়াসে। বললেন, সে কথা বোঝে কে বলো ? রাজেন বাঁড়ুজ্জে ছিলেন ওর গার্জেন এখানে। তাঁর কথাতেই সীতাকে এখানে আনি। সংস্কৃতে ফার্ষ্ট ক্লাশ অনার্স। আর সত্যি, ভালো মেয়েই তো। ইস্কুলটাকে দাঁড় করিয়েছিল শহরে। তবে ছেলেমানুষ। এখানকার মানুষও তো দেখছ,—মহিমবাবুর কথা তো বলিনি তোমায় ? পুলিশ লাগিয়েছিল সীতার বিরুদ্ধে। কত করে ঠেকাই তা। তবু সীতা ছেলেমানুষ। সেবার শহরে এল, কেশববাবুর বাড়ীতে রইল, মহিমবাবু বলেন, 'প্রমথ, শিবু, মজিদের সঙ্গে জুটেছে সীতা।' এভাবে কত ঠেকাই বলো তো ? রাজেন বাবুও নেই এখন। কি করবেন তিনি ? করোনেশান ইস্কুল আর যেন টি'কে না। দ্বিজুরও চাকরী নেই। একটা ব্যাঙ্কের চাকরি নিয়ে তিনি এ বয়সে গেলেন জামশেদপুরে, না জব্বলপুরে। যাবার সময় আমার হাত ধরে বললেন, 'সীতা রইল একা, দেখবেন। আমার মেয়ের মতো।' আমি কি করব ? ভাবতে হয় সবই, আজ রাজেনবাবু নেই। ইস্কুলটাকে টি'কিয়ে রাখতে হবে—টাকাকড়ি নেই। সীতারও বুঝে-শুঝে চলা উচিত। এতটা ঠিক হচ্ছে না—আর ওর বাড়ি যখন-তখন কেন প্রমথ যাবে, মজিদ যাবে ? তুমিও একটু দেখো তো ডাক্তার। সীতার একটু খোঁজ খবর করো—তোমাকে আমরা কমিটির মেম্বর করছি, রাজেনবাবুর জায়গাটা খালি তো। আর কিছু টাকা চাই—সে তুমি যা দেবার তা দেবে—জানি, তুমি কি আর কম দেবে ? টাকা তুলতেও হবে, যশোদাবাবুকে অন্তত ধরো।

বিনয় স্বীকার করলে, সে চেষ্টা করবে। বৈকুণ্ঠবাবুকে বিদায় দিতে পারলে সে বাঁচে।

কিন্তু কেন সীতা এমনভাবে খেলতে যাচ্ছে বৈকুণ্ঠবাবুর সঙ্গে ? বিনয় জানে সীতা বুদ্ধিমতী। কিন্তু এ তো শুধু বুদ্ধির কথা নয়। এর পিছনে

আছে চালাকি। তাতে মহত্ত্ব কিছু নেই,মর্যাদারও কিছু নেই—এই চিন্তাটাই বিনয়ের পক্ষে পীড়াদায়ক। সুবিধাবাদিতা একে বলতেই হবে—যাই বলুক সীতা। সে বলবে, 'সুবিধাবাদিতা কোথায়?—অসুবিধা দূর করা।' সে কাজ করতে চায়—কাজের পক্ষে অসুবিধা এই বৈকুণ্ঠবাবু। সে বাধা সে এমনি করে কাটিয়ে উঠতে চায়। চাকরি সে ছাড়তে পারে না; তাই, অনেক বুদ্ধি করে তাকে চলতে হয়। এমনি তাকে চলতে হয়েছে বরাবর। বিনয় শুনেছে তারই কাছে—সে স্কলারশিপ্ নিয়ে পড়ছে। ছাত্রী পড়িয়ে বাড়ির খরচও সঙ্গে সঙ্গে চালিয়েছে। 'কত জনের মন জুগিয়ে যে চলতে হয়েছে, সে বুঝবেন না, ডাক্তার দা। ছাত্রী আছে, তার বাবা আছেন, মা আছেন, দাদা আছেন, দিদি আছেন, বাড়ির চাকর আছে, ঝি আছে। আবার আছে তার ভাবী বিয়ের প্রয়োজনের তাগিদ—'গান চাই', শেখাতে পারব কি আমি? আছে তার হয়ত বর্তমান কোনো প্রেমিকের দাবী—'কেমন করে লীলা চিট্‌নিশের মতো চোখের ভ্রূ আঁকতে হয়, শেখাতে পারি কি আমি?'—বিনয় শুনেছে, বুঝেছে অনেক বাধার পাশ কাটিয়ে কাটিয়ে সীতা মানুষ হয়েছে। বুদ্ধি তার ছিল, কৌশল তাকে শিখতে হয়েছে। আর বুদ্ধি তার এখনো আছে—আছে আরও অনেক গুণ; কিন্তু কৌশলও আর সে ছাড়তে পারে না। কৌশলের দরকারও হয়। কিন্তু দরকার না হলেও সে আর তা ছাড়াতেও পারবে না বোধহয়।

বিনয় অস্বস্তি বোধ করছে এই কথা ভেবে।

দু'দিন পরে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে বিনয় দেখল—বাড়ি জম-জমাট। হাসি উঠছে খুব। ও-ঘরে যেন প্রমথর কণ্ঠও শোনা গেল। একটি মেয়ে-কণ্ঠ স্বচ্ছ উচ্ছল হয়ে উঠেছে, 'বুঝলাম, সব চেয়ে ভালো বুদ্ধি এই। বললাম, কাকাবাবু, আমি আপনার ওখানে ছাড়া অন্য খানে উঠতে পারব না।

কি জানি শেষে কি কথা হবে।' বিনয় বুঝলে সীতা। এল কখন সে? 'অমনি বুড়ো খুশী—তা বেশ, তা বেশ। এদিকে বোধহয় গিন্নীকে বলতেও সাহস করেন নি বিশেষ। পৌঁছতেই দেখলাম কাকীমার মুখ গম্ভীর। বুঝলাম, মেজাজটা সুবিধের নয়। লীলাকে বৈকুণ্ঠবাবু আমার কথা বলেছিলেন; সে খুব খুশী হয়েছে। বলে, 'সীতা দি, টাওয়েল নাও', 'সাবান নাও', 'চায়ে ক' চামচ মিষ্টি দোব?' কিন্তু শৈলেশবাবুর বউ বেশি কাছে ঘেঁসেন নি। হয়ত বউ মানুষ, শাশুড়ীর ভয় আছে। কিন্তু লীলা মেয়েটি মন্দ নয়, প্রমথ।'

প্রমথ বলছে, মন্দ হবে কেন? তবে ওর নিজস্ব সত্তা নেই। প্রমোদের পাল্লায় পড়েছে—সেটা ওরই বা দোষ কি?

যাই বলো তোমাদের প্রমোদবাবু চমৎকার মানুষ। হঠাৎ ইস্কুলের কাছে গাড়িশুদ্ধ এসে হাজির সেদিন বেলা একটায়। তিনি শহরে ফিরছেন —আমি যাব না? 'চলুন।' হঁা, পরিচয় আগেই হয়েছিল,—সেদিন বৈকুণ্ঠবাবুর সঙ্গে এসেছিলেন, ইস্কুলে নাকি প্রমোদবাবু টাকা দেবেন। আমি বললাম, 'আজ তো যেতে পারব না—আমাদের টিচার্স কমিটির মিটিং আছে। কাল সকালে যাব। অসংখ্য ধন্যবাদ—কষ্ট করছেন।' প্রমোদ চৌধুরী বললে, 'কষ্ট আর কি? তবে মিটিং কি করবেন? চলুন— শহরে সব মেয়েরা এসে যাচ্ছে। আপনি কাল গেলে চলবে কেন? চলুন, চলুন, চলুন—' পারলে আমাকে তখনি তুলে নেন গাড়ীতে—এত দরদ তার তোমাদের এই সম্মেলনের জন্য। আমি নানাভাবে এড়ালাম' 'সে কি হয়। মিটিং করতেই হবে।' জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনার স্ত্রী এসেছেন?' একটু অপ্রতিভ হলেন প্রমোদবাবু, বললেন, 'এই তাঁকেই নিয়ে আসতে গেছলাম। ছেলেপিলে নিয়ে আজ আসতে পারলেন না। নইলে একসঙ্গেই যেতে পারতেন দু'জনায়। তারপর ভাবলাম, আপনি তো আজই যাচ্ছেন, গাড়ী কেন খালি ফেরত যায়? কাজের মানুষ, আপনি

গেলে কাজ হবে অনেক।' এই রকমের অনেক কথা। বিদায় দিয়ে বললাম, 'বাবা।'

প্রমথ বুঝল, হাসল। বলল, বুঝলাম, প্রমোদ কেন নিজ থেকেই গাড়ী দিচ্ছে তোমাকে কাল।

একটা সলজ্জ হাসি বিনয় শুনতে পেল, আর তার সঙ্গে—'যাও।'

মানুষকে তো শুধু চোখ দিয়েই দেখা যায় না। কান দিয়েও মানুষকে যায় বোঝা—বিনয় তা জানে। এই তো সেই ওই গলা শুনছে, কথা শুনছে, ছোট একটি সলজ্জ কথা, 'যাও!'

বিনয় শুনছে আর কোথায় যেন অনুভব করছে এক অভিযোগ। এই স্বর, এই হাসি, এই আনন্দ সীতার—তাকে ছাড়াই তা জমে উঠেছে—আর তার বাড়িতে।

ডাক্তার দা! কতক্ষণ?

বিনয় পিছন ফিরে টেবিলের ওপর নিজের পকেটের কাগজপত্র গুছিয়ে রেখে মাথা নিচু করে বসে ছিল। মুখ ফিরিয়ে দেখলে সীতা।

এই তো, এই এসেছি।

কথা শুনে ওঘর থেকে প্রমথ এগিয়ে এল। কথা শুরু হল।

সম্মেলন হচ্ছে, তা উপলক্ষ্য করেই সীতাও এসেছে শহরে, উঠেছেও আবার বৈকুণ্ঠবাবুর বাড়ি। কিন্তু বিনয়ের এ সব ভালো ঠেকছে না আর। মেয়েদের সম্মেলনেই তার আর উৎসাহ নেই। প্রমথ তার করেছিল কলকাতা থেকে একজন মেয়ে কর্ম্মী পাঠাবার জন্য। আগেই কথা ঠিক ছিল। বিনয় শুনেছিল হয়ত আসবে সুধা গুপ্তা। শুনে অবধি সে একটা অশান্ত উদ্দীপনায় দিন যাপন করেছে। আসছে কি সুধা? মনে পড়ল তার পাঠানো বই। মনে পড়ল—আর ভাবতে লাগল তার মানে কি?

সুধার বিদায় সম্ভাষণ তা? না তা সুধার সপ্রেম স্মরণ? আগেও সে তা ভেবে বুঝে উঠতে পারে নি—আজও ভেবে কূল কিনারা পেল না। কিন্তু তবু তাকে ভাবতেই হচ্ছিল—আসছে সুধা গুপ্তা, সুধা গুপ্তা!

কিন্তু বিনয় যা প্রত্যাশা করেছিল, ঠিক তা পূর্ণ হল না। ডাকে একটি চিঠি এল সেইদিনই।

বিনয়,

তোমায় বই পাঠিয়েছিলাম, পেয়েছিলে নিশ্চয়। পড়েছ কি? বোধহয় পড় নি—সময় পাও নি বলে। আমিও কাজের তাড়ায় লিখব-লিখব করে লিখবার সময় করতে পারলাম না। কিন্তু পথ চেয়েছিলাম—চিঠি পাব বলে। হাঁ, তবে নিজে চিঠি দিই নি কেন? আর তোমার তার? সে তার ঠিকানা ভুল করে ঘুরে ঘুরে হাতে এল কাল। আমি কিন্তু তোমার খবর পেয়ে গেছলাম তার আগেই—কোন্ ডাক্তার মানুষ বাঁচিয়েছে তা শুনছিলাম—আর মনে মনে রাগ করছিলাম, দেখা হলে হয়। আর একটা আশাও মনে মনে ছিল। হয়ত কিছু না বলে একেবারে গিয়ে উপস্থিত হব। দু' মাস ধরে পথ চেয়ে ছিলাম এজন্যই। তুমি যদি কিছু না বলে কাজের ডাকে একেবারে কলকাতা থেকে পালাতে পার, আমিই বা কিছু না বলে কাজের নামে একেবারে সোনাপুরে গিয়ে উঠতে পারব না কেন? কিন্তু দেখলাম—তা হবে না। সেই কণ্ট্রোলের দোকানের সামনেই পাহারা দিতে হবে—কলকাতায়।

যাওয়া আর হল না—তোমাকে চমকে দেওয়া গেল না।

তুমি করছ কি, তার খবর পাই। কিন্তু তুমি কি নিজে খবর দেবার সময় করতে পার না। এটা বাহুল্য, না? ইতি—

সুধা

সেই সুধা গুপ্তা ! কোথাও তার একটু পরিবর্তন ঘটে নি। তেমনি স্বচ্ছ, স্পষ্ট, পরিহাস-প্রিয়। বিনয় যেন এ চিঠির ভেতর দিয়ে তার সেই বড় বড় চোখ জোড়াও দেখতে পাচ্ছে—বড় বড় দুটি চোখ, যাতে বিদ্যুৎ চমকে চমকে ওঠে, আর হাসি উছলে উছলে পড়ে—আর যাতে বিনয় দেখেছে এক আধ নিমেষে অসীম গহন আস্থা ও আহ্বান — দেখেছে কি বিনয় তা? কবে? সেই ডিসেম্বরের দিনে? সত্যই দেখেছে?

চিঠির অক্ষর কয়টি যেন বিনয়ের চোখের সামনে তার উজ্জ্বল সাক্ষ্য হয়ে উঠেছে। বিনয়ের কাছে যেন একেবারে পরিষ্কার হয়ে উঠেছে তার সত্য। আর সেই সূত্রে পরিষ্কার হয়ে উঠেছে তার চোখে সীতার আচরণের ক্রটী ও বিমূঢ়তা। সুধা যেন তরবারির মত স্পষ্ট—চতুরতা, কৌশল তার স্বভাববিরুদ্ধ। সীতার সেই সম্ভ্রমবোধ কোথায়?

বিনয়ের চোখ পড়ল সুধার চিঠির শেষ কথাটার দিকে, 'কিন্তু তুমি নিজে খবর দেবার সময় করতে পার না কি? এটা বাহুল্য, না?'

বিনয় সুধাকে যেন বুঝতে পারল—বুঝতে পারল তার নিজের সমস্ত অভিমান ক্ষোভ কত মিথ্যা আর কত তুচ্ছ।

সে চিঠি লিখতে বসল। কিন্তু কি লিখবে? লিখল :

সুধা,

আশা করেছিলাম দেখব মানুষটিকেই। এল প্রথম তার অগ্রদূত—রুশীয় কেতাব, তার পরে তার পত্রদূত। ভগ্নদূত বলা বোধ হয় ঠিক হবে না? কিন্তু আশা একটু ভঙ্গ হয়েছে বৈকি? কলকাতা আর সোনাপুর দূরের পথ—দিল্লী সে তুলনায় দূরই নয়—তোমরা হিল্লী-দিল্লী যাচ্ছ এ-বেলা ও-বেলা। 'বাহুল্য' হয়ে রইলাম আমরা তবু সোনাপুরের অধিবাসীরা। আমাদের 'কিউতে' তোমাদের চোখ পড়ল না। 'কিউ' অবশ্য এখানে তেমন নেই, কেরোসিনের ছাড়া। কারণ, কণ্ট্রোলের দোকানই নেই—কণ্ট্রোল আছে কাগজপত্রে, আর কার্যক্ষেত্রে চুরি। মানুষের নৌকা গেছে,

জাল গেছে, জমি গেছে, গাছ গেছে, গরুও যাচ্ছে, হাল যাচ্ছে। ফৌজের টাকায়ও পেটে ভাত জুটছে না—লাফিয়ে লাফিয়ে জিনিসের দর বাড়ছে—আর বাড়ছে অসুখ পীড়া মরণ। জেলা জুড়ে এই কাণ্ড—আজ চারমাস ধরে। তোমরা যখন ভাবছ দুর্দিন, এখানে তখনই দুর্ভিক্ষ—একটা-দুটো পথে নয়, দু'-দশটা গাঁয়ে নয়—আড়াই হাজার বর্গমাইল জুড়ে। তোমাদের কলকাতা যেন এখানে আড়াই হাজার বর্গমাইল জুড়ে ছড়িয়ে দিয়েছে তার দুর্দশার জাল। অবশ্য সেখানকার মত একটা জায়গায় মানুষ জড় হয় নি। তেমনি আবার এই জেলাজোড়া অভাবেও সরকারের দৃষ্টি কোনোখানেই পড়ে না। তোমাদেরও বুঝি তাই দৃষ্টি পড়ল না, আমরা 'বাহুল্য' হয়ে রইলাম।

আসা যেত না, না? না আসবার কারণ যথেষ্ট রয়েছে তা লিখেছ। মানিও। কিন্তু অকারণে আসবার মতো কারণ কি নেই? না, তা তুচ্ছ?

ইতি—

বিনয়

বিনয়ের বারে বারে মনে পড়ল সুধাকে।

কেমন যেন সীতার কথা, সীতার আচরণ আজ বিনয়ের কাছে আরও মনে হল মর্যাদাহীন, শুধু ধূর্তামি, সুবিধাবাদিতা। এমনি কথাবার্তা কি বলত সুধা? এমনি আচরণ দেখতে পেত তার কেউ? সেও কম চতুর নয়। কিন্তু বিনয় জানে—ফিকির-ফন্দি তার চরিত্রের বিরোধী। 'সাহসিকা,' 'অপরাজিতা' বলেছিল তাকে শিশির সেন—যে নাকি তাকে প্রথম ভালোবেসেছিল, আর যাকে সেও ভালোবেসেছিল প্রথম। সেখানে কপটতা নেই, ছলনা তার বল নয়। সুধা উগ্র হতে পারে, কিন্তু সে মর্যাদাময়ী। তাকে শ্রদ্ধা করতেই হবে। কিন্তু সীতা—সীতা কি বোঝে না তার এই ছলনা কত ছোট? তাতে বৈকুণ্ঠবাবুকেও ছলনা করা যায় না? হয়ত উপায় নেই সীতার—তাকে জীবিকা উপার্জন করতে হয়,

ভরণপোষণ করতে হয় অন্যকে। বোঝে বিনয় সীতার অবস্থাও, বোঝে। কিন্তু তাই বলে বুঝে কি তাকে সমর্থন করতে পারে ?

বিনয় দেখল সীতাই ওদের মেয়েদের সমিতির হল সেক্রেটারি। শৈলদি', চিনু, আমিনা, লীলা সবাই ওকে চায়—সত্যই সে সবচেয়ে কাজের। বিনয়ের মনে হল, এই আশাই বুঝি সীতারও মনে ছিল। তাই সে এতটা তৎপর হয়েছে কাজে, ছুটোছুটি করেছে, এখানে এসে পড়েছে। আর এতটা তাই চেষ্টা করেছে বৈকুণ্ঠবাবুকে খুশী করতে? বিনয়ের মনে আরও কুণ্ঠা জেগে উঠল। বৈকুণ্ঠবাবু অবশ্য মজিদ, প্রমথের সঙ্গে কথা বলছেন—তাঁকে ভাইস্‌চেয়ারম্যান্ করবার জন্যই ওরা যেন মুস্‌লীম্ লীগ্‌কে অনুরোধ করে; কংগ্রেসের কেউ যেন আবার ভাইস্-চেয়ারম্যান্ না হয়। কিন্তু তাই বলে তিনিই বা কতটা পারবেন সীতার এভাবে মজিদ প্রমথদের সঙ্গে জুটে মেয়ে-সমিতির সেক্রেটারী হওয়া সহ্য করতে ?

বৈকুণ্ঠবাবু বিনয়কে বললেন, লীলা এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করলে কাকে উচিত ওদের সেক্রেটারি করা ? আমি বললাম, 'কেন ? সীতাকে করো। অপর লোককে কেন করবে ?—এই তো খাদ্যসম্মেলনে ডাক্তারকে সেক্রেটারি না করে করব নাকি প্রমথকে ? কিংবা মহিমবাবুকে ?' না, ডাক্তার, ঠিক বলছি আমি। না, সে আমরা থাকবই না নইলে এসবে। বললাম লীলাকেও, 'মানুষের স্বাধীনতায় আমি হাত দিই ? তোকে বাধা দিই ? আর প্রমথ, শিবু, এরা কি আমার পর ? তোমরা যদি সীতাকে সেক্রেটারী করো—আমি বাধা দেখি না। তবে ও যেন যার-তার সঙ্গে ঘোরাফেরা না করে,—কি বলো ডাক্তার ? কথাটা ঠিক নয় ?

ঠিকই। আপনারও একটু দৃষ্টি রাখতে হবে। এখানকার লোককে সে কিই বা চেনে ?

বিনয়ের কাঁধেই কাজ চাপিয়ে দিলে খাদ্যসম্মেলন। বৈকুণ্ঠবাবু আর খাঁ বাহাদুর দুজনাই পীড়াপীড়ি করলেন—তাকেই হতে হবে খাদ্য-সমিতির

সেক্রেটারি। অন্য কারো উপর মুকুন্দবাবুরাও ভরসা রাখে না। কি করবে বিনয় ? তাকে নিতেই হল ভার। সে চায় না—পদপ্রার্থী সে নয়। কিন্তু কেউ শোনে না সে কথা। কাজেও সে লাগল—মানুষ মরছে যে—লাগল সে চা'লের জন্য, লঙ্গরখানার জন্য।

এসে গেল তার এত চেষ্টার ফল সেই হুকুম—সুর্যিপুর থেকে এখানকার লাইসেন্সওয়ালা ব্যবসায়ীরা চা'ল আনাতে পারে। নাখোদারাও রাজী হয়েছে চা'ল দেবে। জাহেদুদ্দীনকে এজন্য বিনয় তার করেছিল—কলকাতায় ইব্রাহিমভাইদের সঙ্গে কথা বলে সে বন্দোবস্ত যেন করে। জাহেদ এবার একজন পার্লিয়ামেণ্টেরি সেক্রেটারি হবে; তাই কলকাতায় গিয়ে বসে ছিল আগেই। তার কথার জোর আছে এখন ইব্রাহিমভাইরও কাছে। আর জাহেদ তাদের বুঝিয়েছে, এই ডামাডোলে নাখোদারা যদি এ জেলায় চা'ল পাঠায় তা হলে লোক তাদের পক্ষে দাঁড়াবে, লীগের আরও অসুবিধা হবে। দু'দিনের জন্য একবার নিজের গরজে ফিরে এসে জাহেদ বললে, 'আপনারা তো রাগ করেন, কত কথা বলেন—আমি ইব্রাহিমভাইদের দালালির লোভ সামলাতে পারি নি, ইত্যাদি। কিন্তু দেখলেন তো এখন। আমি বুঝেছিলাম আমাদের জেলাকে বাঁচাতে হলে ইব্রাহিমভাইদের হাতে রাখতে হবে। নইলে সব চা'ল মরিসন্ এণ্ড মরিসনের মারফৎ যেত সাগর-পারে, চটকলের সাহেবদের গুদামে, রেলওয়ে আর চা-বাগানের সাহেবদের হাতে।'

বিনয় মৃদু হাসল। সেই মীরবংশের জাহেদুদ্দীন, এমন ভাবে সে আপনাকে সমর্থন করবার যুক্তি খোঁজে। একটা পার্লিয়ামেণ্টেরি সেক্রেটারী হওয়াই তার চরম কথা। অবশ্য নাখোদারা তাদের চা'ল দিচ্ছে। এবার দিতই। কমিশনার গেছল কলকাতায় কনফারেন্সে—সেখানে সে জোর দাবি

করে—এসব ঘাটতি জেলার জন্য চা'ল চাই। বিনয় শুনেছে সে কথা। বাংলার একজন কমিশনার ছাড়া সবাই একবাক্যে বলে, 'তাদের এলাকায় চা'ল বাড়তি নেই—দুর্ভিক্ষ আসন্ন!' এই সাহেব-সুবাদের দাবি ইব্রাহিম-ভাইরা ঠেলে ফেলবে কি করে? লীগের মুরুব্বি-মহাজন সাহেবেরা, লীগের মন্ত্রিত্ব তো সাহেবদেরই মর্জিতে; ইব্রাহিমভাইরও মুনাফার পথ প্রশস্ত হবে তাতেই। তাই, চা'ল তারা দেবে সাহেবদের হুকুমেই—কিন্তু জাহেদুদ্দীন তার নিজের কথা বলবে।

তবু চা'ল আসবে। মালগাড়ি পেতে দেরি হবে কি? না, দু'-চার গাড়ি করে মাল রওনা হচ্ছে। গাড়ি পাওয়া যাবে। এইটাও সেই কমিশনারের কৃতিত্ব হয়ত।

চাল আসতে লাগল। এক সপ্তাহে বেগমপুরা, সোনাপুর প্রভৃতি ষ্টেশনে এত চা'ল এল যে তার আর কথা নেই। ষ্টেশন মাষ্টার, মালবাবু সবাই খুশী। প্রমথকে মালবাবু বললেন, 'এবার যত চা'ল এল অন্য বছরেও আমাদের ষ্টেশনে এত চা'ল আসে নি।'

বাজারে চা'ল বিক্রী হতে তবু দেরি হচ্ছে।

বিনয় বললে, মুকুন্দবাবু, দেরি করছেন কেন?

মুকুন্দবাবু বললেন, আমরা সবাই মিলে একটা দর ফেলছি—খরচপত্র ঠিক করে নিই।

খরচপত্র আবার কি? আপনারা তো সাড়ে বারো টাকা দরে কিনেছেন।

আপনারা ওই দেখছেন—কুলী-মজুর, গরুরগাড়ী ভাড়া, রেলওয়ের বাবুদের ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে সেলামি, সে সব দেখেন? পথে ঝড়তি-পড়তি আজ কাল মণ পিছু আড়াই সের, জানেন? বড় বড় পেটওয়ালা কর্তাদের 'কণ্ট্রোল', তার অর্থ বোঝেন?—এসব তো আর আপনারা ভাবছেন না?

হৃষিপুরের বারো টাকার চা'ল বিশ টাকায় বিক্রী হতে লাগ্‌ল! তারপর সেই তের টাকার কেনা চা'ল সোনাপুরে ও বেগমপুরের হাটে বাজারে বেরুল পঁচিশ টাকা! ক'দিন আগে বাজারে চা'লের দর উঠেছিল—পঁচিশ ছাড়িয়ে ত্রিশে। অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্নরা তাই সস্তা বলে এই চা'লও কিনে নিচ্ছিল।

বিনয় ক্ষেপে গেল। মুকুন্দ পাল, মোহনবাঁশী, ঢাকাপট্টি, শিলেটপট্টি সকলের কাছে গেল।

এ কি করছেন আপনারা?

কি ব্যাপার বলুন তো?

পঁচিশ টাকা দরে বিক্রী করছেন সেই তেরো টাকায় কেনা চা'ল?

আপনি কি বলেন, ডাক্তারবাবু? আমাদের চা'ল তো ষোল টাকা দরে কবে আমরা পাইকারদের দিয়ে দিয়েছি—চলে গেছে হাটে হাটে, কোথায়।

আপনারা বিক্রী করছেন, আমি শুনলাম।

সে তো এ চা'ল নয়। গৃহস্থদের থেকে কেনা নতুন চা'ল।

এ চা'লই। বলেছেন কে জানেন? মিথ্যা কথা তিনি প্রাণ গেলেও বল্‌বেন না।—প্রভাতবাবু।

মুকুন্দ পাল হেসে বল্‌লেন, মাষ্টার প্রভাতবাবু? না, ডাক্তার, —বড় সোজা মানুষ আপনারা, যে যা বলে বিশ্বাস করেন। আসুন, দেখবেন—আমাদের গুদামে চা'ল ক'মণ আছে। খালি সব। হৃষিপুরের চা'ল বিক্রী হয়ে গেছে কবে।

বিনয় নির্বাক হয়ে গেল। তার মনে আগুন জ্বলছে। সে পথে পথে ঘুরতে লাগল। বুঝল, সে পরাজিত হয়েছে, প্রতারিত হয়েছে। তারই দেশের লোক মুকুন্দপাল, মোহনবাঁশী, সুরেন্দ্র চৌধুরী। বরাবরের ব্যবসায়ী তারা। তাদের দানে ঠাকুরবাড়ি চলে, তাদের চা'লে রামকৃষ্ণদেবের

মহোৎসব হয়, তাদের গুরু-ব্রাহ্মণের ভক্তিতে হিন্দুসমাজ গৌরবান্বিত। তারা ইস্কুলে টাকা দেয়, বন্যায় চাঁদা দেয়, কংগ্রেসের খরচও জোগায়। তারাই আবার ইব্রাহিমভাইর এজেন্ট হয়ে চা'ল চালান দিয়েছে সেদিন,—বিনয় তাও বুঝতে পারে! তারা ব্যবসায়ী; ব্যবসায়ের দায়ে বোঝে নি সে কাজের দায়িত্ব কত। কিন্তু সুষিয়্যপুরের চাল নিয়ে তারা এমনভাবে প্রতারিত করবে খাদ্য সমিতিকে, দেশের লোককে?—লোভ এত বড় হয়েছে আজ? বিনয় তা ভাবতে পারে নি।

বিনয় ও প্রমথ তাড়াতাড়ি গেল মিষ্টার মিত্রের কাছে।

সেই সুষিয়্যপুরের চা'ল নিয়ে এত বড় ভয়ঙ্কর কাণ্ড করছে আপনাদের লাইসেন্স্ পাওয়া ব্যবসায়ীরা, একবার দেখুন।

সেই মিষ্টার মিত্র। এবার পাকা ডেপুটি আবার। ধীর নিয়মমাফিক কায়দায় বললেন, কি করেছে তারা বলুন তো?

বিনয় সব বললে।

মিষ্টার মিত্র বললেন, আশ্চর্য কথা! এখনি অনুসন্ধান করছি।

কিন্তু চা'ল শেষ হয়ে গেল যে।

মিষ্টার মিত্র হেসে বললেন, হবে না, এত সহজ কাণ্ড তা নয়।

কিন্তু এখনি ওদের গুদাম থেকে ওরা চা'ল সরিয়ে ফেলছে।

মিষ্টার মিত্র একটু গম্ভীর ভাবে বললেন, সরাবে কোথায়? আপনারা মিছিমিছি উত্তেজিত হন, ডক্টার মজুমদার।

বিনয় একটু ভেবে বললে, বেশ। একবার আজই কারো ওপর অনুসন্ধানের ভার দিন না।

প্রমথ বলতে যাচ্ছিল, মিষ্টার দাশগুপ্তকে এ ভার দিন না?

বিনয় তার কথায় সায় দিলে না।

বিনয় বিরক্ত। মিষ্টার মিত্রেরও ঠোঁটের কোণে ও চোখে হাসি খেলল সে নাম শুনে। বিনয় বুঝল প্রমথ দাশগুপ্তের সমস্ত কাণ্ড শোনে নি।

প্রভাতবাবু কিছু দিন আগে এসেছিলেন। বিনয়কে বলেন, আপনাকে কিন্তু অশেষ ধন্যবাদ। লীলার বাবা আমাকে ডাকছেন ওকে পড়াতে—যতদিন সে থাকে এখানে। ভালো কথা। তার চেয়েও ভালো কথা, সেই মিষ্টার দাশগুপ্তের সঙ্গে দেখা করেছিলাম। তাঁকে বললাম পরিষ্কার—এই আমার অবস্থা, এ-আর-পি'র সেই চাকরি আমার চাই। তিনি তখুনি কাজে লাগলেন। বলেন, 'ওই ডি-এস্-পি'র কাছে আমি যাব না। একেবারে বড় কর্তাদের কাছে চলুন, প্রভাতবাবু।' বেরিয়ে পড়লেন আমাকে নিয়ে এ-ডি-এম্ মিষ্টার ব্যানার্জির কাছে। আশ্চর্য লোক ওই মিষ্টার দাশগুপ্ত। নিজে নিয়ে গেলেন আমাকে। মিষ্টার ব্যানার্জিও কথা দিলেন। বেশ বুদ্ধিমান যুবক মিষ্টার ব্যানার্জি—সাহিত্যে ঝোঁক। বললেন, 'আমি যা পারি করব।' কথা রেখেছেন—আজ আমি চিঠি পেলাম। আগামী মাস থেকে আমি চাকরি পেলাম—পঁয়তাল্লিশ টাকা মাইনে—এ-আর-পিতে। দাশগুপ্তকে ধন্যবাদ দিয়ে এলাম—খুব খুশি হলেন। বেশ লোক।

বিনয় জানত, প্রভাতবাবুকে প্রমোদই জোগাড় করে দিয়েছিল লীলাকে পড়ানোর কাজ—প্রমোদও এক-আধটা ভালো কাজ করে। আজ এখন দাশগুপ্তও প্রভাতবাবুকে জোগাড় করে দিলে এ কাজ। সে ভাবছিল হয়ত প্রভাতবাবু এবার বাঁচবেন—একটা মানুষের বাঁচবার পথ হল। কিন্তু মাষ্টার তিনি থাকতে পারলেন না। মাষ্টাররা বাঁচবে না, ইস্কুলগুলো উঠে যাবে। বিনয় তবু খুশি হয়েছিল সে দিন দাশগুপ্তের সেই আচরণ শুনে। মানুষটা এখনো মানুষ রয়েছে—নানা ঘটনার আঘাতে শুধু ওর মন বেঁকে-চুরে গেছে, নইলে খাঁটি মানুষ।

ঠিক এমনি সময়ে আবার এসে গেল আরেক অপ্রত্যাশিত সংবাদ। পাহাড়খাড়ীর সেই শিবুদা'দের ব্যাপারে মিষ্টার দাশগুপ্ত এমন রিপোর্ট দিয়েছেন যে সবাই ছাড়া পাবে। প্রভাতবাবুকেই তিনি বলেছেন কথায়-

কথায়, 'খেতে পায় না মানুষ, লুঠ করেছে। বেশ করেছে। কে কি করেছে ঠিক নেই ; দেশশুদ্ধ ভদ্রলোক ব্যবসায়ী, মহাজন—ম্যায়, ওদিককার মাষ্টার আর উকীলরা পর্যন্ত একত্র হয়ে লোকগুলোকে চালান দিয়েছে। এ হয় ? ছেড়ে দিতেই হবে ওদের। হয় হোক লুঠ—মানুষ লুঠ করে খেয়ে বাঁচলে, ক্ষতি কি ? না লুঠ করে অনাহারে মরার থেকে কি তা খারাপ ? এখন এদের না ছেড়ে দিলে সমস্ত অঞ্চলটা একেবারে ভয়ে মরে থাকবে—আর মাথা তুলবে না।'

প্রমথও এ খবর পেয়ে খুশি হল। অবশ্য বললে, উদ্দেশ্যটা মোটেই সুবিধার নয়। তবে বারো আনা সরকারী কর্মচারীরই উদ্দেশ্য এই ;—ওরা মুনিবের হাতে মার খায়, আর ভাবে মুনিব বদল হলেই বাঁচি। তার চেয়ে ইনিই তবু ভালো, অন্তত 'অনেষ্ট'।

সেদিন বিনয়ই এ কথায় আপত্তি করতে গেল। বললে, 'না, প্রমথ, তা নয়। দাশগুপ্তকে তোমরা ঠিক জানো না। সে দেশের স্বাধীনতা চায়, বিপ্লব চায়।' কিন্তু বলতে গিয়ে বিনয় থেমে গেল। বলতে হলেই বিনয়কে বলতে হবে দাশগুপ্ত কি রকম মতবাদ চায়। তা হলে একটা বৈরিতা এখনি সৃষ্টি হয়ে যাবে দাশগুপ্তের বিরুদ্ধে। কিন্তু বিনয় দাশগুপ্তের দুর্ভাগ্যের জন্য আবার একটা বিশেষ মায়া অনুভব করছে—জীবনে সে তার পাওনা পায় নি ; তাই না সে এমন আঘাত করে সকলকেই ? না হলে সে একটা মানুষ হতে পারত। এই তো তার প্রমাণ এখনো বিনয় দেখছে—বজরংলালের চিনি সে বন্ধ করায়, জোচ্চোর এম-এল-এ মালেককে দিয়েছে ফৌজদারীতে, প্রভাত দত্তকে চাকরি পাইয়ে দিলে, আর শেষে পাহাড়খাড়ীর ব্যাপারটায় সবকে বাঁচিয়ে দিচ্ছে। বিনয় তাই নিজের কথা ঘুরিয়ে নিয়ে বললে, জানো প্রমথ, দাশগুপ্ত ছিলেন ভালো ছাত্র, কেমিষ্ট্রিতে ফার্ষ্ট ক্লাশ। সে ব্যর্থতাই ওকে এমনি পীড়া দেয় নানা ভাবে।

প্রমথ তা শুনলে, বুঝলে। আবার বললে, দেখুন না, প্রভাতবাবুকেও। এ সমাজে, এ দেশে মানুষ এমনি ব্যর্থ হচ্ছে আজ। দাশগুপ্ত বোঝেন না কেন এ ব্যর্থতা তাঁর একার নয়? এ ভাবেই বিনয়ের কথায় প্রমথের মনেও দাশগুপ্তের জন্য একটা শ্রদ্ধা জেগে থাক্‌বে।

কিন্তু ইতিমধ্যে চিনু ও সীতা এসে বিনয়ের মন থেকে দাশগুপ্তের এই চিত্রটুকু বিনষ্ট করে ফেলল।

সম্মেলনের পরে সেদিন সীতারা প্রথম গেছল দাশগুপ্তের বাড়ি। সীতা সেক্রেটারি হয়েছে, কাজ করবে না? তাই শহরের মেয়েদের বাড়ি বাড়ি যাচ্ছিল।

সীতা বললে, এক সঙ্গে আমরা পড়তাম এক কালে—কল্যাণী আর আমি। এই উপলক্ষে হল আবার দেখা। সেদিন সম্মেলনে এসে ও খুব খুশি হয়েছিল। মিঃ দাশগুপ্ত আবার সেদিন বাড়িতে নেই, মফঃস্বলে বেরিয়েছেন। বাসা খালি, একটু ভাবছিল কল্যাণী তাই, 'উনি হয়ত এসে যাবেন।' আমি বললাম, 'তাতে কি? একেবারে কেনা চাকর তো নোস।' রাত্রি দশটা হয়ে গেছল সেদিন আমাদের সভা ভাঙতে। তাতে আর কি? আমরা মেয়েদের দলে দলে যার-যার পাড়ায় পৌছে দিলাম। ওদের হাকিমপাড়ার লোকের অভাব নেই; ওঁরা অনেকেই ছিলেন। তবু প্রমোদবাবুর গাড়ীতে ওঁদের পৌছে দেয় লীলা। কল্যাণী সেদিন বলেছিল পরে চাঁদা দেবে। আজ দুপুরে গিয়ে দেখি কল্যাণী বড় বিমর্ষ। ভাবলাম, অসুখ-বিসুখ করেছে বুঝি। বললে, 'হাঁ ভাই, সেদিন ফিরে এসেই কেমন যেন অসুখ করলে—মাথা ধরেছে, গা ব্যথা।' 'ইনফ্লুয়েঞ্জা নয় তো?'—জিজ্ঞাসা করলাম। বললে, 'না, তা হবে না বোধ হয়।' বেশিক্ষণ গল্প করলাম না; দেখি, ওর গল্প করবার ইচ্ছা নেই। বললাম, 'আমি যাচ্ছি ভাই বেগমপুরা। তোমার চাঁদাটা?' কল্যাণী একটু আমতা-আমতা করে বললে, 'মাসের শেষ। তা তুমি যাও। আমি পাঠিয়ে দোব সামনের

মাসেই।' কেমন যেন ঠেকল ওর ভাব, তবু বিশেষ কিছু ভাবি নি। ঘুরে-ঘুরে যখন মিসেস্ ব্যানার্জির ওখানে পৌছুলাম, তখন কথায় কথায় সব বুঝলাম। মিসেস্ ব্যানার্জি—ডলি ছিল তার ভাল নাম। দিল্লী না রাজপুতনায় কোথায় ওর বাপ বড় কাজ করতেন, অনেক দিনের বড় মানুষ তাঁরা,—সে সব কথাও হল। কিন্তু ছাড়তে চায় না আর। বলে, 'বসুন, কথা বলবার লোক পাইনা এখানে।' বললাম, 'আপনার তো হাতে অনেক সময়, কিছু কাজ করুন না?'

কি কাজ, বলুন না?

কেন, দেখুন কত লোক আজ খেতে পায় না, মরছে। মেয়েদের অবস্থাও তো শুনলেন। তবু তো সব কথা বলতে পারি না সভায়—সে যে ভয়ঙ্কর।

মিসেস্ ব্যানার্জি বলেন, 'সে হবে না, মিস্ রায়। উনি বলেন, ওসব পলিটিক্স্। ওসবে মেয়েদের কি কাজ'? আমি তা নিয়ে রাগ করেছিলাম। উনি বলেন, 'এ-আই-ডব্ল্যুই-সি'র শাখা থাকত, কাজ করতে,—মেয়েদের শিক্ষা, অধিকার, এসব আলোচনা করতে। আপনারা ওই এ-আই-ডব্লুই-সি'র সঙ্গে সংযুক্ত করে নিন এই নারীসমিতিকে?' আমি অসুবিধা বুঝিয়ে বললাম। মিসেস্ ব্যানার্জি আরও মুস্ড়ে গেলেন, ক্রমে সব বলে ফেললেন। 'শুধু আমাদের ঘরেই 'মানার রাজত্ব' নয়, ওদের বড় চাকরেদেরও মানার রাজত্ব কম নয়।' ডলি ব্যানার্জি বললেন, 'ইচ্ছা তো করে কাজ করি। কাজের আমি কি বুঝি? আপনাদের সঙ্গে ঘুরি, গল্প করি, দেখি শুনি—এই ইচ্ছা করে বেশি। কিন্তু আমাদের ইচ্ছা থাকলেই বা কি? কারুর বাড়ি যেতে পারি না। উনি বলবেন, 'না।' রাগ করব, ঝগড়া হবে। উনি ওঁর কাগজপত্র নিয়ে তা ভুলে যাবেন। ফাইল দেখবেন, বেরুবেন বাইরের কাজ দেখতে—কে কি পেল, না পেল; মানুষের কষ্ট-দুঃখ 'কত কি ভাবে দূর করা যায়। তারপর কিছু কাজ

করে উনি বেশ খুশি মনে শিস দিতে দিতে এসে ড্রয়িংরুমে বসবেন। কাজ করছেন মানুষের জন্য, খুব খুশি ওঁর মন। আর আমি ততক্ষণ ঝগড়া করে একা বাড়িতে বসে মন গুম্‌রে রয়েছি। তা দেখে উনি হবেন আবার বিরক্ত, আর আমারও আরও হবে রাগ। দেখুন তো এভাবে বাঁচা যায়? তবু তো উনি কাজের মানুষ, বদমেজাজী নন, ঝগড়া করেন কম। জানেন না তো কাণ্ড এক-এক জনার। এই তো মিসেস্ দাশগুপ্ত। সেদিন দেরি করে রাত্রিতে ফিরলেন তো? ফিরে দেখলেন মিষ্টার দাশগুপ্ত মফঃস্বল থেকে এসে গেছেন। বাইরের ঘরে—আমরা সে রাত্রিতে তাঁকে দেখেছিলাম —কি গম্ভীর দাঁড়িয়ে আছেন বারান্দায়। শুনলাম মিসেস্ দাশগুপ্তকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘কোথায় গেছলে?’ কি গম্ভীর গলা! আমরা তো চলে আসি। পরে মিসেস্ মিত্রের কাছে শুনলাম—মিষ্টার দাশগুপ্তের নাকি কি রাগ! ‘ওসব কমিউনিষ্ট মেয়ের পাল্লা তুমি কেন গেলে?’ যা তা দাশগুপ্তের কথাবার্তা। শেষে নাকি গায় হাত তুলেছে!—ওরকম নাকি আরও তোলে,—মিসেস্ মিত্র বললেন! কল্যাণী দাশগুপ্ত দু’দিন ধরে আর মুখ দেখাতে পারেন না। এ শহরে কল্যাণীই ছিলেন আমার কথা বলবার মানুষ। ভাবুন তো তাঁর অবস্থাটা? কি সুখ? কি শান্তি? এর থেকে বিয়ে না হলে কি ক্ষতি হত? এখানে যেয়ো না, ওখানে যেয়ো না; এতে পলিটিক্‌স, ওতে প্রেষ্টিজ্ নষ্ট; এই তো আমার অবস্থা! বসে থাকো বাড়িতে একা। কেউ ‘কল্’ করলে বাঁচি, পরের বাড়ি যেতে নেই,—কেউ আসেও না, কথা বলবার নেই। ওঁরা কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত—তুমি গ্রামোফোন বাজাও, রেডিও শোনো, বই পড়ো, নিজে গান গাও—আবার ওঁরা এলে নতুন করে সেই পুরনো গান শোনাও,—পারে মানুষ এভাবে বাঁচতে?’

সীতা বললে, আমার আর মিসেস্ ব্যানার্জির কথাও ভালো করে কানে গেল না। ভাবলাম কল্যাণীর কথা। মুখে কেন ওর তখন কথা ফুটছিল

না তা বুঝলাম। আর ভাবলাম—আপনাদের ভালো স্কলার দাশগুপ্তের কথা। ইউনিভারসিটিতে যে কোনো জীব ফার্ষ্টক্লাশ হতে পারে—ফার্ষ্টক্লাশ 'বীষ্টের' প্রদর্শনী দিন আপনারা।

ঘৃণা সীতার চোখে মুখে। বিনয়ও গ্লানি বোধ করছিল। মানুষের পর্যায় থেকে নির্মল দাশগুপ্ত সত্যই এত নেমে যাবে তা যেন সে কল্পনাই করতে পারে নি। কত অমানুষ হয়ে পড়ছে সে, সে নিজেই তা জানে না। সত্যই কি এত অমানুষ-বানানোর মতই অমানুষী অবস্থা এ সমাজের? না, বিনয় তা মানবে না। মানুষও হতে পারে এখানে মানুষ—সে আহ্বানও তো সমাজে রয়েছে। এদেশের চারদিকেও তো আছে সে ডাক।···

প্রমথ এ খবর নিশ্চয় শোনে নি, তাই মিষ্টার দাশগুপ্তের নাম তুলেছিল।

মিষ্টার মিত্র মিষ্টার দাশগুপ্তের নাম শুনে হাসলেন। বললেন, তিনি বুঝি আপনাদের বন্ধু! কিন্তু আমাদের ইন্‌স্পেক্‌টারও তো রয়েছে, দরকার মত অনুসন্ধান আমরা করব।

কিন্তু ওরা সাংঘাতিক লোক।

কারা, ডক্টর মজুমদার?

এই আমাদের ব্যবসায়ীরা।

মিষ্টার মিত্র হেসে বললেন, তারাই যে আপনাদের ফুড্ কমিটির বড় মেম্বর। আপনাদের কথা মতই ব্যবসায়ীদের সমিতির সঙ্গে পরামর্শ করে আমরা লাইসেন্‌স্ দিয়েছি। বাজে ফড়ে ব্যবসায়ী একজনকেও আমরা এ চা'লের পারমিট্ দিই নি।

বিনয় আবার বিমূঢ় হয়ে গেল। সত্যই তো, এই ব্যবসায়ীরাই বিনয়দের ফুড্ কমিটির মেম্বর—তাদের তাগিদেই সে মিষ্টার ব্যানার্জিকে দিয়ে অত জোর করে বাইরের চা'ল আনায়। কেমন চালে আজ তারা তার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে দিলে! তেরো টাকায় কেনা তাদের চা'ল সুখিপুর থেকে,—হয়ত তাও আবার নাখোদারা এই এখানকার চর ও হাটবাজার

থেকেই কিনে নিয়েছে দু-চার মাস আগে সাত-আট টাকায়—আজ এবাজারেই সে চা'ল বিকোচ্ছে পঁচিশ টাকায়। আর এদিকে মুকুন্দ পাল বলেন, 'এ সে চা'ল নয়, আপনি বিশ্বাস করুন।'

একবার শেষ চেষ্টা করে বিনয় মিষ্টার মিত্রকে বললে, অন্তত যাতে কণ্ট্রোল দরে এ চা'ল বিক্রী হয়, আপনি তার ব্যবস্থা করুন।

মিষ্টার মিত্র বললেন, দেখুন, আমরা বিবেচনা করে দেখেছি—এই কণ্ট্রোল দর নিয়ে এখানে জোর-জবরদস্তি করা চলবে না। আমাদের হাতে চা'ল বেশি নেই। এখন কিছু কিছু চা'ল বাজারে বেরুচ্ছে—জোর করলে তা আর পাওয়া যাবে না—আবার ত্রিশ টাকা হবে দর।

তা হলে কণ্ট্রোল তুলে দিচ্ছেন?

দরকার কি? ও সম্বন্ধে গবর্মেণ্ট মত বদলান নি তো।

তাকে কার্যকরী করছেন না যে গবর্মেণ্ট।

—যতটা এ অবস্থায় সম্ভব, করা হচ্ছে। এ নিয়ে নালিশ করে লাভ নেই। আপনারা নিজেরাই ব্যবসায়ী ঠিক করেছেন; তারা কেন কণ্ট্রোল মানে না? আপনারা নিজেরা যদি কণ্ট্রোলের থেকে বেশি দর না দেন —তা হলে তারাই বা বেশি আদায় করে কি করে? নিজেদের গলদ গবর্মেণ্টের উপর চালানো আমাদের জাতের অভ্যাস হয়ে গেছে।

'জাত' শুনেই বিনয় প্রায় ক্ষেপে যাচ্ছিল—নিজেকে তবু সামলাল। সেই মিষ্টার মিত্তির এখনো সেই 'গোলাম-বড় দেশের' গোলামই। অদ্ভুত এরা! বিকৃত আমলাতন্ত্র ওদের আরও বিকৃত করছে। কি মিষ্টার মিত্তির, কি দাশগুপ্ত—ওরা মানুষ থাকে না।

কিন্তু শুধু আমলাতন্ত্রকেই কি সমস্ত বিকৃতির জন্ম বিনয় দায়ী করতে পারে?

জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেটের ওখানে ডাক পড়ল আবার বিনয়দের। কমিশনার আবার কি তাগিদ পাঠিয়েছেন, নিজে আসছেন।

বিনয় তাঁকে বললে, অন্তত যে সব জায়গায় মানুষ মরছে সেখানে রিলিফ্ দাও, দুর্ভিক্ষ হলে যেমন হয় তা করো।

'দুর্ভিক্ষ' তো হয় নি। হলে দুর্ভিক্ষের রিলিফ দিতে হবে গবর্মেণ্টের।

দুর্ভিক্ষ হয় নি? মানুষ মরছে তবু দুর্ভিক্ষ হয় নি?

রিলিফ্ দিতে দিতে শেষ হবে সবাই—প্রমথ বললে।

সাহেব বললেন, মানুষ না খেয়ে আছে, মরছে, এ খবর কি করে ঠিক হয়? না খেয়ে মানুষ থাকে কি করে?

থাকে না? মেহেরপুরে কি হয়েছিল? অখাদ্য খায়, মরে,—বিনয় বললে।

প্রমথ বললে, ত্রিশ টাকা মণে মানুষ চা'ল কিনতে পারে, এ তুমি মনে করো?

সাহেব উত্তর দিলেন, কিনে কে? গবর্মেণ্টই কিনে তার কর্মচারীকে রেশন দেওয়ার জন্য। গৃহস্থ কৃষক তো নিজেদের ঘরেই খাবার মজুদ রেখেছে। এ জেলা অবশ্য ঘাট্‌তি জেলা, আমরা তা বুঝেছি; আর গৃহস্থও অন্য বারের থেকে কম খাবার রেখেছে। তবু ঠিক মত বিলি হলে সকলের কষ্টে সৃষ্টে চলে যাবে।

মানলাম নয় তাই। বিলিরই বা তবে সে ব্যবস্থা কই? তাহলে রেশনিং করো—প্রমথ তৎক্ষণাৎ জোর দিয়ে বললে।

রেশনিং এ দেশে!—সাহেব হেসে মাথা নাড়লেন—ও একটা কথাই নয়—কোটি কোটি লোক দেশে, কোনো সংগঠন নেই—কিছু নেই।

তা হলে কি করবে? কণ্ট্রোল করবে না, রেশনিং করবে না—

সাহেব বললেন, যা দরকার করবই, এ তোমরা জানবে। এই আস্থা গবর্মেণ্টের উপর রাখবে।

কি করে রাখবে তারা—হাকিমহাকায়, সর্ষেখালিতে, সল্লাখালিতে, যেখানে মানুষ দেখছে না খেয়ে চোখের উপর মানুষকে মরতে ?

সাহেব গম্ভীর হয়ে বললেন, যদি সত্য হয় এ কথা, তা হলে তার প্রতিবিধান করব।

'যদি সত্য হয়'—আমলাতন্ত্রের ধারাই এই। সাধ্য কি, নিজে কিছু করে ? সততা কোথায়, অন্যকে কিছু করতে দেবে ?

তবু পরদিন বিনয়ের আবার ডাক পড়ল। সাহেব আজ চলে যাবেন। বললেন, আমরা ঠিক করেছি—আপাতত এখানে গরীবদের চা'ল দেওয়া হবে—যাদের আয় বিশ টাকার কম। তোমরা ভার নিতে পারবে ?

অপ্রত্যাশিত দায়িত্ব এল বিনয়দের উপরে।

ঠিক হল, দু'সপ্তাহের মত এ ভাবে সরকার পরীক্ষা করবে, দেখবে সত্যই সাধারণের খাদ্যসমিতি দিয়ে কাজ চলে কি না।

কাজ হাতে পেল বিনয়। কিন্তু বিনয় কাজে এগিয়ে দেখল কাজ তত সহজ নয়। সরকারের নিয়ম, যাদের চাষের জমি আছে তারা পাবে না এ চা'ল, বিশ টাকার উপরে যাদের আয়, তারাও পাবে না। এ সব নিয়মের আক্ষরিক অর্থ করলে মানে হয় না। বিশ টাকার ওপরেই আয়, অথচ পরিবারে হয়ত তার বিধবা ভাইর বউ আছে, মাসী-পিসি আছে ; তার উপায় হবে কি ? বিনয় বলে, দিতেই হবে এদেরও। ম্যাজিস্ট্রেট বলে, 'ফ্যামিলি' মানে এ সব নয়। বিনয় বোঝাতে পারেনা—এ দেশ বিলাত নয়। এ দেশে পরিবারের মধ্যে পরিজন গণ্য হবেই। দু'শ বছর এদেশ শাসন করেও যারা এ কথা বুঝলে না, তারা এখন বুঝবে কেন এ কথা ? তবু বিনয় ফাঁক খুঁজে বের ক'রে এ সব দুরবস্থাগ্রস্ত লোকদের চা'লের কার্ড দিলে।

কিন্তু চমকিত হল বিনয় অন্য দিককার অকল্পিত বিরোধিতায় !

বিনয় যে মুস্লীম লীগের কাজীর সঙ্গে জুটে খুব টাকা মারছে এবিষয়ে মহিমবাবু, মহেশবাবুর সন্দেহ নেই। মুকুন্দ পাল, সুরেন্দ্র চৌধুরী পূর্বেই বিরুদ্ধ হয়ে উঠেছিল—তারা এই খাদ্যসমিতিতে আসা ছেড়েই দিয়েছিল। এখন বললে, আমরা ব্যবসা করি, মুনফা করি—সে তো নতুন কথা নয়, অন্যায়ও নয়। কিন্তু আপনারা ভদ্রলোকেরা বড় বড় কথা বলেন, দেশ উদ্ধার করেন। আপনাদের সে সব কি তার অর্থ বুঝলাম।

'আসলে, কাজ না পড়লে মানুষ চেনা যায় না'—সবাই মানল।

সুরেন্দ্র চৌধুরী বেগমপুরা থেকে বৈকুণ্ঠবাবুকে নানা কথা বলছিলেন। কিন্তু বিনয়ের বিরুদ্ধে বৈকুণ্ঠবাবু তবু লাগতে চান না। সুরেন্দ্রবাবু তাই মহিম রায় আর মহেশবাবুকে নিয়ে শহরের উকীলদের মধ্যে একটা প্রতিবাদের ব্যবস্থা করলেন—মুসলমানদের চা'ল দেওয়া হচ্ছে বেশি, হিন্দুদের দেওয়া হচ্ছে না।

সিবিল সাপ্লাই'র মিষ্টার মিত্র জানালেন, ডাক্তার মজুমদার, এসব ভালো হচ্ছে না। পার্টির জন্য আপনারা এভাবে চা'ল রেখে দেন, এ নিয়ে নানা কথা হচ্ছে।

পার্টি কোথায় ?

মিষ্টার মিত্র বললেন, ওই তো মজিদের নামে কার্ড বিলি করেছেন, চা'লও দিচ্ছেন। অথচ মজিদ তো শহরেই নেই—তার চা'ল নিচ্ছে কে ?

বিনয় বিব্রত হয়ে মিথ্যার আশ্রয় নিলে—সে নেই কিন্তু তার দাদা আছেন, ভাই-পো আছেন।

তারা তার পরিবার নয়—বলে হাসলেন মিষ্টার মিত্র।

মিষ্টার মিত্র পরামর্শ দিলেন, আপনার নিজের নামে নিতেন অত কথা হত না। বুঝছেন না ? আজ মুসলমান মজিদের নামে নিয়েছেন, এতে কথা হবেই। এমনিতেই তো আপনারা যে কার্ড বিলি করেছেন তাতে বারো আনাই মুসলমানরা পেয়েছে।

এ জিলায় বারো আনাই মুসলমান যে।

এ শহরে তারা ছ' আনাও নয়।

কিন্তু গরীবের মধ্যে তারাই বারো আনা—বেশিও বা।

যাক্,—মিষ্টার মিত্র কথা শেষ করলেন বাঁকা হেসে,—আজ লীগের মন্ত্রিত্ব, এ কৌশলে আপনাদের সুবিধাই হবে। কিন্তু কাজটা নিয়ে শহরে কথা হচ্ছে তা জানবেন।

সত্যই নানা কথা বাড়তে লাগল। বৈকুণ্ঠবাবুও রীতিমত অসুবিধায় পড়লেন।

'এ কিন্তু ডাক্তার, ঠিক হচ্ছে না তোমাদের। হিন্দুরা মুখ ফুটে কথা বলতে পায় না, কষ্টে মরছে; তোমরা দেখছও না।

কই বলুন না, কার কথা বলছেন?

বৈকুণ্ঠবাবু নাম করলেন। সবাই তারা মধ্যবিত্ত। শহরে নানা কাজকর্ম করে। কষ্ট তাদের অনেকেরই হচ্ছিল। কিন্তু যে নিয়মকানুন তাতে তাদের বিনয় চা'ল দেবে কি করে? বৈকুণ্ঠবাবু বললেন, নিয়ম দিয়ে হবে কি? নিয়ম আজ কোথায় চলেছে? লীগের রাজত্ব, জাহেদুদ্দীন বলে বেড়াচ্চে—এসব তারই জন্য হচ্ছে। সে-ই মন্ত্রীদের দিয়ে হাকিমহাকায়, মেহেরপুরে ফ্যান-ভাত দেওয়াচ্চে, শহরে সস্তায় চা'ল দেওয়াচ্ছে। দেখতে হবে—মুসলমান ছাড়া হিন্দুরা যেন না পায়।

বিনয় বললে, ওসব বাজে কথা, শোনেন কেন?

সত্যই, এই আর এক মুশ্‌কিল। মন্ত্রীদের কাজ নিয়ে তুমুল তর্ক হচ্ছে। দিনের পর দিন তার বিষ সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় ছড়িয়ে পড়ছে। মন্ত্রীরাও তেমনি! মন্ত্রীরা প্রথমেই বলে দিলে, 'চা'লের আসলে অভাব নেই। দেশের লোকেরও ভয়ের কোন কারণ নেই। চা'ল আছে, অন্য খাদ্যও যথেষ্ট আছে।' মন্ত্রীরা জানালেন, তাঁরা দর বেঁধে দেবেন। দিন পাঁচ পরে খাদ্যবিভাগের ভারতীয় কর্তা মেজর জেনারেল উড্‌ বললেন, 'খাদ্যের অভাব

নেই।' প্রায় তখনি সুরাহবর্দী বললেন, এবার তিনি ভারতসরকার থেকে আরও ধান ও চা'ল আনাচ্ছেন; চোদ্দ লক্ষ মণ চা'ল আসছে, ষোল লক্ষ মণ অন্য খাদ্যশস্যও তাঁরা পাবেন। ওদিক থেকে স্যর আজিজুল হক বললেন, এই শুধু নয়, এরও চারগুণ খাদ্যশস্য তিনি তাঁর বাংলাদেশকে পাঠাবেন—মোট সাড়ে পাঁচ লক্ষ টন। তা ছাড়া, পূর্বপ্রদেশগুলোর মধ্যে অবাধ বাণিজ্য চলবে; উড়িষ্যা, আসাম, বিহার থেকে চা'ল আসবে, বাংলা দেশ বাঁচবে।

এই সংবাদে ব্যবসায়ীদের মহলেও উত্তেজনা দেখা গেল—ব্যবসায়ের আরও বড় সুযোগ দেখা দিচ্ছে। এখনি লোক পাঠানো চাই শিলেটে, উড়িষ্যায়, বিহারে। একদিকে জাহেদুদ্দীন বলে বেড়ালেন, লীগ্ মন্ত্রীসভা থাকাতেই এসব পাওয়া গেল। হক সাহেবের সাধ্য ছিল বাংলাকে খাওয়ায়? ঘুষের কারবারে তারা লাল হয়েছে—কেউ তাদের বিশ্বাস করত না।

এদিকে সুরেশ দত্ত বললেন, লীগ্ তো আমলাতন্ত্রের কেনা গোলাম। এতদিন ভারত সরকার এক মণ ধান দিতে রাজী হয় নি; এখন অমনি সাড়ে পাঁচ লক্ষ মণ দিতে এগিয়ে আসছে। আর ঘুষ? হক্ মন্ত্রী আর ঠক মন্ত্রী, কে কাকে দেখে? ইব্রাহিমভাইরা দেশ লুঠ করছে। ধান চা'ল তারা যুদ্ধে চালান দিচ্ছে—এখনো চা'ল রপ্তানি হচ্ছে। একদিকে খাদ্য সৈন্য-বিভাগ কিনছে, আর দিকে সিবিল সাপ্লাই কিনছে,—আবার কলওয়ালারাও কিনছে। এদের এজেণ্ট হাটে এসে হাঁকে সতের টাকা মণ, ওদের এজেণ্ট অমনি হাঁকে আঠার। আবার দু' এজেণ্টই হয়ত একই ইব্রাহিমভাইর লোক—কেউ কাউকে জানে না, জানলেও যায় আসে না। চা'ল হাত করতে পারলেই তাদের টাকা। লীগ্ মন্ত্রীরা এসব চাপা দিয়ে এমেরির সুরে বলছে, দেশে ধান-চাল মজুদ আছে, কোনো ভয় নেই।

বিনয় বুঝছে, এ সব কোনো কথাই হয়ত একেবারে সত্য নয়, কিন্তু কোনো কথাই একেবারে মিথ্যা নয়। কিন্তু সব চেয়ে বড় কথা যা তা

দেশের লোক বিস্মৃতই হচ্ছে কেন?—মানুষ মরছে। আজ এ নিয়ে ঝগড়া করলে মানুষ মরবেই, তাদের বাঁচানো যাবে না। সে সকলকে বলে, 'সবাই মিলে আসুন তা হলে—রপ্তানী থামান, বিশৃঙ্খল কেনাবেচার আড়াআড়ি থামান, বাঁধাদরে চা'ল আদায় করুন, রেশনিং করতে বাধ্য করুন।' কিন্তু কে শুনবে তার সে কথা?

বিনয়ও তাই দৃক্‌পাত করলে না। কেন করবে? গরীবেরা এ সব কথা বলে না। শহরের বস্তীতে বস্তীতে সে দেখেছে গরীব মজুর আর ভদ্রলোকেরা তাকে আশীর্বাদ করে। তারা বরাদ্দ মত চাল পেয়েছে, এ কি কম ভাগ্য!

দু'সপ্তাহ শেষ হতেই বিনয় চমকিত হল। এ ব্যবস্থা চল্‌ল না, এই সরকারের মত!

মিষ্টার মিত্র বদলি হয়ে চলে গিয়েছেন। মিষ্টার ব্যানার্জি চলে যাচ্ছেন সেক্রেটেরিয়টে। এখানে মিষ্টার মিত্রের জায়গায় একজন মুসলমান কর্মচারী আসছেন—মিষ্টার সামেদ। এখানকার লীগ্‌ জানিয়েছে, মুসলমান অফিসার না হলে সে মুসলমানদের আস্থাভাজন হতে পারে না।—বিনয়কে তা বলে মিষ্টার ব্যানার্জি হাসলেন—আর আমাকেও দাশগুপ্তকেও যেতে হবে—লীগের এম্‌-এল্‌-এ মালেকের মামলাটা নইলে তুলে নেওয়া যায় না। তবে অত সহজ হবে না তা তুলে নেওয়া—তাও বলছি, ডক্‌টর মজুমদার।

নতুন এ, ডি, এম্‌, জেম্‌স্‌ সাফ কথা বললে, আমরা স্পেশ্যাল ষ্টাফ্‌ এজন্য নিযুক্ত করছি। নানা অভিযোগ হচ্ছিল তোমাদের চা'ল বিলির বিরুদ্ধে।

বিনয় চমকিত হল। বল্‌লে, তার মানে তোমরা জনসাধারণের সহকারিতা চাও না।

কে বলে? সহকারিতা করো না তোমরা। আমরা সাদরে নিচ্ছি।

কিন্তু সহকারিতা অর্থ মনে করো না এডমিনিষ্ট্রেশান ছেড়ে দিতে হবে তোমাদের হাতে—তোমরা দু'দশ জন যারা আছ।

বিনয় তাড়াতাড়ি খবর দিলে খাদ্য-সমিতির সবাইকে।

জাহেদ বললে, ভাবছেন কেন? মিষ্টার সামেদ তো আমাদেরই লোক—হাতে আছেনই। ওরা নতুন ষ্টাফ নিযুক্ত করলেই বা কি? বরং তার মধ্যে আপনারা অখিল, অধীরবাবু, তিনু চক্রবর্তী এদের ঢুকিয়ে দিন। আমি দিচ্ছি হাবিব, বসির, আবদুল ওদের ঢুকিয়ে।

বিনয় বুঝলে জাহেদের কাছে আজ চাকরির হিসাবই বড় হিসাব। সে বুঝবে না, বুঝতে চায় না—ষ্টাফ হলেই যে লোকে খেতে পাবে তা নয়। এইতো একশ'র ওপর লঙ্গরখানা জেলায় খোলা হয়েছে; প্রায়গুলোই দেওয়া হয়েছে প্রেসিডেণ্ট পঞ্চায়েৎদের হাতে। তাতে লোক খেতে পায় না, পেলেও পায় খিচুড়ির নামে অখাদ্য। খাদ্য যা তা প্রেসিডেণ্টের আত্মীয়রা চোরাবাজারে বিক্রী করে। বিনয় সল্লাখালি সর্ষেখালি থেকে এ খবর পেয়েছে। শিবুদা'ও লিখছেন। বেগমপুরা থেকে সীতাও লিখছে, সেখানকার গঞ্জেও ফিরছে সমস্ত কাঙালী—মরছেও মানুষ। শহরের অবস্থাও কি চোখে দেখ্‌ছে না জাহেদ? আমলাতন্ত্র দেখে না। তার চোখ নেই; কিন্তু চোখ নেই কি দেশের মানুষেরও?

গ্রাম ছেড়ে প্রতিদিন মানুষ শহরে এসে যাচ্ছে। কাঙালের ভিড় বাড়ছে, বাজারে আরও বেশি বেশি কঙ্কালসার সব দেহ ঘুরে বেড়াচ্ছে। পথের পার্শ্বে, গাছের তলায়, বাড়ির বারান্দায়—যেখানে যে পারছে এবার বসে পড়ছে, শুয়ে পড়ছে তারা। কারুর একটা পুঁটুলি সম্বল, কারুর তাও নেই। সবারই হাতে একটু কিছু—ভাঙা থালা, টিনের, এনামেলের, এলুমিনিয়মের থালা বা বাটী, কিংবা টিনের একটা কৌটা হয়ত। তারা জানে না কোথায় যাবে। সমর্থ পুরুষেরা গ্রাম ছেড়ে গেছল আগে—কেউ শহরে, কেউ লেবর কোরে। পরে গেল কেউ কলকাতায়, কেউ বা আসামে।

খোঁজ নেই, কারুর খোঁজ নেই আর। বুকে ছোট-বড় শিশু নিয়ে অনাথা রমণীরা ঘুরছে—ঘুরছে বালক, আর ঘুরছে বৃদ্ধ; 'ভাত, ভাত, ভাত।' দুয়ারের পার্শ্বে বসে পড়েছে এক প্রৌঢ়া—দেখতে সে বৃদ্ধাই। অদূরে এক নগ্ন বালক। ক্ষীরোদ ছুটে এসে বলছে, বাবু, বেটী বুঝি মরে। বিনয় বেরিয়ে গেল। দুধ আনাল, খাওয়াল। জিজ্ঞাসা করলে;

কোথা থেকে এসেছ তুমি? বাড়ি কোথা?

সোনাকান্দি।

সোনাকান্দি?

জী।

বাড়ি ছেড়ে এলে কেন?

উপরে হাত তুলে রমণী বললে, আল্লায় আনল।

বাড়িতে কে আছে?

চোখ ছাপিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। 'ছেলে ছিল, সে পালিয়েছে আসামে।' বউ-টউ কেউ ছিল না? 'ছিল—ফেলে পালাল।' তারপর? 'বউ ছোট মেয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল—ফৌজের ছাউনির দিকে—তারপরে আর কোথায়?'—অস্ফুট ওষ্ঠাধর বললে ধীরে ধীরে প্রশ্নের উত্তরে। 'আমি নাতি নিয়ে মরতে রইলাম।' তাকে কে ভিক্ষা দেবে, পয়সা দেবে? তার বয়স নেই, কাজ করতে পারে না। রূপও নেই—সে খায় কি? খাওয়াবে কি তার চেরুকে? তাই শেষে গ্রামের লোকের সঙ্গে এসেছে শহরে।

সোনাকান্দি যাবে?—সুস্থ হলে বিনয় জিজ্ঞাসা করলে।

না, না, না। মরে যাব—মরে যাবে চেরু—কিছু নেই, কিছু নেই। পোড়া দেশ, পুড়ে গেছে সব, পুড়ে গেছে—

সেই সোনাকান্দি—বিনয়ের সোনাকান্দি—যারা ক্ষেতে সোনার ফসল দোলা খেত, নদীতে জল রূপার মত ঝিকমিকিয়ে উঠত!

বিনয় অস্থির হয়ে উঠল—কি করবে সে ?

কিন্তু আরও আসছে ওরা, কোথা থেকে আস্‌ছে ঠিক নেই। সন্নাখালি, সর্ষেখালি—দুরের পথ, সেখান থেকেও আসছে তবু। আসছে নিকটের গ্রাম থেকে, চর থেকে, উজান থেকে, ভাটি থেকে, পূব থেকে, পশ্চিম থেকে। আর সেই একটানা ক্রন্দন উঠছে—'ভাত, ভাত, ভাত।'

১২

বৈকুণ্ঠবাবু বললেন, চলো, ডাক্তার বেগমপুরা। তোমাকে নিয়ে একটু কাজ করে আসি। একবার ইস্কুলটাও দেখে আসবে।

বেগমপুরার বাজারে কাঙালীর ভিড় বাড়ছে। সীতা বারবার লিখেছে যেতে; বিনয় যেতে পারে নি। আসল কথা, এই মাসে দেড়েক ধরে সে ইচ্ছা করেই সীতার সঙ্গে একটু দেখা-সাক্ষাৎ কমিয়ে দিয়েছে। বিনয়ের মনে কেমন সঙ্কোচ জাগিয়ে তুলেছে সেবার সোনাপুরে সীতার আচরণ। তারপর এ একটা মাসে বিনয় কাজে ব্যস্ত ছিল। বেগমপুরা আর যায় নি। এখন যাওয়া তার উচিত—অত যখন ওখানেও ভয়ঙ্কর অবস্থা। আর সীতার খবর নেওয়াও বিনয়ের উচিত। সীতা তো অন্যায় কিছু করে নি। যা তার স্বভাব তা'ই প্রকাশ পেয়েছে! বিনয়ের সঙ্গে তার আচরণে কৌশলের লক্ষণ কিছু ছিল না তো।

বৈকুণ্ঠবাবুর সঙ্গে বিনয় সোনাপুর চলল।

পথে বৈকুণ্ঠবাবু বললেন, ডাক্তার, মজিদের কাণ্ডটা দেখলে ?

বিনয় বুঝলে না। বললে, কি?

সেই জেলাবোর্ডে মুসলিম লীগ্ আমাকে ভাইস্ চেয়ারম্যান হতে দিলে না।

কে হল তবে?

তুমি জানো না? কেদার ভৌমিক। তোমার সঙ্গে ওরা পরামর্শও করে নি?

আমার সঙ্গে পরামর্শ করবে কেন?

বৈকুণ্ঠবাবু যেন একটু ভাবলেন। বললেন, লীলাও বলেছিল, 'ডক্টর মজুমদার তো কমিউনিষ্ট নন, তিনি এসব জানেনও না।' কিন্তু ইদ্রিস কণ্ট্রাক্টার বলছিল তোমার মারফতেই নাকি মজিদ তাকে পরামর্শ দিয়েছিল—জেলাবোর্ডে নমিনেটড মেম্বর হতে। আমি বিশ্বাস করি নি। ইদ্রিস কণ্ট্রাক্টার—সেও হয় জেলাবোর্ডের মেম্বর! মজিদের শ্বশুর—তাই কমিউনিষ্টদের শ্বশুর। বুঝলে মানুষ নয় এরা—এই কমিউনিষ্টগুলো। বিনয়ের মনে পড়ল, ইদ্রিস কণ্ট্রাক্টার মাস দুই পূর্বে একদিন বিনয়ের সঙ্গে গাড়ী থামিয়ে দেখা করতে আসে। বলে, আপনি দোস্ত মানুষ, তবু দেখা করতে পারি না। কিন্তু বড় কাজ পড়ে গেছে। আপনারাই হলেন আসল ওস্তাদ।

বিনয় বুঝলে কণ্ট্রাক্টারের ভূমিকা এখনো শেষ হয় নি। ভাষাও তাঁর হবে—হয় শুদ্ধ, নয় উর্দু ঘেঁষা। কণ্ট্রাক্টার বলে চলল। পরে একটু একটু করে বিনয় বুঝলে এবার তার নালিশ আমিনার বিষয়ে। প্রথম দফায় নালিশ হল—ভুল ফারসী শব্দ মিশিয়ে—ইস্‌লামের শরিয়তে কি আছে? যে আওরাৎ বেপর্দা হয়ে যায় সে তো অমনি তালাক হবার কথা। একথা অবশ্য মজিদ বোঝে না। কিন্তু বিনয় জ্ঞানী লোক, অতএব—এবার কণ্ট্রাক্টার বিশুদ্ধ বাংলায় কথা বললে—ডাক্তার সাহেব নিশ্চয় বুঝতে পারেন, স্ত্রীলোকের লজ্জাই ভূষণ। তারই আমিনাকে একটু বোঝানো উচিত।

আমিনা বাড়ি বসে যা করে তাই করুক। আছে শহরের বাড়িতে সে, থাক। কিন্তু পথে বের হওয়া, গ্রামে যাওয়া—এসব কণ্ট্রাক্‌টার সাহেব সহ্য করবে না তা বলে।

বিনয় ভালো বুঝল না, কি ব্যাপার। এত শীঘ্র ইদ্রিস কণ্ট্রাক্‌টারের কথা ফুরোয় না। ইদ্রিস একটু একটু করে বললে, আপনি দোস্ত মানুষ। তাই জানাতে চাই। আমার বিবিসাহেবার বড় ছেলের সাধ। ওর কি অসুখ—

বিনয় বুঝলে। বললে, উনি খানদানী ঘরের মেয়ে। ওকে লেডি ডাক্তার দেখাতে হবে। আমার তো দেখা সম্ভব নয়।

সে তো ঠিক বাৎ। আমি লেডি ডাক্তার দেখিয়েছি। ওরা কিছু জানে না। আপনাকে দেখতে হবে না। শুনবেন সেই লেডি ডাক্তারের সব কথা, পরামর্শ দেবেন। সে মতে চিকিৎসা হবে।

আমি ডাক্তারি করতে চাই না। আর মেয়েদের কোন ডাক্তারিই করি নি। আপনি এক কাজ করবেন, ওঁকে নিয়ে চাটগাঁ বা কলকাতা যান— দেরী করবেন না।

আপনি দেখবেন একবার। যা ভিজিট হয় আমি দোব।

সে কথা নয়। আপনি দোস্ত মানুষ, তাই বলছি। নইলে টাকা পেতাম, যা তা বলে দিতাম। কিন্তু আমি এসব জানিই না।

কণ্ট্রাক্‌টার সাহেব তবু বসে রইল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, সব খোদার মর্জি। এই তো এত মেহনত করছি, দেখছেন। কিন্তু কার জন্য? একটা ছেলে নেই। লেড়কী ছিল—সেই আমিনা। সে যদি বুঝত আমার দুঃখ ছিল কি? কিছুতেই তাকে ভালো করতে পারলাম না। কোনো কথা শুনলে না। আপনারা এত দোস্ত রয়েছেন, কেউ আমার জন্য কিছু করতে পারলেন না।

বিনয় জানতে চাইলে সে কি করতে পারে?

আপনি সব কিছু করতে পারেন। আপনি ওদের সকলের সর্দার। আর সর্দারকে যে মানবে না ইসলামের শরিয়তে তার কি শাস্তি জানেন?

তাও বিনয় জানল। কিন্তু ইদ্রিস কণ্ট্রাক্টার তাতেও সুবিধা করতে পারলেন না।

বিনয়ের হঠাৎ একটা বুদ্ধি মাথায় এল—ইদ্রিসকে তার হাতছাড়া করা উচিত নয়। বিনয়ের কাছ থেকে সেদিন তাই ইদ্রিস মিঞাও হতাশ হয়ে ফিরে গেলেন না। তাকে নিয়ে বিনয় একবার স্থানীয় লেডি ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করে এল। অমনি একবার তাঁর বিবি সাহেবার নব্‌জ্‌ দেখে এল। অনেক পরামর্শ দিলে বিবিকে নিয়ে কলকাতায় কাকে দেখাবে, এসব। ইদ্রিস খুশী, সে জিতেছে।

বিনয় তখন ইদ্রিস কণ্ট্রাক্টারের কাছে একটু একটু করে তার কথা পাড়লে, আপনি করছেন কি কণ্ট্রাক্টার সাহেব? মজিদ আপনার জামাই; এত ক্ষমতা ওদের; এত টাকা আপনার হাতে; ইচ্ছা করলে আপনি কি না হতে পারেন? মজিদ কাজ করছে না? বলেন কি? ওসব কি কাজ নয়? দেখছেন না, কেমন খাঁ বাহাদুর পর্যন্ত ওদের রাতদিন ডাকাডাকি করে? তিনি জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান হতে চান কিনা। যান না আপনি জেলাবোর্ডে? আহা, ভোটের সময় নেই? নমিনেশান্ নিয়ে আসুন। কি লাগবে আবার? কলকাতায় আপনাদের মন্ত্রীরা রয়েছেন। বুঝছেন তো, একবার মেম্বর হলে কতদিকে ব্যবসায়ের সুবিধা বেড়ে যায়। দেখেছেন জাহেদুদ্দীনকে; কি ছিল জাহেদুদ্দীন? মজিদরাই তো করেছে ওঁকে মেম্বর। আর আপনি মজিদের শ্বশুর, আমিনা আপনার মেয়ে; ওদের সঙ্গে আপনি করেন ঝগড়া।

ইদ্রিস মিঞা চতুর লোক। কিন্তু আশা তার কম নয়। এক সময়ে সে ছিল 'ইদ্রিস কণ্টগ্‌দার', তারপর হয় 'ইদ্রিস মিয়া কণ্ট্রাক্টার', আজ 'ইদ্রিস আহমদ, আর্মি কণ্ট্রাক্টার', এ জেলার নতুন ধনীদের মধ্যে সেরা

ধনী। ভবিষ্যতে আরও কি না হতে পারেন? মনে মনে সে স্বপ্নও ইদ্রিস দেখে। সে বলল, সব বুঝি ডাক্তার সাহেব। কিন্তু আমার বিবি-সাহেবার ভয়ানক রাগ এই আমিনার উপর। তিনি চাইছিলেন মজিদ তাকে তালাক দেয়, আর আমিনা তাঁর ভাইপো কাশেমকে সাদি করে।

সে তো আর হয় না। কাশেমকে আপনি আপনার ঠিকাদারীতে যথেষ্ট করিয়ে দিয়েছেন। আবার কি? আর সত্যি কথা বললে, কাশেমকে চিনে কে? আর মজিদকে আপনাদের খাঁ বাহাদুর, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব কে না চিনে? তবে মজিদ আর আমিনাকেই বা আপনি পর করে দিচ্ছেন কেন? মজিদের তো সামান্য শক্তি নয়, দেখছেন। লীগের মন্ত্রীরাও ওদের এখন খাতির করে।

সম্ভবত বিনয়ের এ সব কথায় কাজ হয়েছিল। বিনয় তা জানত না। তবে দেখেছিল যে, সোনাপুরের শহরের বাড়ির একটা অংশ মজিদ ও আমিনাকে ইদ্রিস ছেড়ে দিয়েছে। তারপর তারই এক অংশ ভাড়া নিয়ে বসল প্রমথরা। সেখানে থাকত প্রমথর দিদি, তাদের দলের মেয়েরা। আর বিনয় দেখেছে ইদ্রিস তারপর থেকে সরু পা-জামা আর শেরওয়ানি ছাড়া শহরে বেরোয় না। সে প্রায়ই ছোটে কলকাতায়।

বিনয় এখন বৈকুণ্ঠবাবুর কথায় বুঝল, তার কথা ইদ্রিস কণ্ট্রাক্টারের কানে বৃথা হয় নি। ইদ্রিস কণ্ট্রাক্টার জেলাবোর্ডের মেম্বর হয়েছে।

বৈকুণ্ঠবাবু ততক্ষণ বলছিলেন, ডাক্তার, তুমি কমিউনিষ্ট নও যখন, তখন ওদের সঙ্গে যাও কেন আর? মিছামিছি তোমাকে ওরা দুর্নামের ভাগী করছে। সুরেশ দত্ত আর কেদার ভৌমিকই এ শহরে থাকে নাকি? আমরা থাকি না? আমি তোমাকে দেখাচ্ছি কত কাজের অবসর রয়েছে এখানে। এই তো বিদ্যামন্দির—ইস্কুলটা যেতে বসেছে। সুরেন চৌধুরী রাগ করছে—তার গুদামে জায়গা নেই। তার মাল রাখতে হবে; এখন সেখানে চা'ল রাখছে,—ইস্কুল অন্যত্র নিয়ে যেতে হবে। তোমাদের উপর

রাগ কি না, তাই বলছে ওসব। বলুক; তাতে কি? তোমরা থাকলে ইস্কুল থাকবে, এ আমি জানি। হিন্দু মেয়েদের একটা ইস্কুল না থাকলে চলে আজ? কত অনাচার দেখা দিচ্ছে চারিদিকে দেখছ তো? এসব অনেক সামাজিক অনাচার তোমাকে দূর করতে হবে। বুঝছ, আজ দেশে ছেলে-মেয়েদের কত উচ্ছৃঙ্খলতা বেড়ে গেছে। এ সময় সাবধান না হলে কোথায় যাবে স্বরাজ, কোথায় যাবে সমাজ? চলো শুনবে'খন আরও কথা।

গাড়ী এসে দাঁড়াল সীতাদের ইস্কুলের দুয়ারে। বৈকুণ্ঠবাবু লাইব্রেরীতে বসলেন। সেখান থেকে সীতাকে সংবাদ পাঠালেন। সীতা এল। বিনয়কে দেখে সে কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু থামল। নমস্কার করে বসল। বেশ স্বচ্ছন্দ কিন্তু গম্ভীর মুখভাব। কেমন ঠেকল যেন বিনয়ের।

বৈকুণ্ঠবাবু বললেন, সীতা, আমার চিঠি পেয়েছ?

কোন্‌টার কথা বলছেন?

বুধবার যেটা দিয়েছি।

পেয়েছি।

কি ঠিক করেছ?

আমি 'নারী সমিতির' কাজ ছাড়ব না।

বৈকুণ্ঠবাবু একটু চুপ করে থেকে বললেন, তা হলে ইস্কুল থেকে রিজাইন দাও।

প্রয়োজন হলে দোব।

'প্রয়োজন হলে' মানে?

ওই তো বলেছি।

কেমন অস্বস্তি বোধ করছিল বিনয়। এসব কি কথা? বিনয় বললে, আমি বরং যাই, বৈকুণ্ঠবাবু।

বৈকুণ্ঠবাবু বললেন, না, ডাক্তার, তুমি শোনো। তোমার শোনা দরকার। এ জন্যেই এসেছি তোমাকে নিয়ে।

সীতা হেসে বললে, আপনি বসুন, ডক্‌টার মজুমদার। তেমন কিছু কথা নয়।

বৈকুণ্ঠবাবু বিনয়কে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলেন, আমি ওকে বললাম, নারীসমিতির কেন সেক্রেটারি হয়েছ তুমি? আমরা তোমাকে ইস্কুলে রাখতে পারব না। কমিটির অনেকের আপত্তি আছে। তারপর নানা কথা উঠছে এসব নিয়ে। ইতিপূর্বেও তোমার নামে কথা উঠেছিল—শিবু'র কথা নয় গেল। প্রমথ এসে তোমার এখানে থাকে, মজিদরাও সময় অসময়ে দেখা করে—চিঠিপত্রও লেখে তোমাকে নানা লোকে—

সীতা বললে, সে আমি করব কি? ডাকঘর যখন আছে লিখবেই অনেকে। এই তো প্রমোদবাবু পর্যন্ত শাসিয়ে চিঠি লিখেছেন আজ—

প্রমোদবাবু? প্রমোদ?

হাঁ। তাতে আর কি? আমি ইস্কুলের মেয়ে টিচার—আমার তো এ-রকম জুটবেই ভাগ্যে।

কি লিখেছে প্রমোদ?—বৈকুণ্ঠবাবু জিজ্ঞাসা করলেন সন্দিগ্ধকণ্ঠে।

সেটা কি বলা ঠিক? আপনার চিঠির কথাই কি আমি বলব আর কাউকে? না, আপনিই তা বলা ভালো মনে করবেন?

বৈকুণ্ঠবাবু যেন স্তব্ধ হলেন। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, যাক্ তোমাকে যা বলতে আসা বলেছি—ভালো চাও, রিজাইন্ দাও। নইলে আমাকে কমিটি মিটিং ডাকতে হবে, তখন তুমি ডিস্‌মিস্‌ড্ হবে। তাতে কিন্তু ক্ষতি হবে বেশি তোমার।

সীতা নমস্কার করে বললে, আমাকেও তা হলে সেক্রেটারির দু'-একটা চিঠি দাখিল করতে হবে—তাতেও অবশ্য ডিস্‌মিস্‌ই হব, কিন্তু ক্ষতি অন্যেরও হবে।

ফিরে দাঁড়িয়ে বৈকুণ্ঠবাবু বললেন, সেক্রেটারির চিঠি! কি চিঠি আছে তোমার কাছে আমার?

অন্তত দু'খানা—যা একটু প্রাইভেট ধরনের, ডক্টার মজুমদারের কাছে আর তা বলব না। আর একখানা—সেটা নয় উনি জানুনই—যাতে আপনি বলেছেন, আমি যখন নারী-সমিতির সেক্রেটারী, প্রমথ চক্রবর্তীর মারফৎ কেন তখন ওঁদের উপর আমি চাপ দিই না আপনাকে ভাইস্-চেয়ারম্যান হতে সাহায্য করবার জন্য। না দিলে আমার পক্ষে তা ক্ষতিকর হতে পারে।

বৈকুণ্ঠবাবু স্তব্ধ বলেন। বিনয় মুখ অবনত করলে। বৈকুণ্ঠবাবু দাঁতে দাঁতে চেপে বললেন, লায়ার।

চিঠি রয়েছে। তবে নমস্কার।—বলে সীতা উঠে পড়ল। বিনয়কে বললে, আপনিও যাচ্ছেন নাকি ডাক্তারদা'? একবার বাজারের ওই কাঙালীদের দেখবেন না? আবার আসবেন? আচ্ছা, আমিও আসছি শীগ্গিরই শহরে, ধরে নিয়ে আসব আপনাকে তখন।

গাড়ীতে বিনয় আর বৈকুণ্ঠবাবুর সঙ্গে কথা বলতে পারল না। বৈকুণ্ঠবাবু থেকে থেকে বলছেন, কি মিথ্যাবাদী। কী কালসাপ! আমার অন্যায় হয়েছে ওকে বেশি বাড়তে দেওয়া—আমার নামে মিথ্যা বলে! লীলার মা তখন ঠিক বলেছিলেন, 'মেয়ে তো নয়—সং—'

বিনয় ভাবছিল, কোথায় চলেছে সে? কোথায় চলেছে পৃথিবী? এত বড় ওলট-পালটের মধ্যে পৃথিবী কি একেবারে সম্পূর্ণ আপনার দিক্-দেশ-ঠিকানা হারিয়ে ফেলছে? প্রমোদকে সে বোঝে, লীলাকেও সে বুঝতে পারে। যুদ্ধের টাকা প্রমোদের হাতে। পৃথিবীতে তার কোনো দায়িত্ব নেই; মুনাফা আর ফূর্তি, এই তার পৃথিবী। আর লীলা? পৃথিবীকে হয়ত সে এখনো চিনেও না—নতুন চোখে দেখছে—যে চোখ সবই দেখে, বলে, 'চাই', কিন্তু কিছু নিজের করে নিতে জানে না। হয়ত সে ঠকে, তবু ভাবে, 'বাঃ, বেশ'। কিন্তু এই বৈকুণ্ঠবাবু? বিচক্ষণ উকিল, পদস্থ লোক, বহু সম্মানিত, শিক্ষিতও—এ কি তাঁর জীবন-গতি? কোথায় চলেছেন তিনি?

কোথায় চলেছে পৃথিবী ? সব ওলট-পালট—সব শতভাবে খণ্ডিত—সমস্ত জীবনের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে আজ শত মিথ্যার একি রাজত্ব ? একদিকে এত যে বিচক্ষণ, অন্যে দিকে এতই তার মূঢ়তা ? তা হলে কেন বিনয় জাহেদুদ্দীনের জন্য দুঃখ পায় ? হাফেজের স্ব-বিরোধী কার্যে অধৈর্য হয় ? এই তো আজকের পৃথিবীর এই অবস্থা—সব মিথ্যা, সব ঝুটা।···কিন্তু, সত্যও কি জন্ম নিচ্ছে না ? দেখেছে সে বীরুকে, দেখেছে শাহেদুদ্দীনকে,···দেখল সীতাকে···দেখল সীতাকে, দেখল···

বিনয় সমস্ত রাত ঘুমুতে পারল না। একই সঙ্গে দুটা সত্য তার মনের দুয়ারে এসে ঘা দিচ্ছে। পৃথিবী মিথ্যাও হচ্ছে, আবার সত্যও হচ্ছে আজ। কেমন করে না তার চোখের সামনে বৈকুণ্ঠবাবু তুচ্ছ আর মিথ্যা হয়ে গেল ! এত মিথ্যাও মানুষ !—ভাবছিল সে। এমন মিথ্যা হয়ে যেতে পারে মানুষ এত সহজে ?...আর কেমন করে না সঙ্গে সঙ্গে তার চোখের সামনে সত্য হয়ে উঠল আর একটি মানুষ—সীতা। এত সত্য হয়ে উঠতে পারে সীতা, তা কি বিনয় জানত ? সে সদা-সানন্দ মেয়ে, স্বচ্ছন্দ আর চতুরা মেয়ে ; কিন্তু কে জানত ওর মধ্যে ছিল এত আগুন আর এত সত্য ? ওই তো মানুষটি সীতা—দেখতে এখনো বালিকা, বালিকাই কথায়, চলনে ;—তনু দেহে আর সচল মনে তার কোনো গম্ভীর গরিমা নেই—সহজ, লঘু,—যেন বেশি আত্ম-সচেতনও নয়। সেদিনও বিনয় তাকে ভেবেছিল বুদ্ধিমতী চতুরা,—কিন্তু মর্যাদাময়ী নয়। আর আজ একটি সন্ধ্যার কয়েকটি মিনিটে কি দেখল তাকে !...এত সত্য সীতার মধ্যে লুকিয়ে আছে—বিনয় যেন স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি।

এ সত্য আর বিনয় ভুলতে পারল না। না, পৃথিবীতে মানুষ শুধু মিথ্যাই হয়ে যাচ্ছে না, সত্য হয়েও উঠছে, অনির্বাণ আগুনের মত সত্য হয়ে উঠছে, শাণিত ইস্পাতের মত সত্য হয়ে উঠছে—সত্য হচ্ছে মানুষের মতই।

সকাল হতেই বিনয় বেগমপুরায় গেল।

বিনয় বললে, হাঁ, সীতা, আমি চলে এলাম সকালেই। যাওয়াই আমার অন্যায় হয়েছিল কাল।

যেতেন না, তবে কি থাকতেন ?

কোনো গুরুতর সচেতনতা নেই আজও সীতার কথায়। আশ্চর্য! বরাবরের মত তার চোখের প্রথম বিস্ময় মুখের সহজ কৌতুকে পরিণত হল।

কিন্তু পরিহাস বিনয় করবে না আজ। বললে, শোন, সীতা। বৈকুণ্ঠবাবুর সঙ্গেই ফিরে গেছি কাল। সে আমার দুর্বলতা। আমার থাকা উচিত ছিল। তোমার থেকে জানা দরকার, তুমি কি করবে ?

কি আবার করব ?

ইস্কুল তোমাকে ছাড়তে হবে, বুঝছ ?

ওরা ছাড়াবেন, না ? কিন্তু আমি ছাড়তে চাই না—এবার সীতার ভাবান্তর হল। সে যেন আবার সেই বালিকাটি হয়ে পড়ল,—ইস্কুল আমি চালাতে পারব না, ডাক্তারদা' ? কি বলেন ?

কি করে চালাবে, তা'ই জানতে চাই। কিছু মনে করো না—তোমারই বা চলবে কি করে ?

সীতা বুঝল। এবার সে দায়িত্বকুশলা কর্মী মেয়ের মত একটু গম্ভীর হল। বললে, এখনি কি কিছু চলছে, ডাক্তারদা' ? জায়গা নেই, ছাত্রী নেই, টাকা নেই, টিচার নেই,—মোটে পঁয়ত্রিশ টাকা তো পাই আমি।

রাগ করো না—তোমার বাড়ি চলছে কি করে ?

সীতা মুখ নিচু করে রইল। এবার সত্যই তার মুখে চিন্তার ছায়া দেখা দিয়েছে। বিনয় বুঝতে পারলে সব। অভিমানের সঙ্গেই বললে, অথচ তুমি একথা তো বলো নি আমাকে, সীতা ?

সীতার মুখে বিষণ্ণ হাস্য ফুটল। বললে, দরকার হলে বলব না কেন আপনাকে? বলবই তো।

কিন্তু বলো নি।—বিনয় আবার জিজ্ঞাসা করলে,—কি করবে কিছু ভেবেছ?

কাজ করব।

কি কাজ, সীতা?

কাজ আবার কি? আপনি কি কাজ করেন?—স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললে সীতা। দুশ্চিন্তা কাটিয়ে আবার স্বচ্ছন্দ হচ্ছিল সে।

বিনয় এক মুহূর্ত একটু অপ্রতিভ হল। বললে, আমি? আমি যা করি—তা' করবে?

হাঁ। পারব না? এত বাজে মনে করছেন আমাকে?

না। বরং উল্টো, আমার খেটে খেতে হয় না, তাই এসব বিলাসিতা সাজে।

আমি খেটে খাই—খাটব, তবু, খেতে পাব না?

পাবে না।—খাটলেই কি মানুষে খেতে পায়?

পায় না?—হেসে বললে সীতা—তা হলে আপনারা আছেন কেন?

বিনয় একবার নীরব রইল কিছুক্ষণ। তার চোখেমুখে আলোছায়ার খেলা ও আবেগের আলোড়ন দেখা যাচ্ছিল। সে বললে, সত্য বলছ, সীতা? তা হলে কি তোমার চাই, বলো?

বলেছি, ইস্কুলটা টিঁকিয়ে রাখতে চাই।

আর?

আর কি?—কণ্ঠে সীতার সানন্দ পরিহাস ফুটছে,—গল্পের বই, রবীন্দ্র রচনাবলী।

বিনয় নিরাশ হয়ে উঠছিল, অভিমানে তার আঘাত পড়েছিল।

শুধু এই? আর কিছু চাই না, সীতা?

'শুধু এই' নয়। চাই অনেক। কিন্তু আপনি তা হলে প্রমথ বা শিবুদা'র সঙ্গে কথা বলবেন—আর যা দরকার বলবেন শৈলদি'।

আহত হল বিনয়। সীতাকে সে সাহায্য করতে চাইছিল একান্ত আপনার বলে ; তাতেও চাই প্রমথ বা শিবুদা'র সঙ্গে কথা বলা ? সীতা তার একান্ত আপনার নয়,—এতটুকুও সীতা তার থেকে চাইতে অস্বীকৃত।

বিনয় বললে, তুমি চাইবে না, সীতা, না ?

চাইব না কেন ? তবে আমি আবার বিশেষ করে চাইব কেন ?

কেন ?—বিনয় যেন কথা খুঁজছে, ঠোঁটের কাছে তার কথা কাঁপতে লাগল।—বন্ধুত্বের দাবিতে।

সীতা সচকিত হল। হেসে বললে, তাতে কেউ চায় নাকি ?—বন্ধুত্বের দাবিতে যে পারে দেয়, যে পারে নেয়।

বেশ। সে জন্য তবে আবার অন্যদের বলতে হবে কেন ?

বলতে হবে না ? বন্ধুত্বের দাবি তো তাদের উপরও আছে।

বিনয় এক মুহূর্ত নীরব রইল। সীতা সহাস্যে বললে, ভাবছেন, তা ছাড়াও আরো কত বন্ধু রইল আপনারও, না ? না, এখনো তাঁর ঠিকানা খুঁজে পাচ্ছেন না, ডাক্তারদা' ?

বিনয় চমকিত হল। এক মুহূর্তে মনে পড়ে গেল সুধাকে। মনে হল যেন কোন্ অপস্রিয়মান ভূমির উপরে সে দাঁড়িয়ে ছিল এতক্ষণ। সীতা কি সেই কথাই তাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে ?

সীতা ততক্ষণে বলছে, সে আপনি বুঝবেন ওদের সঙ্গে আলোচনা করে। যা ভালো মনে হয় করবেন। আমি জানি খাটব—কিন্তু খেতে যেন পাই। আর আজকে এবেলা আমার এখানে খেয়ে যাবেন তো ? আবার যেন বন্ধুত্বের দাবিতে 'প্রিন্সিপাল চক্রবর্তীর বাড়িতে খেতে হবে' বলবেন না !

ঘণ্টা তিন পরে বিনয় ফিরে গেল সোনাপুরে। তখন তার মনে একটা অদ্ভুত আলোড়ন, নিরাশা আর জিজ্ঞাসা। সীতা তাকে বন্ধু বলে স্বীকার

করলে—আবার করলেও না; মধ্যখানে দাঁড় করিয়ে দিলে প্রমথ ও শিবুদা'কে। আবার মধ্যখানে এসে দাঁড়াল সুধাও, না? বিনয় সীতার বন্ধু, কিন্তু একান্ত বন্ধু নয়—জানিয়ে দিলে তা সীতা, না? আর এ জানানো কি বিনয়ের প্রতি তার গঞ্জনা? তা'ই বা বিনয় ভাববে কি করে? একান্ত বন্ধুত্বের দাবী বিনয়-ই বা কি করে করছে আজ? তবু সেই দাবীই সে করতে যাচ্ছিল, ভুলে যাচ্ছিল বিনয় অনেক সত্য—সীতার জাগ্রত দৃষ্টিই তাকে সে ভুল থেকে রক্ষা করেছে। কিন্তু সত্যই রক্ষা করেছে কি?

বন্ধু সে সীতার—যেমন বন্ধু প্রমথ ও শিবুদা'। এর বেশি নয় কিছু?··· বিনয় যেন শুধু এ কথায় সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি পাচ্ছে না।

দিন দুই এমনি একটা নিরাশায় ও প্রশ্নে কাটল বিনয়ের। কাজের অভাব নেই। তা বলে প্রশ্ন কি চাপা পড়ে? পথে পথে কান্নাও শোনা যাচ্ছে—'ভাত, ভাত, ভাত'। তবু কি প্রশ্ন চাপা পড়ে তাতে?

তারপর বিনয় আবার পেল সুধার চিঠি। আর এক মুহূর্তে যেন সে বুঝলে, সে তো সীতারই শুধু বন্ধু নয়।

সুধা লিখেছে দীর্ঘ চিঠি: বিনয় বুঝবে নিশ্চয় তার কথা। 'সময় নেই; সত্য কথা। তা বলে কি চিঠি লিখবার সময় করাও যায় না? নিশ্চয় করা যায় তা'—লিখেছিল বিনয়। 'কিন্তু সব চিঠি তেমন সময়করা সময়ে কি লিখে ওঠা যায়? তুমিই কি লিখতে পার সব চিঠি তেমন সময়ে, বিনয়?'—লিখেছিল উত্তরে সুধা। বিনয়ও লিখেছিল, 'সব চিঠি লিখতেই হয় কি তা বলে?—কাগজে আর কলমে? না-লেখা চিঠিগুলোও কম চিঠি নয়, সুধা'। সুধা কিন্তু মানবে না তা: 'না-লেখা চিঠিও পড়া যায় না; না-পড়া থাকে। তারপরে মনে মনেও আর তা লেখা বন্ধ হয়। না-দেখা মানুষও মনের কাছে ঝাপ্‌সা হয়ে ওঠে, ওঠে না? আর না-লেখা চিঠির তবে প্রাণ কতটুকু? না, বিনয়, আমরা দেখার জগতের মানুষ। লিখতে চাই, দেখতে চাই। মানে, হাওয়ায় বাঁচতে পারি না'।

সত্য কথা—বিনয় বুঝছে তা। সত্যই। এই তো কাগজে আর কলমে লেখা এই আঁচড়ের মধ্য দিয়ে একটা মানুষ তার মনের দুয়ারে এসে গেল। এই আঁচড় কালি-কলমে না আঁকলে এ মানুষই তো বিনয়ের কাছে ঝাপ্সা হয়ে উঠত। উঠছিলও। তার চেয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠছিল দেখা মানুষ, সামনের মানুষ···কে সত্য হয়ে উঠছে তার কাছে বেশি?—সীতা, যে কাছে থেকেও দূর রয়ে যায়? না সুধা, যে দূরে থেকেও দূর হতে চায় না?···কিন্তু সত্যি কি চায় না—সুধা দূর হতে?

বিনয় চিঠি লিখতে বসল সুধাকে। লিখল দীর্ঘ চিঠি। কিন্তু কি লিখল? কত লিখল সে, কিন্তু কি লিখল নিজেই কি ভালো করে জানে?

কে সত্য তার কাছে? কি সত্য?

১৩

মীর শাহেদহুদ্দীন নিজে শহরে এসে উপস্থিত হলেন। বিনয় সবিস্ময়ে বললে, আপনি!—একেবারে শহরে!

হাঁ, আর পারলাম না, ভাই।

কি ব্যাপার?

সবই তো জানছ। আর উপায় নেই। জাহেদকে লিখেছিলাম আগেই, 'অন্তত একটা লঙ্গরখানা খোলো—আমি তার ভার নিচ্ছি মীরপুরে'। যথানিয়মে তার জন্ম দরখাস্ত পাঠিয়েছি লোকজনদের দিয়ে জেলার কর্তাদের কাছে—আমিও তাতে সই করেছি। ওদের কাছে দরখাস্ত সই করব জীবনে তা কল্পনা করিনি। তাও করলাম। কিন্তু কোথায় কি? দিন

যায়—মানুষ মরে! আমার গ্রাম, আমার প্রজা, আমার পরিজন—তারা মরতে বসেছে!—কি করি ভাই, আর থাকতে পারলাম না। এসেছি—কিছু করতে হবে!

বিনয় এবার উৎসাহিত হল। বলুন, বলুন—কি করব?

সব। যা কিছু পার। পার কর্তাদের থেকে আদায় করো খয়রাত। হাঁ, খয়রাত। আজ আর 'দাবী' বলবার সাহস নেই, ভাই। দাবী করবার মত জোর কই দেশের? নিজের বুকের মধ্যেও যে সে জোর আজ পাই না আর। আদায় করো ভাই, পার তো লঙ্গরখানা। তোমাদের সঙ্গে যেতে হবে বলো, তাও যাব—হজুরদের দুয়ারে। এ দরখাস্ত নিয়ে তাও যাব।

বিনয় সবিস্ময়ে বললে, আপনি যাবেন দরখাস্ত নিয়ে?

হাঁ, ভাই, বাঁচবার দরখাস্ত করছি। আমি কংগ্রেসম্যান্; দেশকে বাঁচাতে পারি না, কিন্তু সেই চেষ্টাও করব না?

বিনয় আনন্দিত হল, বললে, বলুন কি করতে হবে?

চলো আগে সুরেশবাবু, বাদলবাবুর কাছে। আমি কংগ্রেসম্যান; আমার আত্মীয় বলতে তুমি আর ওঁরাই; মজিদ প্রমথও আমার আত্মীয় নয়, সহযোগী। তারপর চলো—লীগের কাছে। কাজী আছে তো? ফেলতে পারবে না আমার কথা, চলো। হিন্দুসভার বৈকুণ্ঠবাবু?—রাজী করাব তাঁকেও। অন্য কে আছে তুমি জানো। মুকুন্দ পাল? সে আমাদের পুরনো বন্ধু, শুনবে না কথা? নিশ্চয় শুনবে।

'দুঃস্থত্রাণ সমিতি' খুলতে হবে। রিলিফ চাই।

'দুঃস্থত্রাণ সমিতি?'—শুনে শাহেদুদ্দীন বললেন,—দুঃস্থ কাকে বলো? একি 'ডেস্টিটিউট'?—এ যে মৃত্যুর মিছিল।

বিনয় শুদ্ধ করে বললে, দুর্ভিক্ষগ্রস্ত এরা।

দুর্ভিক্ষ কই? দুর্ভিক্ষ বলো একে?

বিনয় বুঝতে পারল না, বললে, দুর্ভিক্ষ নয়? তবে কি?

জানি না। 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' শুনেছি। মেকলের লেখায় পড়েছি, বঙ্কিমও তার চিত্র দিয়েছেন। এমন দেশজোড়া মৃত্যুর মিছিল সেবারও কেউ দেখে নি। কি বলবে একে? মন্বন্তর—মন্বন্তর। সংস্কৃত কথা, কিন্তু সত্য কথা।

মন্বন্তর—বিনয় মনে মনে বললে,—'দুর্দিন' নয়, 'দুর্ভিক্ষ'ও আর নয়, 'মন্বন্তর'!

দু'জনা বেরিয়ে পড়ল, প্রমথকে পথে খুঁজে নিলে।

সুরেশবাবু শাহেদুদ্দীনকে এভাবে দেখে বিচলিত হলেন—জেলার সব চেয়ে পুরনো কংগ্রেসম্যান্ তিনি। কিন্তু তিনি বললেন, কি রিলিফ করবেন মীর সাহেব, বলুন? গোটা দেশের এ অবস্থা। এ সাহায্য আমরা কি করে করব? এত টাকা কই? টাকা পেলেই বা চা'ল কই? শিলেট থেকে, বিহার থেকে, ওড়িষ্যা থেকে চা'ল কিনেও আনা যাচ্ছে না; ওরা মালগাড়ী দেবে না। সে-সব চা'ল ওরা সৈন্যদের জন্য এখনো নিচ্ছে, এখনো বিদেশে রপ্তানি বন্ধ করছে কি? বলে বন্ধ করেছে, কিন্তু হিসাব দেখাক না? এখনো ইব্রাহিমভাইরা চা'ল লুঠ করছে। এদিকে এরা গাড়ী দেবে না, চা'ল দেবে না, মাল দেবে না—ওরা দেশের লোককে না খাইয়ে যুদ্ধে সাহায্য করতে বাধ্য করবে। আপনি—আমি বাঁচাব কি করে?

শাহেদুদ্দীন এসব মানবেন না, তর্কও করবেন না। বললেন, সব জানি, সুরেশবাবু, তবু আমরাই চিরদিন দুর্দিনে দেশের লোকের পাশে দাঁড়িয়েছি,—বন্যায় বাঁচাই, অনাবৃষ্টিতে বাঁচাই, ভূমিকম্পে বাঁচাই। আমাদেরই নিতে হবে এবার সেই দেশকে বাঁচানোর ভার—যা সাধ্য করব। আপনারা আছেন, আছি আমি, আছে ডাক্তার, আমার মতের মানুষ সে—

সত্য? সুরেশবাবুর সন্দেহ ঘুচল না, কিন্তু সুরেশবাবু ত্রাণ-সমিতি গঠনে রাজী হলেন। কাজী তো তখনি রাজী। তাঁর পুরনো নেতা মীর

সাহেব বলছেন, কথা কি আবার? তবে হাফেজ ও খাঁ বাহাদুর আছে, কাজীর তাও ভাবতে হয়। খাঁ বাহাদুরও কিন্তু রাজী হলেন। তাঁর আপত্তি হবে কেন রিলিফের কাজে? তবে লীগের মন্ত্রিত্বকে সবাই জব্দ করতে চায় যে। বৈকুণ্ঠবাবু প্রায় কথা দিয়ে দিলেন। মুকুন্দবাবুরা রাজী হলেন—প্রমথরা কেউ কার্যাধ্যক্ষ হবে না; তাদের তাই আপত্তি নেই। দু'দিনে প্রায় 'দুর্ভিক্ষত্রাণ সমিতি' গঠন ঠিক হয়েছে। পাকাপাকি প্রোগ্রাম হবে পরদিন—কোথায়, কি কাজ হবে।

এমনি সময়ে সুরাহাবর্দী সাহেবের বক্তৃতা বের হল—সব চা'ল ব্যবসায়ী আর কৃষকেরা মজুত করে রেখেছে। তিনি তা বের করবেন, তক্তপোষের তলায় খুঁজে খুঁজে দেখবেন। আসছে তাঁর মজুত-তল্লাসী অভিযান।

সব ওলট-পালট হয়ে গেল। বৈকুণ্ঠবাবু, সুরেশবাবু ক্ষেপে গেলেন। বিনয় কিন্তু প্রমথের সঙ্গে এবার এক মত—মন্ত্রীদের এ কাজ ঠিকই হবে। সে তো দেখেছে ঢাকাপট্টি আর মুকুন্দ পালের প্রতারণা। জানে, বেগমপুরায় সুরেন চৌধুরীর পাটের গুদাম হচ্ছে এখন চা'লের গুদাম। এরই পরে বের হল সংবাদ—মন্ত্রীরা এ অভিযানে জনসাধারণের খাদ্যসমিতির সহযোগ চায়। সে খাদ্যসমিতি গঠিত করতে হবে সকলকে নিয়ে। প্রমথ আরও উৎসাহিত হল। ফুড্ কমিটি এবার কাজের সুযোগ পাচ্ছে।

বিনয় বললে, দ্যাখো শেষ পর্যন্ত কি হয়। শেষ পর্যন্ত আমাদের গোয়েন্দার কাজ করাতে চায় কিনা।

মুকুন্দ পাল শাহেদ সাহেবকে বলেলেন, আমাদের ডেকে লাভ কি? আমরাই তো আপনাদের মতে শত্রু।

শাহেদুদ্দীন বললেন, কি বলছেন, মুকুন্দবাবু? আপনাকে আমি জানি না? আপনিও জানেন আমাকে—

সেদিন নেই, মীর সাহেব। আজ অন্যেরা দেশের নেতা, তাদের কাজকর্মও অন্য রকমের। আমরা জানতাম—সরকারের সঙ্গে অসহযোগ।

আপনি চিরকুট পাঠাতেন, 'অত জনের মত চা'ল ডাল তেল চাই'। আমরা প্রশ্নও করিনি। আমরা ব্যবসায়ী মানুষ, জানতাম দেশের আর কি করতে পারি আমরা? আজ আমরাই হলাম দেশের শত্রু। আজ দেশোদ্ধার হচ্ছে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করে। তের টাকায় চা'ল কিনে আমরা পঁচিশ টাকায় তা বেচি—সাহেবদের কাছে তা নিয়ে নালিশ হয়। আমাদের লাইসেন্স নিয়ে টানাটানি পড়ে। তার পরে সেখানে আক্কেল সেলামি দিয়ে উদ্ধার পাই। আজ আমরাই দেশের শত্রু।

শাহেদুদ্দীন বোঝাতে চাইলেন, মুকুন্দ পালকে কিন্তু আর সন্তুষ্ট করা করা গেল না। বৈকুণ্ঠবাবুও কেমন উদাসীন হয়ে গেলেন—জেলাবোর্ডের ব্যাপারে প্রমথরা তাঁকে সাহায্য করলে না। তা ছাড়া, হিন্দু ব্যবসায়ীদের মারবার পথ করছে লীগ্; তা তিনি সহ্য করবেন কেন?

সুরেশবাবু একেবারে বেঁকে বসলেন, মীর সাহেব আমার স্পষ্ট কথা। দেশকে লুঠ করছে ইব্রাহিমভাই আর সাহেবরা। কোনো 'অনেষ্টি' নেই সুরাহাবর্দীর। মন্ত্রী হবার আগে আমাদের সঙ্গে ও শ্যামাপ্রসাদবাবুর সঙ্গে একযোগে বসে আলোচনা করেছে। যেই লাটসাহেব ডাক দিলে অমনি আমাদের 'বিট্রে' করলে। এখন সেই আমেরি-হার্বার্টের বুলি কপ্‌চাচ্ছে। আমরা ট্রেটরের সঙ্গে হাত মেলাব না—লীগের সঙ্গে যেতে পারব না। আপনারা জানেন, লোকে বলে কত লক্ষ টাকা গেছে এই হার্বার্টের পকেটে আর তাঁর স্ত্রীর গলায়? ইব্রাহিমভাইর ধান লুঠের ব্যাপারে তাঁর কত শেয়ার?

কোনো যুক্তি শুনবেন না সুরেশবাবু, তাঁর স্পষ্ট কথা। এ গোয়েন্দা-গিরিতে তিনি নেই—মানুষকে খাওয়ানো সরকারের কাজ, 'ত্রাণ-সমিতি' চালানো কংগ্রেসের কাজ নয়।

বিনয় একবার বললে, সুরেশবাবু, আপনি কংগ্রেসম্যান্। এখানে দেখেছেন কি করে তখন ব্যবসায়ীরা তের টাকার চা'ল পঁচিশ টাকায়

বেচল। দেখেছেন বজরংলালের গোলায় চিনি থাকতেও কেমন আমরা পাইনি। এর পরে আপনি বলতে পারেন যে এদের গুদামে চা'ল নেই—চিনি নেই, তেল নেই, নুন নেই ?

থাকতে পারে সামান্য। কিন্তু চা'ল আসলে লুঠে নিয়েছে ইব্রাহিমভাই, তা এ জিলায় নেই। আপনি জানেন, ডাক্তারবাবু, লীগ্ মন্ত্রীরা চোর ধরবে না—কি হল বজরংলালের, কি হল মালেকের, কি হল আপনাদের কেরোসিনেরই বা ? মজুতদারের নামে গরীবের উপর এখন পুলিশ লেলিয়ে দেওয়া হচ্ছে ; মানুষের উপর অত্যাচারের অবধি থাকবে না। চা'ল থাকলেও আমি এ গবর্মেণ্টের হাতে তা তুলে দেব না—ওরা বিদেশে পাঠাবে, সৈন্যদের জন্য নিয়ে যাবে, নইলে আবার ইব্রাহিমভাইর গুদামেই জমা করবে। না, এক কণা চা'লও আমরা দোব না। শ্যামাপ্রসাদবাবু এই কথা বলে থাকেন ভালো ; না বলেন, আমরাই বলব।

শাহেদ্দীন হতাশ হলেন, বললেন, ডাক্তার কি উপায় বলো ? তোমাদের খাদ্যসমিতিও গেল, আমাদের দুর্ভিক্ষত্রাণ সমিতিও হল না।

বিনয় বললে, 'খাদ্যসমিতি' থাকবেই ; 'দুর্ভিক্ষত্রাণ সমিতি' খুলতেই হবে। আমি-আপনি থাকব এক সঙ্গে, এক দলে,—দেখব যা হয়।

বিনয় আগেই ঠিক করে ফেলেছিল—নিজের থেকে অন্তত হাজার কয় টাকা সে দেবে। আগে ভেবেছিল, কিছু টাকা হলে সীতার ইস্কুলটাকে আবার শহরে খোলবার চেষ্টাও করা যায়। শহরে মেয়ে আছে, অথচ মেয়েদের ইস্কুল নেই। সে অনুসারে সে তার কলকাতার ব্যাঙ্কে লিখেও দিয়েছে। কিন্তু 'দুর্ভিক্ষের রিলিফ' নামতে হলে আরও বেশী টাকা চাই, তার একার টাকায় তা হবে না।

বিনয় প্রথম যশোদা চৌধুরীর কাছে গেল। বললে, বীরু নেই, নিজেই এলাম, আর দেরি করতে পারি না। বড় জরুরী কথা—'না' বলতে পারবেন না।

যশোদা চৌধুরী দাঁড়িয়ে উঠলেন। একঘর লোকজন, তারা হিসাবপত্র করছিল, তাদের বসতে বললেন। নিজের ছোট শয়নকক্ষে নিয়ে গিয়ে বিনয়কে বললেন, বসুন।

'না' বলতে পারবেন না।—বললে আবার বিনয়।

বলব না। জানি, আপনি অসম্ভব কথা বলবেন না। বলুন এবার।

টাকা চাই।

কত ?

বিনয় একটু থেমে বললে, 'কেন', জানতে চাইলেন না ?

জানবার হলে আপনিই বলবেন।

বিনয় চুপ করে রইল। যশোদা চৌধুরী একটু মৃদু হাসি হেসে বললেন, ডাক্তারবাবু, আজ আমি পলিটিক্সের ত্রিসীমানায় নেই—থাকবও না যতদিন ব্যবসা করি। কিন্তু একদিন আমি 'স্বদেশী' ছিলাম। সেদিন যাঁদের মেনেছি তাঁদের প্রশ্ন করিনি 'কেন'? আজও যাকে চিনি তেমন মানুষ পেলে, তাঁকে আমি কোন্ মুখে জিজ্ঞাসা করব 'কেন টাকা চাই ?'

বিনয়ের মনে একটি সম্ভ্রম জেগে উঠল। 'একদিন স্বদেশী ছিলাম'—শুধু এই স্মৃতিটুকু, আজও এই লক্ষপতি ঠিকাদার যশোদা চৌধুরীকে কতখানি মহত্ত্বের অধিকারী করে রেখেছে। 'একদিন স্বদেশী ছিলাম'—সত্যই কত গৌরবের পরিচয়।

বিনয় বললে, তবু শুনুন কি জন্য।—সংক্ষেপে সে উদ্দেশ্য বললে।

যশোদাবাবু বললেন, এ ভাবে মানুষ বাঁচবে কিনা জানি না। কিন্তু সে তর্ক আমি করব না। কত টাকা চাই বলুন ?

বিনয় কিন্তু তা ভেবে আসে নি, বললে, আপাতত পাঁচ হাজার ?

পাঁচ হাজার ?

বেশি হল। বেশ তিন হাজার দিন।

যশোদাবাবু বললেন, পাঁচ হাজারই দোব। কিন্তু একটি কথা আছে—মনে কিছু করবেন না। একদিন আমি ইস্কুলমাষ্টার ছিলাম—পুলিশ তা থাকতে দেয় নি। তবু জানি—ইস্কুল দেশের গোড়ার জিনিস, আর মাষ্টাররা সব থেকে হতভাগ্য। কি করে তারা দিন কাটায় সে আমি জানি। ওদের ছেলেপিলে মরছে, লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আপনি দু' হাজার টাকা রাখুন তাঁদের জন্য; তাঁরা যেন নিজেরা খেতে পায়, তাঁদের পরিবার যেন দরকার মত সাহায্য পায়। আর তিন হাজার আপনাদের 'ত্রাণ-সমিতিতে' যেমন খুশি খরচ করুন।

বিনয়ের সামনে আর একটা পথও খুলে গেল যেন। বললে, করোনেশান ইস্কুলের অবস্থা শুনেছেন? বেগমপুরার হিন্দু বিদ্যামন্দিরের কথা?—শুনেছেন তার টিচারদের অবস্থা?

যশোদা চৌবুরী সব শুনলেন। বললেন, ইস্কুলগুলো বাঁচান না আপনারা, ডাক্তারবাবু!

আপনারা সাহায্য করুন।

আমার সময় নেই। কিন্তু টাকা যদি বলেন, যা পারি দোব—অন্তের যদি কাজে লাগে।

খাঁ বাহাদুর ডাকলেন ইদ্রিস মিঞাকে। বিনয় আগেই কথা বলেছিল তাঁর সঙ্গে। বলেছিল,—দেখছেন কি কণ্ট্রাক্টার সাহেব। মানুষ মরছে। বাঁচান তাদের। আল্লাও দোয়া করবে—আর এরাও মনে রাখবে তা।

আমি কি করব?

চা'ল দিন, টাকা দিন।

ইদ্রিস মিঞা সহজে রাজী হবে এমন লোক নয়। তার মজুরদের চা'ল চাই না? বিনয় বললে, শহরে আপনার বাড়ি। 'কণ্টগ্দার বাড়ি' থেকে আপনার বস্তীর এই হিন্দু-মুসলমান শ'-চার লোকের একটা লঙ্গরখানা খুলুন। চালাবে কে? কেন মজিদ আছে, আমিনা আছে। নাম হবে

কার ? 'কন্টগ্‌দার বাড়ির লঙ্গরখানা'। তারপরে আসুক মিউনিসিপ্যালিটির ইলেকশান কি আইনসভার,—আপনাকে আঁটবে কে ?

ইদ্রিস মিঞা বিনয়কে কথা দিল না। কথা দিল খাঁ বাহাদুরের কাছে। তখনি স্বীকার করল, বেশ ইস্কুলের জন্যও খাঁ বাহাদুরের হাতে দু'হাজার টাকা দেবে। তবে তার ইচ্ছা একটা মসজিদ আর মাদ্রাসা সে করে দেয় শহরে।

খাঁ বাহাদুর বললেন, সে হবে, ইদ্রিস মিঞা। আর প্রথম মাসের চা'ল আপনার ষ্টক থেকে দিতে হবে। আমরাও এদিকে চা'লের জোগাড় দেখব—হাফেজ আছে। চা'ল দেবেই ইব্রাহিমভাইরা।

ইদ্রিস মিঞা খুব খুশী হল না—কিন্তু রাজী হল।

সপ্তাহখানেকের মধ্যে শহরে দু'দুটা বেসরকারী লঙ্গরখানা চলল। 'দুর্ভিক্ষত্রাণ সমিতি' কাজ আরম্ভ করে দিয়েছে।

মজুত অভিযানের তোড়জোড় হচ্ছে।

মিষ্টার সামেদ প্রমথদের ডাকিয়েছেন, 'সাহায্য করুন'। সুরেশবাবু বলছেন, এরা দেশের শত্রু—গোয়েন্দা। গণেশ বেরিয়ে গেছে গ্রামে বলতে, 'পুলিশ আসছে—ক্ষেতের ধান পর্যন্ত লুঠে নেবে'।

মিষ্টার সামেদ সরকারী কর্মচারীদের, এ-আর-পি'র লোকজনদের, মাষ্টারদের, প্রাইমারি ইস্কুলের পণ্ডিত ও মৌলবীদের, প্রেসিডেন্ট পঞ্চায়েৎদের ডাকিয়েছেন। তাঁদের নানা দলে ভাগ করে বুঝিয়ে দেবেন—কেমন করে প্রেসিডেন্ট পঞ্চায়েৎ আর হাকিমদের নেতৃত্বে তাদের কাজ করতে হবে—মজুত চা'ল গোলা থেকে বার করতে হবে।

সত্যই প্রথমটা চা'লের দর পড়ে যেতে লাগল।

শিবুদা' এসে হাজির। তাঁদের এলাকায় যাদের গুদাম-ভরা

চা'ল ছিল হাফেজ তা কিনে নিচ্ছে। তা সব গিয়ে জমছে এখন হাওড়া, কলকাতায় ইব্রাহিমভাইদের গুদামে—যেখানে মজুত-অভিযান নেই। চা'ল-চালানির তাই দিন পড়ে গেছে। ছোট ছোট মহাজনরা ভয়ে যা বেচছে, তা জমছে গিয়ে কলকাতার বড় মুনাফাদারদের হাতে।

প্রমথও নিরুপায় হয়ে পড়ছে। বলছে, চাল সস্তা; কারণ সবাই গুদাম খালি করছে। কিন্তু সে চাল যাচ্ছে কলকাতায়।

প্রমথ বলতে গেল ম্যাজিস্ট্রেটকে এ কথা।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বললেন, বাজে কথা। ইব্রাহিমভাইরা গবর্মেণ্ট এজেণ্ট। তাঁরাই স্থবিাপুর থেকে তোমাদের চাল দিয়েছিলেন সেবারও।

কিন্তু তাদের হাওড়া কলকাতার গুদাম দেখছে কে?

দেখবে সেখানকার কর্তৃপক্ষ—যেমন আমি সোনাপুর দেখছি। কিছুই হল না, চাল মফস্বল থেকে চলল কলকাতায়।

ছোট ছোট দলে হাকিমরা এদিকে যার-যার এলাকায় সহকর্মীদের কর্তব্য বোঝাচ্ছেন। পাহাড়খাড়ীর ইস্কুলমাষ্টার বিজয় চক্রবর্তী প্রশ্ন করলেন, আমরা তো জানি মহাজনরা ইতিমধ্যে চাল অনেক সরিয়ে ফেলছে—কলকাতায়।

সার্কেল অফিসার বললেন, তা আপনি কি করবেন?

না, স্যর। জানি কিনা, তাই জিজ্ঞাসা করলাম।

পশ্চিম এলাকার স্থবলবাবু বললেন, আমরা জানি, অনেক চা'ল লুকিয়েও ফেলছে।

জানেন, খুঁজে পান, দেখুন, ভালো কথা।—না পান, কি করবেন? চা'ল যে পেতেই হবে এমন কথা নেই ত।

শেওড়াতলীর প্রাইমারী ইস্কুলের মাষ্টার মদন দাস—শিবুদা'র তিনি বড় বন্ধু,—বললেন, কিন্তু, এমন ঢিলে দিলে যে মজুত ধরাই পড়বে না।

সেদিককার তালুকদার মোক্ষদাবাবু, বললেন, তার জন্য কি আমরা দেশের মানুষের উপর অত্যাচার করব নাকি? সে, স্যর, আমরা পারব না।

হাকিম বললেন, দেখুন, অত্যাচার কিন্তু অন্যায়। মজুত পান ভালো, না পান কি করবেন? বাড়াবাড়ি যেন না হয়।

মজিদ শুনছে আর বলছে, এরা অভিযানটা 'স্যাবোটাজ' করবে।

প্রমথ বলছে, অর্ধেক তা হয়ে আছে—কলকাতা-হাওড়া বাদ দেওয়ায়। রুই-কাৎলারা সেখানে গিয়ে জমেছেন—ইব্রাহিমভাই, মুরারি সেন প্রভৃতি।

বিনয় বললে, সব তো যায় নি। এদিকে-সেদিকে এখনো তাদের গুদাম আছে। দেখা যাবে কি বেরোয়।

সে কলকাতায় জাহেরুদ্দীনের কাছে তার করে পাঠাল—মন্ত্রদের বলো, হাফেজের লোক চাল জেলা থেকে পার করে দিচ্ছে, কর্মচারীরা মজুত-বিরোধী কাজে যথেষ্ট উদ্যোগী নয়।

শহরে বিনয় তার এ-আর-পিদের নিয়ে একটা এলাকার ভার পেল। সাধারণ গৃহস্থ সব সে পাড়ার লোক। দু'একজন গরীব মুসলমান ও হিন্দুও আছে। যাদের অবস্থা ভালো—তাদেরও ঘরে বেশি চাল নেই। বিনয় জানে তারা কেউ কেউ চাল রেখেছে দেশের বাড়িতে—যেমন বৈকুণ্ঠবাবু, মহেশবাবু বিনয়কে আগে বলেছিলেন একথা। তা সেখানকার লোকেরা বুঝবে। বিনয় কি করবে শহরে?

আশ্চর্য কথা, বেগমপুরার হাটে চালের খোঁজে স্বয়ং গেলেন এক বড় হাকিম। সুরেন্দ্রবাবুর দুটো গোলায় কিছু নেই। অন্য গোলা খোলা দরকারও হল না। মুকুন্দ পালের সে হাটে একটা গোলা; তাতে কিছু নেই, তাতে পাট থাকে। অন্য গুদাম? সে তো তার নয়। রসিদ বের করে মুকুন্দ পাল দেখালে—তা ছ'মাস ধরে ইব্রাহিমভাইরা ভাড়া নিয়েছে।

সে সব গুদামের চাবি এদের কাছেও নেই। কোথায় হাফেজ সাহেব জানেন হয়ত। কিন্তু তিনি গেছেন মহকুমায়। আরসাদ ব্যাপারীর ঘরে কিছু নেই। কাদির মিঞার যা আছে ইদ্রিস মিঞার মজুরদের রেশনের জন্য।

সীতা ও অন্য কর্মীরা কি বলছিল। হাকিম বললেন, না ওরা সরকারী কণ্ট্রাক্টর। ওদের গোলা না দেখলেও চলবে।

শিলেটপট্টির গুদাম দুটোও ইব্রাহিমভাইর নামে। তার চাবি জাহেদুদ্দীনের কাছে। তিনি নেই। তবে তিনি ভার রেখে গেছেন বসিরের উপর। বসির আহম্মদ নিজেই তো এখন এই মজুত-অভিযানে কাজ করে। নিয়মকানুন সব সে জানে। এ গুদাম দুটোর জন্য তাই কোনো গোলমাল নেই। খুলতে হবে না।

অবস্থাপন্ন লোকদের বাড়িতেও খোঁজ করা নিষ্প্রয়োজন। ঘরে কত চাল আছে জিজ্ঞাসা করলেই বলে দেবেন। ভদ্রলোকে কি মিছে বলবে? না, যারা তল্লাসীতে গেছে তারা গোয়েন্দার লোক যে তার হাড়ি-কুড়ি খুঁজে—তক্তপোষের তলায় ঢুকে দেখবে?

'মজুত-অভিযান' চমৎকার শান্তিপূর্ণভাবে শেষ হল। ধরা পড়ল বৈকি,—এখানে ওখানে বিশ মণ, ত্রিশ মণ চা'ল। কিন্তু তার পুরো হিসাব তো এখন বের হবে না—উপর থেকে পরে সরকার জানাবেন। জেলার কর্তৃপক্ষ বললেন, 'এ ঘাটতি জেলা, এখানে তো বেশি ধরা পড়বার কথা নয়। কিন্তু অভিযান সার্থক হয়েছে—মজুত চা'ল ধরা পড়েছে।'

আর ধরা পড়ল প্রায় শিবুদা'। একটা মামলায় সে জড়িয়ে পড়ল আবার।

এ জেলার মধ্যে পাহাড়খাড়ীতে ধান-চা'ল বেশি জন্মে। চা'ল রয়ে গেছলও কিছু কিছু সে অঞ্চলে। অবস্থাপন্ন জোৎদার, তালুকদারের

তখনো চা'ল বিক্রী করতে হয় নি। তাদের থেকে চা'ল আদায়ের ফন্দি বের করেছিল শিবুদা'।

চিনিচরার নন্দী কর্তারা লোকজনকে গালমন্দ করে তাড়ালেন, ব্যাটারা নিজের চা'ল বেচে দিয়েছিস কেন তখন? এখন আমাদের খাবারে ভাগ বসাবি—মারবি আমাদের?

গাঁয়ের মেয়েরা এল তারপরে, একেবারে বাড়ির গিন্নীদের গিয়ে ধরল। বাড়ির গৃহিণীরা তো সহজে পারেন না। সুদামের মা কেঁদে বলে, 'দুধ নেই বুকে মা, না খেয়ে আছি নিজেরা —আমার কোলের ছেলেটা মরে গেল। তোমরাও তো বোঝো মা—ছেলেটা মরে গেল!' তিন বছরের মেয়েটা আজ মরছে—রাধা,—এই দেখো মা—দুটো ফ্যান-ভাত দাও, মা—ফ্যান-ভাত।'

গৃহিণীর বুক কেঁপে ওঠে! তিনিও সন্তানের জননী—এত মায়ের দুঃখ বুঝবেন না? ভগবান নেই না কি? শেষটা এসব মায়ের বাপের অভিশাপও লাগবে নাকি তাঁদের বংশে! বড় কর্তাকে খবর দেন, বলেন, 'না, দাও, ওদের যা আছে দাও। আমাদের খোরাকী যেমন আছে চলবে। নইলে আমার মুখে ভাত উঠবে না। কে জানে কেমন আছে আমার সুরেন—চিঠি পাই না আজ সাতদিন।' নন্দীকর্তারা রাগ করতে পারলেন না—'শিবুবাবুর কৌশল চমৎকার।' তাঁদের গোলা থেকে এ ভাবে চিনিচরার লোকদের ধান-চাল 'ধার' দিয়েছেন—শিবুদাও হিসেব পাঠিয়ে দিয়েছেন কে কি নিয়েছে।

সবখানে তাই বলে অত সুবিধা হল না। হাট-বাজারের আড়ৎদাররা চটে যায়—'ব্যবসা করতে বসেছি; এখন সত্র খুললে পারি তোমাদের জন্য?'

'মজুতবিরোধী অভিযান' আসতেই শিবুদা উৎফুল্ল হলেন। বিজয় চক্রবর্তীকে নিয়ে আড়ৎদারদের বললেন, আর দেখছেন কি? এবার

সরকারই সব ধরবে। তার আগে আপনারাই গরীবদের বাঁচান—গোলা খালি করে ফেলুন।

ছোট খাটো দু'-একটা আড়ৎদার ভয় পেল। কিন্তু যা বাজারে চা'ল উঠল তা বাইরের ব্যাপারীরা কিনে চালান দিতে লাগল হাওড়ায়, কলকাতায়। বড় তালুকদাররা অবশ্য দমল না—দেখা যাক না, কি ব্যাপার দাঁড়ায়।

মোক্ষদাবাবু বললেন, শিবু, তোমরা বলছ বেশ, 'আমার গোলাভরা ধান-চা'ল, এত ধান-চা'ল দিয়ে আমি কি করব?' একা খাব? বছরের ধান-চা'ল রেখেও অপরাধ করেছি, না? এই বর্ষাকাল সামনে। এবার আউশ ফসল তো চমৎকার; চাষীর দু'দিন পরেই অভাব কেটে যাবে। কিন্তু আমার আসবে পূজো—মেয়ে-জামাইরা আসবে, তাদের ছেলেপিলে আছে। পূজোয় তাদের না এনে পারব? ছেলের বিয়ে দিয়েছি, বেয়াই-বাড়ির লোকও আসবে। পাঁচুর বন্ধুবান্ধবও আসে, কুটুম্বও আসে। এইখানেই নাটক করে ওরা পূজোর সময়ে বরাবর। তাদের খাওয়াতে হবে, না, খাওয়াতে হবে না? তারপর গুরু, পুরুত, ধোবা-নাপিত, মালি, বাস্তকর—গ্রামের এগুলোকে আমি বাদ দোব পূজোবাড়ি থেকে? তোমাদের তো চমৎকার হিসাব—সাতজন লোক, তিনজন আমার চাকর 'বদলা'; যেন বছরে এই আমার খোরাকীর হিসাব! পূজো নেই, কোজাগর নেই, কালীপূজো নেই,—বারো মাসে তেরো পার্বন নেই, মেয়ের বিয়ে নেই, আত্মীয় কুটুম্ব নেই—আছি আমি আর আছে আমার পেট। এ হিসাব তোমাদের আজকালকার হিসাব। আমরা অন্য যুগের মানুষ—অন্য রকম হিসাব আমাদের। দশজনকে দিয়ে-থুয়ে আমরা বাঁচি—তাদের ছেড়ে নাকি আমি, না আমাকে ছেড়ে তারা?

শিবুদা বলতে চাইলেন, তাই তো বলছি—ওরা যে এখনি মরছে। আপনার চাকরানা খায় হরিশ ধুপী—কাপড় ধুতে পারে না, মরছে। আপনিই তো ওদের 'কর্তা মশায়', খাইয়ে রাখবেন না?

চাকরানা তো খাচ্ছে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করেছ—কাপড় ধোয় না কেন?

ধোবে কি? মসলা কোথায়? ওদিকে অসুখে পড়ে আবার ছেলেটা অকর্মণ্য। স্ত্রী একা, বয়সও হয়েছে—ও নিজে খেতে পেলে কাপড় ধুতে পারে না?

ওরা ওরকমই নেমকহারাম—চাকরানা খাচ্ছে, কাজ করবে না। তিনবার ডেকে পাঠালে দেখাও করে না। ওর ছেলের বউটার কথা শুনেছ তো? সে বাড়িতেই থাকে না—এ-পাড়ায় সে-পাড়ায় ঘুরে বেড়ায়। গ্রামটা তার জন্য নষ্ট হল—ছেলেগুলোর মাথা খেল।

অন্য কথা উঠে যায়—হরিশ ধুপীর ছেলের বউ কি রকম নষ্ট মেয়ে। শিবুদা' সমস্যায় পড়লেন। কিন্তু মোক্ষদাবাবু কি করে এত লোকের খোরাকী নষ্ট করবেন? 'পুজো আছে, ঠাকুর সেবা আছে—সে সব বন্ধ হোক তার পরে, না?'

এমনি সময়ে জানা গেল—শিবুদার অধ্যাপক সুধীর বোস বলে দিয়েছেন, 'এক কণা ফসল কেউ বার করো না। সব ওরা বিদেশে চালান দেবে।' শিবুদা' তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চেষ্টা করলেন, দেখা হল না। কোথা থেকে বরং গণেশ, গোকুল এসে গেল ওদিকে। মাষ্টার মশায়ের নাম করে তারা বললে, 'সর্বনাশ, এক কণা ফসল দিয়ো না। ক্ষেতের ফসল ওরা কেটে নিয়ে যাবে—আউশ ধান বড় হয়ে উঠেছে—নিয়ে যাবে। এখনি পুড়িয়ে ফেল।' ওদিকে ছোটখাটো জোৎদারদের কাছে খবর গেল, 'ভালো করে জড়িয়ে মটকি-মটকি ধান পুতে ফেলো মাটিতে—এক কণাও যেন সরকার না পায়।'

একদিকে ক্ষেতের পর ক্ষেত মাঠ জ্বলে যেতে লাগল; মটকিতে, চটে জড়িয়ে চা'ল গৃহস্থ পুতে ফেলতে লাগল। আবার অন্য দিকে নৌকো-

বোম্বাই গাড়ী-বোম্বাই সস্তা চা'ল' ততক্ষণে পাড়ি জমিয়েছে জেলা ছেড়ে কলকাতা-হাওড়ার পথে। শিবুদা বিব্রত হয়ে পড়লেন—কি হবে ভবিষ্যৎ ফসলের?

'এর থেকে মজুত-বিরোধী আন্দোলন বন্ধ হলেই ভালো ছিল'—বললে শিবুদা' শহরে গিয়ে প্রমথকে।

প্রমথ তাঁকে তাড়া দিয়ে বললে, লোককে বুঝাতে পাচ্ছ না—এখন উল্টো হাল ছেড়ে দিচ্ছ। লোকের সঙ্গে থেকে মজুত ধরো। তাদের নিয়ে গাড়ী নৌকো বন্ধ করো। তাদের জন্য আদায় করো এখানকার মজুতদারদের কাছ থেকে ধান-চা'ল।

শিবুদা' বুঝল, তাই তো লাইন ভুল হয়েছিল। ফিফ্‌থ্‌ কলামের কাছে হারলে চলবে কেন?

দ্বিগুণ উৎসাহে লাগল শিবুদা' মজুত-বিরোধী অভিযানে। যারা মজুত ধরবার ভার পেয়ে এসেছে তারা কিন্তু গা করে না। মজুত ধরতে তাদের মোটেই উৎসাহ নেই। দারোগা বললে, কি যে বলেন আপনি, শিবুবাবু? 'মজুত' দেখছেন কার ঘরে? মোক্ষদাবাবুর? পূর্ণ সাহার? যেমন কথা আপনার। মোক্ষদাবাবু প্রেসিডেন্ট-পঞ্চায়েৎ মানুষ—তিনিই হলেন ইউনিয়নের 'মজুত-অভিযানের' কর্তা। পূর্ণ সাহা —মহাজনী করে, ভালো অবস্থা; আপনাদের তার উপর রাগ আছে—যা তা বলছেন।

শিবুদা' বিরক্ত হল না; ফিএ্‌থ্‌ কলামকে হারাতে হবে। পাহাড়-খাড়ীর কেন্দ্রে গিয়ে হাকিমের কাছে সে হাজির। অভিযানে তাঁরা আসল লোকদের ছেড়ে দিচ্ছেন কেন?

সাব ডেপুটি মুখার্জি সাহেব চুপ করে শুনলেন, বললেন, আপনারা গুরুতর অভিযোগ করছেন—প্রেসিডেন্ট-পঞ্চায়েৎ, দারোগা সবাইকে জড়িয়ে। প্রমাণ করতে পারবেন ?

প্রমাণ হাতে হাতে রয়েছে। চলুন দেখবেন।

আচ্ছা যান। আমি যাচ্ছি।

পরদিন মুখার্জি সাহেব নিজে গেলেন। কিন্তু কোথায়! মোক্ষদাবাবুর রিপোর্ট রয়েছে, কি ভাবে তাঁর ইউনিয়নে অভিযান চলেছে! সব দেখালেন মোক্ষদাবাবু। বললেন, দেখবেন? আসুন, আপনি দেখবেন শোবার ঘর, তক্তপোষের তল, সবই দেখুন। মিষ্টার মুখার্জি বুঝলেন, তা নিষ্ফল। তবু নিয়ম বজায় রাখবার জন্য দেখে গেলেন বাড়িঘর।

পূর্ণ সাহার ওখানেও এরূপই ঘটল। মুখার্জি সাহেব ফিরে এসে সন্ধ্যায় ডাকালেন শিবুদাকে।

আপনার নালিশ তো মিথ্যা হল।

শিবুদা' বললেন, আপনার কেরানী-পিয়ন ওঁদের খবর দিয়েছে, কাল ওঁরা সব সরিয়েছেন, রাত্রিতে।

কোথায়? তখন বললেন না কেন?

তখন জানতে পারি নি। চলুন, এখন দেখাব। মোক্ষদাবাবুর বাড়ির পিছনকার সুপারি বাগানের পরেই তাঁর রায়ৎবাড়ি—দেখবেন সেখানে।

মিষ্টার মুখার্জি বললেন, শিববাবু, আমি বুঝেছি সব; চা'ল দেশেই আছে জানি। কিন্তু সে থাক, এখন আপনার বিরুদ্ধে যে নালিশ তার কি জবাব দেবেন তাই বলুন? আমি অবশ্য কিছু হুকুম দোব না। কিন্তু আমি ছোট হাকিম। থানার দারোগার রিপোর্ট যাবে। মোক্ষদাবাবু, পূর্ণবাবুও চুপ করে থাকবেন না। অতএব, কৈফিয়ৎ নিয়ে তৈরী হোন।

মজুত-বিরোধী আন্দোলন শেষ হল। সাতদিনের মধ্যে শিবুদা'র উপর নোটিশ ১০৭ ধারার—'কেন তোমাকে আইন অনুসারে অভিযুক্ত করা হইবে না তাহার কারণ দর্শাও'—পাহাড়খাড়ীতে সে পরম অশান্তি সৃষ্টি করছে। প্রমাণেরও অভাব নেই—সে সম্মানিত লোকজনকে পর্যন্ত নাজেহাল

করতে চেয়েছে। ভয়ে তাই সাধারণ লোক ক্ষেতের ফসল পুড়িয়ে ফেলছে ; যার যা ঘরে ছিল তাও নষ্ট করে ফেলছে।

শিবুদা' শহরে এসে উপস্থিত। বিনয় বললে, কি শিবুদা, খুব মজুত করেছিলেন বুঝি ধান-চা'ল ঘরে ?

শিবুদা' মৃদু হেসে বললে, তাই। মানুষ খেতে পারছে না। মুখে ওরা বলে, 'বছরকার পূজাপার্বণের চা'ল রাখছি'। ওদিকে বিক্রী করছে মুনাফাদারদের কাছে।

নইলে ইব্রাহিমভাই চা'ল পাবে কোথায় ? সৈন্যরা খাবে কি ? ইদ্রিস্ মিঞার 'লেবর কোর' কাজ করবে কি করে ?

দু'দশ হাজার মণ চা'ল ধরা যা পড়েছে তা জমা হয়েছে কোথাও থানার হাতায়, কোথাও প্ল্যাটফর্মের উপরে। বিনয় 'দুর্ভিক্ষ-ত্রাণ সমিতি'র পক্ষ থেকে বললে, এ চা'লটা স্থানীয় লোকদের বাঁধাদরে দেওয়া হোক্। যেমন বাঁধা বরাদ্দ তেমনি তারা যেন পায়।

মিষ্টার সামেদ বললেন, তাই দোব। কিন্তু উপর থেকে হুকুম আসা চাই। ততদিন দেরী করুন।

এদিকে ওরা মরছে যে। সর্বেখালি গল্লাখালির দিকে আপনারা লঙ্গরখানা খুলেছেন মাত্র তিনটা। তাও প্রেসিডেন্ট-পঞ্চায়েৎরা যে কি করেন তা তো জানেন না। ওখানে ত্রিশটা লঙ্গরখানা হলেও মানুষের যথেষ্ট হবে না।

সবশুদ্ধ জেলায় এখন পঁচিশটা লঙ্গরখানা চলছে। আমরা আরও পঁচিশটা এখনি খুলছি—মোট খুলব একশ'টা।

বিনয় একটু আশ্বস্ত হল।—কবে খুলছেন ?

সাপ্লাই পেলেই। সাপ্লাই কবে পাব, তা কি করে বলি, বলুন। সাপ্লাই —আমাদের জন্য রওনা হয়েছিল—উত্তর বাঙলা থেকে। কিন্তু বুঝ্‌ছেন তো কাণ্ড। শান্তাহার না পার্বতীপুরে পৌঁছতেই মিলিটারি নাকি গাড়ী ধরে

নিয়ে চলে গেছে। তাদের দরকার আসামে না কোথায়। জানি না, সত্য না মিথ্যা। আবার মাল গাড়ী পেলেই সাপ্লাই এসে যাবে!

তবু একশটা লঙ্গরখানা জেলায় চলবে শুনে বিনয় একটু আশ্বস্ত বোধ করছিল। সবগুলি চললে হয়ত মানুষ একটু বাঁচবার পথ পাবে। কিন্তু চাল কোথায়? কোথায় মালগাড়ী? একদিন রেল খুলে ইংরেজ বলেছিল, 'আর দুর্ভিক্ষ হবে না এ দেশে'। আজ দুর্ভিক্ষ যখন এল দেখা গেল, রেলগাড়ীও নেই—যা আছে, আছে ইব্রাহিমভাই আর মিলিটারি কণ্ট্রাক্টারদের জন্য, বিদেশে চালানের জন্য,—দুর্ভিক্ষ বাড়াবার জন্য।

তবু চা'ল এলেই —চল্‌বে একশ'টা লঙ্গরখানা।

সর্ষেখালি থেকে মজিদ এল। 'একশটা লঙ্গরখানা?' শুনে সে বললে, ডাক্তারদা', আপনার ভুল ধারণা। আজ এক হাজার লঙ্গরখানা চালালেও এ জেলাকে বাঁচানো শক্ত। চরের কথা ভেবেছেন? সেখানে সব চাল লুঠ হয়ে গেছে। সর্ষেখালি, সল্লাখালি—তার কথা এখন চোখে দেখলেও বিশ্বাস করতে পারবেন না। সেই চাষবন্ধ আর নৌকো কেড়ে নেওয়ার আমল থেকে ওরা কেবল মারই খেয়েছে। শুরু তখন থেকে। আজ মানুষ নেই, কঙ্কাল। ঘরবাড়িতে লোক জন আছে মনে হয় না। পথের দু'পাশে মানুষ শুয়ে আছে—শক্তি নেই উঠবে। মরছে আর মরছে। সাধ্য নেই কেউ মাটি দেয়, কাঠ নেই পোড়ায়—খালের ধারে, মাঠে শেয়ালে শকুনে মড়া নিয়ে টানাটানি—যাবেন? দেখবেন?

মজিদ বলে চলল, বিনয় স্তম্ভিত হয়ে গেল শুনে। কচু নেই, মেটে আলু নেই, গাছের কোনো ফল নেই যে আর খাবে। কি চাই তবে? আরও লঙ্গরখানা, খিচুরি, ফ্যান। এখন আর ওরা ভাত চায় না, ফ্যান-ভাতও চায় না; শুধু ফ্যান চায়, ফ্যান। অথচ মাইল পনের দূরে—পথ আছে, খাল আছে, মালও আছে—জাহাজমারায় এখনো কিছু ধান

আছে, হুষিপুরের গুদামে গুদামে এখনো চাল আছে। ওদের অঞ্চল থেকেই খালে মাঠে পথে সে চা'ল গিয়েছে ওখানে।

ওরা লুঠ করে না কেন?—অসহ্য বেদনায় বিনয় বলে ফেলল।

মজিদ বললে, তাও ওরা জানে। ওদের সংগঠন নেই। আর ভদ্রলোক, বিত্তবান লোক, দোকানী-পশারী, উকিল-মোক্তার, জমিদার-মহাজন—সবাই লুঠ হলেই চিৎকার করবে, 'আমাদের ধনপ্রাণ গেল। সরকার করছে কি'? তারপর—সবই জানেন।

সবই জানে বিনয়। চোখের উপর আগেও তা দেখেছে। লুঠ করবে কার বাড়ি? মুকুন্দপালের গদি? সুরেন চৌধুরীর আড়ৎ? আরসাদের গোলা? ইব্রাহিমভাইদের গুদাম? শেওড়াতলীতে লুঠ করতে গেলে আজ মোক্ষদাবাবু বন্দুক বের করবেন। তারপর তাঁর উকিল বৈকুণ্ঠবাবু শহরে সাহেবের সঙ্গে দেখা করবেন। হিন্দুসভা বিচলিত হবে। লীগের কর্তারাও চমকে যাবে—এর পরেই সাহস করে ওরা হয়ত ইব্রাহিমভাইয়ের গোলায় হানা দেবে। স্থানীয় সংবাদপত্রে চিৎকার উঠবে। কলকাতার কাগজে বের হবে—'ভদ্রলোকের ধনপ্রাণ আজ নির্বিঘ্ন নয়।'

ওরা জানে, লুঠ করলে ওদের পথ নেই।

মজিদ বললে, সে অভিজ্ঞতা যাদের নেই, লুঠ না করলেও যাদের চলে, তারাই শুধু এ গঞ্জনা দেয়, 'ওরা লুঠ করে না কেন?' আর তাদেরই শ্রেণীর তাদের আত্মীয়বন্ধুরা বলবে, 'পুলিশ এসব চোর-ডাকাতকে দেখছে না। আমাদের ধনপ্রাণ গেল।'

লুঠ করে না কেন নয়, ওরা জোট বাঁধে না কেন—এই প্রশ্ন।

বিনয় জানে তা।

সুধা নিশ্চয়ই ষ্টেশনে এসে অপেক্ষা করবে। চিঠি দিয়েছে বিনয় তাকে। সেখানে হেনাও আসবে হয়ত, শচীপ্রসাদও আসতে পারে। বিনয়ের মনে পড়ে গেল—নিশ্চয় সুধাও আসবে ষ্টেশনে। কি বলে বিনয় তা হলে সুধার সঙ্গে সাক্ষাতের কারণ বুঝিয়ে দেবে হেনাদের? বিনয় কি বলবে? কিছু বলবে না শচীদাকে হেনাকে? সুধাই বলুক না?—বলুক সুধা, 'সাহসিকা' সে।—তা'ই তো ঠিক কথা। সুধাই নিজে বলুক তার মনের ইচ্ছা, তার অভীষ্ট সম্পর্ক।

বিনয় নিজের হাত থেকে এভাবে সুধার উপর এ দায়িত্বভার সমর্পণ করে মনে মনে একটা স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করতে চেষ্টা করতে লাগল।

সেই কলকাতা—পা দিতেই এখানে বিনয়ের মন আবার নিরাশার সাক্ষাৎ পেল। সুধা আসে নি? না আসুক, বাঁচা গেল, হেনার কাছে এখনি কোনো কৈফিয়ৎ দিতে হল না বিনয়ের। তবু বড় খারাপ লাগছে বিনয়ের। আবার সঙ্গে সঙ্গে সে ঠিক করেছে, নিজের মনে এই হতাশাকে স্থান দেবে না, ঝেড়ে ফেলে দেবে তা এখনি।

বিনয় বাড়ি পৌছে স্নান সেরে নিতে নিতে বাড়ি এসে গেল শচীদা'। তার মুখ উজ্জ্বল, কর্মতৎপরতায় সে যেন স্বচ্ছন্দ। বললে, কি যে হয়েছ! নিজের ব্যবসা ন্যাশনাল মেডিসিন, তা দেখছ না। জিজ্ঞাসা করলে সে সম্পর্কে একটা কথা লেখো না।

দরকার কি? ল্যাবরেটরিতে কেমিষ্টরা আছে, তুমি আছ—যা ভালো বোঝ করবে। আমি মাঝখান থেকে কথা বলে কি লাভ পাব?

শচী প্রসাদ খুশীই হল। তবু বললে, ওহে নিজের জিনিস তবু দেখতে হয়। এই তো সেই ইন্‌ভেষ্টমেণ্ট ট্রাষ্টটার খোঁজ নাও না। তুমি তো পঁচিশ হাজার টাকা দিয়ে চলে গেলে। এদিকে মিষ্টার মুরারি সেন আমার মাথা খান, 'মত দিন—এখানে টাকাটা খাটাব, না ওখানে?' আমি

কি জানি? ইন্‌ডাষ্ট্রি হয় তা বুঝি—কারখানা বসাও, মাল তৈরী হোক; কাটতির ব্যবস্থা হবে, ডিভিডেণ্ড দোব, নতুন মেশিন আনাব। কিন্তু এই 'হাই ফিন্যান্স' আমি বুঝি না। ওঁদের তাতে মাথা খেলে। শাদা কাগজে মুরারিবাবু কত লক্ষ টাকা করে ফেললেন তখন। শৌরীন পর্যন্ত সাহিত্য আর কাগজের ব্যবসায়ে হয়েছে এখন লাখপতি। চা'লের বাজারে ট্রাষ্টের টাকা খাটছে। মিষ্টার সেন তাঁর ছেলেকে শুদ্ধ ট্রাষ্টে নিয়ে এসেছেন, তাকেই করতে চান পরে ম্যানেজিং ডিরেক্টর।—সেসব নিয়ে একটু কথাও উঠছে। মুকুল সেন ছেলে মানুষ এখনো। আমার মাথায় আসত না অত ধান-চা'ল। বলতাম, 'কেন আপনার কাপড়ের কলটা বড় করুন।' নইলে বলতাম, 'আসুন আমার লোহার কারখানাটা বড় করি। সেলাই কল আর সাইকেল তৈরীর কারখানা করি।' কিন্তু মিষ্টার সেন চমৎকার বোঝেন ফিন্যান্স। শৌরীনেরও বেশ মাথা। বলে, 'ইন্‌ডাষ্ট্রিতে এ টাকা এখন ঢেলে আপনি দাঁড়াবেন পাঁচ বছর পরে। ডিভিডেণ্ড তখন দেবেন শতকরা ছ'টাকা। এখন তার আগে পাবেন কি? পেলেও ইন্‌কাম ট্যাক্স আর ই-পি-টিতে আজকাল সব শুষে নেবে। তার থেকে দিন টাকা আজ চা'লে, কাগজে, কয়লায়, চিনিতে—এক মাসে দাম দ্বিগুণ হচ্ছে—একশতে অন্তত এক শত টাকা লাভ এক মাসে। ইন্‌ডাষ্ট্রিতে আজ টাকা দেয় কে?' সত্যি, সেই পাঞ্জাবী খরমবীর মেহ্‌রা, ভাটিয়া পরমেশ্বরপ্রসাদ, মারোয়াড়ী হরসুখলাল—সবাই এখন এখানে। কেউ এখন কল-কারখানায় টাকা আবদ্ধ করে রাখে না। এই সব কেনা-কাটার ব্যবসায়ে টাকা খাটাচ্ছে তারা। ছাখো না, আমার এমন লোহার কারখানাটা আরও বড় করব, নতুন মেশিনারি পাচ্ছি; তার জন্যও মুরারিবাবু বেশি টাকা ধার দিতে চান না। বলেন, 'লাভ তো আর বেশি হবে না, এক্সট্রা প্রফিট্ ট্যাক্স দিয়ে কি থাকবে? তার চেয়ে চা'লের বা কয়লার বাজারই ভালো।' বরং তুমি বলো তো তোমার ন্যাশনাল মেডিসিনে ট্রাষ্ট টাকা দেবে। ওষুদের বাজার এখনো

চড়ছে—আরও চড়বে। তাই তো বার বার লিখি—আর তুমি সে সব কথার জবাবই দাও না।

বিনয় একটা নতুন দিক দেখতে পেল। বললে, তা হলে ওঁরাও চা'লের কারবারে আসছেন, কল-কারখানায় মনোযোগ দিচ্ছেন না?

সুরেন্দ্র সাহা পাটের, টিনের ও কাঠের ব্যবসা করত বেগমপুরায়। তবু চা'লের ব্যবসায়ে হাত দিয়েছে, বিনয় দেখেছিল। সে মনে করেছিল, ওরা ব্যবসায়ী, লাভই ওদের বড় কথা। দেশের ইন্ডাষ্ট্রির কথা ওরা ভাবতে জানে না। কিন্তু বিনয় এবার শুনছে ব্যাঙ্ক ও কল-কারখানার মালিকেরাও চা'লের বাজারে নেমে পড়েছে।

মনোযোগ দেবেন না কেন? তবে টাকা আজ এসব বাজারে।

চোরাবাজারে বলো।—বিনয় বললে।

কেন? চোরাবাজার কি বাজার নয়?—অসন্তুষ্ট হল শচীপ্রসাদ,—মুরারিবাবু ঠিক বলেন, 'আসল বাজার তোমরা বন্ধ করলে—চোরের দল। সেটা চোরাবাজার হল না, আমাদের এটা চোরাবাজার! ইব্রাহিমভাইর বাজার হল সাধুবাজার—লাট সাহেবের মত আছে বলে? আর আমরা দেশের লোক, দেশের লোককে চা'ল দিচ্ছি, যে করে হোক কিনে-কেটে—সেটা হবে চোরাবাজার?'

বিনয় তর্ক করলে না। সবে এসেছে, আবার শচীদা'র সঙ্গে এখনি তর্ক বাধাবে নাকি? বললে, আমরা ভেবেছিলাম, ইব্রাহিমভাইরাই সব চা'ল লুঠ করেছে।

করেছেই তো।

কিন্তু এই যে বললে মুরারি বাবু, পরমেশ্বরপ্রসাদ—ওঁরাও এদিকে নেমেছেন ব্যবসায়ে।

মুরারিবাবুরা তো নতুন নামেন নি—আগেই ছিলেন এদিকে,—সেই হক সাহেবের সময় থেকে। কত করে সেথায় ইব্রাহিমভাইর

একচেটিয়া সেই এজেন্সিতে তাঁরা ভাগ বসালেন—চার আনা—মনে আছে ?

বিনয়ের মনে আছে। বললে, তা হলে ইব্রাহিমভাই ধরা পড়েছে একা কেন ?

তুমি বুঝছ না বিনয়। শুনবে'খন কাল ওঁদের থেকে।

বাঙ্‌লা দেশের ব্যবসায়ীদের বাঁচাতে হবে। মুরারি সেন বিনয়ের জন্য অপেক্ষা করছেন। ডাক্তার খানকে সামনে রেখে এজন্য তিনি বেঙ্গল রাইস্ মিলস্ ওউনারস্ এসোসিয়েশন গড়ছেন। ঠিকই করছেন। বাঙালীর চা'ল বাঙালীর হাতে না থাকলে বাঙালী তো মরবেই।

এ কথা বিনয় মানে। ইব্রাহিমভাইরা বাঙালী হলে আজ হয়ত বাঙলায় এত ভয়ানক অবস্থা হত না। কিন্তু ধরমবীর মেহ্‌রা, পরমেশ্বর প্রসাদ, হরসুখরায়—এরাও তো কেউ বাঙালী নয়। অথচ এরাও চা'লের সরকারী এজেন্ট। আর বাঙালী হলেই বা কি ? মুকুন্দপাল, আরসাদ, মোহনবাঁশী, সুরেন্দ্রবাবু বাঙালী হয়েও তো বাঙালীর দিকে দেখে না। না, শচীদা না বুঝুক, বিনয় মনে মনে এটাও বুঝছে, লাভের খুন যাদের মাথায় চেপেছে, তাদের একটু পরেই আর দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞান থাকে না।

কিন্তু বিনয় তর্ক করতে চাইলে না।

শচীপ্রসাদ ততক্ষণ বলছে, ইব্রাহিমভাইর ফাঁস থেকে বাঙলাদেশকে এখন না বাঁচালে আর রক্ষা আছে ?

কিন্তু কি করে ফাঁস আল্‌গা করবে ?

শচীদা' খুব বুদ্ধিমানের মত হেসে বললে, ত্যাখোই না, কি করে ওরা মন্ত্রিত্ব চালায়। লোকজন খেতে পায় না, মানুষ মরছে—ওরা খাওয়াক না এখন যেখান থেকে পারে।

তাই তো বলি—লোকজনকে বাঁচাবে কি করে ?

ওরা মন্ত্রী, ওরা চা'লের এজেন্ট ; ওরা বুঝুক এখন তা।

বিনয়ের মনে হল, না, শচীদা' দুর্ভিক্ষ দেখে নি—বিনয়ের কথা বুঝতে পারছে না। বিনয়ও যেন ওদের বুঝতে পারছে না।

বিনয়কে কে টেলিফোনে ডাকল। শচীদা ফোন ধরেছিলেন। মৃদু হেসে ফিরে এসে বললেন, নাহে অদৃষ্ট খারাপ! যা ভেবেছি, গলাটা যখন এমন মিষ্টি মিষ্টি তখন আমাকে ডাকবে কেন? দেখলামও তা'ই। মধুকণ্ঠী বললেন, 'ডক্টর মজুমদারকে চাই'। কেন, বাবা, আমার বাড়ি, আমার ফোন, একবার মিথ্যা করেই বলো না, 'মিষ্টার চৌধুরী, আপনাকেই চাই।' —যাও ত্যাখো গে, তোমার আসবার আগেই কোন্ বান্ধবী পথ পানে চেয়ে আছেন।

বিনয় আনন্দিত হল, কিন্তু মুখে তা প্রকাশ পেল না। আশ্বস্তও হল বিনয়—শচীদা' পরিহাস-প্রিয়ই আছে। নিরাসক্তের মত বিনয় উঠে গেল, বললে, দেখি কাকে আমার ঘাড়ে চালান দিতে চাচ্ছ, শচীদা'।

একটু পরে এসে বিনয় বললে, অমিদা' ডাকছেন, তাঁর কাছে যেতে হবে।

'অমিদা' কে হে? সেই অমিত—কমিউনিষ্ট? তা তাঁর এত মধুর স্বর হল কবে থেকে? আর ওদের আর আছে কি এখন? ওদের তো পথে বসিয়ে দিয়েছে ষ্টালিন। পার্টি ভেঙে দিয়েছে।

বিনয় যা শুনেছিল প্রমথর থেকে তা বুঝিয়ে নিজে বললে, তা নয় হে, এবারই ওরা সত্যিকার পার্টি হতে পারে। এতদিন তো ছিল মস্কোর অনুচর।

রাখো, রাখো। মিষ্টার সেন বলেন, 'এখন হয়েছে ম্যাক্স্‌ওয়েলের গুপ্তচর।' স্যর রাজপ্রসাদ দাসকে মনে আছে? তিনি মিষ্টার সেনকে বলেছেন,—ম্যাক্স্‌ওয়েলের সঙ্গে ওদের ব্যবস্থা হয়েছে। এদিকে এখন আবার লীগের দালালি করছে এদেশে।

মিষ্টার সেনের কথা এ বিষয়ে আর বিনয় বিশ্বাস করবে না। সে জানে কত মিথ্যা ধারণা তিনি পোষণ করেন। কিন্তু তা নিয়ে তর্ক করে সে আবার শচীদা'র সঙ্গে ঝগড়া করতে চায় না। বিনয় বললে, নাইট-নবাবরা এসব জানেন বেশি। কিন্তু যাই বলো, এখন আর বলতে পারব না, ওরা ষ্টালিনের দল।

ষ্টালিনের দল হলে তো ওদের একটা ভয় থাকত,—দেবে ষ্টালিন ডাণ্ডা! একটা শাসন থাকত, তখন আর লিনলিথগোর পাণ্ডা হতে পারত না। ষ্টালিন মানুষ, ভায়া, পাকা গুণ্ডা। কিন্তু নিজের দেশকে সে ভালোবাসে, রুশিয়াকে বড় করছে—ঠিক করছে। এই কমিউনিষ্টরা ভাবে একবার নিজ দেশের কথা—ভারতবর্ষের কথা? ওরা চেনে ইংরেজকে। দিয়েছে ষ্টালিন তাই দল ভেঙে। দেবেনা? ভারী তাঁর মাথাব্যথা ওদের জন্য।

কিন্তু বিনয় তর্ক করলে না। তার কানে তখন পর্যন্ত সুধার কণ্ঠস্বর বাজছে, 'কখন দেখা হবে? কাল ষ্টেশনে খুঁজেছিলে? খোঁজ নি? মিথ্যা কথা। কাল, ত্যাখো, আমাদের মিটিং ছিল। এত কাজ, দেখবে'খন কলকাতার কি অবস্থা। সে সভা শেষ হলে আর ট্রাম পাই না। না, আমি আর বাড়ি থাকি না, এখানে আছি। আপিসে এসো—অমিদা'র কাছে। এখন আসতে পারবে না? আমি আসতে পারি নইলে।' ঠিক হয়েছে ত্ব'টার সময় অমিতের আপিসে দেখা হবে। বিনয়ের মনে সেই কথাই ঘুরছিল।

শচীদা' কারখানায় গেল। বিনয় এখন বেরুবে না, তুপুরে বেরুবে।

বসে বসে বিনয় গল্প করতে লাগল হেনার সঙ্গে, ইরার সঙ্গে, মন্নুর সঙ্গে। এমন করে আপনার লোকের সঙ্গে ও কতকাল যেন কথা কয় নি। ওর সমস্ত মন এজন্য যেন তৃষিত হয়ে আছে। সেই হেনা—তার স্নেহময়ী বোন—তেমনি আছে। বিনয় বলবে কি হেনাকে এখন সুধার কথা? বলা উচিত হবে আজ? না, সুধার সঙ্গে দেখা হোক আগে;

তারপরে, তারপরে বলবে বিনয় হেনাকে। হেনা কত গল্প করতে লাগল। ঊষা আর শৌরীনের কথা জানে কি বিনয়? সেবার বড় রাগ করেছে ঊষা, হঠাৎ বিনয় চলে গেল। শৌরীন বাড়ি কিনেছে। তার কাগজ খুব ভালো চলেছে। তা ছাড়া শাদা কাগজও আছে। শৌরীন্ এখন অনেক টাকার মালিক। যুদ্ধের নানা ব্যবসায়ে সে হাত দিচ্ছে। শৌরীনের সাহিত্যিক বন্ধুদের—সেই প্রদ্যোৎ দত্ত, সুরপতি চাটুজ্জে তাঁদের শুদ্ধ সেবার বিনয়কে একদিন চা-পার্টি দেবার ব্যবস্থা করছিল শৌরীন—বিনয় চলে গেলে ঊষাও দুঃখ করেছে।

আসে সে প্রায়ই—ঊষাদের সেই বন্ধুও এসেছিলেন—সুধা গুপ্তা। হাঁ, সুধা আসে মাঝে মাঝে—আপনা থেকেই জানাল হেনা।

সুধা আসে নাকি? বিনয় উন্মুখ হল তার সংবাদ শুনতে। কিন্তু হেনা নীরব। আর কিছু বলছে না কেন হেনা? তবে কি হেনা সুধাকে পছন্দ করতে পারে নি?

একটু নীরব থেকে হেনা নিজে নিজেই বললে, তা হোক। ওঁদের কারখানার ব্যাপার ওঁরা বুঝুন, আমার তাতে কি? দু'জন ওঁদের কারখানার মজুর—কি নাম, জানি না। মুসলমান,—তাদের ওঁরা ছাড়িয়ে দেন। তা নিয়ে খুব নাকি গোলমাল হয় কারখানায়। তারাই ছিল মজুর-ইউনিয়নের নেতা—সেই বোমা পড়ার সময়ে খুব কাজও করেছিল। তাদের জবাব দিলে সুধারা নাকি ওঁকে জব্দ করে। তারা লেবার কমিশনারকে ধরে, ওঁকে সে মজুরদের আবার কারখানায় নিতে হয়। উনি এজন্যে ভয়ানক খাপ্পা সুধাদের উপর। তা আমি কি করব? ঊষার সে বন্ধু, আমার তাকে ভালো লাগে, ইরার ভালো লাগে তার গল্প শুনতে—উনি রাগ করলে হবে কি? আমি তো যাই না তাদের সঙ্গে সভায়; তাদের সমিতিতেও যাই না, 'কিউ'তেও পাহারা দিতে যাই না। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নাকি তারা,—ওঁকে বলেছেন মিষ্টার সেন। ঊষা বলে, 'না'।

উষা যায় কাজে, তাতেও ওঁদের রাগ। শৌরীনও তাতে অসন্তুষ্ট। কেন? উষা কি মুরারি সেনের চাকরি করে? শৌরীন চাকরি করে বলে উষাও যাবে না 'কিউতে' কাজে? উষাকে শৌরীন আবার ক্ষুব্ধ করে তুলছে। সেদিন আমিও শৌরীনকে শুনিয়ে দিয়েছি। 'বাড়ির সামনে সারে-বসা মেয়ে-পুরুষ, এ দেখে কে না চায় কিছু করতে? কাজ করতে পারি না, যা পারি দিই টাকাকড়ি, তাও দোব না? অন্য মেয়েরা এত কাজ করে—তাদের দোষ দেবে 'ওরা পথে পথে ঘুরে বেড়ায়।' কাজ যে করে সে ঘরে থাকলে কাজ হয় না কি?

বিনয় ভাবলে, হেনা কি একটু বদলেছে? এ সব কথা সে আজ ভাবে? না, এ শুধু তার দাদার প্রতি ভালোবাসা? যাই হোক্ সুধাকে হেনা অপছন্দ করে না। তবে বিনয় বুঝছে সুধার ও উষার কাজকে উপলক্ষ্য করে হেনাতে-শচীপ্রসাদে একটু কথা কাটাকাটি হয়; শৌরীনও খুশী নয় উষার কাজে। কিন্তু এ শচীদার অন্যায়, বিনয় তা বলতে বাধ্য। শৌরীনই বা অমন ভাবে কেন? সে তো যথেষ্ট আধুনিক, সোশ্যালিষ্টও? সেবার তো আগষ্ট আন্দোলনে সে আর মুরারি সেন ছিলেন প্রধান উৎসাহদাতা। তাদের ভালো লাগে না 'দুর্ভিক্ষের সাহায্য', তাই উষাও তা করতে পাবে না? শচীদা'র ভালো লাগে না, হেনারও ভালো লাগবে না সে জন্য? এর পর ওরা বলবে হয়ত বিনয়েরও ভালো লাগা উচিত নয়। আর ভালো লাগবে না সেজন্য এরূপ কাজের মানুষদেরও,—সুধাকেও?

বিনয় হেনাকে বললে, যে দুর্দশা মানুষের, হেনা! এখানে কি দেখছ তোমরা জানি না। কিন্তু আজ মানুষের কি অবস্থা—সে একবার কলকাতার বাইরে গেলে বুঝতে। ওরা বুঝবে না—ওরা আর একটা নেশায় আছে—কল-কারখানা, টাকাকড়ি, লাভ ক্ষতি এসব নিয়ে ব্যস্ত ওরা। কিন্তু হেনা, মানুষের দিকে তাকালে এসব মনে হয় মিথ্যা।

কিন্তু কল-কারখানারও একটা নেশা আছে, তাতেও একটা আনন্দ আছে। শচীদা'র সঙ্গে ন্যাশনাল মেডিসিন দেখতে দেখতে বিনয় তা'ই বারবার উপলব্ধি করলে। যাদুকরের হাত পড়েছে তাতে। বেড়ে উঠেছে তার সে কারখানা আশ্চর্য রকমে। তবু তো বিনয় বাজে ওষুধ তৈরী করতে নারাজ। তা করলে এতদিনে আরও তিনগুণ হত এ কারখানা, জানালেন কালীধনবাবু। এখনি যা হয়েছে, তা দেখে বিনয় অবাক হল। শচীপ্রসাদ যাদু জানে। সগর্বে সে বিনয়কে কারখানা দেখাচ্ছে—যেন কোন পুত্রগর্বিত পিতা তার আপনার সন্তানকে দেখছে, দেখাচ্ছে। বৃদ্ধ কালীধনবাবু তাদের সঙ্গে, পায়ে পায়ে—যেন কোন বুদ্ধিমান বালকের স্নেহগর্বিত শিক্ষক তিনি। নিজের কৃতিত্বের কথা না উল্লেখ করেই তা সব চেয়ে স্পষ্টভাবে প্রকাশিত করতে পারছেন—তীক্ষ্ণবুদ্ধি বালকই তো জীবন্ত প্রমাণ তাঁর কৃতিত্বের।

শচীপ্রসাদ বালবের কারখানায় যাবার জন্য বেরুতে বেরুতে সগর্বে বললে, এবার নিজে এসে যাও—তোমার রাজ্য তুমি চালাও, মহারাজ।

রাজারা রাজ্য চালালে দুদিনে রাজ্য নষ্ট হয়। রাজ্য চালাবেন মন্ত্রীরাই, কিম্বা ভাইসরয়—বিনয় সকৌতুকে উত্তর দিলে।

শচীপ্রসাদ খুশী হয়ে হেসে চলে গেল। বিনয় খানিকক্ষণ বসে থেকে দেখল কাজ চলছে। লেবরটরিতে তার নিযুক্ত কেমিষ্ট দু'জন গবেষণা করছেন। লোকজন খাটছে, চুল্লি জ্বলছে, চাকা ঘুরছে, নানা রস জ্বাল হচ্ছে। কলকারখানায় যে নেশা আছে বিনয়ের মন তা স্পর্শ করল। এত জিনিসের মালিক সে আজ—সে বিনয়। এ সবই তার আপনার জিনিস—তার নিজের, তার একার।

এ জিনিস আর কার হবে? শচীপ্রসাদ শীঘ্রই জানবে সুধাও তার একজন কর্ত্রী হয়ে উঠছে। আর শচীপ্রসাদ সত্যিই তাতে রুষ্ট হবে, ব্যথিত হবে—তার এত পরিশ্রম, এত সাধনা—সুধা কি বুঝবে তার মর্যাদা?

বিনয় শঙ্কায় সংশয়ে পীড়িত হয়ে উঠে পড়ল। সুধার সঙ্গে দেখা করতে হবে এখনি।

সেই কলকাতা দেখে গেছল বিনয় গত ডিসেম্বর মাসেঃ ভীত ত্রাসগ্রস্ত নগরী—যার পথঘাটের উপর দিয়ে পলায়মান জনপ্রবাহ ছুটছে নানাদিকে, দোকান বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, জিনিসপত্র পাওয়া যায় না, ময়লা পরিষ্কার হয় না। বিনয় শুনেছিল তিন সপ্তাহের মধ্যেই সে কলকাতা আবার প্রত্যাবৃত্ত লোকজনে ভরে উঠে; তারপর তার ঘর-দুয়ার ছাপিয়ে লোক আবার উপ্‌চে পড়তে শুরু করে। যুদ্ধের নানা আপিস এখানে, যুদ্ধ-সংক্রান্ত বহু কল-কারখানাও এখানে। ওদিকে সাজ-সরঞ্জাম ডকে নাম্‌ছে; পথের উপর দিয়ে মহাকায় মিলিটারী লরী ছুটছে; ক্ষুদ্রকায় জীপ্‌স কৌতুহল উদ্রেক করে চলছে; আর চারিদিকে লোক আর লোক আর লোক। বাস প্রায় নেই, ট্রামে উঠতে পারা যায় না, ট্যাক্সি দেখাই যায় না, রিকৃশ দেশী খদ্দেরের দিকে ফিরে তাকায় না। আর এদিকে-সেদিকে এখন ফুটপাথ ছাপিয়ে, পথ ছাপিয়ে সার করে বসে আছে গ্রাম-গ্রামান্তরের মেয়ে আর ছেলে। এই সেই 'কিউ'। বিনয় শুনেছিল তা লম্বা হয়েছে, দীর্ঘ হয়েছে, তা আর ফুরোয় না এখন। কিন্তু এক আধটা বাজারের কাছ দিয়ে রিকৃশ আসতে-না-আসতে সে বুঝল কি জিনিস এই 'কিউ'। মানুষ নেই আর, সেই তাদের সোনাপুরের মতই কঙ্কালের সার। তেমনি ক্লান্ত, ক্লিষ্ট, অন্নহীন, প্রায় বস্ত্রহীনও। চুল ওদের উড়ছে, দেহের অনেক প্রান্তই ওদের উলঙ্গ, মুখে ওদের অশ্রান্ত প্রতীক্ষা। কাছাকাছি জায়গা নোংরা হয়ে উঠেছে—বোধহয় ময়লা আর পরিষ্কৃত হয় না। একটা দুর্গন্ধ বিনয়কে যেন বারেবারে প্রতিহত করতে লাগল। একি হল এরা? সত্যই কি এরা দেহ-ধারণের মূলনীতি সম্বন্ধে এত উদাসীন? স্বাস্থ্য, পরিচ্ছন্নতা সব কি বাঙালীর অজ্ঞাত? বাঙালীর দেহ যে এমন দুর্বল, তাও বিনয় যেন আগে জানত না। প্রায়ই খর্বাকৃতি, কৃশ,

শীর্ণাকায়, কৃষ্ণবর্ণও। ফুটপাতে সার বেঁধে বসে আছে ঘেঁসাঘেঁসি করে। তাতে ধরে না, তাই রাস্তায় সার। আবার একসার দু'সার সেখানেও। যার যার কোট কেটে নিয়েছে আবার তারই মধ্যে—অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা এখানে আরও উগ্র। কারণ, পিছনে পড়ে গেলে আজও চা'ল পাওয়া যাবে না—ক্ষুধায় আরও জ্বলতে হবে। কেউ কেউ ইট পেতে বসেছে, অধিকাংশই বসে আছে খালি পথে। কখন দুয়ার খুলবে ঠিক নেই, তবে বিকালে একবার দোকান থেকে হয়ত চা'ল দেবে। তারপর? তারপর যারা পেল তারা ফিরে যাবে? যারা পেল না তারা চিৎকার করবে? এখানেই আবার তারা পরদিনের সারের জন্য সার বেঁধে বসবে, শোবে, ঘুমুবে—ফুটপাত জুড়ে, পথের উপরে, সারা রাত্রি। তাদের চারদিকে আবর্জনার স্তূপ জমে উঠবে; ডাষ্টবিন ছাপিয়ে বাজারের নোংরা তাদের উপরে পড়বে; তাদের ঘিরে দেহ-ব্যবসায়ীর লোকেরা অবির্ভূত হবে। ব্যবসাও চলবে—এই অন্নহীন, ক্লান্ত, শীর্ণ দেহগুলি নিয়েও ব্যবসা চলবে। আশ্চর্য মানুষ! অদ্ভুত পৃথিবী! অথচ দুকূল ছাপিয়ে চলেছে বৈভব! বিনয়ের কারখানায়ও কল ঘুরছে, মাল তৈরী হচ্ছে, ঐশ্বর্য উৎপন্ন হচ্ছে,—দিগ্‌দিগন্তে তার বৈভব বিস্তৃত হয়ে পড়ছে! এই তো এদেরই কানের উপর রেডিওর বিশ্বসংবাদ বর্ষিত হচ্ছে—গানও ছড়িয়ে পড়বে, আর নিশীথ রাত্রির নক্ষত্ররা ওদেরই মুখের দিকে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে থাকবে!

বিনয় উঠে গেল অমিতদের আপিসে তার খোঁজে। অমিত ছিল, হয়ত তার প্রত্যাশাও করছিল। দু'বাহু প্রসারিত করে তাকে আলিঙ্গন করে বসাল। বললে, এসো, এসো, এসো। সুধা তোমার সন্ধানে একটু আগেই এসেছিল, আবার আসছে। যা হাক, শেষ পর্যন্ত এসেছ কলকাতায়?

কি করি বলো? প্রমথও বললে, 'কনফারেন্সে আপনাকে যেতে হবে।'

নিশ্চয়। আসতে তোমার আপত্তি কি?

আপত্তি? আমি কি জানি এত সব রহস্যের?

তুমি যা জানো, তা এরা জানে নাকি? সাড়ে চারশ' ওঁরা প্রতিনিধি ডাকিয়েছেন—কে ডাকলে, কার প্রতিনিধি কিছু ঠিক নেই। তোমার মত এক ডজন লোকও নেই যারা কাজের সঙ্গে সংযুক্ত। চারশ' চল্লিশ জনই হয় শ্যামাপ্রসাদবাবু নয় মন্ত্রিত্বহারা মন্ত্রীমশায়দের বাছাই করা লোক—তারা কনফারেন্সে মন্ত্রিত্ব-ভাণ্ডার মহড়া দেবে। তুমি দুর্ভিক্ষ দেখেছ, হাতে কলমে কাজ করছ; আর এরা অধিকাংশ এখানে কথা বলছে।

যা দেখছি, তা বলতে পারি কই? বলবার মত শক্তি কই?

তোমাদের ও অঞ্চল, এদিকে চব্বিশ পরগনা, মেদিনীপুর—এসব জেলার কাহিনী বলবার মত শক্তি কারুর নেই। সে কথা ছেড়ে দাও। এখন করবার মত কি আছে, কি ভেবেছ—তাই বলো।

বিনয় বললে, সত্যি বলছি, বুঝে উঠতে পারছি না। যেদিকে হাত বাড়াই কেবলি দেখি দুয়ার বন্ধ, তালার পরে তালা।

ঠিকই দেখছ। কিন্তু তালা খুলতে হবে তবু।

চাবি চাই তো। চাবি আমি পাই না—বিনয় বললে।

চাবি হারিয়ে গেছে, তাও তৈরী করতে হবে—বললে অমিত তেমনি মৃদুহাস্যে।

বিনয় বললে, যেখানে তৃতীয় পক্ষ আছে,—আর সে তৃতীয় পক্ষের এক হাতে দণ্ড আর হাতে অর্থ—সেখানে এই চেষ্টায় পারব কেন?

অমিত হেসে বললে, সেই পুরনো তর্কই হল—তৃতীয় পক্ষ আর তার শক্তি। দুইই মানি। কিন্তু তার থেকে আমাদের দু'পক্ষের শক্তি বেশি

—তা'ও জানা কথা। অথচ সেটাই আমরা মনে রাখছি না, আর আজ তা ভুলেই যেতে শুরু করছি। কাজেও তাই ব্যর্থ হচ্ছি, আর ভাবি—কাজটাই বুঝি অসম্ভব।

সুধা এসে গেল। সেই সুধা! কোথা থেকে ঘুরে এসেছে বোধহয়। মুখ একটু শুষ্ক, আগেকার থেকে একটু রোগা হয়েছে সে এ ক'মাসে। বড় চোখ দুটিতে কিন্তু সেই অপূর্ব আলোক ছিটকে পড়ছে। বিনয় সোৎসুক কণ্ঠে বললে, বেশ যা হোক, বসে আছি কতক্ষণ ধরে।

এতক্ষণে তোমার দু'টো বেজেছে, না? তার আগে আসবে না তো। মশায়কে যত বলি ফোনে 'সকালে দেখা হয় না?' বলেন, 'দুটোর সময়'। বাবা, কাজের মানুষ—সময়ই হয় না।

সময় তো তোমাদেরই হয় না। এই কিউ, এই মিটিং, এই ফ্রণ্ট মিটিং, এই মহল্লা মিটিং—এই হল্লা মিটিং—সময়ই তোমার নেই।

তাই বটে! সোনাপুরের তার পেলে—অমনি একেবারে না-বলে না-কয়ে শেয়ালদ' ষ্টেশন, সোনাপুর। একটা খবর দেওয়ারও সময় হল না আমাদেরকে! কি কাজরে বাবা!

বিনয় লজ্জিত হল, কিন্তু মনে মনে আশ্বস্তও হল—সুধা তার ডিসেম্বরের অমন অপ্রত্যাশিত অন্তর্ধানে অন্যরূপ ভাবে নি। সে বললে, সত্যই কি কাজরে বাবা! মেয়েরা কনফারেন্স করছে—তাদের কলকাতার নেত্রী আসবেন, 'কম্‌রেড্ সুধা গুপ্তা'। কিন্তু হায়, তিনি কি কলকাতা ছেড়ে আসতে পারেন? তাহলে কলকাতার 'কিউ' একেবারে 'জেড' হয়ে যাবে।

দেখেছ তো 'কিউ'?

দেখবে চলো সর্বেথালি, সল্লাথালি, দেখবে চলো সোনাকান্দি—দেখবে হাকিমহাকা, মেহেরপুর।

দেখেছি চাঁপাডাঙ্গা, দেখেছি নেয়ামৎপুর—দেখেছি এই ডায়মণ্ড হারবার, বসীরহাটের গ্রামের পর গ্রাম—অবশ্য দেখি নি এখনো মেদিনীপুর।

কথা আর পরিহাস রইল না—দুজনাই আলোচনায় নিমগ্ন হয়ে পড়ল। এতদিনের পরে যে স্বচ্ছ পরিহাস এক নিমেষের জন্য কণ্ঠে জেগে উঠেছিল তা তাদের নিজেদেরই অজ্ঞাতে কোথায় চাপা পড়ে গেল। কিন্তু একটা সান্নিধ্য এই আলোচনার সূত্রেই স্থাপিত হতে লাগল।

আরও লোক এল। তারা ভাবতে বসল কি করা যায়। কখন আলোচনা থেকে সুধা উঠে পড়ল, বিনয়কে বললে, আমি যাব এবার। কাল দেখা হবে কি ? কখন ?

দুপুরে ?

তাই ঠিক হল। সুধা চলে গেল। বিনয় আবার আলোচনা শুনতে লাগল। যখন তা শেষ হল, তখন রাত হয়েছে। বিনয়ের তা খেয়াল হয় নি। বাইরে এসে বিনয়ের মনে পড়ল—তাই তো, সুধা তখন চলে গেল যে। তার সঙ্গে কোন কথাও হল না তো।

সন্ধ্যায় এদিকে শচীদা' বললে, গেছলে কোথায় ? তোমাকে নিয়ে যাবার কথা মিষ্টার সেনের ওখানে, কথাবার্তা হবে। বৈষয়িক কথাও আছে—ইন্‌ভেষ্টমেণ্ট ট্রাষ্ট আর ন্যাশনাল মেডিসিনের কথা। তারপরে এই কন্‌ফারেন্সের কথাও তো আলোচনা করতে হয়—ওঁদের আজ যাবার কথা ডক্‌টর মুখার্জির কাছে। তোমাকে নিয়ে যাবেন, অপেক্ষা করছিলেন।

দিনটা কি বৃথা গেল বিনয়ের ?

দুপুরে বিনয় সকাল করেই গেছল, সুধাও এসে গেল তাড়াতাড়ি। বললে, আমার কিন্তু একটু পরেই যেতে হবে তোমাদের পাড়ায়—

আমারও কিন্তু তখন যেতে হবে ডালহৌসি স্কোয়ারে।

কখন ? এখনি তো নয় ?

তুমিও তো এখনি যাচ্ছ না ? না, এখনি যাচ্ছ ?

সুধা হাসল।—এখন হলে এলাম কি করে?

যেমন করে আমি এলাম,—কাজ আছে বলে ফাঁকি দিয়ে।

ফাঁকি দোব কাকে? এ যে আমাদের পার্টি—ফাঁক নেই রেহাই পাবার। অমনি হিসাব নেবে—'কোথায় গেছলে? কখন? কেন? কাজে কেন গর-হাজির হলে?' তারপরে আবার সবাই মিলে তার সমালোচনা।

বিনয় জানে তা অল্পবিস্তর, তবু বললে, একেবারে চাকরিরও বাড়া।

চাকরি বলতে চাকরি! এ চাকরির বাইরে পরিচয়ই আমাদের নেই, অস্তিত্বও নেই।

সুধার কণ্ঠস্বরে একটা হাস্যতরলতা ছিল, কিন্তু বিনয় জানে—এ কথা সত্য। তবু এ সত্য বিনয়ের বিবেচনায় এক নিষ্ঠুর আত্মনিগ্রহও। সুধা তৎক্ষণে হেসে বলছে, যাই বলো, মুনিবের বিবেচনা আছে—বিশ টাকা বেতনের উপর এখন পাঁচ টাকা 'মহগাই' ভাতা দিচ্ছে।

বিনয় হাসতে চেষ্টা করে বললে, ভালোই তো। তবে এবার খাওয়াও না আমাকে—বেতন বেড়েছে।

কি খাবে, বলো?

আমার বুর্জোয়া টেষ্ট বলবে—লাঞ্চ এ্যাট ফার্পো।

আমার প্রোলিটেরিয়ান্ এথিক্স্ বলবে—চা এ্যাট প্যারাগন—রাজী?

এসো রফা করি - কফি—কফি হাউসে।

আচ্ছা। অমিদা'কে নিয়ে নিই?

কিন্তু অমিতকে পাওয়া গেল না। বিনয় বললে, তা হলে?

সুধা বললে, চলো দু'জনায়।

আনন্দে বিনয়ের মন ভরে উঠছিল। টেবিলে ওরা দুজনা শুধু। শুধু কফি খাবে।

কিন্তু সময়টা দীর্ঘতর করা যায় না?—বিনয় জিজ্ঞাসা করলে।

আমারি চাকরি যাবে দেরী করলে—সুধা হেসে বললে।

চাকর থেকে আমি তোমাকে মালিক করে দোব—বিনয় অর্থপূর্ণ হাসি হেসে বললে।

আমি টু প্রাউড টু বি এ বুর্জোয়া,—সুধাও বললে, হেসে,—তার চেয়ে বরং এসো, চাকরি চাও নাকি? দরখাস্ত করো, তোমাকে জোগাড় করে দিতে পারি কি না দেখি একটা চাকরি। সুপারিশ পত্র-টত্র কি আছে, দেখতে হবে।

বিনয় হেসে বললে, চাকরি করতে পারি,—সহকর্মী ভালোই; কিন্তু মুনিব পছন্দ হয় না।

সুধাও হেসে বললে, মুনিব এ কথা শুনলে হয়, আমি মরেছি। ওঠো এ বেলা—চলো। আমার চাকরিটা আর খেতে হবে না।

বাইরে এসে দাঁড়াল দুজনা—বিদায় নিলে। আনন্দের সঙ্গে সামান্য একটি প্রশ্নও বিনয়ের মনকে দোলা দিচ্ছে—কোন্ সংশয় যেন মাথা তুলে উঠছে। অমন উঠে পড়ল কেন তাড়াতাড়ি ওকথার পরেই সুধা? হয়ত সত্যি কাজ আছে। সুধা কি সত্যি চায় বিনয় তার মতবাদ গ্রহণ করবে?

বিনয়ের মনে তবু আজ আনন্দের একটি গুঞ্জন চলল।

শচীপ্রসাদ বললে, চলো, মিষ্টার সেনের ওখানে প্রথম।

মিষ্টার সেন বিনয়কে সসম্মানে অভ্যর্থনা করলেন। আগে কাজের কথা হল। ইন্‌ভেষ্টমেণ্ট ট্রাষ্ট নিয়ে কথা চলল। মুরারি সেন বললেন, জিনিসটা খুব বড় হয়ে গেল, ডক্‌টর মজুমদার। যে রকম এখন চারদিকে প্রসারের জায়গা—আগেকার মতো শুধু সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতে বদ্ধ রাখলাম না। পরমেশ্বর-প্রসাদ যুগলদাস এলেন, হরসুখরায়ও এলেন, পুরুখচাঁদও এলেন—পুরুখ-চাঁদরা অবশ্য অন্য মারোয়াড়ী দলের, সনাতনী; হরসুখরায়রা গান্ধীবাদী—

তবে পুরুখচাঁদরাই আগে বাঙ্‌লায় বড় ছিলেন। আর এদিকে ফজলভাইকে মনে আছে,—মেমন ব্যবসায়ী? সে তো ছিলই। সেও বললে, আর আমরাও দেখলাম কথাটা ঠিক,—ইব্রাহিমভাইদের একেবারে দূরে রাখলে ঠিক হবে না। ইলাহিভাই ইব্রাহিমভাই ওদের বড় অংশীদার, তিনিও এসেছেন।

বিনয় বললে, বাঃ, এযে একেবারে লীগ্-কংগ্রেস ঐক্য।

মুরারি সেন খোঁচাটা বুঝলেন। গোঁফটা যেন একবার নড়ে উঠ্‌ল, তারপর অমনি তার মধ্য দিয়ে তাঁর হাসি ফুট্‌ল। ভালো মানুষের মত হেসে বললেন, দেখুন, ব্যবসায়ে ওসব ছুঁৎমার্গ চলে না। বিশেষত এসব ফিন্যান্সের ব্যাপার। দেখুন মেহরা, মথুরাদাসজী, পুরুখচাঁদ, ইব্রাহিমভাইরা মিলে কেমন দু'তিনটা কোটি কোটি টাকার ব্যাঙ্ক ফেঁদেছে—

বিনয় তাঁকে শেষ করতে না দিয়ে বললে, আমি ওবিষয়ে একমত আপনার সঙ্গে। কোনো বিষয়েই আমি দেখি ছুঁৎমার্গ চলে না—কি ব্যবসায় কি পলিটিক্‌স্।

মুরারি সেন কথাটার মোড় অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতে চান। বললেন, এখন ওরা আরও মেমন ঢোকাতে চায়,—শুনেছেন তো মিষ্টার চৌধুরীর থেকে? সে লোকটা চা'লের কারবারের ঘুঘু। কিন্তু আমরাই কি তা জানি না? এতদিন চা'লের ব্যবসায় দেখছি—চা'লে তো টাকা দরকারই, তাতে এখন ফিরে আসে টাকা তাড়াতাড়ি দ্বিগুণ তিনগুণ হয়ে।

বিনয় বেশ বুঝছে তা। মুরারি সেন বললেন, অবশ্য ট্রাষ্ট অতটা পায় না। চা'লের নানা এজেন্টের নামে কাজ করতে হয়—তাদের কমিশান দিতে হয়। অন্য এজেন্টরাই কি অত পায়—ইব্রাহিমভাইরাই আসলে লুঠছে বাংলা দেশ। তবে ট্রাষ্ট মোটামুটি ভালই লাভ পায়। তারপরে তার বাজারে একটা দখলও হয়েছে। আমার সেই 'সোনার বাংলা রাইস্ মিলস্' ছিল। সহজেই তাই চেতলায় ওদের সঙ্গেও ট্রাষ্টের সম্পর্ক হয়েছে।

ঘুসুরি-মেমারির দিকে ট্রাষ্টের নিজেরই গুদাম রাখছিও। দেশের লোককে খাওয়াতে পরাতে হবে তো—নইলে তো সবই মিলিটারি নিয়ে নেবে।

মিষ্টার সেন তাকে বোঝাচ্ছেন, বিনয়েরও কৌতূহল বেড়েই চলছে। সত্যই কতটুকু জানত সে সোনাপুরে বসে আর্থিক জগতের এই আশ্চর্য সংবাদ? একই ব্যাঙ্কে, একই ট্রাষ্টে একত্রিত হয়েছেন বাঙালী ব্যবসায়ীর নেতা মিষ্টার সেন, আর মারোয়াড়ী ব্যবসায়ীর নেতা হরসুখরায়, গান্ধীবাদী হরসুখরায় ও সনাতনী পুরুখচাঁদ; একত্রিত হচ্ছেন ভাটিয়া মথ্‌রাদাস ও যুগলদাস আর মেমন ও খোজা, ফজলভাই ও ইব্রাহিমভাই। কি আশ্চর্য শক্তি চা'লের! চা'লের বাজার আজ ওঁদের একত্র করে ফেলছে—সম্পূর্ণ করছে লীগ-কংগ্রেস-মহাসভা ইউনিটি। শুধু চা'ল নয়—কাগজও আছে হয়ত। হয়ত কাপড়ও আছে। কয়লা আছে, চিনি আছে, ওষুধপত্রও—মানে, সমস্ত চোরাবাজারেরই জিনিসপত্র আছে। চোরাবাজারই দেশের 'গ্রেট ইউনিফাইয়ার'—ঐক্য-সংসাধক।

মিষ্টার সেন বললেন, ন্যাশনাল মেডিসিনের কথা হচ্ছিল। এই কিন্তু সময় তা বাড়াবার। আপনার টাকা চাই তো বলুন? ট্রাষ্ট আপনাকে ফিন্যান্স করতে পারে।

বিনয় বললে, সে শচীদা'ই আপনাকে বলবেন। তবে যাই করুন, আমি কিন্তু ওযুধ খারাপ হতে দিতে চাই না—ওখানে ভেজাল দিতে পারব না।

মিষ্টার সেন হাসলেন, বললেন, খারাপ করা না-করা কি আপনার হাত? ভেজালের কথা নয়, আপনি কেমিক্যাল্‌স্ পাচ্ছেন কোথায়? যা না পাবেন তা দেবেন কোথা থেকে? অথচ দেশের লোককে ওষুধ দিতে হবে। সামান্য যা দু'এক ফোঁটা ওষুধ পায় তাতেই ওরা বাঁচে, ঠিক নয়?

বিনয় জানে, এ কথাও সত্য। কিন্তু আজ সে বুঝছেও—এটা ওদের ভেজাল ওষুধ চালাবার পক্ষে ফাঁকিও। বিনয় কিছু বলল না।

বিকাল হল। মুরারি সেন বললেন, চলুন এবার হরসুখরায়জীর ওখানে। কন্‌ফারেন্সের ব্যাপারে একটা কিছু তো করতে হবে—আপনি তো শোনেন নি আমাদের আলোচনা। আপনার আবার সোনাপুরে কমিউনিষ্টদের সঙ্গেও খুব ঘনিষ্ঠতা। ডক্‌টর মুখার্জিদের তাই আপনার সম্বন্ধে ভয়—কিছু শুনেছেনও হয়ত কারুর থেকে। আমি বলেছি, 'আপনি জানেন না, ডক্টর মুখার্জি। কমিউনিষ্ট কি? ডক্‌টর মজুমদার আমাদের ব্যবসাপত্রে পার্টনার। বড় কারখানা ওঁর। তবে, হাঁ, উনি সোনাপুরে নানা লোকের সঙ্গে কাজ করেন। সে দেখুন, আমি ছিলাম ফরওয়ার্ড ব্লক, পরমেশ্বরবাবুরা গান্ধীভক্ত, আর পুরুখচাঁদ তো সনাতনী, হরসুখরায় কংগ্রেসও হিন্দুসভাও—তাতে হয়েছে কি?'

বিনয় কিন্তু এবার হাসতে পারল না কৌতুকে—তাকেও কমিউনিষ্ট বলে লোকে। সে বললে, দেখুন আমি কমিউনিষ্ট নই—বলতে বলতে মনে পড়ল ওর সুধার মুখ, তার কথা—'চাকরি চাও নাকি?' যেন বিনয়ের কোনো মতামত নেই। সে যেন সুধার মতে মত দেবে। বিনয় বললে, আমি মীর শাহেদুদ্দীনের দলের। শাহেদুদ্দীন্‌কে জানেন? তিনি মুসলিম কংগ্রেসম্যান। কিন্তু খাদ্য-ব্যাপারে প্রমথরাই ওখানে কাজ করে। তখন আমি তাদের সঙ্গে একত্র চলি, এখনো চলছি। আপনাদের কি এদিকে সিদ্ধান্ত বলুন তো?

চলুন, শুনবেন'খন।

সমস্ত সন্ধ্যা বিনয় তাঁদের আলোচনা শুনলে। কণ্ট্রোল থাকতে বাজারে চা'ল আসবে না; ভিন্ন প্রদেশের সঙ্গে কারবারের নিষেধ তুলে দিতে হবে; উড়িষ্যা, বিহার থেকে তা হলে সস্তা চা'ল আনতে পারা যাবে বাঙলায়; মন্ত্রীদের নিন্দা করতে হবে—তাঁদের এসব মজুর-বিরোধী ভাওতা মানা যায় না। মন্ত্রীদের ঘোঁটটা ভাঙা দরকার; কারণ লাটসাহেব, বিলাতী বণিক্ ও ইব্রাহিমভাই এই দল একত্র দাঁড়িয়ে গেলে ক্রমেই বাঙলা

দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য সব ওরা দখল করবে—হিন্দুর আর কিছু থাকবে না। এখনি নাকি কত কোটি টাকা ইব্রাহিমভাইরা চা'লের জন্য পেয়েছে। কিন্তু তার হিসাবপত্র নেই—দেয়ও না। ইব্রাহিমভাইদের কবল থেকে বাঙলাকে মুক্ত না করলে বাঙালীর রক্ষা নেই।

বিনয় আবার আশ্চর্য হয়ে ভাবল—অদ্ভুত শক্তি চা'লের, আশ্চর্য শক্তি। একই কালে সে একত্র করেছে—আবার সকলকেই নিযুক্ত করেছে পরস্পরের সঙ্গে সংগ্রামে। তার হাসি পেল, দুঃখ হল, কিন্তু কাকে সে বলবে একথা?

তবু বিনয় বললে, একটা কিছু করুন, শুধু প্রস্তাব পাশ করলে কি হবে?

মন্ত্রীরা থাকতে কিছু হবে না।

লঙ্গরখানা ও রিলিফ সোসাইটির জন্য একটা প্রস্তাব রাখুন।

সেসব আমরা কেন খুলব? ডক্‌টর মুখার্জিও বলেন, 'তা গবর্মেণ্টের কাজ, তাদেরই দায়িত্ব লোককে খাওয়ানো।'

তাই দাবী করুন। আরও লঙ্গরখানা চাই, সস্তা চা'ল-ডালের দোকান চাই। আর কিছু নিজেরাও খুলুন। না হলে লোকে কি বলবে? একটা কিছু করুন—না হলে কি ওখানে বসে প্রস্তাব পাশ করে আমরা ফিরে যাব?

সে ঠিক। কিছু করতে হবে। দেখি ডক্‌টর মুখার্জির সঙ্গে কথা বলে।

ট্রামে বিনয় বসে বসে ভাবছিল—এরা এখনো শহরে কণ্ট্রোলের কিউ দেখছে, কিন্তু বুভুক্ষুর কিউ দেখে নি বিনয়ের মত।

হঠাৎ চমকে উঠল বিনয়। কণ্ডাক্‌টারের সঙ্গে বচসা হচ্ছে যাত্রীর। সেই পুরনো পর্ব। টাকার চেঞ্জ নেই। যাত্রী অমনি কণ্ডাক্‌টারের ব্যাগ ধরে টান দিয়েছে।

চেঞ্জ নেই, কেমন ? খোলো ব্যাগ।

ব্যাগ ধরবেন না।

কেন ? চেঞ্জ নিয়ে ব্যবসা করছ, তা ধরা পড়বে বলে ?

সে কোম্পানি বুঝবে, আপনি এসব বলবার কে ?

কে হে নবাবপুত্র ! কোম্পানি দেখাচ্ছ ? কোম্পানি তোমার বাপ ?

সাবধান বলছি, তুমি-তোকারি ছাড়ো।

বেধে গেছে এভাবেই কলহ।

কত সহজে মানুষ ধৈর্য হারাচ্ছে। বিনয় বুঝতে পারছে—আর পারছে না মানুষ। পথে ঘাটে, দোকানে, কথাবার্তায় সহজেই মানুষ আত্মসংযম হারাচ্ছে ; ধৈর্যের, শিষ্টাচারের বাঁধ আর টিকছে না। এমনি দিন গেছে সোনাপুরে এক সময়—সাত মাস আগে। গাড়োয়ান, কুলী, দেশী ভদ্রলোক, সবাই এমনি তখন ধৈর্য হারাচ্ছিল সেখানে। আজ আর তা নেই—সবাই সেখানে হতাশ, মুমূর্ষু, হতবুদ্ধি,—অবসন্ন। তেমনি দিন আসছে নাকি কলকাতায়ও ?

যাত্রীতে-যাত্রীতে, লোকে-লোকে সর্বত্র বিনয় এবার কলকাতায় দেখছে এই ধৈর্যহারা মানুষ, তাদের মন আর সুস্থ স্বচ্ছন্দ নেই।

বিনয় যখন বাড়ি ফিরে এল তখন তার মনে পড়তে লাগল, এই রুদ্ধগতি, পথহারা, ধৈর্যহারা মানুষের ভবিষ্যতের কথা। আর মনে পড়ল এই ধনকুবেরদের আলাপ-আলোচনা। মনে পড়ল কি অদ্ভুত কাণ্ড চলেছে আজ চা'লের ব্যবসায়ে বাঙলা জুড়ে। বিনয় তার নানা সুড়ঙ্গ ও চোরাপথের আভাস পাচ্ছে। অথচ নিজে তার ঠিক মূল তত্ত্বটি খুঁজে পাচ্ছে না। কল-কারখানায় টাকা না খাটিয়ে সবাই চা'লে টাকা ঢালছে। একদিকে লাভের লোভে সবাই একত্র হচ্ছে ট্রাষ্টে, ব্যাঙ্কে, আবার অন্য দিকে পরস্পরকে চালমাৎ করবার চেষ্টা করছে নানা রাজনীতিক প্যাঁচে। কি হবে শেষ অবধি কে জানে ? কিন্তু এই মন্ত্রীমারা খেলায় বোড়েকে

মার দিতে কেউ ভাবছে না। কেউ ভাববেও না। বোড়েরা মরছে—মরছে সোনাপুরে, চাঁটগাঁয়ে, চব্বিশ পরগনায়, মেদিনীপুরে—মন্ত্রীমারা খেলার জোগাড়ে কেউ তা দেখছে না।...

তাদের বাঁচানো যায় না? কি করে বাঁচাবে তাদের বিনয়? তাদের সোনাপুরে হাজার লঙ্গরখানা এখনি পেলে হয়ত হয়। শহরে সস্তায় চা'ল পেলে হয়ত শহরের গরীবেরা বাঁচে। ছাত্র ও মাষ্টারদের জন্য আদায় করা যায় না মিষ্টার সেনের থেকে সস্তা কয়েক হাজার মণ চা'ল? ওর গুদামে চা'লের অভাব কি? শচীপ্রসাদেরও গুদামে চা'ল আছে—নিজের মজুরদের সে সস্তায় চা'ল দেয়—আর কিছু কিছু হয়ত বাজারেও ছাড়ে। বলছিল নিজেই শচীদা', 'পচে যাবে নইলে গুদামে। বিক্রী করে নতুন কিনতে হবে।' এরা দেয় না কিছু চা'ল—সোনাপুর ও বেগমপুরার মাষ্টার ছাত্রদের জন্য? দেবে না ইব্রাহিমভাই সর্ষেখালি, সল্লাখালির জন্য—কয়েক হাজার মণ তাঁর সুখিপুরের গুদাম থেকে? জাহেদুদ্দীন কলকাতায়—বিনয় তাকে দিয়ে মন্ত্রীদের বাধ্য করতে পারে না সোনাপুরে লঙ্গরখানা খুলতে? বিনয় তাকে ধরতে পারে, ধরতে পারে ইব্রাহিমভাইদেরও। শচীপ্রসাদকে নিয়েও মুরারিবাবুকে ধরতে পারে তাদের চালের জন্য।

এই তো কাজ! কি হবে সম্মেলনে জটলা করে?

মুরারিবাবু বললেন, বেশ আমি চা'ল দোব—পাঁচশ-পাঁচশ মণ মাসে। আমার উড়িষ্যার চালান এসে যাক,—তা আসতে পারছে না—উড়িষ্যা গবর্মেণ্ট আটকাচ্ছে। সস্তা দরে মাষ্টার ও ছাত্রদের সে চা'ল দেবেন। কিন্তু বৈকুণ্ঠবাবু এসেছেন। বললেন গরীব ভদ্রলোকদের বড় দুরবস্থা। তাঁদের বাঁচান আগে, এই গবর্ণমেণ্ট তো তাঁদের মারতেই চায়।

জাহেদুদ্দীন বিনয়কে নিয়ে চলল মন্ত্রীদের কাছে, বললে, দেখবেন, ডক্টর মজুমদার, কি না করছি আমরা। হক সাহেবের সাধ্য ছিল করে?

সুরাহবর্দী সাহেব বড় ব্যস্ত।—দিল্লী পাটনা ঘুরে এসেছেন,—ওসব গবর্মেণ্ট চা'ল ছাড়ছে না,—সেদিন তখন কোথায় তিনি বেরিয়েছেন। আর একজন মন্ত্রীর কাছে জাহেদুদ্দীন বিনয়কে নিয়ে গেল। সৈয়দ সাহেব। সজ্জন, বয়সও হয়েছে। তিনি ছিলেন নাকি মীর শাহেদের ভায়রাভাই; মীর জাহেদুদ্দীনও তাঁরই পার্লামেণ্টারি সেক্রেটারি।

একজন বয়স্ক অফিসার সেখানে বসে—ডেপুটি সেক্রেটারি তিনি মন্ত্রীর। বিনয়কে দেখে লাফিয়ে উঠলেন।

ডক্‌টর মজুমদার না ?

এক বৎসর আগে দেখা হয়েছিল তু'জনায় চাঁপাডাঙ্গায়—ভিটে ছাড়াবার কাজে। মিষ্টার বিহারী সেন তখন ক্ষতিপূরণের ভারে ছিলেন সেখানে হাকিম। বিনয় গেছল সুধাদের সঙ্গে লোকজনকে সাহায্য করতে। সেই বিহারী সেন, সুধার সম্পর্কে দাদামশায়। মিষ্টার সেন মানুষের অবস্থা জানেন। তখনি বলেছিলেন, বাঙলা দেশে চাষীর বাঁচবার পথ নেই, জমি নেই, হাল নেই, বলদ নেই, কিছু বলতে কিছু নেই—আছে এগ্রিকালচার ডিপার্টমেণ্ট আর তার এক্সপার্ট।

আপনি এখানে ?—বললে বিনয়।

আর ডক্‌টর মজুমদার, পেন্‌শেন নিতে চাই, মন্ত্রীসাহেব নিয়ে এলেন এখানে। এককালে সেটেলমেণ্টে সৈয়দ সাহেব ছিলেন হাকিম, আমি তাঁর সহকারী। তাই আজও আমাকেই হতে হবে ওর সহকারী।

সৈয়দ সাহেব হাসলেন, নইলে সব ছোকরা আই-সি-এস্ এনে কি হত ? কি জানে তারা দেশের মানুষের ?

মিষ্টার সেন হেসে বললেন, জেনেই বা কি লাভ হচ্ছে আমাদের ?

মন্ত্রী বাহাদুর জানালেন বিনয়কে কথায় কথায়, আমরা কাজ করতে চাই, গবর্মেণ্ট অব ইণ্ডিয়া বাধা দেয়। মনে করছি দেখি আর ক'দিন। না পারলে ছেড়ে দোব। শুধু শুধু মন্ত্রিত্ব নিয়ে বসে থাকব, তেমন লোক

আমি নই। আমার ঢের কাজ আছে—দেশের লোককে আমি 'সার্ভ' করতে জানি।

জাহেদুদ্দীন খুব সদিচ্ছার সঙ্গে অমনি বললে, অমন ছাড়বেন না, সৈয়দ সাহেব। একটা লোক নেই আপনি ছাড়া যে কিছু বোঝে, কিছু করবে।

বিনয় দেখল মিষ্টার বিহারী সেন হাসি গোপন করছেন।

আমিই বা করতে পারছি কি?—বললেন মন্ত্রীবাহাদুর, এই তো করছি 'ফসল বাড়াও' আন্দোলন। চাষের যোগ্য পতিত জমি রয়েছে। বললাম, গ্রামের জমিশূন্য লোকেরা এই যুদ্ধের সময় তা চাষ করুক। একটা অর্ডিন্যান্স হবে, এক বৎসর আগে এ কথা ঠিক হয়। আপত্তি তুললেন তখন এ্যাডভোকেট জেনারেল—'এ ব্যবস্থা জমিদারী আইনের বিরুদ্ধে যায়।' আমরা এবার বললাম, 'বেশ, বিঘা পিছু আট আনা নয় খাজনা দেবে।' আবার তাঁর আইনের তর্ক—'এ খাজনা যথেষ্ট নয়।' ভাবলাম অর্ডিন্যান্স তো হোক। কিন্তু অর্ডিন্যান্সের জন্য চাই দিল্লীর অনুমতি। সেখানে খসড়া গেল, সর্দার স্যর যোগেন্দ্র সিং বড় জায়গীরদার পাঞ্জাবের। বলে বসলেন, 'একি হয়? মালিকদের জমির অধিকার কেড়ে নেওয়া!' কত লেখালেখি—এদিকে সব নষ্ট হচ্ছে—আমরা পীড়াপীড়ি করছি। এখন সে নিজে আসবে বাঙলায়, তারপরে বুঝবে যা করবার। বসে আছি আমরা তাই, ওদিকে চাষের সময় যাচ্ছে।

মিষ্টার সেন বললেন, তা যাক্, ফার্সী কবিতা শুনতে পাবেন সর্দারজীর মুখে।

সৈয়দ সাহেব সখেদে বললেন, কি করব? বললাম, সেচের জন্য পুকুর, খাল ওসব থেকে জল নিতে দাও চাষীদের। তাতেও সেই আপত্তি। তা ছাড়া সেচের খাল কাটা, বাঁধ বাঁধা, ছোটখাটো কাজ আমরাও করতে পারতাম। কিন্তু সে বিভাগের দিল্লীর বড় কর্তা বলেন, 'ওসব আমার এক্তিয়ার।' এভাবে মন্ত্রী হয়ে বসে থেকে কি লাভ? অবশ্যি, আমরা কিছু করেছি—এবার আউশ ধান ভালো হচ্ছে, আমন কেমন হবে দেখি। রবিশস্যের জন্য আমরা

বীজ জোগাড় করছি। পাবেন, জোগাড় হলেই পাবেন। আমি থাকলে কিছু করব, নইলে জানবেন থাকবই না।

আপনি ছাড়বেন না, স্যর,—জাহেদুদ্দীন আরেকবার উৎকণ্ঠিত ভাবে বল্‌লে, পাছে সৈয়দ সাহেব তখনি মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দেন।

মিষ্টার বিহারী সেন বিনয়ের দিকে তাকিয়ে হাসি গোপন করলেন। বিনয়কে বল্লেন, চলো ডাক্তার, আমার কামরায়। বিনয় সানন্দে স্বীকৃত হল। জাহেদ অন্য ঘরে অপেক্ষা করবেন, সুরহাবর্দী সাহেবের সঙ্গে তাঁর দেখা করতে হবে।

মিষ্টার সেন বললেন, দেখছো ডাক্তার, সবাই মন্ত্রিত্ব ছাড়তে চায়—হক্ সাহেব চাইতেন, শ্যামাপ্রসাদবাবু চাইতেন, সৈয়দ সাহেবও চাইছেন—কেবল দেশকে 'সার্ভ' করতে চান বলেই কেউ ছাড়তে পারেন না।

বিনয় হাসল, বললে, হাঁ।

কিন্তু ডাক্তার, তুমি ছাড়ো নি দেশকে 'সার্ভ' করা?

বিনয় বল্‌লে, ছাড়তে পারলাম কই? মানুষ মরছে যে।

না মরলে উপায় ছিল! তুমি আমি বাঁচতাম কি করে? তোমরা আমরা বাঁচি আগে—দেশের মস্তিষ্কগুলো—নইলে 'সার্ভ' করবে কে?

বিনয় দেখলে সেই পরিহাস-প্রিয় মিষ্টার সেন তেমনি আছেন বটে। তবু বিষণ্ণ হয়েছে তাঁর হাসিও এই এক বছরে।

মিষ্টার সেন পরে বল্‌লেন, ডাক্তার পালাও। মানুষের সব কথা নিয়ে অত ভাবলে আর বাঁচবে না। পালাও—এবার তাঁর চোখের হাসিও নিবে গেল—বাঁচাবে কাকে? ওরা মরেই ছিল বরাবর,—মরতেই বসেছিল,—তারপর 'বর্গী এল দেশে।' আবার এবার 'বুলবুলিতে ধান খেয়েছে'—পুড়ে তেতো হয়ে গেছে পশ্চিম বাঙলার ঝড়ের এলাকার ধান। 'খাজনা দোব কিসে?—' কেন কাগজের টাকা ছাপা হচ্ছেই তো। মুদ্রার অভাব কি? মুদ্রাযন্ত্র তো রয়েছে। কিন্তু মুদ্রাযন্ত্রে চা'ল বেরোয় না, রেল

চলে না। মিলিটারি ঠিকাদারদের সঙ্গে সঙ্গে মুনাফাদারী ফেঁপে উঠেছে, মজুতদারই সরকারী আর বেসরকারী সকল দলের মালিক হয়ে বসেছে। আরে সেক্রেটারিয়েটে আছি না ফটকাবাজারে আছি, খবরদারি করছি না চোরাবাজারে জুটেছি—আমিই তা জানি না আজ আর। কিছু হবে না। কেন আর এখানে? পেন্‌সেন্‌ দিলেই বাঁচি।

ক্লান্ত বেদনা জেগে উঠল মিষ্টার সেনের কণ্ঠে। হঠাৎ তিনি সচকিত হলেন। হাসি ফুটল চোখে আবার।

ডাক্তার, বলো তো আমার সুধাদি' আছে কেমন?

ভালো।

ঠকালে তো তুমি আমাকে? নিলে আমাকে ঠকিয়ে! কিন্তু তা হলে তোমার আর এসব কেন? প্রেম করছে না সে?

বিনয় হেসে জানালে দু'টোই মিষ্টার সেনের ভুল।

বিহারী সেন শুনে বললেন, ডাক্তার হারি আপ্‌! বিহারী সেন আবার সহজ হলেন পরিহাসে, হারি আপ্‌। বাড়িতে গিন্নীর যে অবস্থা—হয়ে যেতে পারে তাঁর যে কোনো সময়ে। কি হবে আর? হার্ট খারাপ। হবে না? বাবা, চোদ্দ বছর থেকে ও জিনিস নিয়ে অমন জোর জবরদস্তি করেছে, এখন হার্টের দোষ কি? ভাবছিলাম, সেই সুধাদি'কে দখল করে বসব এবার,—একবার গৃহিণী সরলেই হয়। তুমি বেদখল হতে পার, ডাক্তার। হাসছ? 'বেশ কথা'? ভাবছ বুঝি, 'এ বুড়োর কি সাধ্য? ভালো চাও তো পাকাপাকি করে নাও। শুন্‌লে না, এটা জমিদারী-তন্ত্রের দেশ? সর্বদাই বলব, পার্মানেণ্ট সেটেলমেণ্ট চাই—কি জমিত্বে কি স্বামিত্বে। তোমরা মান্‌বে না?—বেশ, একবার গিন্নী সরেই পড়ুন না, দেখবে। এপিডেমিক্ ড্রপ্‌সি, হার্টও খারাপ, বড় দেরী করছেন কিন্তু গিন্নী।

এপিডেমিক্ ড্রপ্‌সি নাকি তাঁর? হল কি করে?

খেয়ে। না খেলে তো হয় না। দেখ্ছ না—এই পথের লোকদের? খায় বলেই মরে।

কিন্তু আপনারা তো বাজে ফুড্ খান না, বাজে তেল খান্ না—

নিশ্চয়ই না, আমরা হাকিম। তবে কি যে কে খাই তা জানি না। বাজারে দাম যখন চড়ছে, জিনিসে ভেজালও তখন বাড়বেই।

আপনাদেরও এই অবস্থা তা হলে—

তাতে আর কি? এবার গিন্নীকে চট্‌পট্ সরে পড়তে বলতে হয়। আমার একটা চান্স এখনো আছে—সুধাদি' আছে। একবার সুধার সঙ্গে দেখা হয় না? নিয়েই এসো না? তা'ই ভালো—নিজের পাহারায় নিজে নিয়ে এসো, নিজে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে—আসবে?

বিনয় হাসল, প্রতিশ্রুতি দিতে পারল না। সুধার সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি দেবার মত জোর বিনয়ের কই? কিন্তু এই মিষ্টার সেনের সঙ্গে সুধা কি দেখা করতে পারে না? দেখা করলে দোষটা কি? অন্তত ওদের ছাত্রকর্মী অমিয়ার বাবা তো—আর সে অমিয়া বেঁচে নেই। ভালোবাসেনও মিষ্টার সেন তাঁর অমিয়ার বন্ধুদের, আর ভালোবাসেন দরিদ্র চাষীদের। চমৎকার মানুষ—হাসিতে, পরিহাসে। তবে সে হাসিতে এবার একটা বিষণ্ণতা এসেছে, হতাশাও এসেছে। আসবেই তো,—বিনয় তা বুঝছে,—কি দিন যাচ্ছে দেশের উপর দিয়ে। মিষ্টার বিহারী সেন,—তাঁরও স্ত্রী নাকি ভেজাল খেয়ে খেয়ে পড়েছেন এপিডেমিক ড্রপ্‌সিতে, হার্ট তাঁর অচল হতে চল্‌ছে। মিষ্টার সেন স্থির থাকবেন কি করে? কে স্থির থাকতে পারে আজ? বিনয় দেখেছে দেশের মানুষকে—দেখেছে সোনাপুর, দেখেছে সর্ষেখালি, দেখেছে সল্লাখালি।

কিন্তু লঙ্গরখানা সোনাপুরে না খুল্‌লেই নয়। বিনয় দেরী করতে পারে না। মিষ্টার সেনের কাছ থেকে সে বিদায় নিলে। খুঁজতে লাগ্‌ল জাহেদ সাহেবকে সেক্রিটেরিয়েটের বারান্দায়। জাহেদের নিজের ঘর নেই—জায়গা কই? তবু সে পার্লেমেণ্টারি সেক্রেটারি—মাইনে পায় তো।

জাহেদ এল শেষে। বললে, পেয়েছিলাম সুরহাবর্দী সাহেবকে। বারান্দায় নিজের ঘরের দুয়ারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সাপ্লাই-মন্ত্রী আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'জিৎলিয়া, জাহেদ, তুম্‌হারা পয়েণ্ট জিৎলিয়া। হামি সারা সোনাপুর, চাটগাঁয় নোঙ্গরখানা খুলাবে। যাও, সবুর করো।' তারপর তিনি বললেন ইংরেজিতে—'আই মিন্ বিজনেস্। এখন ইব্রাহিমভাইর সঙ্গে বন্দোবস্ত করো—চা'ল, মালগাড়ী এ সবের কে ভার নেবে, কে ষ্টক রাখবে।' নোঙ্গরখানা চালাবেন—ইংরাজিতে তিনি জানালেন ; সেই বিহারের চাল এসে পড়লে আর এখানে দেরী হবে না। 'আসছে তা—লাখ লাখ মণ চাল আস্‌ছে—ইব্রাহিমভাই হাজ ডান্ এ মিরাক্‌ল। পাটনার গবর্ণমেণ্ট বলে ঐ চাল ছাড়বে না। বারো টাকা থেকে এই কয়দিনে তাদের ওখানে চাল উনিশ টাকা হয়েছে। তাই তাদের আপত্তি। আর কলকাতায় আমাদের পঞ্চাশ টাকা—অবকোর্স অন্‌অফিসিয়ালি ! তারা শুনবে না। রাস্‌কেলস্।'—জাহেদ বিনয়কে জানালে মন্ত্রী সাহেবের কথা।

সেক্রেটেরিয়েট্ থেকে বেরুচ্ছিল বিনয়—জাহেদ সেখানেই রইল।

'সেলাম সাহেব'—বেয়ারারা সাম্‌নে দাঁড়াল। কি হৃষ্টপুষ্ট দেহ, চমৎকার লাল উর্দী। বিনয় বল্‌লে, 'সেলাম'।

বেয়ারারা বল্‌লে, আমাদের বখ্‌শিস্।

বিনয় অবাক হল, বখ্‌শিস্ কেন ? কিন্তু বললে, আমি দশজনের কাজে এসেছি—

বেয়ারা আকর্ণ বিস্তৃত হাসি হেসে বললে, সবাই দশজনের জন্য আসে, সাহেব ; নিজের জন্য এখানে কে আসে ?

তাই বুঝছ তো, আমার কাছে চাও কেন তবে ?

সে কি ! আপনি দেবেননা ?—বেয়ারা রীতিমত বিস্মিত হল, তার কণ্ঠস্বর উগ্র হয়ে উঠ্‌ল।

বিনয়ও বললে, দেব কেন ?

দেবেন না? দস্তুর—দস্তুর মানবেন না!

প্রায় অপমানিত হতে হতে বিনয় বেড়িয়ে এল। পিছনে বেয়ারারা টিট্‌কিরি দিয়ে বলছিল—'প্‌রের জন্ম এসেছেন!'

১৫

জাহেদ ইব্রাহিমভাইদের এজেন্ট। বিনয়ের সঙ্গে পরিচয় হতেই ইব্রাহিমভাই তাকে বল্‌লেন, ডক্‌টর মজুমদার, আপনি ন্যাশেনাল ইন্‌ভেষ্টমেণ্ট ট্রাষ্টে আছেন না?

হাঁ।

ওর মিটিং-এ আপনি থাক্‌লে অনেক কাজ হত। অনেক ব্যাপার হচ্ছে যা জানেন না। মুরারি সেনের কাণ্ড, মিথ্যা নামে শেয়ার হাত করে বসে আছে। কিনতে চাই, তবু বেচবে না। আপনি আসুন না একদিন সে সব কথা হবে। কাল আসবেন চা'তে? তখনি কথা হবে—চা'ল সম্পর্কেও। হাঁ, আমি সোনাপুরকে বাঁচাব—কথা দিচ্ছি। বাঙলা মুলুককে আমি এই মারোয়াড়ী শয়তানদের হাত থেকে বাঁচাব। আমার চা'ল বিহার উড়িষ্যায় আসামে মজুত হয়ে আছে, একবার বের করে আনতে পারলেই হয়।

বিনয় ইব্রাহিমভাইর সৌজন্যে আকৃষ্ট হল। সাহেবী কায়দা, চমৎকার ইংরেজি বলেন, ব্যবহারও বেশ স্মার্ট। সে চা খেতে খেতে মুগ্ধ হল, রেঙ্গুনেরও কত খবর রাখেন ইব্রাহিমভাই। সেখানেও তাঁদের ব্যবসা ছিল। ইব্রাহিমভাই কথা বল্‌তে লাগ্‌লেন—কি ভাবে তাঁরা বাঙলাদেশে মারোয়াড়ী-ভাটিয়া চক্রান্ত ব্যর্থ করবেন, শুধু বাঙালীরা তাঁর সঙ্গে একত্র হোক্। 'ইন্‌ভেষ্টমেণ্ট ট্রাষ্টে মুরারি সেন তাঁর ছেলেকে করছেন ম্যানেজার। আপনারা দেখ্‌ছেন না কেউ—আপনাদের টাকা—'

বোম্বাইওয়ালা এক নাখোদা কর্মচারী এসে সেলাম দিলে ইব্রাহিমভাইকে—'ট্রাঙ্ক কল' আসছে লক্ষ্ণৌ থেকে।

ট্রাঙ্ক কল? ইব্রাহিমভাই উঠে পড়লেন তাড়াতাড়ি। অপেক্ষাকৃত নিম্নকণ্ঠে উর্দু'তে কর্মচারীটি বললে, হিদায়েৎ সাহেব ফোন করেছিলেন আর একবার। সে চালানটা নাকি ইউ, পি, গবর্মেণ্ট আটকাচ্ছে।

ইউ, পি, গবর্মেণ্ট?—চিন্তা ও বিস্ময় ফুটে উঠল একই সঙ্গে ইব্রাহিমভাইর কণ্ঠে। তাড়াতাড়ি তিনি চললেন ফোন ধরতে। তারপর বিনয়কে বললেন, পঞ্চাশ লক্ষ মণ চা'ল, বুঝছেন? এর উপর বেঙ্গল গবর্মেণ্টর ভাগ্য নির্ভর করছে। পাঞ্জাবকে এড়িয়ে আমি কি না করছি বাঙ্‌লার জন্য—আর দেখুন ইউ, পি, গবর্মেণ্টর কাণ্ড।

ফিরে আসছিলেন ইব্রাহিমভাই। মুখে চিন্তার ছাপ, পঞ্চাশ লক্ষ মণ চাল আটকে গেছে লক্ষ্ণৌ-শাহারানপুরে। এজেণ্ট হেদায়েৎ আলীকে গ্রেফ্‌তার করবে ইউ, পি গবর্ণমেণ্ট। খানিকক্ষণ পর্যন্ত তিনি আর অন্য আলোচনাই করতে পারেন না—ইউ, পি, গবর্মেণ্টের শয়তানিতে তিনি বিষম ক্রুদ্ধ। এ চা'ল না পেলে, সোনাপুরকে কি করে বাঁচাবে। ট্রাষ্টেরও অনেক চা'লও তো আছে, ট্রাষ্টটা মুরারি সেনের মুঠো থেকে বের করতে পারলে সব হয়—

বিনয় স্বীকার করলে সে ওদিকেও দেখবে,—ইব্রাহিমভাইর ট্রাষ্ট প্রভৃতি বিষয়ে প্রস্তাব তার মনে থাকবে।

ইব্রাহিমভাইও স্বীকার করলেন সোনাপুরকে তিনি বাঁচাবেন।

দুপুরে বিনয় সেদিন সকাল করে বেরুল। কিন্তু তখনো সুধা আসে নি। কোথায় থাকে সে? শুনেছিল সুধা আছে অমিতদের সঙ্গে এক বাড়িতে—মধ্যকলকাতায়। দোতালার ফ্ল্যাটে আছে অমিত আর কে কে, তে-তলার ফ্ল্যাটে ওদের মেয়েরা জন কয়। বিনয় সেখানে গেল। পাজামা-পরা কে

একজন বেরিয়ে এল। খালি গা, মাথা পুছ্ছেন টাওয়ালে—সে সুহৃদ রায় না? মনে মনে বিনয় কেমন কুণ্ঠিত হল—সেবার ভদ্রলোকের উপর বিনয় বড় অবিচার করেছে।

সুহৃদ রায় অমিতকে দেখে বললে, ডক্‌টার মজুমদার? এখানে এলেন কবে?—বেশ সৌহার্দপূর্ণ সম্ভাষণ, সহজ এবং অকুণ্ঠিত।

বিনয় কুণ্ঠা বোধ করবে না। হেসে উত্তর দিলে, কিন্তু কম্‌রেড্ রায়, আপনি এখানে থাকেন নাকি? বাড়ি থাকেন না?

থাকি তা-ও। তবে এখানে থাকাই কাজকর্মের পক্ষে সুবিধা। তার-পর, কাকে? অমিদা'কে? তিনি বেরিয়েছেন, আজকে তো যেতে হবে তাঁকে লেবর কমিশনারের আপিসে।

বিনয়ের যেন কেমন ভালো লাগ্‌ল না—সুহৃদ রায় এ বাড়িতে আছে শুধু কাজকর্মের খাতিরে,—এ কথাটা কি একটা চাল নয়? না, মিথ্যা ওজর? তাকে উন্মনা দেখে সুহৃৎ রায় মুচকি হেসে বললে, কিন্তু আর কাউকে চাই? না, শুধু অমিদা'কেই?

বিনয় এবার কুণ্ঠিত হল। এক মুহূর্তে সামলে নিয়ে বললে, আর কাকে চাইতে পারি, মিষ্টার রায়, আপনিই বলুন না?

মিষ্টার রায় হটলেন না, বল্‌লেন, কমরেড সুধা কিন্তু সকাল-সকাল খেয়ে বেরিয়ে পড়েছেন আজ।

বিনয়ও হার মান্‌বে না।—তবেই তো দেখুন, কোথায় আর কাকে পাই?

ঠিকানা ঠিক পাচ্ছেন না। আপিসে যান—তা হলে কম্‌রেড্ সুধায়ও আপনার খোঁজে ছুটতে হবে না।

বিনয় বললে, দেখছেন তো ছুটোছুটিই সার হচ্ছে—আপনাদের ঠিকানা আমি কিছুতেই ঠিক রাখতে পারি না।

বিনয় ফিরে গেল অমিতদের আপিসে। সেই সুহৃদ রায়। কিন্তু বিনয়

তাকে দেখে রাগ করবে না ঠিক করেছে,—বাড়ি ছেড়ে সেও এসে রয়েছে অমিদা'র সঙ্গে—সুধাও আছে এ বাড়িতে উপরতলায়। বিনয় খুব খুশীও হতে পারছে না; তার নিজের ওপরই রাগ হল।

সুধা কিন্তু অমিতের আপিসেই অপেক্ষা করছিল, বললে, আমি তোমার জন্যই এসে বসে আছি আধ ঘণ্টা ধরে এখানে—

আমি তোমার জন্য ছুটেছিলাম তোমার বাসায় —

সকৌতুহল দৃষ্টিতে সুধা বললে, সত্যি ?

কিন্তু বিনয়ের কণ্ঠস্বরে স্বচ্ছতা এল না।

সাক্ষী তোমার মিষ্টার সুহৃদ্ রায়। তিনিই বলে দিলেন—আমি ঠিকানা জানি না, তাই এ দুর্দশা। তোমাদের ঠিকানা—সত্যি, ঠিকানা বুঝেই উঠতে পারি না।

সুধা ইঙ্গিত বুঝলে। একটু উন্মনা হল, বললে, ঠিকানাটা খুব বিদ্‌ঘুটে, না ?

ঠিকানা আছে নাকি ?

নেই ?

একদিন জানতাম, ঠিকানা মস্কো।—বিনয়ের মনে পড়ছিল শচীদা'র কথা। সে লোভ ছাড়তে পারল না, সুহৃদ্ রায়কে আক্রমণ করতে হবে, বললে, এক কলমের খোঁচায় ষ্টালিন বলে দিলেন—'না'। এখন তোমাদের ঠিকানা কি তোমরাই জানো।

তুমি জানো না ?

সুধার কণ্ঠস্বরের সবলতায় বিনয় নিজেকে সাম্‌লে নিতে গেল।

অন্তত বুঝি না। আমি কিন্তু সত্যাই খুশী হয়েছি—এতদিনে তোমরা এ দেশের লোক হলে।

কেন ? আগে অন্য দেশের ছিলাম নাকি আমরা ?

দেশেরই কি ছিলে ?

নিশ্চয়, একশ' বার।

বিনয় হঠাৎ যেন মনে স্বাচ্ছন্দ্য পেল। না সুহৃদ্ রায় কিছু নয়! এই তো এই কারণেই সে সুধার সংবন্ধে সুনিশ্চিত হতে পারছে না। সেবারও পারেনি। বিনয় বললে, জানো, সুধা, এই একটি কারণে,—এই একটি কারণেই—আমরা এদেশের মানুষ তোমাদের সকলকে প্রাণ দিয়ে গ্রহণ করতে পারছিলাম না।

এখন পারছ?

পারি— যদি জানি তোমরা ভারতবর্ষকেই একমাত্র সত্য বলে স্বীকার করো।

'একমাত্র সত্য'? কি তা বিনয়? ভারতবর্ষও তো তা নয়।

বিনয় আবার আহত হল। সুধা তাকে বুঝিয়ে বললে, ভারতবর্ষ কেন, কোন দেশই তা নয়। সব দেশই সত্য—কোন দেশ তা বলে একমাত্র সত্য নয়। একা কেউ সত্য নয়, হতেও পারে না।

বিনয় কেমন যেন বাধা পাচ্ছে। তার কাছে ভারতবর্ষই সত্য। দেশে ফিরে এই একটা সত্য সে বুঝে নিয়েছে, সে তা আঁকড়ে থাকতে চায়। কূল-পাওয়া সাঁতারুর মতো অন্য সত্য সে জানে না—বোঝে না। বিশ্বাস করতে সাহস করে না। অত বেশি সত্য জানলে সে বুঝি ভারতবর্ষকেও আর খুঁজে পাবে না, বুঝে উঠতে পারবে না। বিনয়ের মনের বোঝা আবার তার মনে চেপে বসতে লাগল।

সুধা বললে, তুমি আমার পাঠানো সে বইটা পড়েছ?

বিনয় লজ্জিত হল। সে পড়ে নি। তাই খুব সপ্রতিভ ভাবে বললে, ও বই কি পড়ার জন্য?

তবে কি জন্য?

পৃথিবীর সব বই পড়ার জন্য নয়, সুধা। দু'একটা বই আছে, মনে রাখবার জন্য—বইএর থেকেও বড় যা তা মনে রাখবার জন্য।

কিন্তু পড়লে পরে তা বুঝতে হয়ত আরও বেশি।

একটু একটু তর্ক বেধে গেল। বিনয়ের ভালো লাগে না সুধার এত ব্যস্ততা, এত গোঁড়ামি।

কেমন গম্ভীর হয়েছে সুধা। বিনয়ও আরাম পাচ্ছে না মনে।

অমিত এল এবার। স্মিতহাস্যে বললে, বাবা, এত গম্ভীর দুজনায় মুখো-মুখি বসে—'ডীপ্ কলিং আন্টো ডীপ্!'

ম্লান হাস্যে বিনয় বললে, যেমন আকাশ আর সমুদ্র—

অমিত বুঝল। হাসি অক্ষুণ্ণ রেখে আবহাওয়া হালকা করবার মত স্বরে বললে, কি ব্যাপার, হে আকাশ?

তোমাদের 'আন্তর্জাতিক' উঠে গেল। তাই বলছিলাম

অমিত তেমনি লঘুস্বরে বললে, তাতে তোমারও আবার আমাদের জন্য দুঃখ হল নাকি?—দুঃখ হয়েছিল তখন তিনজনার—কমিউনিষ্টরা তাতে দুঃখ পেল না,—দুঃখ পেল জার্মানিতে গোয়েবল্‌স্, ব্রিটেনে তাদের লেবর পার্টি, ভারতবর্ষে মিষ্টার সেনের কাগজ—'স্বদেশী'।

সুধা হাসল। বললে, বিনয়ের দুঃখ ঠিক সেরূপ নয়, অমিদা'।

কিরূপ তবে?

আমরা তা হলে 'জাতীয়তাবাদী হব না কেন?

অমিত বললে, আমরা 'স্বাধীনতাবাদী' বলে—সকল জাতের স্বাধীনতা চাই বলে।

বিনয় কথাটা ভালো করে বুঝল না। অমিত বললে, বিনয়, মনে রেখো 'জাতীয়তাবাদী'রা স্বাধীনতাবাদী নাও হতে পারে। এই তো আমাদের দেশে আজ সবচেয়ে বড় জাতীয়তাবাদী কারা জানো?

কারা?

ইণ্ডিয়ান আই-সি-এস'রা আর হিন্দুমহাসভা-ওয়ালারা। একেবারে যেন আগুন! আবার 'দু'দলই অখণ্ড হিন্দুস্থানওয়ালা—তা নইলে স্বাধীনতাও

তারা চায় না। বিলাতে জাতীয়তাবাদী কারা জানো? হিটলারের বন্ধুরা; অন্য জাতিকে তারা জাতিও হতে দেবে না। আর এসব সাম্রাজ্যবাদীরাই সব দেশে জাতীয়তাবাদী। কারণ, স্বাধীনতাবাদী হলে কেউ সত্যকার আন্তর্জাতিকতাবাদী না হয়েও পারে না।

বিনয় বুঝেও একথা বুঝতে চাইল না।

যত খুশী পরকে খোঁচা দাও, অমিদা, আসল কথা—তোমরা 'জাতীয়তাবাদী' নও। তোমরা ত হলে কমিউনিষ্ট?

নিশ্চয়, আমি স্বাধীনতাবাদী বলেই আমি সাম্যবাদী হয়েছি। এই আমাদের পরিচয়—আজও কালও।

অমিতের মুখে সকৌতুক হাসি আছে তখনো, কিন্তু গর্বের দীপ্তিও পরিষ্কার। বিনয়কে তা স্পর্শ করলে না। তার মনে জেগে উঠ্‌ল মীর শাহেদুদ্দীনের মুখ—তাঁর কথা। সে মুখ তার বেশি চেনা; তিনিই বিনয়ের বেশি আত্মীয়। বিনয়ও তাঁরই আত্মীয়—অমিতের নয়, সুধার নয়।

না, সুধাকে সে আর বল্‌তে চায় না, 'সুধা আমি তোমাকে দাবী করতে এসেছি।' সুধাই বলছে না যে কিছু। হয়ত বিনয় তার আপনার নয়, সে চায় গোঁড়ামি, চায় তার মতের, তার পথের কোন মানুষ—যেমন সুহৃদ্‌ রায়।

বিনয় সুধাকে সম্পূর্ণ স্বীকার করেও আবার তাকে আপনার করতে পারছে না। নিজেকে বুঝালে, সুধাই তার আপনার হতে চায় না, সে পার্টির চাকর। 'তুমি চাও সে চাকরি?'—এই তো সুধার স্পষ্ট ইঙ্গিত, বিনয়ের তা মনে পড়ল। না, বিনয়ের সে ইচ্ছা নেই—তার পক্ষে সেরূপ পরিবর্তন অসঙ্গত, অসহ্য। সে এই চাকরি স্বীকার করবে কেন? তার যথেষ্ট আত্মমর্যাদা বোধ আছে। সে ভারতবর্ষের সন্তান—জাতীয়তাবাদী। এরূপে একটা নীতিগত আড়ালের আশ্রয় পেয়ে বিনয় এবারকার মত নিশ্চিন্ত

নিঃশ্বাসও ফেলল—এই মুহূর্তেই সুধাকে দাবী করবার দায়িত্ব গ্রহণ না করে সে যেন বাঁচল! অথচ উল্টো নিজেকে বুঝাতে পারল, 'নির্মম ওয়া—ফ্যানাটিক।' নিজের বেদনা ও অতৃপ্তিকে লালন করবারও একটা অবকাশ পেল—সুধাই তার এত নিকট হয়েও এত দূর হয়ে থাকবে, থাকতে চায়। তাই সুধার ইচ্ছা। ব্যথিত হৃদয়েই বিনয় সুধার সে ইচ্ছাকে তাই মেনে নিচ্ছে।

আহত গর্ব আবার তার অভিমান জাগিয়ে তুল্‌ল, মূর্খ মেয়ে সুধা, তুমি কি মনে করো বিনয় তোমার জন্য তার দেশ, তার জাতি, তার অদর্শ—সব বিস্মৃত হবে? এত মিথ্যা বিনয়? বিনয়ের মূল্য ও মর্যাদা বোঝা সুধার পক্ষে সম্ভবও নয়।

১৬

বিনয় সোনাপুরে ফিরে গেল।

মুরারিবাবু চালের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ইব্রাহমভাইরাও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কলকাতায় অপেক্ষা করে কি হবে? সীতা ও যেতে লিখ্‌ছে।

কিন্তু শুধু এই কাজেই কি বিনয় কলকাতা এসেছিল? সুধার সংবন্ধে তার সংশয় এমন সহজভাবে মিটে গেছল চিঠিপত্রে। বিনয়ের প্রত্যাশা তাতে না বেড়েই পারে না। কিন্তু নিকটে আসতেই মনে হল না তা।

আর সীতা?

বৈকুণ্ঠবাবু এসে বললেন, তুমি গেছলে বীরুদের বাড়ি? লীলার সঙ্গে দেখা হল? হাঁ, তাকে বলেছিলাম, হোষ্টেলে সীট না পেলে বীরুর ওখানেই

উঠতে,—বীরুরা তো আমাদের বরাবর আত্মীয়। বীরুর সঙ্গে দেখা হয়েছে ? তা আছে ওরা ভালো সবাই ?

বিনয় সংক্ষেপে জানাল, হাঁ।

বৈকুণ্ঠবাবু আসল কথায় এলেন পরে। এটা কি করছ বিনয় ? শহরে আবার নতুন মেয়ে ইস্কুল কেন ?…তুমি নেই ওসবে ? আহা, জানো তো সব। না, না ; তুমি সায় না দিলে যশোদার সাহায্য ওরা পেতই না—বলেছে প্রমোদ। আর প্রমোদই কি অমন ছিল ? ওই সীতা,—তুমি বুঝছ না সীতাকে। ঠিক বলেছেন লীলার মা—'সাংঘাতিক মেয়ে।' প্রমোদকেও সে-ই অমনি খেলিয়ে বেড়িয়েছে। তুমি বুঝছ না, ডাক্তার এখনো। ঠিকই বলেছেন লীলার মা, 'অত যদি ডাক্তারের জন্য দরদ সীতার, তা বিয়ে করুক না কেন ডাক্তারকে ?—তা করবে না, খেলাবে। ভালো মানুষ পেয়েছে ডাক্তারকে ; খেলাবে।' যাক্, সে তো কথা নয়। কিন্তু তুমি এ সবের একটা সুরাহা করো ডাক্তার।

বিনয় বুঝলে সীতার সঙ্গে এবার তার নাম জড়িয়ে পড়ছে। আরও জড়িয়ে পড়বে। কিন্তু তাতেই বা বিনয় কি করবে ? সীতাকে তাই বলে বিনয় অবহেলা করতে পারে কি ? বেগমপুরা ছেড়ে এসেছে, সে ইস্কুল্‌ও উঠে গেছে। বাড়িতে তার মা আর দু'ভাই। তাদের কি হবে ? সীতা কিছু বলেনি ; কিন্তু আমিনা তাদের চিঠি দেখেছে। দেশে ওর মা খেতে পান না ; থালা বাটী বিক্রী করছেন, বাড়ি ঘর দোর বিক্রী করছেন। দুবার রিলিফ্ কমিটি থেকে টাকাও দেওয়া হয়েছে। আগে পঁচিশ টাকায় সমস্ত পরিবার খেয়ে থাকত, আজ তাতে একুশ দিনের মত চা'ল-ডাল হয়। তাঁরা করবেন কি ?

তা হলে সীতা কি করবে ?

সে বলছে, 'হয়ে যাবে। গীতা পড়া ছেড়ে দিয়েছে,—কলকাতায় একটা কাজ খুঁজে নিচ্ছে'—সীতা বলে।

বিনয় বোঝে এ তার মিথ্যা স্তোকবাক্য। কিন্তু সত্যই পথ কই?

যশোদা চৌবুরীর সঙ্গে কথা বলে বিনয় গোপনে ব্যবস্থা করল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চমকিত হল। যশোদা চৌধুরী জানিয়েছেন, টাকা দোব যা বলেন, ইস্কুলের জন্য, টিচারের জন্য। কিন্তু চা'ল পাব কোথায়? আমার মজুরদের দিনে এক সের করে দিই একজনের পক্ষে তা যথেষ্ট। কিন্তু ওরা গোষ্ঠীশুদ্ধ খাবে সেই একসের চাল। তাতে কি হয়েছে জানেন? রহমৎ বলী, আড়াই মণ-তিন মণ বস্তা বইতে যার কষ্ট হত না, সে কাল এক মণ আমার সিমেণ্টের বস্তাটা তুলতেই পারলে না, বইবে কি? কাজও হচ্ছে না আমাদের— একজনের কাজ এখন দু'জনেও করতে পারে না।

শুনতে শুনতে বিনয়ের মন ব্যথিত ও অস্থির হয়ে উঠছে। মানুষের এত বড় সর্বনাশের সামনে কলকাতায় ওরা কি মিথ্যা নিয়েই না মরছে তবু? পথে পথেও বিনয় দেখে এসেছে ঘনায়মান দুর্ভিক্ষের ছায়া। রেল চলে না ঠিক সময়ে, মালগাড়ী নেই। এদিকে চা'লও এল না মুরারি সেনের বা ইব্রাহিম-ভাই'র—তারাও মালগাড়ী পাচ্ছে না! মানুষই টিকেট কিনতে পায় না — ষ্টেশনে' পথে-ঘাটে সর্বত্রই ভিখিরী, ছেলে-মেয়ে, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা।

সোনাপুর ফিরে বিনয় দেখছে—এ কয়দিনে অবস্থা আরও গুরুতর' হয়েছে।

তবে আউশ ধানের দিন এসে যাচ্ছে। কোথাও কেথাও তা কাটা হচ্ছে —প্রথমকার ফসল। অবশ্য এদিকে আউশ সকালেই পাকে। ফলনও এবার আশাতীত রকমের ভালো। কেউ এক টুকরো জমি বৃথা ফেলে রাখে নি; ফসলে ভরে উঠেছে প্রত্যেক ক্ষেত। দু'মাস চলবে দেশের এই আউশের ফসলে; আরও একটা মাস পার করে দিতে পারলেই হয়। মানুষ তা হলে খানিকটা আশার নাগাল পাবে। সেই একটা মাস লঙ্গরখানায় মানুষকে বাঁচতে হবে—তাদের বাঁচবার শক্তি নেই, তবু বাঁচতে হবে। তার জন্যই চাই চা'ল, চাই টাকা।

মজিদ বললে, বাঁচবে কি তাতে? লঙ্গরখানার চা'লের বদলে বাড়ছে ফ্যান, বাজরা, তুষ, বাদামতেলের খোসা। ডালের বদলে দিচ্ছে কি বীজকণা—তা কেউ চোখেও দেখিনি আগে। আট শ' লোকের লঙ্গরখানায় লোক জুটছে বার শ', পনের শ'। হাজার, বার শ', লোক ফ্যান-ভাত পায়, বাদ-বাকী পায় না। তারা কাঁদে, চেঁচায়, পরস্পরে কাড়াকাড়ি করে, না পেয়ে বসে থাকে—আবার কাল যদি ভাগ্যে জোটে। যারা পেল তারা এই খিচুড়ি খেয়ে দু'দিন পরেই শুয়ে পড়ল—পেটে সহ্য হয় না। মরলে বাঁচল।

তবু ভরসা আউশের দিন এসে গেছে।

তখনি বাঁধভেঙে দামোদরের জল ভাসিয়ে নিয়ে গেল পশ্চিম বাঙলার শস্যভরা ক্ষেত, ঘর-দুয়ার, বাড়ি-ঘর। পাঁচ লক্ষ একর জমি হয়ে গেল শূন্য।

'ধন্য দামোদর'!—কে বলে উঠল,—'তুমি রেল লাইন ভেঙে ইংরেজের যুদ্ধ-চেষ্টায় বাধা জন্মিয়েছ—যা বাঙালী পারে নি তুমি তা করেছ।' বিনয় প্লাবনের খবর পড়ে শিউরে উঠল। পশ্চিম বাঙলার মৃতপ্রায় চাষীর উপর দেবতার একি বিচার? ঘরেই ফসলের অভাব; কি করেই বা এবার বাইরের ফসল বাঙলা পাবে—রেললাইন যখন নেই? সকরুণ বেদনায় বিনয় এখন হাসল—'ধন্য দামোদর!'—কাগজটা পড়ে বললে,—'যা ইংরেজ জাপানী করতে পারে নি তুমি তা করেছ। দশ লক্ষ বাঙালীর ঘর-দুয়ার ক্ষেত ডুবিয়ে দিয়েছ, দু'কোটি বাঙালীর প্রাণরক্ষার পথ দিয়েছ উড়িয়ে চুরমার করে।'

বর্ষা হয়েছে। নৌকো চলল। এবার বিনয় যাবে কি সর্ষেখালি-সল্লাখালি? বিনয় মজিদের সঙ্গে চলল। যা তখনো সে জানত না, কল্পনা করত না, তা'ই দেখল। বিনয় দেখে গেল—গ্রাম দেখল, গঞ্জ দেখল, বৃদ্ধ দেখল, শিশু দেখল, মৃত দেখল, জীবন্ত দেখল—দেখল—দেখল—

এই কি পৃথিবী, এই তার দেশ? এরাও মানুষ, তার মত, সীতার মত, সুধার মত,—হয়ত গান্ধীর মত।

সমস্ত ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল বিনয়ের।

কলকাতায় আইনসভা তখন শুরু হয়েছে। বিনয় দেখল বিপুল উদ্যমে চলছে 'মন্ত্রী-মারা খেলা'। দিনের পর দিন সে কাহিনী কাগজের পাতায় উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে। মিথ্যার ঝুড়ি এক একবার দেশের মাথায় ঢালছেন মন্ত্রীরা—'অভাব নেই, অনটন নেই।' আবার বলছেন, তাঁরা দোষী নন; 'হক সব শেষ করে গেছে।' তারপর আবার: 'অভাব হবেই তো—বর্মা হারানো, ক্ষেত ছাড়ানো, নৌকো ভাঙা, ঝড়-বন্যা, দু'বছরের অজন্মা, পোকায় ফসল কাটা, বর্মার লোকের ভিড়, বাঙ্‌লায় মজুরের ভিড়, বিদেশী সৈন্যদের ভিড়, ভিন্ন প্রদেশ থেকে খাদ্য আমদানী বন্ধ, আর লোকবৃদ্ধি—এসবে মিলেই অভাব হচ্ছে।' তারও পরে শোনালেন, 'ভারত গবর্মেণ্ট ফসল দেয় না, রেলবিভাগ মালগাড়ী দেয় না। দেশকে বাঁচিয়েছি তবু আমরা মন্ত্রীরাই—চা'লের দর আর তত বেশি নেই, মানুষ তত মরে না, অভাব তত বেশি নয়।'

বিনয় ধৈর্য হারিয়ে ফেলে পড়তে পড়তে—মানুষ মরে না?…মনে পড়ল বিহারী সেনের কথা 'সেক্রেটারিয়েট্ না চোরাবাজার—আমিই জানি না তা।'

তীব্র আক্রোশে শ্যামাপ্রসাদবাবু মন্ত্রিসভার দুষ্কৃতি উদ্‌ঘাটিত করে দেন—মন্ত্রীরা কি করছেন? ইস্পাহানির তাঁবেদার তাঁরা। কোটি কোটি টাকা নিয়ে ইস্পাহানিকে ছিনিমিনি খেলতে দিয়েছেন কেন মন্ত্রীরা?… 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের' ঐতিহাসিক প্রমাণ ডক্টর মুখার্জির হাতে—তিনি তা শুনিয়ে দিচ্ছেন।

ছিয়াত্তরের প্রমাণ—হাণ্টার আর মেকলে। কেন দেখে নি বিনয় সর্বেখালি সল্লাখালি? জানে না—চট্টগ্রাম মেদিনীপুর? আর দেখে নি খাদ্য-সম্মেলনের খেলা?

বিনয় দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে পড়তে পড়তে—'সেই মন্ত্রী-মারা খেলা'।

কিন্তু মন্ত্রী মারা গেল না। আরও শক্ত হয়ে বসল তারা নিজের ঘরে। আর মারা যেতে লাগল দেশের মানুষ। বিনয়ের চোখের সামনে পথের উপরে, বাড়ির সামনে, গাছের তলায়—বাজারে, হাটে, ষ্টেশনে, —মরে পড়ে রইল মানুষ—মরবার অপেক্ষায় রইল মানুষের কঙ্কাল।

শিবুদা'র বন্ধু ট্যানার মাঝে একদিন টাকা নিয়ে এল—তার সমস্ত মাইনা আর যা কিছু পেল তার বন্ধুদের থেকে। ঔষধ জোগাড় করে নিয়ে এল তাদের ডাক্তারখানা থেকে যা বিনয় চায়। বিনয় এ বিদেশী যুবকের আন্তরিকতায় কৃতজ্ঞ হল। খবর পেল—শহরের অনভিপ্রেত লোকদের কাছে ট্যানারের গাতায়াত বেড়ে যাচ্ছে, এজন্য তাকে সাবধান করে দিচ্ছে মিলিটারি কর্তৃপক্ষ। সত্য কি?—বিনয় জানতে চাইল। ট্যানার কথাটার পাশ কাটিয়ে গেল, 'বেশি কিছু নয়। ওরা সাধারণের সঙ্গে আমাদের মেশাই পসন্দ করে না।'

কলকাতায়ও আবার মজুত-ধরা নাটকের অভিনয় হল। এ তামাসা আর কেন —ভাবল বিনয়। কিন্তু এখানেও তামাসার শেষ নেই।

ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব কনফারেন্স ডাকালেন—সাধারণের সঙ্গে তিনি বুঝাপড়া করতে চান। লঙ্গরখানার ব্যাপারে বিনয়রা সাধারণের কর্তৃত্ব দাবী করেছে। ইউনিয়নে শহরে মিলে নাকি শ-চারেক লঙ্গরখানা চলবে। আট হাজার মণ চাল লাগবে তাতে, আড়াই লক্ষ টাকা তার খরচ। ম্যাজিষ্ট্রেট বলেন, 'অর্ধেক খরচ তোমরা দাও, নইলে আমরা লঙ্গরখানা চালাব না, তা খুলবও না।' কোথাও কোথাও কর্তারা লঙ্গরখানা বন্ধও করে দিলে। হাজার হাজার মানুষ শহরে এসে ধন্না দিচ্ছে। এখন তাই ম্যাজিষ্ট্রেট করবে কন্‌ফারেন্স। মানে, নানাথান থেকে প্রেসিডেন্ট

পঞ্চায়েৎরাও এসেছে, তালুকদার, মহাজন, ব্যবসায়ীরাও আছে—সাহেব ডাকিয়েছেন।

লঙ্গরখানা বন্ধ করা চল্‌লো না, নতুন লঙ্গরখানা হতে লাগল। কন্‌ফারেন্স আপত্তি করেছিল, তবু প্রেসিডেন্টরাই কিন্তু তার ভার পেল। সরকারী লোকজনের সঙ্গে এই প্রেসিডেন্টদের কি ব্যবস্থা হয় বলা শক্ত। কিছুই আজ অসম্ভব নয়। সবাই আজ টাকা পিটছে—আর সরকারে চাকরেরাই কি বোকা? সেক্রেটারিয়েট চোরাবাজার হয়ে উঠছে, বলেছিলেন না মিষ্টার বিহারী সেন?

ট্যানার বললে, 'শোষণের ফাঁস এঁটে ধরছে পৃথিবীকে।'

তোমাদের 'প্যাক্‌স্‌ব্রিটেনিকা' দেখেছ? ছাখো স্থশাসন। কাগজের পাতায় আজ অন্য মৃত্যুর খবর অজস্র পড়ছ তোমরা। শিউরে উঠছ পড়ে—নাৎসি বর্বরতার কথা, জাপানী নৃশংসতার কথা। কিন্তু এই যে আমাদের শহরে হাটে বাজারে মৃত্যু হানা দিয়েছে—তার কোনো খবর জানবে কি কেউ? দিল্লীর প্রাসাদে শাহানশাহী আর নোকরশাহীর নিদ্রার ব্যাঘাত হবে কি? বিশ্রামের লাঘব হবে কি? আত্মপ্রসাদের অভাব হবে কি?

ক্ষোভে, দুঃখে, বিপুল হতাশায় বিনয় আপনাকে সংযত করে রাখতে পারছে না। ইংরেজ বলে ট্যানারকেই আক্রমণ করছে অকারণে।

নীরবতার ষড়যন্ত্র ঠেলে তবু এমনি দিনে বেরিয়ে পড়ল কলকাতার মৃত আর মৃত্যুযাত্রীরা। 'ধন্যবাদ মৃত্যু, তোমাকে—' বিনয় ইংরেজের কাগজ হাতে নিয়ে বললে,—'তুমি কলকাতার পথে তোমার আসন প্রতিষ্ঠা করছে। ধন্যবাদ ধন্যবাদ—তবু পৃথিবী জানবে আমরা মরছি,—জানবে ভারতবর্ষের মানুষও—তাদের ভাইরা বাঙ্‌লার মরেছে। হয়ত জানবে না তারা কলকাতার বাইরে আমরা কতদিন আগে থেকেই এই মৃত্যুর সাধনা করেছি; কিন্তু তবু সকলে জানবে বাঙালী মরছে। হয়ত একবার ভেবেও দেখবে—মরছে

কারা? যারা ভারতবর্ষের পূর্বতোরণে প্রথম চক্ষু খুলে স্বাধীনতার সূর্য-নমস্কার জানিয়েছে তারা—তারা—তারা।'

কিন্তু তাতে সান্ত্বনা কই বিনয়ের?

ফসল উঠেছে, দর তবু নামছে না। কলকাতার পথে কর্পোরেশানের হিসাব মত দৈনিক মরেছে তখন দেড় শ'। আরও দেড় শ' মরেছে দুঃস্থ হাসপাতালে। হুকুম বের হল ছাব্বিশে আগষ্ট থেকে চা'লের দর বেঁধে দেওয়া হল: 'ধান-চালের দর এখন এই সেপ্টেম্বর থেকে নামানো হবে, আমরা কুড়ি টাকায় তা আনছি মাসখানেকের মধ্যে। যে সব ব্যবসায়ী তা না মানবে তাদের কঠিন দণ্ড হবে।'

অমনি কলকাতায় চা'ল উবে গেল। কালও দোকানে চাল ছিল, কিন্তু আজ আর তা নেই। 'জোগাড় করে দিতে পারি পাঁচ সের—কিন্তু তা ওসব দর হবে না'—জানায় পরিচিত দোকানী। 'দর?—পঁয়ত্রিশ টাকা!' 'পঁয়ত্রিশ?' অগত্যা তাতেই রাজী হতে হবে ক্রেতাকে, চা'ল চাইলে এ-দরই কিনতে হবে। কিন্তু সে দরেও আর বিকালে চা'ল মিলল না। তখন—আটত্রিশ। তা'ই দর। তারপরে চল্লিশ। উপায় নেই, তা'ই কিনতে হবে, তা'ই দর। অনেক কষ্টে বেরোয় চা'ল—চা'ল বাজারে নেই।

অথচ তবু আবার বেরোয়ও—টাকা হলেই বেরোয়।

এক রাত্রির মধ্যে কলকাতায় চা'ল উবে গেল। কাগজের পিঠে এ খবর গেল, তারের মারফৎ এ সংবাদ গেল, চিঠিতে চিঠিতে এই বার্তা গেল—আর সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা খবর দিলে—বাজারে চাল নেই। ফরিদপুর খবর দিলে—চাল নেই। খবর এল বরিশাল থেকে—চাল নেই। চট্টগ্রামে তো চাল নেইই। ত্রিপুরার চাল অবাধে বাজারে এসেছিল দুদিন আগে, এখন নেই। পাবনায় চাল নেই। সমস্ত পূর্ব বাঙলায় দু'দিনের মধ্যে—আট

চল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে—চা'ল নেই, কোথাও এক কণা চা'ল পাওয়া যায় না।

বাজার থেকে উবে গেল চা'ল।

বিনয়ের মনে পড়ল ট্যানারের কথা—'শোষণের ফাঁস এঁটে ধরেছে পৃথিবীকে'।

সভ্যতার যে সব বাহন মানুষের জীবন সুগম করেছে, মানুষের অব্যবস্থায় আজ সে সব বাহন, রেলগাড়ী টেলিগ্রাফ ডাকঘর সংবাদপত্র—মানুষের মৃত্যুর পথ প্রশস্ত করে দিলে—বিনয় বিস্মিত হয়ে তা দেখল।

শ্যামাপ্রসাদ নতুন লাটসাহেবের নামে খোলা চিঠি লিখেছেন, 'বোঝা যাচ্ছে এবার মন্ত্রীদের দিন ফুরিয়েছে। বাঙ্‌লাকে গবর্ণরের শাসনে চালানো দরকার, তিনি সে ইঙ্গিত দিয়েছেন,—অতএব…'বিদায় মন্ত্রীদল! স্বাগত আমলাতন্ত্র।'…

সোনাপুরেও চা'ল বেশি নেই। নতুন ফসল উঠেছে, বাজারে আসছিল, আর এল না। এসব খবরের পরে তা বাজারে দুর্লভ হচ্ছে। মুকুন্দ পালদের খবর—'সব গবর্মেণ্ট কিনে নিচ্ছে। আমাদের ব্যবসা করতে দেবে না।'

নেতারা চিৎকার করে উঠলেন। দেশেই চাল নেই, গবর্ণমেণ্ট তার এজেন্টের মারফৎ সব কিনে নিয়েছে, দেশের সর্বনাশ করেছে।

লঙ্গরখানাও কি বন্ধ হবে? বাইরের চাল আসছে না, মহাজনরাও চা'ল বাঁধা দরে দিচ্ছে না। ম্যাজিষ্ট্রেট বলছে, 'তোমরা জোগাড় করো, আমাদের হাতে নেই চা'ল।' মুকুন্দ পালের কাছে গেল বিনয়, 'শহরের লঙ্গরখানা বন্ধ হচ্ছে। চা'ল কিছু দিন।' 'কোথায় চা'ল?'—মুকুন্দবাবু বললেন। সুরেশবাবুকে ধরলে বিনয়, মুকুন্দবাবু-ঢাকাপট্টি ওদের থেকে চা'ল আদায় করে দিন—কংগ্রেসের নামে।

সুরেশবাবু বল্‌লেন, আগে মজুতের নামে দেশ থেকে চাল ঝেঁটিয়ে

নিয়েছে গবর্মেণ্ট, কিনে নিয়েছে নিজেদের মজুতদারকে দিয়ে চাল। এখন সমস্ত দেশে চা'ল নেই—দেখুন এখন, কোনো বাজারে চা'ল নেই আর।

কিন্তু আউশ ফসল যাবে কোথায়? আপনারা বলেছিলেন, তাতে ছ'মাস অন্তত আমাদের চলবে।

কোথায় আউশ ফসল দেখছেন?—সুরেশবাবু বিরক্ত হলেন।

কোথায় আউশ ফসল? কেউ উত্তর দিল না—কেউ আর সে প্রশ্নও এখন তুলল না। নেতারা তা জিজ্ঞাসা করলেন না, কাগজওয়ালারা তা জানতে চাইল না—মানুষেও যেন তাই কথাটা ভুলে গেল।—সমস্বরে শুধু একটি কথাই উত্থিত হল—'বাঙ্‌লা দেশে চাল নেই।'

বিনয় বললে, চা'ল যথেষ্ট নেই বুঝছি। বাইরে থেকে আনানো চাই চাল গম যা কিছু পাই, তার জন্যও বলছি। কিন্তু আউশ ফসল গেল কই? আর যা আছে ফসল, তাই বা সবাই ভাগ করে, রেশনিং করে খেলে কি বাঁচতে পারি না?

কিন্তু না—চা'ল নেই, চা'ল নেই।'

'দেশে চা'ল নেই, দেশে চা'ল নেই'—এই কথাই বিনা প্রশ্নে সবাই মেনে নিলে।

গ্রাম খালি করে চলে গেল পুরুষেরা। তারা প্রথম যুদ্ধে গেছল খাটতে, গেছল লেবার কোরে তারপর; তারপর চেয়েছিল যেভাবে পারে বাঁচতে— বীজধান খেয়ে, জমি বিক্রী করে, গরু বিক্রী করে, ঘটি বাটি বন্ধক দিয়ে। এবার এল গ্রামের বাইরে, ছুটল এখন ভাতের খোঁজে—শুধু নিজের প্রাণ বাঁচানোর চিরন্তন দায়ে—স্ত্রী নয়, পুত্র নয়, পিতা নয়—কেউ আর আপনার নয়। সব চেয়ে আদিম যে-চেতনা,—প্রাণ-রক্ষা,—তা'ই তাড়িত করে নিয়ে চলেছে তাদের—'বাঁচো, বাঁচো।' গ্রামে পড়ে রইল নারী, বৃদ্ধ, শিশু, বালক। কিন্তু তারাও মরতে চায় না। তাদের বাঁচবার পথ আছে আর কিছু? আছে বই কি। স্ত্রীলোকের যৌবন এখনো তার বড় সম্পদ। তার

দাম আছে—একমাত্র তারই দাম এখনো আছে। কারণ জোৎদারের ঘরে ধান আছে, মহাজনের ঘরে অর্থ আছে, তাদের অনুগৃহীতদের পেটে খাদ্য আছে, আর মিলিটারির নানা কাজের টাকা আছে সামরিক বেসামরিক নানা লোকের হাতে—স্ত্রীলোকের যৌবনের দাম দিতেও ব্যগ্র তারা। যুবতী স্ত্রীলোকের বাঁচবার সুবিধা আছে, অধিকার আছে। ঘর? ধর্ম? মর্যাদা? কতক্ষণের তা? স্বামী? সন্তান?—সে সব তো মানুষের আবিষ্কার—সভ্যতার দান। জীবগতের সব চেয়ে চরম, সব চেয়ে আদিম তাড়না তো ক্ষুধা।

ক্ষুধা, ক্ষুধা, ক্ষুধা। জয়ী হচ্ছে জন্তু; পরাজয় হচ্ছে মানুষের।

প্রমথদের কর্মীরা নানাখানে লোক জমায়েৎ করেছে। বিনয়ও সর্বত্র গেল—এ জিলার চা'ল বাঁচাবে। 'চা'ল বেরুতে দেবে না, নিজেদের অঞ্চলের চা'ল নিজেদের জন্য রাখো আগে। পাহারা দাও। রাস্তার মোড়ে বসে যাও, খালের বাঁকে বসে থাকো, নৌকাঘাটায় ছাখো, ষ্টেশনে ছাখো—যে-চা'ল দেশে আছে তা যেন বাইরের ব্যাপারীরা নিতে না পারে, যে নতুন চা'ল বাজারে আসে তা যেন বাঁধা দরে বিক্রী হয় এ জেলায়।'

সাধ্য ছিল না কারুর এত বড় আয়োজন সম্পন্ন করবে। কিন্তু মানুষের ক্ষুধা মানুষকে প্রস্তুত করে রেখেছিল; দরকার ছিল শুধু বুদ্ধি জোগাবার। হঠাৎ সে বুদ্ধি পেয়ে সে নিজেই উদ্যোগী হয়ে উঠল। বিনয় একবারের মত দেখে বিস্মিত হল—দল নেই, সংগঠন নেই,—নিজে থেকে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে এবার জনতা, তারাই উদ্যোগী হচ্ছে—চা'ল বেরুতে দেবে না। বেগমপুরার দু'হাটে বাঁধা-দরের থেকে বেশি দরে আউশ বিক্রী হল না। সুরেন্দ্রবাবু পুলিশে খবর দিতে গেলেন, তাঁর গদি পিকেটিং হচ্ছে। আরসাদ ব্যাপারী লীগকে বললে, হিন্দুরা দৌরাত্ম্য করছে তার ওপর। কিন্তু কাজী তা শুনলে না,

'মরছে তো মুসলমানরাই বেশি; পাহারাও দিচ্ছে মুসলমানরাই।' শহরের বাজারে প্রকাশ্যে আর বেশি দর চাইতে পারে না মুকুন্দ পাল, মোহনবাঁশী। পাহাড়খাড়ীতে চা'ল কিনছে ব্যবসায়ীরা। দু'বাজারে বাঁধা দরে তবু তারাও চা'ল বেচতে বাধ্য হল। ব্যবসায়ীদের একটা গোপন সভা হল—অমনি চা'ল উবে যেতে লাগল জেলা থেকে। বেগমপুরার হাট থেকে, শহরের দোকান থেকে, পাহাড়খাড়ীর গুদাম থেকে চা'ল উবে গেল। কোনো হাটে চা'ল নেই, কোনো বাজারে চা'ল নেই। যা-ও বা চা'ল পাওয়া যাচ্ছিল, ব্যবসায়ীদের গোপন সভার পরে তা আর পাওয়া গেল না। যতই সাধারণ মানুষ বাঁধা দরে চা'ল বেচতে ব্যবসায়ীদের বাধ্য করতে গেল, ততই ব্যবসায়ীরা চা'ল বাজারে কেনা-বেচা বন্ধ করলে।

'চা'ল নেই।' জেলায় কোথাও চা'ল নেই।

মফিজ মিঞা এসে বললে, একি সর্বনাশ করলেন আপনারা? সাধারণ মানুষ যে ক্ষেপে গেল! চা'ল একেবারেই আর তারা পাচ্ছে না।

শহরে অবস্থাপন্ন ভদ্রলোকেরা এবার অভিশাপ দিতে লাগল প্রমথদের, ওরা বরাবর সর্বনাশ করছে দেশের—ইংরেজের টাকা খেয়ে।

বিনয় নিস্তব্ধ হয়ে গেল—দেখতে না দেখতে তাদের সমস্ত বিজয় পরাজয়ে পরিণত হয়েছে, আবার তারা ব্যবসায়ী-মুনাফাদারদের হাতে পরাস্ত হয়েছে। মানুষ দোষ দিচ্ছে তাদেরই।

এমনি সময়েই শহরের পথে পথে কে এঁটে দিলে এক ছাপানো বেনামা বিজ্ঞাপন। 'দেশব্যাপী অত্যাচার আজ—ফৌজের হাতে দেশের মানুষ লাঞ্ছিত। টাকার জোরে দেশী-বিলিতি সৈন্যরা মেয়েদের ইজ্জত কিনছে। ডাক্তার মজুমদারের বাড়িতে বিলিতি সৈন্যদের অত আনাগোনা কেন! সীতা রায়ের সঙ্গে কি সম্পর্ক ডাক্তারের ও তার কমিউনিষ্ট বন্ধুদের? তাদের ধর্মাধর্ম, সতীত্ব, চরিত্র, এ সবের বালাই নেই। যারা মান-মর্যাদা খুইয়েছে তারা অন্যদেরও সেপথে টানতে চায়। ভদ্রলোক ও ভদ্র-কন্যাদের

সাবধান হতে হবে—ইংরেজের দালালদের ব্যবসায়ের ফাঁদে যেন এদেশের মেয়েরা না পড়ে। বোঝে যেন সীতা রায়ের মত মেয়েরা কি চরিত্রের, কি উদ্দেশ্যে তারা ভদ্রপরিবারে গতায়াত করে।'

বিনয় স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। এমন জঘন্য ইতরতার জন্য সে কোনো দিন প্রস্তুত ছিল না। মজিদ ক্ষেপে গেল। প্রমথ গম্ভীর হল। বললে, এছাড়া ওদের পথ ছিল না। এই ছাপানো কাগজটা ওদের শেষ চেষ্টা। আমরা জিতব কাজের মধ্য দিয়ে, জবাব দোব হাজার মানুষের মুখ দিয়ে।

শহরে একেবারে হৈ-চৈ বেধে গেল। সবাই বললে, এমন ঘৃণিত কাজ কার? আবার সঙ্গে সঙ্গে সকলেই বাড়িতে বলে দিলে, সীতার সঙ্গে আর মেয়েদের পরিচয় না রাখাই ভালো।

শিবুদা' বললে, শহরের সমস্ত নেতাদের স্বাক্ষরে এর বিরুদ্ধে একটা বিবৃতি বার করব, ডাক্তারদা'। সুরেশবাবু ও বৈকুণ্ঠবাবু বলেছেন সই দেবেন—

শুনে সীতা বললে, প্রমোদবাবুকে বাদ দেবে কেন?—আমাকে সে কলকাতা যেতে বলতে এসেছিল, সেখানে চাকরি করে দেবে—এ জায়গায় কি মানুষ থাকে?

বিনয় বুঝল। কিন্তু বিনয় কুণ্ঠিত হয়ে পড়েছে। কি বলছে সীতা? এখানে থাকবে সে তবু? এর পরে আর সোনাপুরে বিনয়ই থাকবে কি?

ডাক্তারদা', বড় বিশ্রী ঠেকছে, না?—সীতা বললে বিনয়কে, কিন্তু আমার পক্ষে তো নতুন নয় একেবারে। কত চিঠি পেয়েছি এতদিন, নামে আর বেনামে; এবার নয় তা ছাপা কাগজেই বেরুল। প্রমোদকে বললাম, 'ভাবছিলাম এখান থেকে যাব—একটা রোজগারের পথ দেখব। কিন্তু এরপরে যাওয়া হয় না আর।'

অবাধ অটল সীতা, ভ্রূক্ষেপও যেন করলে না কিছুতে।

বিনয় প্রমথকে বললে, প্রমথ, আমাকে এবার বিদায় দাও। আমি বুঝছি—আমরা পরাজিত হয়েছি, আর পারছি না।

প্রমথ কিছুতেই তা মানবে না। বললে, পরাজিত হয়েছি। কিন্তু হার মানি নি, হার মানব না—এ আপনি ঠিক জানবেন।

মানা না মানার কথা নয়, প্রমথ, এটা কঠিন সত্য। আমরা জানি আউশের ফসল দেশ থেকে উবে যায় নি; কিন্তু তবু আজ বাজারে চা'ল নেই। আর তার জন্য আমরাই লোকের বিবেচনায় দায়ী—এতো সত্য কথা?

লোকের কথাকে তুচ্ছ বলি না। তবু আমরা দায়ী নই, এইটাই সত্য কথা। কারণ সব চেয়ে বড় সত্য তো এই যে, চা'ল আছে, কিছু-কিছু খেয়ে বাঁচবার মত চা'ল দেশে আছে। যতক্ষণ এ কথা সত্য, ততক্ষণ হার মানব কি বলে? হেরেছি বলে? হেরেছি বলেই হার মানব? তা হলে চিরদিনের মত হারকেই স্বীকার করা হবে। না, না, জয়ী আমরা হবই।

'জয়ী আমরা হবই'? কিন্তু কই, বিনয় তো তার চা'রদিকে তার কোনো প্রমাণ দেখে না। সে তো দেখছে চারদিকে মানুষের পরাজয়ই, মানুষের পাপই—মানুষের দুর্জয় হিংসা, দুর্জয় ঘৃণা, দুর্জয় বিদ্বেষ, দুর্জয় বিরোধ। আর মানুষের হিংসা, মানুষের ইতরতা, মানুষের বিরোধ,—সমস্ত ছাপিয়ে তার সামনে উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে মানুষের লোভের এক সর্বগ্রাসী রূপ! চোখের উপর সে দেখছে—এই তার নিজের চারিদিকে—লোভের সমুদ্র—তারই বিষ উথলে উঠছে—মানুষ তাতে তলিয়ে যাচ্ছে।

তার চোখের দৃষ্টিকে স্পষ্ট করে তুলল ট্যানার।

ট্যানার তাকে বলেছে, মিথ্যা নয় ডক্টর, কিন্তু তোমাদের এদেশে আসবার আগে সে সত্য এভাবে বুঝি নি—কি মানুষের পাপ।

বিলাতের শ্রমিক-সন্তান ট্যানার, বিনয় তার কথা জানত। তাদের গ্র্যামার ইস্কুল থেকে বৃত্তি নিয়ে যায় কলেজে, পড়া শেষ না করতেই যুদ্ধ

বাধে। দুঃখ রয়েছে তার মনে—সে পড়াশুনা ভালোবাসত—বায়োলজিতে ছিল তার ঝোঁক। আরও দ্বন্দ্ব ছিল তার মনে, বিনয় জানল তা এবার। ট্যানার কমিউনিষ্ট ছিল না, ছিল বরং শান্তিবাদী। ক্ল্যারাকে সে বলত—'মানুষের দুঃখ শেষ করবে কি শ্রেণী-বিদ্বেষের বিষ দিয়ে?' এ নিয়ে পরিহাসের সীমা থাকত না ক্ল্যারার। তার বাপ ট্রান্‌স্‌পোর্ট ইউনিয়নের উৎসাহী মেম্বর, ক্ল্যারাও ছিল প্রায় রেড্। নার্সিং-এর অবসরে নানা সভায় যেত—কোথাও বেভিন বলছে, কোথাও আবার পলিট। ট্যানার বিরক্ত হত, ক্ল্যারাও রাগ করত। 'তারপরে এল যুদ্ধ। আমি মিশরে যাচ্ছি, ক্ল্যারা-ই বিয়ে করে বসল এবার আমাকে। তার চিঠি পেতাম—কোনো রকমে দিনগুলো সহ্য হত মিশরে তাই। যুদ্ধ আমার ভালো লাগত না। কেন এই যুদ্ধ?—গেল মিশর, এলাম ভারতবর্ষে। কিছু জানতাম না, কিছু বুঝতাম না। কত বড় দেশ, কত জাত, কত বিচিত্র—কিন্তু কত গরীব। দেখছিলাম—সত্যই শোষণ কাকে বলে, সাম্রাজ্যবাদ কি। আর দেখেছিলাম ফৌজের কর্তাদেরও, বারো আনা তারা হিট্‌লার-ভক্ত—বারো আনা তোমাদের ভদ্রলোকেরাও যেমন হিট্‌লার-ভক্ত। তোমাদের সঙ্গে তর্ক করেছি আগষ্টের দাঙ্গা-হাঙ্গামা নিয়ে; তোমাদেরও বুঝি না কিছুতেই। ক্ল্যারা নানারকমে বোঝাত, ওখান থেকে পাঠাত নানা চুরি করা বই। কিন্তু বুঝতে লাগলাম বরং চোখে দেখে। দেখলাম, এই আমলাতন্ত্র; দেখলাম তোমাদের ব্যবসায়ী-দেরও; দেখলাম সাধারণ লোকদের—তারপরে এখন দেখছি তোমাদের এই দুর্ভিক্ষ। বুঝছি—লোভের বিষে সমস্ত পৃথিবী কালি হয়ে উঠছে। তোমার দেশের লোকও তোমাকেই চুষে খাচ্ছে।'

ট্যানার বললে, এমন করে এদেশ না দেখলে কিন্তু বুঝতাম না যুদ্ধের থেকেও বড় পাপ কি—মানুষের পাপ—এই মুনাফার লোভ, মানুষের শোষণ। এ না বুঝলে হয়ত ক্ল্যারার সঙ্গেও আমার দ্বন্দ্ব ঘুচ্‌ত না।

বিনয়ের কিন্তু অন্য কথা মনে পড়ল ক্ল্যারার কথায়—সুধা। বিনয় বললে, কিন্তু ক্ল্যারা তো কমিউনিষ্ট ?

হাঁ, এতদিনে দলে যোগ দিয়ে থাকবে।

তুমি ? তুমি তো কমিউনিষ্ট নও ?

অন্তত ছিলাম না।

তা হলে তোমরা চলতে কি করে ?

ট্যানার যেন বুঝতে পারল না। বললে, কেন ? আমরা ভালোবাসতাম নিশ্চয়ই।

তা'ই যথেষ্ট ? তারা পার্টির চাকর তো ; দু'জনায় মিল না হলে কি হত ?

বিদায় নিতে হত। ফাঁকি দিত না ক্ল্যারা। কিন্তু গাউন, ড্যান্স, ডিনার এসব নিয়ে ওরা ঝগড়া করত না। সে বিষয়ে ওরা ঠিক—ফাঁকি দেয় না—কাজেও ফাঁকি দিত না ক্ল্যারা, আমাকেও ফাঁকি দিত না। আর মানুষের আশা তো এই—এই অকৃত্রিমতা।

'ফাঁকি দেয় না ওরা'—কাজেও না, মনেও না।...সুধাও কি এমনি ? বুঝবে কি সে, বিনয়ও ফাঁকি দিতে চায় নি তাকে ?...কিন্তু সেই নোংড়া ছাপা কাগজ তার হাতেও পৌছবে নিশ্চয়।...আর সুধার সঙ্গে তার সম্বন্ধ বিনয় এমন ঝাপ্‌সা করে রেখেছে যে, আজ সুধা বিনয়কে ভুল বুঝলে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

মানুষের আশা এই অকৃত্রিমতা...।

বিনয়ের মন কয়েক মুহূর্তের জন্য চলে গেল কলকাতায়। আর বারে বারে বলতে লাগল নিজেকে, মানুষের পাপ এই মুনাফার লোভ...মানুষের আশা এই অকৃত্রিমতা।

ট্যানার তখন তাকে বোঝাচ্ছে, তোমাদের এই দুর্ভিক্ষ দেখে দেখে আমিও বুঝলাম—নিজেকেই ফাঁকি দিতে চাই শান্তিবাদী বলে। পৃথিবী

জোড়া রয়েছে এক শোষণের সাম্রাজ্য। কতকাল ধরে তাই চলছে। তোমাদের দেশের সভ্যতাও তাকেই পোষণ করেছে। শান্তি আসবে কোথা থেকে শোষণের রাজ্যে? তবু জয়ী হতেই হবে মানুষকে।

কিন্তু 'জয়ী আমরা হবই,' বলছে প্রমথও।···ট্যানার বলছে, 'মানুষের পাপ এই মুনাফার লোভ, মানুষের আশা এই অকৃত্রিমতা।

আরও নতুন দৃষ্টিতে বিনয় দেখ্‌তে লাগল পৃথিবীকে।

দেশের নেতারা সাহায্যের জন্য আবেদন জানিয়েছেন। সেই সাহায্য যা দু'মাস আগে নেতারা বলেছিলেন, গবর্ণমেণ্টের কর্তব্য, আজ তারই জন্য আবেদন করছেন তাঁরা। আবেদন করছেন বাংলার গণ্যমান্য সকলে—মিষ্টার সেন, হরসুখরায় পরমেশ্বরপ্রসাদ, পুরুখচাঁদও। প্রদেশে প্রদেশে সাড়া পড়ে গেছে—'বাঙ্‌লা মরছে!' বিনয় বুঝতে পারল না—একি কাণ্ড! দেশ-জোড়া লোভের রাজ্য, এঁরাই কত দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী। চারদিকে লোভের জাল, মুনাফার নাগপাশ,—কে তার বাইরে? বিনয় নিজেও কি তার থেকে মুক্ত? তবু বাঙ্‌লা মরছে। মুরারিবাবু, পরমেশ্বর-প্রসাদ, সবাই চান বাঙলা বাঁচুক। আর তাঁদের অর্থও আজ ইন্‌ভেষ্টমেণ্ট ট্রাষ্টের শক্তি যোগাচ্ছে, বাঙ্‌লাকে মারছে। বিনয়ের শক্তিও আহরণ করেছে সেই ট্রাষ্ট, দুর্জয় লোভ এভাবেই লুঠ করে নিচ্ছে বাঙ্‌লায় উড়িষ্যায় মানুষের খাদ্য, মানুষের প্রাণ, মানুষের মান, তার সম্মান, ইজ্জত, ধর্ম, নীতি। বিনয় নিজেও বুঝছে মানুষের এ পাপে সেও অংশীদার। অথচ সেও আবার মিষ্টার সেনের মতই বাংলার মানুষকে বাঁচাতেও চায়।

'এক হাতে আমরা অন্ন জোগচ্ছি, আর হাতে অন্ন হরণ করছি।'

বিনয় নিজেকে যাচাই করতে বসে গেল।

দিন দুই পরে বিনয় প্রমথকে বললে, প্রমথ, আমি কলকাতা যেতে চাই। সেই মিষ্টার সেন ও ইব্রাহিমভাইদের চা'ল কিছু অন্তত আদায় করতে চেষ্টা করি—

আপনি এখনো সেই কথা মনে করে বসে আছেন! ওরা চা'ল দেবে?

বিনয় প্রমথকে জানাল তার ট্রাষ্টের শেয়ারের কথা আর ন্যাশনাল মেডিসিনের কথা। ট্রাষ্টের থেকে চা'ল সে পেতে পারে; ওষুধপত্র সে দিতে পারে। শুনে প্রমথ বললে, যান। কিন্তু ভেবেছিলাম, আপনাকে আর একবার বলব ডাক্তারি করতে বেরুতে। শহরেও তো দেখছেন, ব্যারাম-পীড়া শুরু হয়ে গিয়েছে—দয়ারাম এসেছিল, ওদের দিকে কলেরায়ও লোক শেষ হল। কিন্তু চা'ল যদি পান, ওষুধ যদি পাঠাতে পারেন, দেখুন গে কলকাতায়।

১৭

এ কি যাতনা আজ রেলে! এই ক'মাসের মধ্যে সমস্ত রেলপথে যে এমন ভিড় বেড়েছে সে কথা যেন বিনয়ের ধারণা ছিল না। টিকেট করতে তার অসুবিধা হল না; উঁচু ক্লাশের যাত্রী কম। কিন্তু উঁচু নিচু কোনো ক্লাশে জায়গা নেই। মানুষ গাড়ীর মধ্যে ঢুকতে পায় না—গাড়ী-ভরতি গ্রাম ছাড়া দুস্থের দল। যে জায়গাটুকু গাড়ীতে যেখানে আছে সে আছে মিলিটারীর কবলে। তাদের প্রতাপে সেখানে অন্য যাত্রীরা বসতে পারে না। গাড়ীর ছাদে মানুষ, হাতলে ফুটবোর্ডে ঝুলছে মানুষ।

গ্রাম ছেড়ে জেলা ছেড়ে সব চলেছে। যে ট্রেন্ পায় চেপে বসে। যতদূর গাড়ী যায় চলে যেবে। পথে মানুষের কাছে পয়সার জন্য হাত পাততে এখনো সঙ্কোচ আছে। কিন্তু খাদ্য পেলে নিঃসঙ্কোচে হাত বাড়িয়ে দেয়। আর কী তাদের ক্ষুধা! যেন তা আর মেটে না। কেউ তাদের বাধা দেয় না, কেউ তাদের গাড়ী থেকে নামিয়ে দেয় না। শুষ্ক শীর্ণ দেহ, রুগ্ন, পীড়িত,—জ্বরে কাঁপছে, পাকশক্তি অনেককাল পুষ্টি হারিয়ে নির্জীব হয়ে পড়েছে। গাড়ীতে গাড়ীতে তাদের রুগ্ন, অসুস্থ ভিড়ে এক অস্বস্তিকর,

অস্বাস্থ্যকর অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে। এদিকে যুদ্ধের নামে গাড়ীতে আলো নেই, জল নেই, বৃষ্টি হলে ছাদ দিয়ে জল পড়ে, ভাঙা গাড়ী যেন কঁকিয়ে কঁকিয়ে চলে। মানুষের ও যাত্রীর ভীড় জমিতে আরও বেশি। ষ্টেশনে ষ্টেশনে প্লাটফর্মের আশেপাশে আর জায়গা নেই। আর কি অস্বাস্থ্যকর সেই আবহাওয়া—নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। গাড়ী আর পরিষ্কার করা হয় না, ষ্টেশনের মধ্যে, প্লাটফর্মের সর্বত্র আবর্জনার স্তূপ। খাদ্য নেই, পানীয় নেই, চারদিকে ছন্নছাড়া আবহাওয়া। আর ভেতরে-বাইরে সর্বত্র অপেক্ষা করছে বালক বালিকা নরনারী যুবতী বৃদ্ধ-বৃদ্ধা। তারা পালাতে চায়, ভিক্ষা চায়, চায় পয়সা, খাদ্য। ষ্টেশনের এরা ভিক্ষায় অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে 'বাবু ক্ষুধা, বাবু পয়সা।' অনেকদিনে এদের মুখে সহজ হয়ে উঠছে এই প্রার্থনা। আস্তে আস্তে তা সহজ হয়েছে; শেষে তা একমাত্র কথা হয়ে উঠেছে ষ্টেশনে ষ্টেশনে, 'বাবু ক্ষুধা, বাবু পয়সা।' কিন্তু গাড়ীর ভেতর অন্নহীন, গৃহত্যাগী পুরুষনারী এখনো এই যাচ্ঞা গ্রহণ করতে পারে নি। তারা ভিক্ষা চায় না, কাজ চায়; অন্ন চায়, বাঁচতে চায়। ভাবে, অভিশাপের দেশ থেকে বেরিয়ে গেলেই বুঝি তা পাবে। কোথায় সেই বাঁচবার জায়গা, সেই ভাতের থালা? আসামে? কলকাতায়? আরও দূরে? আরও নিকটে? কোথায়? কোথায়? সেকথা তারা আর ভাবে না। মনে করে যেখানে হোক তা আছে, তা পাবে, তারা বাঁচবে, খেতে পাবে—এদেশ থেকে বেরুলেই হয়। চলেছে তাই সকলে।

যেন সেই বর্মার পথ!

আলো নেই, জল নেই, অপরিষ্কৃত, অপরিচ্ছন্ন, দুর্গন্ধ, অস্বাস্থ্যকর গাড়ীর মধ্যে বিনয় প্রায় সমস্ত রাত কোনো রকমে বসে দাঁড়িয়ে চলল। ষ্টিমারেও প্রায় সে অবস্থা; সারারাত তাতে কাটাতে হবে। জায়গা তখনো তাতে ছিল, পরে আর থাকবে না। কুলীরা দু'টাকার কম মাল ছোঁবে না। খাবেই বা কি ওরা নইলে?

সেকেণ্ড ক্লাশের খানাঘরের টেবিলের উপর বিনয় শুয়ে পড়ল। তার পার্শ্বে বসে ঝিমুতে লাগল ক্যাথোলিক মিশনের এক পাদ্রি। খানিকক্ষণ আগে চা খেতে গিয়ে তাকে বিনয় দেখে। বিশ্রী চা—আট আনা কাপ। পেয়ালাপত্রও আজ আর পরিষ্কৃত নেই, একবার ভাঙলে নতুন পেয়ালা পাওয়া যায় না। খাবারও বিশেষ পাওয়া গেল না—ডিমের ওমলেট আর টোষ্ট, তাও পাঁচসিকে। উপায় নেই। সাহেব পরিষ্কার বাঙ্‌লায় খানসামাদের জিজ্ঞাসা করছিলেন—এ অঞ্চলে কোথায় কি পাওয়া যায়? লোকে খায় কি?

বিনয় সাহেবের মুখে এমন পরিষ্কার বাঙ্‌লা আর পূর্বে শোনে নি। লোকটির সঙ্গে আলাপ করতে কুতূহলী হল। খাওয়া শেষে আলাপ হল। ক্যাশে বেলজিয়ান্। ইংলণ্ডে পড়াশুনা করেছে, ক্যাথোলিক মিশনের কাজে এদেশে আছে বছর আটেক। এদেশ তার ভালো লেগেছে। নিম্ন বাঙ্‌লায় ছিল পাদ্রি, এখানে এসেছিল এই দুর্ভিক্ষের কাজে। এখানেও তাদের মিশন আছে। দেখে যাচ্ছে এ অঞ্চলের অসম্ভব অবস্থা। সে নিজেও যেখানে কাজ নিয়ে আছে সেখানেও অবস্থা এমনিতর—হয়ত আরও মন্দ। এদিকে মুসলমান বেশি, তারা বাঁচতে জানে, বাঁচতে চায়। লঙ্গরখানাও এদিকে বেশি। কিন্তু ওদিকে নিচু জাতের হিন্দু বেশি। তাদের স্বাস্থ্য নেই, শক্তি নেই, বাঁচবার ইচ্ছাও যেন নেই; আর লঙ্গরখানাও কম—সব তারা কলকাতায় ছুটছে।

ষ্টিমার দাঁড়িয়ে আছে। কোন্ ফাঁকে পাহারা এড়িয়ে দু'চারজন করে ভিক্ষুক এসে যাচ্ছে—ছেলে মেয়ে বুড়ো।

ক্যাশে বললে, এই ছেলেদের মা-বাপ কোথা, ঠিক নেই। আমাদের মিশনের দুয়ারে রাত্রিতে মায়েরা মৃতপ্রায় ছেলে মেয়ে ফেলে দিয়ে যায়। কি করি, বুঝি না। এই এত ভিড় দুস্থের,—কলকাতায়ও এমনি দেখবে, শেয়ালদ' ষ্টেশন থেকে বেরুতে পারবে না,—কিন্তু তার মধ্যে একটাও যুবতী

মেয়ে দেখবে না। কোথায় তারা? গ্রামেও নেই। সব ভেঙ্গেচুরে গেল—শুধু মানুষই মরছে না, সভ্যতাই ধ্বসে পড়ছে।

বিনয় বললে, সত্যই তা'ই। দেখছ তোমাদের ইউরোপে—

ইউরোপের ব্যাপার বুঝি। সেখানে মানুষ ভগবানকে ভুলেছে। মুখে বলে ডিমোক্র্যাসি, আসলে ম্যামনই দেবতা। কিন্তু এদেশে তো তা নয়, ডক্টর। আমি তোমাদের গ্রাম্য-সমাজের লোককে দেখেছি। তারা এখনো ভগবানকে মানে, সহজ ধর্মজ্ঞান তাদের আছে, দশজনকে আত্মীয়-ভাই বলে জানে। বড়লোক গরীব সবাই মিলে মিশে একসঙ্গে থাকে, সুখে দুঃখে এক সঙ্গে বাঁচে, এক সঙ্গে মরে—

সত্য কি এই কথা? বিনয়ের মনে পড়ল ট্যানারের কথা—'অনেক কাল ধরে তোমাদের সভ্যতাও মারছে যে এদের; আজ এরা মরবে না তো কি?

ক্যাশে বললে, না। এরা লেখাপড়া জানে না, কুসংস্কার আছে, স্বাস্থ্যের নিয়ম বোঝে না, তাই তারা নানা রোগে ভোগে, সহজে মরে। কিন্তু এরা তো অসভ্য নয়। মানুষে মানুষে সত্যই তত হিংসা নেই এদেশে। বড়লোকেও গরীবকে 'বাপু' বলে, 'বাছা' বলে। রায়তেরা 'মা' বলে কর্ত্রীকে, 'দাদাবাবু' বলে জমিদারের ছেলেকে। দুঃখের দিনে এরা এসব সম্পর্ক ভুলে যাবে কেন? ভুলে যাবে কি?—প্রশ্ন করলে ক্যাশে।

ট্যানার ভারতবর্ষের এই রূপটি দেখে নি। সে দেখেছে শুধু শোষণের দিক—ফৌজের ছাউনির চারদিকের, শহরের ব্যবসায়ী ও ভদ্রলোকদেরই সে দেখেছে। কিন্তু ক্যাশে গ্রামের ভারতবর্ষকে দেখেছে, সে ভারতবর্ষকে ভালোবাসে—সত্যই শ্রদ্ধা করে এ জাতিকে। বিনয়ের তৃপ্তি হল ক্যাশেকে দেখে। 'ডিমোক্র্যাসি তো পয়সার রাজত্ব। তার থেকে তোমাদের এই আত্মীয়তার বন্ধন অনেক বড় জিনিস'—বললে ক্যাশে। আর বিনয়ের স্বদেশভক্ত মন যেন তাতে সাড়া দিতে পেরে তৃপ্তি লাভ করল।

সকাল না হতে ষ্টিমারে ভিড় বাড়ল। তারপর আরও ভিড়, আরও ভিড়। ষ্টেশনে ষ্টেশনে যাত্রীর স্রোত, দুঃখীর প্লাবন। সবাই পালাতে চায়। পারে অন্নহীন বস্ত্রহীন মানুষ; এদিককার ভদ্র-ইতর, গরীব বড়লোক সব ষ্টিমারে ঢুকতে চায়। দুয়ারে দুয়ারে তাদের রুখতে হচ্ছে, মারতে হচ্ছে, তাড়াতে হচ্ছে। আর পয়সা আদায় করে করে আবার তাদের ছাড়াও হচ্ছে। পয়সা, পয়সা, পয়সা—কেউ পয়সা না হলে পালাতেও পারবে না। পয়সা না হলে টিকেটঘরের দুয়ার খুলবে না, টিকেটবাবু কথা বলবে না। পয়সা না হলে ভিড়ের সারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টিকিট মিলবে না। পুলিশকে আধুলিটা দিয়ে টিকিটের জানালার দিকে এগোতে হবে, সিকিটা দিয়ে বেরুতে হবে। দুয়ারে দুয়ারে দক্ষিণা,—ষ্টেশনের টিকেটবাবু, মালবাবু, তার পিয়ন, তার কুলী—আবার পুলিশ, আবার পিয়ন, আবার ষ্টিমারের টিকেটবাবু, তার মাল্লা, তার খালাসী,—সবারই পয়সা চাই!…একি বর্মার পথ, না বাঙলার পথ? কোথায় ক্যাশের দেখা ভারতবর্ষ? ম্যামনের রাজত্ব এখানে নয় তো কোথায় আবার তা? শোষণের সাম্রাজ্য কোথায় আছে আর?

'শুধু একটুকু জায়গা—একবার, একটুকু'—মেয়ে আছে, ছেলে আছে, বুড়ো আছে—এক কথা সকলের—'পালাতে দিন—পালাতে চাই—বাঁচতে চাই—বাঁচতে চাই।' এক কথা। 'কোনোখানে চাল নেই—সমস্ত ঢাকা জেলায় আমাদের এক কণা চা'ল নেই।'

এই ঢাকা জেলা! যেখানকার শিক্ষাদীক্ষা সভ্যতা সমৃদ্ধির কথা বিনয় সুদূর বর্মায় বসে শুনেছে—সেখানে গ্রাম খালি হয়ে যাচ্ছে! 'চা'ল নেই। হাঁ, চা'ল নেই। আশী টাকা মণেও পাবেন না।'—শুনছে বিনয়, তবু আছে চা'ল, মজুত-ধরা চা'ল তিনটে হাটে জমে আছে এখনো। তালাবন্ধ। তা পাওয়া গেলে এদিককার লোক দু'মাস খেয়ে বাঁচত। ঢাকার কর্তারা তা সদরের জন্য চায়; মহকুমার কর্তারা এদিককার জন্য তা চায়। বাংলার

কর্তারা দু'দলের তারের জবাব জানায় তার দিয়ে, 'বন্ধ রাখো গুদাম; চা'ল গম বাজরা তোমাদের হাজার হাজার মণ পাঠিয়েছি।'—কই? কোথায় তা, কে জানে? এদিককার গুদামে মজুত-ধরা চা'ল তালাবন্ধ রইল। এদিককার মানুষ আশী টাকা মণেও চা'ল পাচ্ছে না। গ্রাম ছেড়ে চলছে ছেলে, বুড়ো, মেয়ে, পুরুষ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত গরীব।

গ্রাম ছেড়ে ঢাকা জেলার শিক্ষিত-অশিক্ষিত গরীব…এমনি এখান থেকে গ্রাম ছেড়ে গেছে কলকাতায় সীতার মা, বোন, ভাই—চা'ল নেই।… হেড্ মাষ্টার রাজেন্দ্রবাবু বাঙ্লা ছেড়ে গেছেন—এদিককার লোক তিনিও। কি করছে এই ভয়ঙ্কর দিনে গ্রামের মধ্যে তাঁর পরিবার? আছেন তাঁরা? না, পালিয়েছেন? কোথায় দ্বিজু? কি করছে বিনয়ের বর্মার বন্ধুদের আত্মীয়-স্বজন, ভাই-ভগ্নী?

এই ঢাকা জেলা!…বাঙ্লার সেরা শিক্ষিত জেলা, সেরা বিপ্লবীদের নিজভূমি!

মজুত-ধরা চা'ল এখনো তালাবন্ধ আছে।—বিনয় জানে এমনি সে চা'ল রয়েছে তাদের সোনাপুরের হাটে-বাজারে, থানায়-ষ্টেশনেও। বেশি চা'ল নয়, কিন্তু তা রয়েছে। এমনি তা রয়েছে—সে দেখতে দেখতে যাচ্ছে—কলকাতার পথে আশে-পাশের ষ্টেশনে। পাহারা দাঁড়িয়ে আছে—সীল-করা গুদামের মধ্যে, কিংবা ষ্টেশনের বাইরেই পড়ে আছে চা'ল মুক্ত আকাশের জল ও রৌদ্রের তলায়,—পাহারাও হয়ত কাছে নেই। তবু ষ্টেশনে ষ্টেশনে অজস্র মূর্তি—হাতে সেই টিনের কৌটো, মাটির ভাড়, যা কিছু হয়; আর একটানা জানাচ্ছে ক্রন্দন—'বাবু ফ্যান, বাবু পয়সা বাবু ক্ষুধা, ক্ষুধা।'

সত্যই ক্ষুধা। বিনয় প্রায় তিনটা পর্যন্ত ষ্টিমারে খেতে পেল না—গোরা সৈন্যরা 'কিউ' করে খেয়ে খেয়ে যাচ্ছে, বাবুর্চিরা তাকে ব্রেকফাষ্ট দিতেই পারে না। বিনয়ের ক্ষুধা পেয়েছে—কাল রাত্রিতে সে বিশেষ কিছু খায় নি। তাই ক্ষুধা পেয়েছে, ক্ষুধা—যা অসংখ্য লোকের পাচ্ছে—যার

থেকে অসংখ্য লোক মরে নিষ্কৃতি পায়—সেই ক্ষুধা বিনয় জঠরে অনুভব করলে—মাত্র কটা কয়েকের মত। অস্থির হয়ে উঠল। তারপর খেতে গেল। ঠাণ্ডা ভাত, ঠাণ্ডা রুটি টোষ্ট, ঠাণ্ডা মটন চপ্ ক্যারি। কিন্তু তাতেও তৃপ্তি এল। আর শুনতে পেল গাড়ীতে বসে সমস্ত দিন পথের দু'পাশে সেই ক্রন্দন—'ক্ষুধা, ক্ষুধা, ক্ষুধা।' এই ফরিদপুর—এই নদীয়া—বাঙলার মাথার মুকুট নদীয়া।

রাত্রি এগারোটা বেজে গেল গাড়ী কলকাতা পৌঁছুতে পৌঁছুতে। তারপর ঘোড়াগাড়ী, ট্যাক্‌সি নেই। ষ্টেশনের ওদিক থেকে একটা দুর্গন্ধ এদিক পর্যন্ত আসছে। অনেক করে পাঁচ টাকায় গাড়ী ঠিক হল—বিনয় যখন এসে বাড়ি পৌঁছল তখন বারোটা বেজে গেছে। দু'পার্শ্বে পথে দেখে এল উপবিষ্ট বা শায়িত মূর্তি। কেউ বেড়া দিয়ে নিয়েছে, কেউ কাপড় বিছিয়ে নিয়েছে; কোথাও ক্ষুদ্র শিশু তখনো কাঁদছে, আর কোথাও বাড়ির দুয়ারে তখনো ক্রন্দন শোনা যাচ্ছে—'মা ফ্যান, মা ফ্যান, মা ফ্যান।' তাইতো, কলকাতায়ও আর সে ধ্বনি নেই—'মা ভাত, মা ভাত।' এখন আর সে কান্নাও নেই—'মা দুটি ফ্যান ভাত—ফ্যান ভাত।' এখন শুধু এক ক্রন্দন—'মা ফ্যান, মা ফ্যান, মা ফ্যান।'

হেনা উঠে এল, শচীপ্রসাদও নেমে এল। এ সময়ে? 'আর বলো না—এদিনের ট্রেনের কথা।' চাকরদের তুলতে হল—সবে ওরা ঘুমুবার উপক্রম করেছিল। এদিকে রাস্তার ধারে ওদের ঘর, ওরা পথের হল্লা-ক্রন্দনে কি ঘুমুতে পারে? সারাটা সময়ই শুনতে হয় সেই কান্না—'ফ্যান, ফ্যান, ফ্যান।'

তাড়াতাড়ি ডাক্তার সাহেবের জন্ত খানা তারা তৈরী করে দিলে। হেনা লেগে গেল ষ্টোভে ওমলেট ভাজতে। একটা বিলিতী প্রিজার্ভড্ ফুডের

টিন খুলে দিলে। শচীদা' বললে, 'এ জিনিস পাওয়া যায় না হে। তবে হুজুরদের ক্যান্টিনে না মেলে এমন জিনিস নেই। জোগাড় করতে হয়। প্রিজার্ভড ফিস্ চাও—সালমন? খুলে দে তো, দলবাহাদুর। আরে খেয়েই ভাখো না। এ সব তোমার আমার সহ্য হবে না—এ হল যুদ্ধের খাবার। অফসার লোগ্‌দের জন্য—নইলে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মাথা খুলবে কি করে?

বিনয় আপত্তি করছিল—কেমন তার ইচ্ছা করছিল না। কোথায় একটা অসঙ্গতি ঠেকছিল এতক্ষণের দেখা পৃথিবীর সঙ্গে এই আহারের সমস্ত আয়োজনের। বলছিল, এত রাত্রিতে আর ওসব থাক্।

শচীদা' শুনলে না। হেনাও মানল না, 'সারা বিকালে চা-ও পাওনি দাদা, আমি জানি—'

দুপুরে যে খেতে পেয়েছি সেই তো বেশি—

তবে? ক্ষিদে পায় নি, বলতে চাও?

ক্ষিদে পেলেই বা কি করে আজ কে? সমস্ত পথের পাশে তো এক কথায় শুনলাম, 'ক্ষুধা, ক্ষুধা, ক্ষুধা।'

হেনা মাথা নিচু করে সমস্ত উপকরণে প্লেট ভরতি করতে করতে বললে, নাও, এখন তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও। আমি দেখি গে শোবার কি হল।

বিনয় খেতে বসল। শচীদা' গল্প করতে লাগল। খেতে খেতে বিনয় সব খেয়ে চলল—চমৎকার সুস্বাদু খাদ্য! মনে কোনো অসঙ্গতি-বোধ রইল না।

সকালে মেঘহীন আলোকে রূপ নিয়ে উঠল এক ক্রন্দন। এমনি অনেক ক্রন্দন বিনয় সোনাপুরে শুনেছে। তবু মুখ বাড়িয়ে জানালা দিয়ে দেখল এ পাড়ায় অজস্র এসে গেছে ঘরবাড়ি ছাড়া নরনারী—জীবন্ত মানুষের সহস্র সহস্র মৃত আত্মা। তাদের বাড়ির ফুটপাতেই গুটিকয় পরিবার জমেছিল। তাদেরই মধ্যে এক নারী বুকে-জড়ানো শিশুর মুখে বিশীর্ণ স্তন বারে বারে দিচ্ছে আর হাহাকার করে কেঁদে উঠছে।

আশ্বিনের আকাশ থেকে রৌদ্র উঁকি দিয়ে দেখছে নিচেকার পথকে—সুপ্রভাত, পঞ্চাশের কলকাতা, সুপ্রভাত!

বিনয় জানালায় দাঁড়িয়ে রইল। মানুষের লাইন চলে গেছে দু'ফুটপাত দিয়ে বড় রাস্তার দিকে। এখনো তাতে অনেকেই শুয়ে, দু'একজন বসে। একটা ছোট উলঙ্গ ছেলে সেই ক্রন্দনরতা মায়ের সামনে বসে একভাবেই তাকিয়ে আছে। অদূরে আর এক বিশীর্ণা রমণী। আর এক মা এসে দাঁড়িয়েছে কাছে; দেখছে আর দেখছে। মুখে কথা নেই, হয়ত চোখেও কোনো বেদনা নেই। আরও দু'-একজনা উঠে বসেছে, কিন্তু এগিয়ে আসছে না তারা, বুঝছে যা জানা তাই ঘটেছে। যা ঘটছে তা'ই ঘটেছে। যা ঘটবে আরও তা'ই ঘটেছে। জেগেও অনেকে তাই একবার মাথা তুলে দেখে আবার শুয়ে পড়ছে। অনেকে মাথা তোলে নি, হয়ত জাগেও নি—হয়ত ঘুমোয়ও নি, মহানিদ্রার ছায়া তাদের দেহ-মনে নেমেছে—দিনের চাঞ্চল্যে আর তাদের দেহেও সাড়া জাগে নি।

"প্রাসাদপুরী" কলকাতা! যতদূর নজর যায় প্রভাতের রৌদ্র সহস্রশীর্ষে নগরীর মাথায় সোনার মুকুট পরিয়ে দিচ্ছে। পথে যতদূর দেখা যায় পায়ে পায়ে বিছানো মানুষের দেহ।

বিনয় দাঁড়িয়ে রইল। দু'কানের উপর এবার মূর্ছিত হয়ে পড়তে লাগল অভাগিনী এক মায়ের কান্না।

চায়ের সময় হল। টোষ্ট-রুটি, ডিম সব আছে। সত্যি সব উপাদেয়। রসনা আপনা থেকেই উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। কিন্তু শোনা যায় যে সে কান্না। হেনার কানেও তা এক-একবার যায় আর সে যেন চমকে ওঠে। বিনয় তর্ক করে, তীক্ষ্ণ, তীব্র হয়ে ওঠে তার কণ্ঠস্বর। শচীপ্রসাদ তর্ক করে, অসন্তুষ্ট হয়। হেনা আহত হয়—পথের উপরকার কান্না তারও কানে বাজছে কি?

শচীপ্রসাদকে বিনয় বলছিল, সোনাপুরের জন্য চা'ল চাই—লোক মরছে।

চা খেতে খেতে শচীপ্রসাদ বললে, মরছে না? ওই তো শুনছ—পথের উপর সেই নারীকণ্ঠের ক্রন্দন শোনা যাচ্ছিল—কিন্তু চা'ল পাচ্ছ কোথা?

মিষ্টার সেন বলেছিলেন, দেবেন। মনে আছে?

মনে থাকবে না—তোমার এতগুলো তার পেয়েছি—তার পরেও? তোমার বোন তো বলতে গেলে আমাকে মারতে বাকী রেখেছেন! কিন্তু তাতে মিষ্টার সেনই বা করবেন কি? সে চা'ল তো ট্রাষ্ট আনতে পারে নি উড়িষ্যা থেকে। সেখানেই বিক্রী করতে হয়েছে—ন'লক্ষ টাকার চা'ল বারো লক্ষে। তেত্রিশ পার্সেণ্ট মাত্র লাভ—নানা কথা হচ্ছে তা নিয়ে—

বুঝলাম। কিন্তু মিষ্টার সেনেরও চা'ল আছে তো।

তাঁর নানা কল-কারখানাও আছে।

কিন্তু দেখছেন না, দেশ উজোড় হয়ে গেল যে।

অত দেখতে গেলে চলবে কেন? তোমরা দেশের বড়লোক, যুদ্ধের বাজারে তোমরা এত মুনাফা করছ, তোমরা দেখবে না তোমাদের দেশের লোককে?

আমরা দেখছি না তবে দেখছে কে? মিষ্টার সেনের কাছেই শুনবে'খন। কতগুলো লঙ্গরখানা আমরা চালাচ্ছি এ শহরে, জানো? সাতাশটা আমরাই চালাচ্ছি এখানে—সগর্বে বললে শচীপ্রসাদ।

সে কথা বললে, দু'মাস ধরে আমাদের সোনাপুরেই গবর্ণমেণ্ট চালাচ্ছে সাড়ে চারশ লঙ্গরখানা।

তুমি বিশ্বাস করো?—সবিস্ময়ে শচীপ্রসাদ বললে।

আমি হিসাব জানি।

তবে আর সেখানে লঙ্গরখানার দরকার কি?—শচীপ্রসাদ উল্টে দিলে কথাটা।

বিশ লক্ষ লোকের জেলা, তার দু'লক্ষ ফৌজে গেছে, অন্যত্র পালিয়েছে; পাঁচ লক্ষ লোক আজ দুর্দশায় পড়েছে। লঙ্গরখানায় ব্যবস্থা আছে বড় জোর এক লক্ষ লোকের, খাওয়াচ্ছি তবু আমরা দেড় লক্ষ লোককে। কিন্তু বাকী সাড়ে-তিন লক্ষ খায় কি?

সাড়ে তিন লক্ষকে খাওয়াবে তুমি আর মিষ্টার সেন?

যতজনকে পারি দেখি।

শচীপ্রসাদ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। পরে বললে, বিনয় বলেছি আগেও—হেনাকেও বলেছি—মনে কিছু করো না, তুমি একেবারে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়েছ।

হ্যাঁ। তা ফিরে পেতে হবে এখন চা'লে তেত্রিশ পার্সেণ্ট লাভ করে, না?—যখন তোমার বাড়ির দুয়ারে মা কাঁদছে মরা ছেলেকে বুকে করে—ওই শুনছ তো—

পথের উপর নারীকণ্ঠের ক্রন্দন শোনা যাচ্ছে—হেনাও শুনেছিল বারবার। বিনয়ের কথা শুনে তার মুখ এক বেদনায় ও বিভীষিকায় কাতর হয়ে উঠল।

শচীপ্রসাদ একটু বিপন্ন ও বিরক্ত হল, শুনছি বলেই তো বলছি। ষ্টকে চা'ল নেই তবু গবর্ণমেণ্ট কণ্ট্রোল ও অর্ডার চালায়—এ ইয়ার্কি বন্ধ না করলে মানুষ মরবেই তো। 'ব্যবসাপত্রও থাকবে না'—বলেছে শৌরীন্।

শচীপ্রসাদ বেরিয়ে পড়ছে—গাড়ীতে উঠবে, কান্না এবার তার কানে পৌঁছল। একবার ফিরল হেনার দিকে। কেমন বিরক্ত, আহত স্বরে বললে, কি যে কাণ্ড! এখনো এ-আর-পি'র লরী আসে নি বুঝি? বাচ্চাটাকে নিয়ে যাওয়া দরকার তো। আমি বরং তা হলে 'হিন্দু সৎকার সমিতিতে' ফোন করে দিই।

হেনা কথা বললে না, ভিতরে চলে গেল নিঃশব্দে। নিঃশব্দে এসে বসল কখন বিনয়ের পার্শ্বে! মাথা অবনত দু'জনার—দু'জনারই কানে সেই ক্রন্দন। শ্রান্ত হয়ে এসেছে সে কণ্ঠস্বর এখন।

রোজই দু'একটা এমনি হচ্ছে, দাদা, ওখানে।

মোটে দু'একটা?

না। দু'একটা শুধু আমাদেরই খাড়ির কাছাকাছি—এই পথটুকুতেই। শহরে তো দেখছই—এখন কাগজেও হিসাব বেরুচ্ছে।

ওরা ভাগ্যবান, হেনা, ওরা কলকাতায় মরল, তবু হিসাব রইল ওদের। কিন্তু আমাদের সোনাপুরে যেখানে যে মরুক, তাদের হিসাবও পাবে না—সরকারী খাতায় না, মিউনিসিপ্যালিটির খাতায় না, চৌকিদারের চোখে না। তাদের হিসাব রাখত শেয়াল-শকুনে—যদি তারা রাখতে জানত।

হিসাব এরা ক'দিন ধরে রাখছে, দাদা? তাও ক'দিন বেরুতেই বন্ধ করে দিয়েছিল সরকার।

বিনয় জানে তা।

হেনা বলল, মাথা খারাপ হয়ে যেত, দাদা, দেখে-দেখে। এখন তবু নিয়ে যায়—এ-আর-পি'র লোকেরা নিয়ে যায়। ধন্যি বলতে হবে তাদের। কি কাজই না করে—ডোম মুদ্দোফরাশও করত না।

পথের ক্রন্দন হঠাৎ আকুল হয়ে আছড়ে আছড়ে পড়তে লাগল। হেনা চমকিত হল। আবার লরী এল বুঝি নিতে।

হেনা আর সইতে পারে নি, ভিতরের একটা ঘরে চলে গেছে। বিনয় উঠে জানালায় গিয়ে দাঁড়াল। বাচ্চাটাকে কেড়ে নিতে হয় নি ওদের, আপনা থেকেই ছেড়ে দিয়েছে জননী। নোংরা কাপড়ে কি একটা বোঝা শুইয়ে দিলে লরীওয়ালারা। তারপর কাপড়টার চার কোণ ধরে ঝুলিয়ে নিয়ে ফেলে দিলে গাড়ীতে। গোটা পঁচিশ এমনি অর্ধাচ্ছাদিত দেহের স্তূপে বাড়ল একটা নতুন বোঝা।

বিনয়ের মনে পড়ল—সে দেখেছে ছেলেবেলা, মিউনিসিপ্যালিটির গাড়ী আসত। ঠিক এমনি করে তারা মরা কুকুর বা ছাগল গরুর দেহ এমনি ছুঁড়ে ফেলত তাদের ময়লা-ফেলা গাড়ীতে।

সমস্ত শরীর দিয়ে বিনয়ের একটা কিসের প্রবাহ খেলে গেল।

দু'পাশের দিনরাত্রির সহযাত্রীরা লরীর দিকে তাকিয়ে ছিল এতক্ষণ। এক শীর্ণা-বিশীর্ণা কঠিন নারী এসে কেবল দাঁড়িয়েছিল লরী ঘেঁসে। উঁকি দিয়ে দেখছিল তার ভিতরটা, দেখছিল প্রভাতের পুঁজি। সে এবার ফিরে গেল তার স্থানে। ছেঁড়া একটা মাদুর রেলিংএর পার্শ্বে, গোটাদুই মাটির পাত্র তার নিকটে, এই তার গৃহস্থালী। লরী চলে গেল। সে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল তার দিকে। তারপর ডান হাতের আঙুলটা সামনের আকাশের দিকে তুলে বললে, 'যাঃ—'। পরক্ষণে একবার যেন হাসল। কি বিড়-বিড় করতে লাগল। আর উঠে চলল আবার সামনের ডাষ্টবিনের দিকে, দু'হাত দিয়ে কি খুঁজতে লাগল তাতে অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে।

সবাই জেগে উঠছে এবার। উঠছে, বসছে। কি কথা বলছে—ধুঁকছে, কাসছে, আবার শুয়ে পড়ছে।

পথে বেরুতেই দেখল বিনয় কলকাতা। এ কলকাতাকে সে দেখে নি আগে,—দেখবার আশাও করে নি।

সুপ্রভাত! কলকাতা, সুপ্রভাত!

বাইরের বসবার ঘরে কার সঙ্গে কথা বলছিল শৌরীন কোঙার। ঘরে আরও দু'-তিনজন লোক। বিনয়কে সম্বর্ধনা জানাল ফোন শুনতে শুনতে। হাস্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে শৌরীনের মুখ কি কথা শুনে।

ফোন শেষ হলে বললে, কখন এলেন? এই ফোন করছিলেন ডাক্তার মৌলিক। বললেন 'সাহিত্যের' গত সংখ্যার সাময়িকী নিয়ে। বললেন, 'আপনি মশায়, ইতিহাসে নাম রেখে গেলেন। এ কথা আর কেউ বলতে পারত না।' দেখেন নি আপনি, বিনয়দা? 'সাহিত্য' পড়েন না? বুঝিয়ে দিয়েছি গবর্ণমেণ্টকে।

একজন বললে, বন্ধ করে দেবে পুলিশ এবার 'সাহিত্য'—

শৌরীন সোৎসুক কণ্ঠে বললে, শুনেছ নাকি কিছু?

না, তবে দেখছেন তো—তার কণ্ঠস্বরে তাঁবেদারির ভাব স্পষ্ট।

শৌরীন সগর্বে বললে, ডাক্তার মৌলিকও তাই বলছিলেন। আমি বললাম, 'আমাদেরও একটা দায়িত্ব আছে তো দেশের কাছে'—বলে বিনয়ের দিকে তাকাল সে। বললে, আপনারা পড়েন না সোনপুরে? ওঃ, আপনার সঙ্গে এদের পরিচয় হয় নি—ডক্টার বিনয় মজুমদার, লেট অব বর্মা এণ্ড সোনাপুর—

পরিচয় পূর্বে হয়েছিল একজনের সঙ্গে—অনিল বোস,—সেই বছরখানেক আগে। এখন অন্যদের সঙ্গেও হল। শৌরীনই বললে, পুজো সংখ্যা 'সাহিত্যের' জন্য সাহিত্যিকদের সঙ্গে পরামর্শ করছিলাম। অনিল বাবু গল্প লিখেছেন—ওয়াণ্ডারফুল গল্প। সুরপতি বাবুর গল্প নিয়েছে 'স্বদেশী।' আমিই ঠিক করে দিই—পঁচিশ টাকা। বললাম, 'না, কুড়ি টাকায় হবে না, মিষ্টার সেন। লেখকদের বাঁচতে হবে তো। পঁচিশ টাকা ভালো গল্পে—কি বলেন? আমাদের লেখকদের একটা 'গিল্ড' থাকা উচিত। পুজো সংখ্যায় কি কম লাভ করে মালিকেরা!

পূজো সংখ্যা বেরুবে না কি?—বিনয় জিজ্ঞাসা করলে।

বেরুবে না? আপনি বলেন কি? কাগজের টানাটানি বলে? সে তো আছেই।

বিনয় বললে, ওখানে তো দৈনিক কাগজও যায় না বেশি। সংবাদ-পত্রের পর্যন্ত ব্ল্যাক মার্কেট হয়েছে। দু' আনার কাগজ চার আনা না দিলে পাওয়া যায় না। কেউ কেউ ঘণ্টায় এক আনা হিসাবে খবর পড়ে—

শৌরীন বললে, তা তো হবেই। যেখানে কণ্ট্রোল সেখানেই জানবেন এ দশা। তাই বলে পূজো সংখ্যা বন্ধ হবে কেন?

শৌরীন জানালে, 'সাহিত্যের' অবশ্য ভিন্ন কথা—এটা সাহিত্যের কাগজ। কিন্তু 'স্বদেশী' 'হিন্দুমেলা' এসব ব্যবসা। বাড়তি মুনাফা-করের ভয়ে বিজ্ঞাপনদাতারাও বিজ্ঞাপনের জায়গার জন্য কাড়াকাড়ি করছে। হাজার বিশ টাকা লাভ পূজো সংখ্যা 'স্বদেশীতে' হবে। মতীশ বাবুরা লাভ করবেন লাখ টাকার বেশি—এক 'হিন্দুমেলা' পূজো সংখ্যাতেই।

কিন্তু অনিল বাবু, পড়বেন গল্পটা, শুনবেন বিনয় দা? লীগের চুরি, ইংরেজের যুদ্ধ আর শোষণ। যুদ্ধ তো আছেই—মিলিটারি খেয়ে উজোড় করল তারপর ঘুষও আছে;—কিন্তু ইন্‌ফ্লেশান্‌টা কিন্তু আপনারা সাহিত্যিকরা ভুলে যান।

আর মুনাফাদারী ও মজুত?—বিনয় জিজ্ঞাসা করলে।

মজুত, মুনাফাদারী? আপনারাও এ কথা বলেন?—শৌরীন যেন বিস্মিত হল।

অনিল বোস গম্ভীর কণ্ঠে বললে, আমেরি ও কমিউনিষ্টদের প্রচার চলছে, দেখছেন। 'হিজ্‌ মাষ্টারস্‌ ভয়েস্‌'—।

বিনয় একটু বিস্মিত হল। অনিলকে সে জানত কমিউনিষ্ট-মতাবলম্বী লেখক বলে। গত বছর অনিল বিনয়ের সঙ্গে চট্টগ্রাম সোনাপুর যাবার জন্য উদ্‌গ্রীব ছিল, অমিতকে ধরেছিল সে জন্য। সে দেখবে, বুঝবে,

'সোনার বাঙ্লাকে জাপানের বিরুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করবে।' কি হয়েছে সেই অনিলের?—ভাবল বিনয়।

বিনয় বললে, আপনি অমিতের নামে বিশ্বাস করেন একথা, অনিল বাবু?

অমিতের নামে না করি অমিতদের নামে করি। করব না কেন? ওরা প্রথম 'বিট্রে' করেছে পৃথিবীতে রিভোল্যুশনকে, এখন 'বিট্রে' করছে ওদের নিজের দেশকে—

শৌরীন সস্মিত মুখে তাকিয়ে রইল।

বিনয় চমকিত হল। সে যেন নির্মল দাশগুপ্তের কথাই শুনতে পাচ্ছে। কিন্তু বিনয় তর্ক করতে চায় না; করে লাভ নেই, তাও সে জানে। বললে, কিন্তু মজুত নেই, বলেন কি করে?

নেই বলে—হেসে বললে অনিল।

আউশ ধান গেল কোথায়? অন্য চা'লই বা ব্ল্যাক মার্কেটে আসে কোথা থেকে?

সরকারের গোলা থেকেই আসে। এই তো বলেছিলেন শৌরীন বাবুই, পাঞ্জাবের গম ওখান থেকে আসে বারো টাকা—এখানে বিক্রী করছে গবর্মেণ্ট বাইশ টাকায়।

শৌরীন হিসেব দিয়ে গেল। বিনয় শুনলে। বললে, আমারও বিশ্বাস গলদ আছে। কিন্তু বাঁচবার পথ কি তাই বলুন?

অনিল বললে, কিছু নেই। কাঁচের ওপাশে খাবার, একটা ঢিল ছুড়লেই হয়, তবু তার চেষ্টাও নেই। এমন নিশ্চেষ্টভাবে মরতে যারা চায় তারা বাঁচবে কি করে?

সিগারেট এগিয়ে দিলে অনিল। বিনয় বললে, নো, থ্যাংক্স্।

তা হলে শুধু গুলি খাবে সে?—বিনয় বলতে যাচ্ছিল।

তাই থাক্, মরুক। অত বেশি বেশি ওদের বাঁচাবার চেষ্টা করে লাভ কি? এই তো বালিগঞ্জের রেলের রাস্তার ওপারে যান—পাড়ার লোক

টিকতে পারছে না। মরছে তো মরছে। কিছুক্ষণ কাঁদল—তারপর রাত হলে ফেলে দিলে জঙ্গলে; আবার চুপ করে এসে বসল, 'বাবু পয়সা, বাবু টিকেট।' এদিকে শেয়াল-শকুনে সেই মড়া নিয়ে কাড়াকাড়ি করবে। পচে গন্ধ উঠছে, পাড়ায় মানুষ টিকতে পারে না, পাহারা বসিয়েছে এভাবে মড়া ফেলা বন্ধ করতে। সব থেকে মুস্কিল মাগুলোকে নিয়ে। পুঁটলি বেঁধে নিয়ে বসে থাকে, কাঁদছে, চেঁচাচ্ছে—দেখ না-দেখ ঝুপ করে মড়ার পুঁটলি পাশের জঙ্গলে ফেলে দিয়ে আবার এসে বসল কাঁদতে।

বিনয়ের মনে পড়ল—সোনাপুরে সে জানে মা ছেলেকে ফেলে দিয়েছে খালে, পুকুরে ফেলে দিয়েছে জীবন্ত ছেলেকে।

উঠতে চাইল খানিক পরে অনিল বোস, উঠি এবার, প্রদ্যোৎ দত্ত এল না আর—

শৌরীন বললে, না। অথচ আসবার কথা। আজ মনে করেছিলাম মিষ্টার সেনকে বলব প্রদ্যোতের কথা আবার—একশ' টাকা মাইনে দিতে তিনি রাজী হতে পারেন। এদিকে কিছু রেশনও আদায় করা যাবে। আপনারা সাহিত্যিকরা বড় অদ্ভুত! এভাবে যখন তখন কাজে রিজাইন দিলে চলে?

অনিল বললে, প্রদ্যোতের কাণ্ড। আমাকেও মিছিমিছি রেণুকা বললে —সে আসবে। প্রদ্যোতের সঙ্গে আবার ঝগড়া করেছে কিনা কে জানে?

অনিল বোস চলে গেল।

বিনয় শৌরীনকে বললে, ব্যাপার কি শৌরীন? অনিল বোস অমিতদের উপর ক্ষেপে গেল কেন?

ক্ষেপে নি কে? দেখেন তো ওদের কাজকর্ম। আমি তা বলি উষাকে,—আপনিও বলবেন সব দেখ্‌লে—

উষা কোথায়?

কোন মিল্‌ক্ ক্যান্টিনে, না লঙ্গরখানায় বেরিয়েছে। এদিকে বাড়িতে

কুড়িয়ে এনেছে একটা বাচ্চা সাত-আট বছরের ছেলেকে। সেটা মর-মর, আর কেবল 'খাই-খাই' করে।

বিনয় দেখল শৌরীন ঊষার কাজে বিরক্ত হয়েছে। জিজ্ঞাসা করলে, আসবে কখন ঊষা?

এসে যাবে খানিক বাদেই। বসুন, গল্প করি।

গল্প চলতে লাগল। শৌরীন বললে, 'সাহিত্য' কিন্তু আপনার পড়া উচিত। দেখবেন এ লেখাটা অনিল বোসের। কি গ্রীম্! খুব এক্স্পোজ করেছে। মিলিটারির কাছে দেশের মেয়েদের ইজ্জত বিকিয়ে যাচ্ছে—আর ওরা বলে জনযুদ্ধ।

বিনয়ের মনে পড়ল সোনাপুরের ইশতেহারটা—এ যেন তাকেই ইঙ্গিত করা।

বিনয় বললে, কিন্তু অমিতদের উপরে অনিল চটেছে কেন?

শৌরীন হাসল এবার, বললে, তার অনেক কারণ। অমিতরা সুরপতি চাটুজ্জেকে নিয়ে মাতামাতি করছে—সেই নাকি বড় গল্প লেখক। জানেন না তো, সাহিত্যিকদের পলিটিক্স্—মোগল হারেমের পলিটিক্স্ আর কি। সুরপতিকে ভালো বললে অনিল বোস সইবে না। অনিল বোসকে ভালো বললে সুরপতি বাবু রাগ করবেন। কত ভাবে যে এদেরকে ট্যাক্ল্ করতে হয় আমার—আমি আছি বলে তবু এরা কিছু পাচ্ছে। পাঁচ টাকা করে বেশি পাইয়ে দিচ্ছি সকলকে এবার—

ঊষা এসে গেল—উস্কো-খুস্কো চুল, খুব উত্তেজিত বিরক্ত হয়েই এসেছিল বোধ হয়। বিনয়কে দেখে কিন্তু চম্‌কে দাঁড়াল। খুশী হল।

কখন এলে ছোটদা'?

কাল রাত্রিতে। তোমার জন্যেই বসে আছি।

একটু যেন লজ্জিত হল ঊষা।—কেমী হয়ে গেল আজ। কি যে কাণ্ড! মেয়েদের সব টিকেটগুলো নিয়ে গিয়ে অন্য টিকেট দিচ্ছে। বলে, 'লাট

সাহেবের বাড়ি চল ; তিনি বলেছেন, চা'ল দেবেন, ছেলেদের দুধ দেবেন।' কিছুতেই বুঝোতে পারি না।

কি বুঝোবে ?—জিজ্ঞাসা করলে শৌরীনই একটু হেসে।

সব মিথ্যা কথা। ওদের দিয়ে তোমরা মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে ডিমোন্‌স্ট্রেশান করাতে চাও—ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললে উষা।

শৌরীন হেসেই বললে, চাইলে অন্যায়টা কি ? মন্ত্রীরা কি উপকারটা করছেন ওদের ?

তোমরাই বা কি উপকারটা করছ ওদের ?

লঙ্গরখানা চালাচ্ছি আমরাই।

না খাইয়েও মারছ তোমরাই।

এ সব তোমাদের কমিউনিষ্টদের মিথ্যা প্রচার।

তুমি বলতে চাও মুরারি সেন চা'ল রাখেন নি ? তাঁর গুদামে চা'ল নেই ? ইন্‌ভেষ্টমেণ্ট ট্রাষ্টের চা'ল নেই মজুত ?

বিনয় যেন একটা কলহের সূচনা দেখল। কেমন অস্বস্তি বোধ করে সে বললে, তা নয় হল, উষা। কিন্তু মেয়েদের ওঁরা ডিমোন্‌স্ট্রেশানে নিচ্ছেন, বলো কেন ?

ওঁরাই নিচ্ছেন। চিনি যে লোকগুলোকে আমরাও। হিন্দুস্তভার একজন ; আরেকজন ওদের কাপড়ের কলের ওয়েলফেয়ার ওয়ার্কার। কি কাণ্ড করছে জানো ? একটা 'ঠেলা' নিয়েছে সামনে—উপরে তার রাঁধা খিচুড়ী ; কিছু কিছু শালপাতা। সামনে ওটা নিচ্ছে, আর পিছনে পিছনে কাঙালীর পাল—ঠিক যেন কুকুরকে ভাত দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

শৌরীন উপহাস করে বললে, তোমরা রুখতে পারলে না ? 'দিদিমণিদের' ওপর তো ওদের অত বিশ্বাস—

উষা ক্ষুব্ধ হল, বললে বিনয়কে, ভাত পেলে আজ মানুষ ছেলে বিক্রী করে ফেলে ; আর ছুটবে না এই গাড়ীর পিছনে ?

তোমরা কি করলে ?—শৌরীন বললে আবার খোঁচা দিয়ে।

বিনয়ের অস্বস্তি বেড়ে গেল। শুধু হাল্‌কা পরিহাস নয়, একটা বিদ্রূপের ভাবও ছিল শৌরীনের কথায়—উষ্মা ছিল উষার কণ্ঠে। বিনয় বললে, আমি যাই উষা। হেনা আমার জন্য অপেক্ষা করে থাকবে।

উষা অমনি সচকিত হল। না খাইয়ে ছোটদা'কে সে ছাড়বে না। ফোনে শৌরীনও হেনাকে জানিয়ে দিতে যাচ্ছে, বিনয় এ বেলা এখানে খাবে। কিন্তু বিনয়ই রাজী হল না। তবু বিনয়কে বসতে হল। উষা তাড়াতাড়ি কিছু খাওয়াবেই দাদাকে, অন্তত চা।

শৌরীন শান্তভাবে উষাকে বললে, কই, প্রদ্যোৎ রেণুকা কেউ এল না? অনিল এসে বসে ছিল এদিকে—

উষা উত্তর দিলে না। আবার শৌরীন বললে, তুমি কাল যাও নি? বলো নি রেণুকাকে ?—

না।—আবার উষার কণ্ঠ গম্ভীর।

কেন? আমি প্রদ্যোতের পদত্যাগ-পত্র রেখে দিয়েছি। মিষ্টার সেনকে বলে কয়ে বোঝাতে পারব।

সে কথা তুমিই জানিয়ো তা হলে প্রদ্যোৎকে।

শৌরীন হাল্‌কা করতে চায় কথাটা। হেসে বললে, সে বুঝবে না কি? একে সাহিত্যিক, তাতে আবার বিয়ে করেছে তোমাদের দলের মেয়ে।

না করলেই পারত।—উষা বড় সহজেই চটে যায় যেন।

পারতই তো। সে বুদ্ধি কি ঠিক সময়ে আমারই হয়েছিল? হয় না। হলে রেণুকার দাদারাও রেণুকাকে এমন ছাড়ত না, আর প্রদ্যোতেরও এখন এমন মাথা খারাপ হত না। কিন্তু ওদের বাঁচতে তো হবে। রেণুকা না হয় এ-আর-পি'তে কাজ পেয়েছে—এম্‌-এ পড়া চুলোয় গেছে। কিন্তু প্রদ্যোতের পঁচাত্তুর টাকার সাব-এডিটরিটা কি ছাড়া ঠিক? ওকে দিয়েই মিষ্টার সেন এবার পূজোসংখ্যা 'স্বদেশী' এডিট্‌ করাবেন তো—

ঠিক না হলে তাকে বলো না।

তুমি বলো না? এক শ' টাকা করেই দেওয়াব, রাজী করাব মুকুন্দ বাবুকে। আর কথা হয়েছে—মিষ্টার প্রদীপ রয় রেণুকাকে একটু উঁচুতে তুলে দেবেন।

কোথায়? তাঁদের গ্র্যাণ্ড হোটেলের সেই রুম্‌সে?

শৌরীন যেন কি দেখল হঠাৎ সামনে। শঙ্কিত মুখে বিনয়ের দিকে তাড়াতাড়ি তাকাল। তাড়াতাড়ি হেসে আবার বললে, আহা, চটো কেন? প্রদীপ রয় জোর করে 'লভ্‌' করতে পারে না কারুর সঙ্গে। সে যাক্‌, কিন্তু প্রদ্যোৎ গেল কেন কমিউনিজম্‌ লিখতে 'স্বদেশীতে'? গেল তো গেল, আবার এই 'স্বদেশী'র আপিসে রেশন-দেওয়া না-দেওয়া নিয়ে ওসব গোলমাল সৃষ্টি করলে কেন? পুলিশে খবর দিলে—

পুলিশে কে খবর দেয়, তা তুমি ভালোই জানো। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললে উষা।

আহা, আমি না হয় জানি। কিন্তু মিষ্টার সেন বুঝবেন কেন তা? তবু আমার সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে। মিষ্টার সেন প্রদ্যোৎকে তাঁর ইন্‌সিওরেন্স ও ব্যাঙ্কের এ্যাসিষ্টেণ্ট পাবলিসিটি অফিসার করে নেবেন। তুমি একবার বলো সে কথা।

তুমিই বলো—তোমার সঙ্গে মিষ্টার সেনের কথা হয়েছে।

আমার কথা প্রদ্যোৎ শুনবে না। তুমি হলে তার 'উষা-বৌদি', রেণুকার 'উষাদি'; তুমি বল্‌লে ভিন্ন কথা।

হাসির সঙ্গেও খোঁচা ছিল কথায়। বিনয় অস্বচ্ছন্দ বোধ করছিল, উঠে পড়ল। উষা এগিয়ে দিতে দিতে বললে, আমিও কমিউনিষ্ট নই, রেণুকাও না। আর প্রদ্যোৎ তো ছিল ওঁরই দলের। সে ওঁদের যা কিছু দেখেছ তাই লিখেছিল গল্পে। যাক্‌গে,—কবে আসবে আবার ছোট্‌দা'?

বিনয় ভারাক্রান্ত মনে বিদায় নিয়ে বেরুল। এ কেমন হয়ে উঠেছে এবার শৌরীন ও উষা? ভালো লাগছে না বিনয়ের। উষাকে সে পসন্দ করে, সুধাদের বন্ধুও নাকি সে। কিন্তু শৌরীনকেও তার ভালো লাগত—রাজবন্দী ছিল, সে সোশ্যালিষ্ট; মুরারি সেনের প্রবন্ধ ও বক্তৃতা লিখে দিত। কিন্তু মুরারি সেন তাকে ঠকাতে পারে নি। শৌরীনই নিজের পথ করে নিয়েছে—ব্যবসায়েপত্রে, সাহিত্যেও। 'তবু কেমনতর হয়ে উঠছে না কি শৌরীন?' ভাবল বিনয়। যুদ্ধের বাজারে আজ সে সুপ্রতিষ্ঠিত; তার কথাবার্তায় দৃষ্টিভঙ্গিতে, দেহে পর্যন্ত তা পরিষ্কার। উষা কি শৌরীনের সেই জীবনের সঙ্গে খাপ্-খাইয়ে নিতে পারছে না নিজেকে? কেমন সে চটে যায়। তবু কেমন আত্মতপ্ত যেন শৌরীনও।—'ডাক্তার মল্লিক বলছিলেন, আপনি মশায় ইতিহাসে নাম রেখে গেলেন।'…আর, সাহিত্যিক-দের সে যেন কেমন মুরুব্বি হয়ে উঠ্ছে—'পাঁচ টাকা বেশি পাইয়ে দিচ্ছি আমরা এখন গল্পে।'…কমিউনিষ্টদের সে বিরোধী; সে এক্স্‌পোজ করছে—গবর্ণমেণ্টকে, লীগ্‌কে, কমিউনিষ্টকে—কিন্তু নিজেকেও কি নয়? দেখছে না শৌরীন আজ চারদিককার অবস্থা? এই তো—

পথে এদিকে সেদিকে কাঙালী বসে আছে, ঘুরছে। রাসবিহারী এভিন্যু আর বালিগঞ্জ যেন তাদের আক্রমণে বিব্রত হয়ে পড়ছে। বিনয় দেখতে লাগল, কৌতূহল বাড়ল।

স্বামী-স্ত্রী বোধ হয়। পাশে ঘুমুচ্ছে সম্ভবত তাদেরই ছেলে, উলঙ্গ রুগ্ন। বিনয় জিজ্ঞাসা করলে, তোমরা বসে যে? গেলে না লাটসাহেবের কুঠীতে?

শীর্ণা রমণী একবার তার দিকে তাকাল, জিজ্ঞাসু দৃষ্টি তার চোখে। তারপর তাকাল পুরুষটির চোখের দিকে, বলতে যেন চায়, শুনলে, না গিয়ে ভুল করি নি?

বিনয় আবার প্রশ্ন করলে। অন্যদিকে তাকিয়েই পুরুষটি বললে, না।

কেন ?

পুরুষটি জবাব দিলে না। বিনয় প্রশ্নের পুনরুক্তি করলে।

মানা করলে দাদাবাবুরা, দিদিমণিরা ; যাই কি করে ?

তোমরা ওঁদের চেনো নাকি ?

চিনি নে ? ওঁরারা কত এয়েছেন গাঁয়ে। শাল শাল কত দেখেছি—খাস্ খামার নিয়ে কত পুলিশ বরকন্দাজ,হাজত-ফৌজদারী হল—

কোথায় বাড়ি তোমাদের ?

বাড়ি ? ধ্যাবড়া চেনো ? চাঁপাডাঙ্গা ?

বিনয়ের স্মৃতি মথিত হয়ে উঠল—সেই চাঁপাডাঙ্গা, সেই ধ্যাবড়া, সেই নেয়ামৎপুর ! সেখানেই বিনয় এদের মধ্যে প্রথম এসে দাঁড়িয়েছিল। ভিটেছাড়া, জমিহারা সেই নরনারী—এই দশায় এসে পৌছেছে !

বিনয় বললে, চিনি না ? চাঁপাডাঙ্গা, নেয়ামৎপুর—সেই তোমাদের যতীন দা, দুর্গা মণ্ডল—চিনি না তাদের ?

চেনো যতীনদা'কে ?—নিকটে এগিয়ে এল সেই পুরুষটি সাগ্রহে। সোনার মানুষ—রইল না। তাই তো আমরা ম'লাম।

বিনয় সবিস্ময়ে বললে, কি হয়েছিল ?

ক্ষয় কাশ। এই বোশেখ মাসে গেল। নইলে এ দশা হয় ?

দুর্গা কই ? হারু মোল্লা ?

চেনো তাদের ? হারু এলো না। বলে, 'শুকিয়ে মরব, তবু মরব আমাদের এ গাঁয়ে। বাঁচি, ফসল ফলবে, বাঁচব। আমি হারু মোল্লা, আমি যাব ভিক্ষা করতে শহরে ?—জমিদারের কাছে মাথা নোয়াই নি।' দুর্গাই বললে, 'কলকাতায় বাবুরা ভাত দিচ্ছে, কাপড় দিচ্ছে। চলো।' কোথায় দুর্গা, কদিন ধরে দেখি নি—জরে পড়েছিল।

সেই দুর্গা—চিরদিনের আধপাগলা দুর্গা, কৃষক সভা বুঝত, বিনয়ের মাল বয়ে নিয়েছিল সেবার।

ক'দিন এসেছ তোমরা শহরে?—বিনয় জিজ্ঞাসা করলে আবার।

সাতাশ দিন হয়ে গেল।

খাও কোথা?

ওখানে লঙ্গরখানা আছে।

পাচ্ছ তো খেতে?

কলকাতার বাবুরা ভালো, খেতে দেয়। কিন্তু আমরা খেতে পারি না যে। সইছে না। দুটো তো গেছে। একটা ছিল দুধের শিশু, তখন দুধ পেলে বাঁচত। এখন নিজেরাই আছি—আর এইটা শেষ।

কাজকর্ম করো না?

কাজকম্ম! দেবে বাবু? সবাই জিজ্ঞাসা করে—'কাজকম্ম করবি?' আমরা ভিখিরী নাকি? পথে পথে কাঁদছি, 'কাজ দাও।' শোনেও না কেউ। সবাই বলে 'কাজকম্ম করবি?' কিন্তু কাজ দেবে না কেউ। এখন তো জোর নেই—উঠতে বসতে পারি না—জ্বর আসে সকালে-বিকালে—এর পরে কাজকম্মই বা করব কি?

লোকটা বিরক্ত হয়েছে। তবু বিনয় আবার জিজ্ঞাসা করলে, সেই নকুড় ঘোষ কই?

তেনার কথা তেনার বাবু। গোলায় ধান ছিল, গোয়ালে গরু ছিল, দুধ বেচেছেন সেপাইদের কাছে—চাঁপাডাঙ্গায় বড় মানুষ তিনি এখন।

মোল্লাপাড়ার ওরা? জেলেরা? মাহিষ্যেরা—চাষী কৈবর্তরা—

কে কোথায় গেল, দেখেছে কে?

বিনয় চলে এল। স্মৃতি তার এবার ব্যথায় ভরে উঠল। তার বড় প্রিয় বন্ধু এরা—যদিও এরা তাকে মনেও রাখে নি। এই চাঁপাডাঙ্গার মাঠে সে সুধাকে পেয়েছিল, প্রথম—আর তাতেই নতুন করে সে নিজেকে পেয়েছে

এখন—এরাও জানে না বিনয়কে বিনয় হবার পক্ষে এদের দান কতখানি। কিন্তু দুর্দশার শুরুও ওদের তখন থেকেই—অকর্মণ্য সরকারের অব্যবস্থায়। আর তাই সমস্ত চব্বিশ পরগনা বালিগঞ্জ ষ্টেশনের ও পথের উপরে এখন মুখ থুবড়ে পড়েছে। কোথায় সাগরদ্বীপ, কোথায় কুলটী, কোথায় মথুরাপুর, জয়নগর—আর এদিকে চাঁপাডাঙ্গা, ধ্যাবড়া, বাঁশখালি—। এক ফসলা ভূমি এদের, আউশ ধানও এরা পায় না, ঝড়ে গত বছরের ফসলও নষ্ট হয়ে গেছে।

বাবু, কথা শুন্‌বে একটা ?—আবার বিনয় দাঁড়িয়ে পড়ল।

কি ?

ত্নটো পয়সা দেবে ?

বিনয় দাঁড়াল কম্পিত-ওষ্ঠ সে বয়স-না-জানা নারীমূর্তির কাছে।

ত্নটো পয়সা—বড় ক্ষিদে বাবু।

বিনয় পকেটে হাত দিলে। জিজ্ঞাসা করলে, তাতে ক্ষিদে মিটবে কেন ? কি খাবে ?

মুড়ি।

বিনয় পয়সা দিলে।—তোমার বাড়ি কোথা ?

তমলুক চেনো ?—হাঁ, সেদিক—চল্‌ল নারীমূর্তি দোকানের দিকে।

বিনয় দাঁড় করালে তাকে—তুমি একা এসেছ ? আর কেউ নেই ?

ছিল অনেকে। গেল পূজোর ঝড়ে সে সব গেছে—কপাল পুড়েছে। এক ছেলে আছে দেশে।

তাকে আন্‌লে না যে ?

দশ বিঘে জমি আছে; ধান ফলেনি বেশি, যা ফলেছে তা সে-ই খেয়ে বাঁচুক। আমি পারি ভিক্ষা করে খাই, না পারি মরি।

এক পাশে এক ছাতার আড়ালে বসেছে এক পরিবার। উনুন জ্বালছে বুঝি ? বিনয় দাঁড়াল, বল্‌লে, তোমরা লঙ্গরখানায় যাও না ?

না, রেঁধে নিই, খাই।

পাও কোথা ?

সবাই এক এক দিকে বাড়ি বাড়ি যাই। যা পাই খাই; চা'ল পেলে তা নিয়ে এসে রাঁধি।

বিনয় আশ্চর্য হল—এখনো কলকাতার গরীব গৃহস্থ গরীব-দুঃস্থকে ভাত দেয়, ফ্যান দেয়, চা'ল দেয়।

লঙ্গরখানায় খাও না কেন ?

সে খেলে যে মরে যায় গো।

সে কি কথা ?

হাঁ গো হাঁ। আমাদের গাঁয়ের লোক আসত এ পারে—কুলটী থানায়। লঙ্গরখানা ছিল। খেয়ে তারা দু'দিনেই শেষ হল।

কোথায় তোমাদের গাঁ ?

গঙ্গার ওপারে।

মেদিনীপুরের গ্রাম ছেড়ে গঙ্গা পেরিয়ে নানা পথে এরা কলকাতায় পৌঁছেছে। বেহালা, বালিগঞ্জ, হাওড়া—চারিদিকে হতভাগ্য মেদিনীপুরের মৃত্যুমুখী চাষী পরিবার এসে ছন্নছাড়া হয়ে যাচ্ছে।

কতদিন এসেছ ?

তা দিন সাত হল।

ওঃ, বেশি দিন আসো নি, তাই বলো। লঙ্গরখানায় যাও না ? ভিখিরীদের খেতে দেয়।

ভিখিরী হতে যাব কেন আমরা ? চাষী মানুষ। গতর আছে, খাটব, খাব।

মোটে সাতদিন ওরা এসেছে শহরে। নতুন এসেছে। এখনও আশা আছে, এখনো শরীরে সামর্থ্যও আছে।—কিন্তু কি আশা আছে ওদের ?

হেনা বসে আছে হয়ত। বিনয় তাড়াতাড়ি চলল। চোখে পড়ল

কেন যেন পথে কাঙালীর ছুটোছুটি। কোনো লঙ্গরখানার দুয়ার খুলছে হয়ত। না, ভীত দুর্বল নরনারী ছুটছে যে! একটু পরেই বিনয় দেখল—পুলিশ তাদের তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে, এগুতে দেবে না শহরের দিকে। বড় রাস্তার উপর একটা 'ঠেলার' উপর তখনো রয়েছে দু'মটকি খিচুড়ি। কেউ নেই সেখানে আর, পুলিশই তা পাহারা দিচ্ছে। দূর থেকে একপাল নরনারী শিশু তা তখনো ক্ষুধার্ত নয়নে দেখছে।

মন্ত্রী-মারার আয়োজন হয়ত। কিন্তু,—ক্ষুব্ধ হৃদয়ে বিনয় ভাবল,—যারা মন্ত্রী, তারাও যে পাল্টা আয়োজন করতে জানে। মরে তাই বোড়েরা।

কলকাতার পথ। বিনয়ের উন্মথিত চেতনার উপরে কলকাতার বীভৎস বিভীষিকা এবার সহস্র তরঙ্গে ভেঙে পড়তে লাগল।

একি পথ কলকাতার! নিরন্নের জোয়ার গ্রাম ছাপিয়ে এসে পড়েছে শহরে। দিল্লীর বা লালদীঘির কোনো 'কেন্নুটের' আদেশ তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে নি। রাসবিহারী এভিন্যু ছাপিয়ে বন্যা পৌঁছেচে রসা রোডে, পৌঁছেচে তা চৌরঙ্গীর সীমানায়। চব্বিশ পরগনা, মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলী—বুঝি সমস্ত বাঙলার হতভাগ্যরা দেখতে এসেছে তাদের রচিত ঐশ্বর্য—প্রাসাদপুরী কলকাতা।

মোটর ছুটছে, লরী ছুটছে, ছুটছে জিপ্, ছুটছে ট্রাক্। চৌরঙ্গীর উপরে চলেছে দেশ-বিদেশের খাকীধারীরা; আর তার পায়ে পায়ে নতুন নতুন রেষ্টুরেণ্ট ও হোটেল আর কৌতুকাগার। প্রাসাদপুরী কলকাতা!—না, তুমি এখনো আত্মরক্ষা করতে পেরেছ, ঐশ্বর্য তোমার অম্লান।

কিন্তু অম্লান কই? কার্জন পার্কের ঘাস আর শ্যামল নেই, পথ ছাপিয়ে এসে গেছে গ্রামছাড়া অন্নহীন মানুষ—রেলিংএর পাশে, ঘাসের উপরে, গাছের ছায়ায় সর্বত্র তারা। [illegible] শ্বেত প্রস্তরের সাক্ষী ব্রিটিশ

সাম্রাজ্যের প্রহরীরা এরই মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে এক-একজন ;—অচঞ্চল দৃষ্টান্ত তারা ব্রিটিশ শান্তি ও শক্তির, আমেরির মহিমার।

লালদীঘির তীরে এসে গেছে তারা। কিন্তু লালদীঘির আমলাশালার মহিমা অম্লান। বারান্দায় ঘুরছে তার লাল উর্দি-পরা বেয়ারা চাপরাশি ; ঘুরছে হয়ত জাহেদুদ্দীন, রচিত হচ্ছে নতুন ঘোষণাপত্র—কিংবা নতুন বিবৃতি মাননীয় কোন্ মন্ত্রীর। বিনয় যেন শুনছে তাদের নতুন ঘোষণা—'সব ঠিক হ্যায়।' এই দপ্তরখানাই সেই সাক্ষী। বাঙলার দপ্তরখানায় চাপরাশি ঘুরছে, 'বখশিস্ চাই।' মন্ত্রীদের তাঁবেদার দল ঘুরছে, 'একটা কিছু আমরা না পেলে কিসের মন্ত্রী তোমরা?' ঠিকাদারের অনুচরেরা ঘুরছে, 'এমন দাঁ মারবার দিন যাচ্ছে—একটা ঠিকা কিংবা অন্য ব্যবসা ফাঁদতে পারব না?' লীগ্-বে-লীগের নতুন-ধরা মুরুব্বিরা ঘুরছে— 'একটা সুবিধা করে রাখতে হয় এ বেলা—আমাদের মন্ত্রীরা থাকতে থাকতে।'

জাহেদ আপিসে নেই। বিনয় বেরিয়ে এল আবার পথে—কোথায় যাবে? চারদিকে অগণিত প্রাসাদ, অজস্র মানুষের স্রোত, যথেচ্ছ স্রোত ফৌজী যান-বাহনের। প্রাসাদময়ী মহানগরী—মেঘভাঙা রৌদ্রে তার ঐশ্বর্য চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। বিনয় যাবে কোথায়? তার ওষুধের কারখানায় যাবে, সোনাপুরের জন্য ঔষধের ব্যবস্থা করে আসবে। এখানেও টাইফয়েড, কলেরা বেড়ে যাচ্ছে, কর্পোরেশান পেরে উঠছে না। পথ ছাপিয়ে চলেছে কঙ্কাল, দুয়ারে দুয়ারে কঙ্কাল—কিন্তু এ কঙ্কালেরও কলেরা হয়, এ কঙ্কালের আবার টাইফয়েড হয়—কলকাতা শঙ্কিত হয়ে পড়েছে। ঘর নেই, দুয়ার নেই—ওরা বাড়ির সামনে বসে যাচ্ছে। মৃত্যুর পথিক ওরা—ঘর গেছে, দুয়ার গেছে, সংস্কার গেছে, লজ্জা-সরম ধর্মবোধ সব গেছে—দেহে ওদের আবরণ নেই, ধুলো জমেছে মাথায়, মুখে—পৃথিবীর আবর্জনা ওদের খাদ্য—ওরা কি পরোয়া রাখে স্বাস্থ্যতন্ত্রের আর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার? কলকাতাকে ওরা নিজেদের কদর্যতায় প্রপীড়িত রোগদুষ্ট করে তুলবে

নাকি ?—প্রাসাদময়ী মহানগরী—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের 'বাঁদী-বেগম'—ভয়ে শঙ্কিত হয়ে উঠছে।

বিনয় ট্রামে যাচ্ছে। দুপুরের পথে জল-কাদা, ঘোলা জলের যথেচ্ছ প্রবাহ, তরকারির খোসা—চার দিকে ডাষ্টবিনের ছাপিয়ে-পড়া আবর্জনা। তার চারদিকে পাঁতি পাঁতি করে খুঁজছে মানুষ খাদ্য—বুড়ো, ছেলে, নারী-পুরুষ—শ্মশানের প্রেতের মত মূর্তি—খাদ্য খুঁজছে। মাঝে মাঝে ছক কেটে কেটে বসে আছে সারের পর সার এখনি—বিকাল চারটায় কণ্ট্রোলের দোকান খুলবে। আবার, দলে দলে ছুটছে পথের উপর দিয়ে আরও মানুষ দুপুরের লঙ্গরখানার উদ্দেশ্যে। তারা অসংখ্য, হাতে সেই ভাঙা থালা, মাটির পাত্র, টিনের কৌটো। ঘুরছে দলে-দলে—শিশু বুকে নিয়ে, ছেলের হাত ধরে। ফুটপাতে আর জায়গা নেই—পথে তাদের জন্য গাড়ী-ট্রাম চলা দায়। একটা গলির মোড়ে ভিড় দেখা গেল। ট্রামের পথ পর্যন্ত ভিড়ের শেষটা এসে পৌঁছেছে। গলির ভিতরেই বুঝি একটা লঙ্গরখানা, তাতে খাদ্য দেওয়া হবে কিছু পরেই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেখানে জায়গা জোগাড় করবার চেষ্টা করছে এরা। লঙ্গরখানার দুয়ার খোলে নি এখনো—ভিড় বেড়ে ছাপিয়ে পড়ছে ট্রামের লাইনে পর্যন্ত! ভিড় জমে উঠছে, একটা জমাট একাকার মানুষের প্রকাণ্ড পিণ্ড হয়ে উঠছে এই ভিড়। সবাই ঠেলাঠেলি করছে, পিষ্ট মানুষের কণ্ঠ থেকে বেরুচ্ছে নানা আর্তনাদ। মা ছেলেকে ডাকছে, বুকের শিশুকে ভিড়ের পেষণ থেকে বাঁচাতে চাইছে চেঁচিয়ে; বাহুছিন্ন বালক খুঁজছে মাকে, খুঁজছে বোনকে;—নড়বার শক্তি নেই কারুর। খুঁজবার উপায় এদের শুধু চীৎকার, ক্রন্দন। এদিকে সেদিকে দু'একজন শক্তিমান্ পুরুষ এই ভিড়কে সুশৃঙ্খল করতে চাইছে—ধাক্কিয়ে, হটিয়ে, ধমকিয়ে। তারা কাউকে সংযত করতে পারে না,—হাতের ছোট বেত আস্ফালন করছে তারা নিরর্থক। কপাল বেয়ে তাদেরও পড়ছে ঘামের ধারা; কণ্ঠে ক্রুদ্ধ, বিরক্ত, উদ্ধত বাক্য—কিন্তু শুনবে কে? এরা যে মরীয়া হয়ে

উঠেছে, লঙ্গরখানা এদের স্বর্গ, ফ্যান এদের অমৃত। এরা বাঁচতে চায়, বাঁচতে চায়।

কারখানার নিকটের পথে ও গলিতে ভিড়। চলতে পারে না যেন বিনয়, পদে পদে সেই মানুষের প্রেত-মূর্তি। এদিককার লঙ্গরখানা থেকে কেউ কেউ খেয়ে ফিরছে, কেউ ফিরে ফ্যান নিয়ে বসে গেছে, কেউ শেষ করে সতৃষ্ণ নয়নে দেখছে অন্যের খাওয়া, কেউ শেষ করেই কাঁদতে শুরু করেছে—তার আরও চাই, ক্ষুধা মেটে নি। এরই মধ্যে এখানে ওখানে কেউ নিস্পন্দ, নিস্প্রাণ—সব তার শেষ হয়েছে ; কিন্তু কে কাঁদছে তার জন্য বসে ? কেউ না।

ওষুধের কারখানার সামনে, প্রায় দুয়ারে, কে মরে পড়ে আছে। হয়ত সে স্বামী হবে, আর ওই স্ত্রী—ফ্যানের হাঁড়ি যে সবে শেষ করে বসেছে, এঁটো হাত ভালো করে চেটে নিয়েছে, 'তারপর স্তব্ধ দৃষ্টিতে দেখছে—সেই মৃত মূর্তিটিকে। বিনয় একবার দাঁড়াল। জিজ্ঞাসা করবে কি ? কথা বলবে—কোথায় বাড়ি, কে ওই পুরুষ ? কে আছে আর নারীর ? বিনয় একটু ভাবলে, তারপর আবার ঢুকে পড়ল কারখানায়। সে স্থির থাকতে চায়। ডাক্তার সে,—বর্মার পথে ফিরেছে, মৃত্যুকে চিনে,—অনেক কাজ তার হাতে আজ। অনেক কাজ—স্থির ভাবে করতে হবে সব কাজ।

গুরুপদবাবু দেখে বিস্মিত হলেন : কখন এলেন ? কেমন আছেন ?

বিনয় হেসেই উত্তর দিলে, কুশল প্রশ্নও জিজ্ঞাসা করলে। পরে বললে, একটা লোক মরে আছে যেন মনে হল ?

গুরুপদবাবু বললেন, কোথা ? ওঃ, হাঁ, ঘণ্টা দুয়েক আগে কান্না-কাটি করছিল মেয়েটা। বুঝলাম মরেছে। মুশকিল হল, পড়ে থাকবে সমস্ত-দিন—কখন লরী আসবে।

অভ্যস্ত দৃশ্য, সহজ কথা।

প্রসঙ্গান্তরে যেতে চায় বিনয়ও কি আছে বলুন তো ? এখনি কিছু ওষুধ প্রথম পাঠাতে হবে সোনাপুরে।

কালীধনবাবুও এলেন। বিনয় প্রথমবারের চালানের ওষুধ লিখে ফেলতে চাইল তাঁদের সঙ্গে বসে। লিখতে লাগল, লিখল। কিন্তু লেখা শেষ হল না। গুরুপদবাবু দামী ওষুধ হাতছাড়া করতে চান না। বিনয় দেখল ভালো ওষুধপত্র খাঁটিভাবে তৈরীও হয় না—সবই একটু নিরেস।

কালীধনবাবু বল্‌লেন, আজ বাজারে যেমন দাম চড়ছে, এ সব এখন ছাড়া ঠিক নয়,—তা'ই বলেছেন মিষ্টার চৌধুরীও।

বিনয় লিখতে পারল না আর।

ঘুরে লেবরটরিতে গেল; কেমিষ্ট দু'জনার সঙ্গে আলাপ করলে। মিষ্টার চৌধুরী তাঁদের বলেছেন একটু বুঝে-শুঝে যেন তাঁরা কেমিক্যালের মাত্রা দেন। না, ওষুধ একেবারে যা-তা হবে কেন? তবে যে সব রাসায়নিক মাল কিনতে হয় তা কি আর খাঁটি আছে? তার পরে এখানে তাঁরা আর কতটা খাঁটি ওষুধপত্র করবেন?

বিনয় ভাবতে পারল না আর—তবু ভাবতে হয়। নানা ভেজাল লঙ্গরখানায় খিচুড়িতে, মানুষ তা খেয়ে আরও তাড়াতাড়ি মরছে। ভেজাল ডাক্তারখানায় ওষুধে, অনশন-পীড়িতদের জ্বালা তা দিয়ে শেষ করছি আমরা আরও তাড়াতাড়ি।...কোথায় চলেছি আমরা? আমার টাকা ইন্‌ভেষ্টমেণ্ট ট্রাষ্টে; ট্রাষ্ট চা'ল মজুত করে মানুষ মারছে; আর আমি খুলছি লঙ্গরখানা। আমার টাকা ওষুধের কারখানায়; ভেজাল ওষুধে তা লোকের আয়ু নিঃশেষ করছে; আর আমি লোককে বাঁচাই—ডাক্তার। কোথায় চলেছি আমরা?...মনে পড়ল ট্যানারের কথা: যুদ্ধের অপেক্ষা বড় পাপ এই তো—এই লাভ আর লোভ। শচীদা' বল্‌বে বিনয় ব্যবসা জানে না, কারখানার কাজ বোঝে না। কিন্তু এযে পাপের ব্যবসা, পঙ্কের পারাবার—মানুষ তাতে নিমজ্জিত হয়ে যাচ্ছে—সকল মানুষ, ছোট মানুষ, বড় মানুষ, ধার্মিক মানুষ, অধার্মিক মানুষ—সকল মানুষ!

আবার বিনয় পথে বেরিয়ে পড়ল। কাকে সে জানাবে নিজের আহত

হৃদয়ের দুঃখ? কাকে বলতে পারে এই গ্লানিভরা বেদনার কথা? মনে পড়ল সুধাকে, মনে পড়ল অমিতকে। হেনা? হয়ত বুঝবে সে,—হয়ত বুঝছে উষা; তবু বুঝছে না শৌরীন, বুঝছে না শচীপ্রসাদ। ওরা এখনো টিনেভরা বিলিতী ফল পায়, বিলিতী মাছ খায়। স্বাচ্ছন্দ্য ওদের চারদিকে ছাপিয়ে পড়ছে। বিনয়ের কথা তবে কে বুঝবে? বুঝবে হেনা, উষা? বুঝবে নিশ্চয় সুধা, অমিত।

সুধার ও অমিতের খোঁজে এবার তাদের আপিসে বিনয় চল্‌ল।

অপরাহ্নের দিকে এসে পৌছচ্ছে দিন, একটা ক্লান্তি এসেছে শহরের পথে আর তার মানুষের গতিতে। কারখানার দুয়ারের সেই মেয়েটা সেই মৃত পুরুষটিকে ঢেকে তার পাশে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে—বিনয় একবার দাঁড়াল। তারপর আবার চল্‌ল। ফুটপাতে অজস্র দুঃস্থের দল শুয়ে পড়েছে, বসে পড়েছে, দেয়ালে গা এলিয়ে দিয়ে ঝিমুচ্ছে। মেয়েরা কেউ একজন আর জনার চুল বাছছে; ছোট ছেলেগুলো ঘুমুচ্ছে, বসেছে, নিজেদের মধ্যে কি বলছে। বিনয় পাশ দিয়ে যেতেই হাত বাড়িয়ে দিলে একজন, চাইড্ডা খাইতে দেন বাবু, দুডা পয়সা দেন। বিনয় একবার দাঁড়াল, দেবে কি একটা ডবল পয়সা?—প্রায় নগ্ন একটা বছর আটেকের ছেলে আর তেমনি অর্ধনগ্ন তার বছর দশেকের বোন। লিক্‌লিকে হাত-পা, প্রকাণ্ড উদর, কাঠির মত তারও হাতপা। রুক্ষ কেশ, ময়লা রংএর উপর ধুলো ও ময়লা। বিনয় বিচলিত হল যেন। বিনয়ের মনে হল এ ভাষা সে কলকাতায় শোনে নি। বাঙ্‌লা দেশের কোন্ প্রান্তে এদের বাড়ি? কোন্ প্রান্তে? সে বর্মায় মানুষ, কান তার বাঙ্‌লার এই বিচিত্র সুরকে চিনে উঠতে পারে না। সে জিজ্ঞাসা করলে, তোমাদের বাড়ি কোথা?

চাইড্ডা পয়সা দেন। তারা বুঝেছে বিনয়ের দৃষ্টি তারা আকর্ষণ করতে পেরেছে, চাইড্ডা পয়সা দেন বাবু,—সারাদিন খাই নাই বাবু, সারাদিন খাই নাই।

তোমাদের বাড়ি কোথা ?

দাঁড়িয়ে গেল ছেলে ও মেয়ে ; ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে রইল বিনয়ের মুখের দিকে। কি জানতে চায় বিনয় ? বাড়ি ? কেন তা জানতে চায় সে ? —বাড়ি ? বাড়ি আবার কি ?

কোথায় দেশ ?—আবার প্রশ্ন করলে বিনয়।

ভীত, শঙ্কিত কণ্ঠে উত্তর দিলে সেই মেয়ে—ক্যান্ ?

না, বাড়ি কোথায় জানতে চাই।

দূরঅ।

কোথায় ?

পিছিয়ে যেতে লাগল তারা, বল্লে, অনেক দূরঅ—এই হ্যাশে না।

বিনয় পকেটে হাত দিলে পয়সার জন্ম। এগিয়ে এল তারা—উদগ্রীব, ক্ষুধার্ত্ত, ধারাল দৃষ্টি চোখে—তবু কি যেন দ্বিধা।

একটা আনি হাতে তুলে নিয়ে বিনয় বল্লে, বাড়ি কোথায় তোমাদের ?

মেয়েটি বল্লে, বাইলা চর।

সে কোথায় ?

গাঙের ধারে, পদ্মা পারে।—আর তারা জানে না। বাপ চলে গেছল আগে কিছু না বলে একদিন রাত্রিতে। মা গ্রামে ছিল, ছোট ভাই ছিল তার কোলে। সে ভাই ? মরে গেছে। মা ? ওই ওখানে শুয়ে পড়ে আছে। ঘুমুচ্ছে ? না, শুয়ে আছে—উঠতে পারছে না।

অনেকেই শুয়ে পড়ে আছে—উঠতে পারছে না। কিছু বুঝা যায় না, শুধু কতকগুলো দুর্গন্ধময়, ময়লা ন্যাকড়ার সার। কতজনকে বিনয় দেখবে ? দেখে সে কি করবে ? খাওয়াবে ? ঔষধ দেবে ? সে ঔষধে লোক বাঁচে না মরে ? থাক, বিনয়ের কাজ নেই ভেবে। একটা আনি সে ফেলে দিলে ছেলেটার হাতে। অমনি ছুট্‌ল ছেলেটা—সরু লিক্‌লিকে হাতপা, ছুটতে গেল। মেয়েটা ধরে ফেল্‌লে।

আমারে দে।

ই, বড় সখ! বইছি দিতে।

আমারে দিইছে বাবু।

তোরে দিইছে—তোর মুখ দেইখ্যা?—ছুটবার জন্য চেষ্টা করছে ছেলেটা।

ঝাপটে ধরলে মেয়েটা :—না, তোর মুখ দেইখ্যা।

হারামজাদী।—চুলের মুঠো ধরে টানতে লাগ্‌ল ছেলেটা। ঘুষি কিল।

বেজাত, বদমাইস! নখ দিয়ে আঁচড়ে দিতে লাগ্‌ল মেয়েটা।

মারামারি বেধে গেছে। বিনয় থামাতে গেল—কে শোনে তার কথা? হিংস্র জন্তুর মত তারা মারামারি করছে—নখ মুখ দাঁত তাদের সহায়। বিনয় ছাড়িয়ে দিতে গিয়ে বল্‌লে, আমি আর একটা আনি দিচ্ছি।

মুহূর্ত মধ্যে ক্ষান্ত হয়ে গেল যুদ্ধ।

হাঁপাতে হাঁপাতে শান্তস্বরে মেয়েটি বললে, কই? দেখি?

হাঁপাতে হাঁপাতে তেমনি সাগ্রহ কণ্ঠে ছেলেটি বললে, আমারে দেন।

বিনয় এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল তার মুখের দিকে। তারপর একটা আনি হাতে তুলে নিয়ে মেয়েটাকে বল্‌লে, তুমি রাখতে পারবে? ও কেড়ে নেবে না আবার?

ও? ওর বাপের সাইধ্যি আছে?

নিজের শক্তি প্রমাণের জন্য সে প্রস্তুত হল। ছেলেটা দূরে সরে গেল, কিন্তু দাঁড়িয়ে রইল দেখতে—সত্যি বিনয় তার বোনকে কিছু দেয় কি না।

কাজ নেই। ও যা নিয়েছে, নিক; তুমি নাও, ঝগড়া কর না।

বিনয় একটা আনি তার হাতে দিতে গেল। মেয়েটি হাতে পেল আনিটা। এক মুহূর্ত তা দেখল, পরে আবার ছুটল ছেলেটিকে তাড়া করে: রাইক্কস্‌রে দেখাই এইবার। বিনয় পিছন থেকে ডাকতে গেল, মায়ের জন্য নিলে না?—কেউ শুনলে না তা। ছুটছে, ওরা ছুটছে। বিনয় দাঁড়িয়ে

রইল, কিছুই দেওয়া হল না সেই মরণমুখী মাকে। হয়ত দিলেও সে পেত না আজ,—জীবনলোভী ছেলেমেয়েরা তার দাবী মানত না। আজ ক্ষুধার দাবীই বড় যে।

আরও লোক এগিয়ে আসছে, তারা বিনয়কে দেখেছে পয়সা দিতে। এগিয়ে আসছে কঙ্কালময় বৃদ্ধ, আসছে নারী-কঙ্কাল, বালকের পঙ্গপাল। বিনয় তাড়াতাড়ি এগিয়ে চল্ল—পালাতে হবে, এখনি, নইলে অসংখ্য কাঙালী তাকে ছেঁকে ধরবে। তার মূঢ় দাক্ষিণ্যের ফল তাকে পেতে হবে।

ট্রামগাড়ীতে দাঁড়াবার ঠাঁই নেই। কাজের শহর কলকাতা ব্যস্ত হয়ে ছুটছে, আর তারই পার্শ্বে আবার অসংখ্য নিরন্ন মানুষ বেকার হয়ে বসে আছে। তারাও কাজ করত, চাষ করত, মাছ ধরত, তাঁত বুনত, জাল বুনত, ঘর তৈরী করত, পুকুর খুঁড়ত, গাছ পুতত, কাঠ চিরত, নৌকো বাইত,—তৈরী করত জীবনযাত্রার নানা উপাদান। কিছুই তাদের করবার নেই আজ—চষা ক্ষেত পড়ে আছে, নৌকা গেছে, জাল আর নেই, তাঁত বিক্রী করে হয়ত খেয়েছে,—তবু শেষে খেতে পায় নি। কাজের কলকাতা ওদেরই চারদিকে সহস্র স্রোতে উদ্দাম হয়ে ছুটছে।

কণ্ট্রোলের দোকান খুলবার সময় হচ্ছে বুঝি। রাস্তার উপর সার-বাঁধা সেই মানুষের ভিড়ে ঠাসাঠাসি বেড়ে গেছে, চেঁচামেচি বেড়ে গেছে, ঝগড়া বেড়ে গেছে—দোকান খুলবার সমস্ত পূর্বলক্ষণই স্পষ্ট। আট শ' দোকান খুললে যে কলকাতায় কুলোবে না, সেখানে দু'শো দোকান চলছে। গুটি পঁচিশ আরও বেড়েছে এ মাসে দোকান, কিন্তু ততক্ষণে চা'লের কাঙাল এসে জুটে গেছে সমস্ত জেলা থেকে—চব্বিশ পরগনা, হাওড়া, হুগলী, মেদিনীপুর, শেষে পদ্মার এপার ওপার, পূর্ব বাঙালার নানা জেলা কলকাতার পথে আসন পাততে শুরু করে দিয়েছে। পথে আর গাড়ী চলাচলের জায়গা নেই; ট্রাম ঘণ্টা বাজাচ্ছে, বারে বারে ঘণ্টা বাজিয়ে একটু একটু করে এগোয়। মোটর এলে কি করে এরা?

শেয়ালদ'র পাশ কাটিয়ে চল্‌ল ট্রাম। রাত্রির সেই কদর্য ঘ্রাণ আবার নাকে এসে পৌঁছল। তবু তার পাশ কাটিয়ে যেতে পারবে বিনয়, বেশিক্ষণ সইতে হবে না এই নরকের দুর্গন্ধ। আবার সইতে হবেও একটু। চোখ বন্ধ করে রাখলেই ভালো হয়। কিন্তু চোখ যেন কে টেনে আবার খুলে দেয়।···সর্ষেখালি-সল্লাখালি দেখেছ, বিনয়, সেদিন। দেখেছ বাঙ্‌লার সে নরকের একটি কোণ। কিন্তু দেখবে না শেয়ালদ'?—বাঙ্‌লার নরকের সিংহদ্বার যে এখানে···এখান থেকে লাট সাহেবের গাড়ী দার্জ্জিলিং যায়, এখান দিয়ে মন্ত্রীরা যান শৈলাবাসে, আজও যান সফরে—সাম্রাজ্যের সরবরাহ যায় যুদ্ধে···কলকাতার পূর্ব-তোরণ, একদিন এখান দিয়ে বঙ্কিম তাঁর বাড়ি যেতেন, রবীন্দ্রনাথ যেতেন শিলাইদ'···

হাজার মৃত্যুযাত্রীর ষ্টেশন—হাজার মৃতের পারঘাট।

পড়ে আছে বুঝি একটা দেহ? সকাল বেলার লরী ওর পূর্বগামীদের নিয়ে গেছে—তখনো এ হতভাগ্য জীবনের বন্ধন কাটায় নি। তখনো ওর সহগামী—ওই আড়ালে আরও যারা লরীর অপেক্ষায় এমনি পড়ে আছে—তারা জীবনের মমতা ছাড়ে নি। শ্বাস নিচ্ছিল প্রাণপণে, শ্বাস নিচ্ছিল যত পারে—ভাবছিল বাঁচবে।···সত্যই তা ভাবছিল কি? ভাবতে পারে কি?

বিনয় ডাক্তার, মনে মনে জানে—ভাবতে হয়ত ওরা পারে না। অনেক আগেই ভাবনা ওদের শেষ হয়ে আসে। মস্তিষ্ক আচ্ছন্ন হয়ে আসে, দৃষ্টিতে নামে অস্পষ্টতা, প্রাণ পর্যন্ত নিশ্চেষ্ট হয়ে আসে। তবু শ্বাস নেয়, নিঃশ্বাস পড়ে, হৃৎপিণ্ড প্রসারিত সঙ্কুচিত হয়। আর তারই প্রভাবে একবার যদি চেতনা হঠাৎ তীব্র হয়ে ওঠে? কি ভাববে তবে ওরা?—বিনয় জিজ্ঞাসা করলে নিজেকে, কি ভাবত ওই পথের শেষ-দেখা মূর্তি—কালকের লরীর অপেক্ষায় যে রয়েছে আকাশের দিকে মুখ করে? ভাববে এই সৌধময়ী মহানগরীর কথা? দৃপ্তগামী যানবাহনের কথা? ওই কাঁচে-ঘেরা মিষ্টান্নের দোকানের কথা? ওই খোলা-টলের ফলের

বাজারের কথা? না, লঙ্গরখানার ফ্যানের স্বপ্ন? না, ভাবত ওরা বাড়ির কথা, ঘরের কথা? আপনার জনের মুখ? যে আত্মীয় ওকে ছেড়ে গেছে তার মুখ? যে আত্মীয়কে ও ছেড়ে এসেছে তার মুখ?—না, এই যুদ্ধের কথা, মন্ত্রীর কথা, মন্ত্রিত্বভাঙা তপস্যার কথা? ভাবত ওই আকাশের কথা? ঈশ্বরের কথা?

ঈশ্বরের কথা? কি ভাবত সে ঈশ্বরের কথা? সত্য? শিব? সুন্দর? অখিলনিধান? পরমকারুণিক? আনন্দস্বরূপ? কি ভাবত সে ঈশ্বরের কথা? কি ভারত সে? কি ভাবে ওরা? বিনয় নেমে গিয়ে একবার জিজ্ঞাসা করবে কি? জিজ্ঞাসা করতে চায় সে—কি ভাবে ওরা ঈশ্বরের কথা? কি ভাবে ওরা মানুষের কথা? যাবে কি বিনয় নেমে?

না, ওরা কিছু ভাবে না। বিনয় ডাক্তার, বিনয় জানে—ওরা কিছু ভাবতে পারে না। ওরা মরে। পরম দয়ালু বিধাতা, তাই ওদের ভাবতে হয় না। ওরা মরতে পায়, নির্ভাবনায় মরতে পায়। ছট্‌ফট্ করে—ক্ষুধায়, মৃত্যু-যাতনায় নয়; ক্ষিপ্ত হয়—যতক্ষণ ক্ষুধাবোধ থাকে; তারপরে শান্ত, সংযত, স্তব্ধ, নিষ্পলক, নিষ্পন্দ,—আর নির্বাণ।

বেলা পড়ে আসছে। মেঘ আসে, মাঝে মাঝে বৃষ্টিও পড়ে। একবার বৃষ্টি এল। বিনয় দাঁড়াল এক বারান্দার নিচে—ব্যাফল-দেয়াল ঘেরা দোকানের সামনে। দু'একজন দরিদ্র ভদ্রগোছের লোকও এসে দাঁড়াল পাশে। ছাতা বন্ধ,—পুরোনো ছাতা, এ যুদ্ধের বাজারে কে কিনতে পারে ছাতা? বৃষ্টিতে আর ঘামে ক্লান্ত মুখ একবার মুছে নিলেন, হাতে রেশনের থলে, পথে নামিয়ে একটু জিরোবেন ততক্ষণ। শ্রান্ত, ভগ্নপ্রায় তাদের দেহ। বিনয়ের কথা বলতে ইচ্ছা করছে এদের সঙ্গে। বিনয় বললে, রেশন আনলেন বুঝি? কোন্ আপিস আপনার?

ভদ্রলোক বিনীত স্বরে বললেন, আমি প্রেসে কাজ করি।

প্রেসে ?—বিনয় কুতূহলী হল, কি কাজ ? কোন্ প্রেসে ?

প্রুফ রীডার। ভদ্রলোক আই-এ পর্যন্ত পড়েছিলেন এক সময়। প্রেসের নাম করলেন—'যুগযাত্রী প্রেস'।—শৌরীনের প্রেস কি ?

বড় প্রেস তো ? রেশন দিচ্ছে ?

আজই প্রথম পেলাম। এতদিন মেসিন ঘরের ওরাই শুধু পেত, এবার আমরাও পাব—দু'জনায় রেশন যারা সপরিবারে থাকে।

আর কেউ নেই—ছেলে-মেয়ে ?

আছে—তিনটি। দেশ থেকে মা-বাবাও এসেছেন। কিছুতে নিষেধ শুনলেন না। নিষেধ করি, কারণ বস্তীর একটা ছোট ঘরে থাকি, পাঁচ টাকা ভাড়া। তার চেয়ে গ্রামেই ভালো না ? এত নোংরা নয়। কিন্তু ওঁরা গ্রামে চা'ল পান না আর। কি করা যায় ? তাঁদের জন্য আপিসের রেশন পাই না, কণ্ট্রোলের দোকানই ভরসা। স্বামীস্ত্রী দু'জনার মত চা'ল এখন আপিসে পাচ্ছি,—তাই কি কম ? যা'ই হোক চা'ল তো—ক'বেলা চক্ষে দেখে মানুষ চা'ল ?

'ক'বেলা চক্ষে দেখে মানুষ চা'ল ?'—বিনয় চুপ করে রইল। আর একটি ভদ্রলোক মনোযোগ দিয়েছিলেন কথায়, শুনছিলেন। এবার এগিয়ে এলেন একটু কাছে, জিজ্ঞাসা করলেন, আপনাদের কোন্ দিকে বাড়ি ? বেলেঘাটা ? কণ্ট্রোলের দোকানে সেখানে চা'ল পান ? ওঃ, মেয়েরা দেখে শোনে সেদিক্‌কার দোকান, তাই পান। আমাদের দুর্দশা আরও। টালার ওদিকে থাকি। কয়লার ছোট একটা দোকান ছিল, সঙ্গে সঙ্গে ছিল অমনি টুকি-টাকি কাজ। মুর্গীহাটা থেকে কিনে আনতাম এলুমিনিয়াম, কাচের বাসন-কোসন, সস্তা চশমা এসব। গুটিপঞ্চাশ টাকা হত এসবে। কয়লাতো নেই—আমি পেতাম না দোকানের লাইসেন্স, এদিকে টাকাও নেই, তাই সে দোকানের নাম কিনে নিয়েছে এক হিন্দুস্থানী। সে পারবে—আরও দুটো দোকান তার আছে। অন্য জিনিস কি বেচি ? যা দাম, কে কিনবে বলুন ?

গরীবের পাড়া, কেউ মিলের, কেউ রেলের মজুর ; কেউ বা এক আধ বিঘা জমিতে কলা, মূলা, শাকসব্জী চাষ করে। তারা কি করে কিনবে আজ ? দেখছেনই তো তাদের অবস্থা। কণ্ট্রোলের দোকানেও চা'ল পাই না। নিজে রোজগারের ফিকিরে ঘুরি ; বাড়ির কাছেও দোকান নয় যে ছেলেরা 'কিউ'তে বসে থাকবে—নিজেই বা কতক্ষণ থাকি ? তা হলে ঘুরব কখন ? সকাল বেলা তবু 'কিউ'তে নিজে চেষ্টা দেখি। কিন্তু পাই না প্রায়ই। ঘরে যা রেখেছিলাম তাতো ফুরুলো।

রাখতে পেরেছিলেন ?

ভদ্রলোক অপরাধীর মত জানালে—হাঁ, রেখেছিলেন তিনি সামান্য। কয়লার দোকানটা বিক্রী করে তখন তাড়াতাড়ি চার মণ চা'ল কিনে নেন। বাইশ টাকা তখন মণ। তারপর ? পঁচিশ, ত্রিশ, পঁয়ত্রিশ ··· চল্লিশ ! দু'মাসে এই অবস্থা ··· মানুষ কি ক্ষ্যাপা না পাগল ? পৃথিবী কি উচ্ছন্ন গেল নাকি ? ভগবানের এ কি অভিশাপ ! মেপে মেপে খাচ্ছেন তাঁরা দিনের পর দিন। দিনের পর দিন একটু একটু করে কম চা'ল নিচ্ছেন—এক মুঠো এক মুঠো কম খান ভাত। শাকসব্জীই নয় বেশি খাবেন—লতাপাতা কচু নানা জিনিস যা পান, তাই খাবেন। মাছ ছেড়ে দিলেন,—কেনা সম্ভব নয়, চোখেই দেখা যায় না। কিন্তু চা'ল ? চা'লের তো পরিমাণ আর কমানো যায় না—আবার কিনবেনই বা কি দিয়ে ? ব্যবসা নেই, রোজগার নেই—দাম বাজারে চল্লিশ টাকা। ফুরোচ্ছে যা ছিল—কিন্তু তারপর ?

ভদ্রলোক ভাবতে পারেন না—সামনে যেন কি দেখছেন। বিনয় জানে তা কি, বিনয় বোঝে, বিনয় দেখেছে তা সোনাপুরের শহরে, গ্রামে। কিন্তু সে কথা বলে কি লাভ ? এ কথা শুনেই বা কি লাভ ?

সচকিত হয়ে বিনয় দেখলে বৃষ্টির ভয়ে তার চারপাশে একি মূর্তি এসে ঘেঁষে দাঁড়াচ্ছে ! নোংরা দুর্গন্ধময় বেশবাস, নানা রোগে জীর্ণ, অপরিচ্ছন্নতায় ম্লান মানুষ। 'তারপর'—ওই ছোট ব্যবসায়ীর উত্তর যেন মূর্তিমান উপস্থিত

তাকে জানাতে তাদের ভবিষ্যৎ। বিনয় সঙ্কুচিত, শঙ্কিত হয়ে উঠল এ সব মূর্তির সান্নিধ্যে। এত কাছাকাছি এদের দাঁড়ানো যায় না, এভাবে কাছাকাছি এদের দিকে তাকানো যায় না।

বৃষ্টি না থামতেই বেরিয়ে পড়ল বিনয়। কিন্তু কোথায় যাবে সে—টালা? না, বেলেঘাটা? একই কথা। তার নিজের দেখা বাঙলা দেশ, মধ্যবিত্তের বাঙলা দেশ, আর টি কতে পারছে না—টিঁকতে পারছে না আর দরিদ্র বাঙালী ভদ্রলোক, যারা ভিক্ষা করেও শিক্ষা নেয়, পড়ে শুনে নিরক্ষর মাড়োয়াড়ীর কেরানী হয়, নিরক্ষর পাটের সাহেবের 'বাবু' হয়—মাষ্টার হয়, উকিল হয়, ডাক্তার হয়, লেখক হয়,—হয় রাজেন বাঁড়ুজ্জে, হয় প্রভাত চৌধুরী, হয় সীতা রায় ···

কোথায় এর মধ্যে সীতার বোন গীতা, তার মা, ভাই বোন? তারা এসেছে এখানে, ঠিকানা বিনয় জানে, কিন্তু যাবে নাকি বিনয়? উত্তর কলকাতায়ই তো। বারে বারে বলেছে সীতা বিনয়কে, সময় ক'রে যাবেন। পথে পথেও বিনয় তাদের অবস্থা ভেবে চিন্তিত হয়ে উঠেছিল।

গলির মধ্যে বাড়ি খুঁজে বের করলে বিনয়। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। একতলার ঘর। একটি কোঠায় ঠাঁই নিয়েছে সেখানে সীতাদের সংসার। সবে গীতা ফিরেছে আপিস থেকে—সাপ্লাইর আপিস। সামান্য বালিকা যেন —শ্রান্ত চোখ মুখ। বিনয়ের পরিচয় শুনে তবু সে মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল: আসুন। তারপরেই আবার সে বিব্রত হয়ে পড়ল—কোথায় আসবে বিনয়? বসবে কোথায়? মাদুর বিছিয়ে দিলে, যথাসম্ভব স্বচ্ছন্দ আনন্দে বললে, বসুন, কিছু নেই আর—এই মাদুর ছাড়া। মা আসবেন এখনি। সামনের বাড়িতে গেছেন। একটি ছেলে ওদের মরেছে কাল।

বিনয় তার কথার ভঙ্গী ও সুরে বুঝলে এ সীতার বোন, তেমনি সাবলীল।

চা আপনাকে খাওয়াতে পারব না। রেশনের চিনি আছে, কিন্তু কয়লা এ বেলা নেই—উনুন ধরাতে হবে তা এনে।

সীতার মা এলেন। বিনয়কে পরিচিত করে দিলে গীতা। মা বিশেষ প্রসন্ন হলেন বলে মনে হল না: সীতার খবর কি? চিঠি লেখে সে, কিন্তু নিজের খবর কিছু লেখে না। রাজেনবাবু নেই যে খবর জানাবেন। সীতা চাকরি ছাড়ল—এখন তারা খায় কি? আচ্ছা, এদিনে চাকরি ছাড়ে কেউ? দেখছে না সীতা অবস্থা দেশের? একবার ভাবলে না সে তার ভাই-বোন, মা খায় কি?

আঃ, মাঁ, কি যে বলো—ঘরে ঢুকতে ঢুকতে গীতা বললে।

গীতা ফিরে এসেছে হাত-মুখ ধুয়ে—শাড়ী-জামা ছাড়া ওর সম্ভব হয় নি। ঘরে বিনয় বসে, বাইরের কলও বিশেষ আচ্ছাদিত স্থান নয়।

বলি কি সাধে? বলি অনেক জ্বালায়। মুখে ভাত জোটে নি—দিনের পর দিন এই ছেলেদের পেট ক্ষিদেয় জ্বলেছে—কে দেবে? মা হয়ে তা দেখছি—আর তা বলতেও পারব না? 'দেশ-জোড়া এমনি দশা', লিখেছে সীতা—

গীতা বললে, মিথ্যা লেখে নি তো। দেখেছ তো দেশে, দেখছ এখানে—

দেখলাম। না দেখে মরলেই বাঁচতাম।

গীতা হেসে উড়িয়ে দিয়ে বললে, বেঁচে তো আছি আমরা তবু; খাচ্ছিও। দিদিও তো আর মরে যান নি—একভাবে দিন চলছে।

কিন্তু মা তা মানবেন না। তাঁর সীতা—এত দায়িত্ব যার ঘাড়ে, এত আশা যে তার মায়ের, ভাইবোনের—গীতার আর পরীক্ষা দেওয়া হল না, ছোট ছেলে ও মেয়েটা ইস্কুল ছেড়ে বসে আছে। তাদের বাবা ছিলেন ইস্কুল মাষ্টার। কত লোককে তিনি পড়িয়েছেন, পড়ায় ছিল তাঁর আগ্রহ,—সীতার মা কি করে বিস্মৃত হবেন এসব কথা? গীতা যায় পুরুষের সঙ্গে আপিসে! সীতাই বা মাকে ভুলল কি করে? ভুলবার মেয়ে নয় সীতা, নানা রকম মানুষের পাল্লায় পড়েছে। সংসার চিনে না সীতা, মানুষ চিনে না। সামান্য বয়স তার—'আর মানুষ তো মানুষ নয় আজ, সব জন্তু। বনের বাঘও ভালো—দেখছি কি চারদিকে? বনের বাঘও ভালো—'

গীতা আবার থামাতে চাইল—কি যে বলো মা। থামো না।

মা থামলেন। কিন্তু বিনয় বুঝলে কিছু তিনি বলতে যাচ্ছিলেন, বাধা পেলেন। গীতাই তা জানালে, বিনয় যখন বিদায় নিলে, মায়ের কথা কিছু বলবেন না যেন দিদিকে। ওঁর মাথাই প্রায় খারাপ হয়ে যাচ্ছে—গ্রামে যে দিন গেছে!—কিন্তু আপনি প্রমোদ চৌধুরীকে চেনেন? কেমন লোক বলুন তো? এ বাড়িতে এসে একদিন কি সব বলে গেছে মাকে প্রমথবাবু ও আপনাদের নামে লাগিয়ে। আগেও কে মাকে চিঠি দিয়েছিল। হয়ত দিদিদের সে সেক্রেটারি। প্রমোদবাবু এখন আবার আরও কি সব বলেছে —দিদি নাকি সেই প্রমথবাবুর পাল্লায় পড়েছে, তাতেই চাকরি রইল না। একটা আবার বেনামা ছাপা কাগজ নিয়ে এসেছিল প্রমোদ চৌধুরী। প্রমোদবাবু মাকে বলে, ‘মেয়েকে এখানে আপনার কাছে নিয়ে আসুন—মাথা ঠিক হয়ে যাবে। এখানে এলে চাকরি পেতে কতক্ষণ? সে জোগাড় করে দোব’খন—আমরা আছি তো।’ এমনি সব কথাবার্তা—মা খুব বিশ্বাস করেছিলেন তাকে। সেও একদিন মুটু আর ছুটুকে নিয়ে কি বায়স্কোপ দেখিয়ে আনল। আবার একদিন মোটরে আমাদের চার মণ কয়লা পৌঁছে দিলে। তারপর একদিন আমার জন্ত টিকেট কিনে এনে হাজির। আমার বায়স্কোপ যাবার সময় কোথায় বলুন তো? মা তখন অতটা বোঝেন নি। কাল আবার প্রমোদবাবু এসে উপস্থিত। পাশের বাড়ির মহীদা’কে তখন শ্মশানে নিচ্ছে, মা বাড়ি নেই, মাসিমার কাছে গেছেন। আমার কথা বলতে ইচ্ছা করে না। প্রমোদবাবু বললে, চলো, মন খারাপ করে কি হবে? দেখে আসবে—নতুন ফিল্ম। মুটু আর ছুটুকে প্রায় নাচিয়ে তুলল সে। তখনো মাসিমার বুকফাটা কান্না শোনা যাচ্ছে। মা এলে আমি বললাম—যা পারি। তাতেই মা সোনাপুরের সব লোকের উপর আরও ক্ষেপে গেছেন—আর দিদির জন্ত ওঁর ভাবনার শেষ নেই। কেবলি বলেন, ‘একা মানুষ সীতা,—জানিস তো না, সংসার নয় আজ, জঙ্গল, মানুষ তো নয় বাঘ’। এই এক কথা হয়েছে ওঁর। নানা রকমে এ ক’মাস ওঁর কেটেছে ভয়ঙ্কর অবস্থায়, দেখেছেন।

বিনয় শুষ্ক হাস্তে বললে, মিথ্যা বলেন নি। আজ তো জঙ্গলের ব্যবস্থাই দেখা দিয়েছে দেশে।

সের দশেক কয়লা জোগাড় করতে কয়লার দোকানে গেল গীতা। বিনয় পথে চলল আবার।

'জঙ্গলের আইন' চেপে বসেছে দেশে। বিদেশেও। তবু সেখানে একটা জঙ্গলের বলিষ্ঠ বর্বরতা আছে—মানুষ মরে, মারে; আঘাত করে, আঘাত সয়; বুক দিয়ে ষ্টালিনগ্রাদ রক্ষা করে, হাজারে হাজারে অসহায় নরনারী নূতন হিংস্রতার কাছে বলি যায়—খারকভে, কিয়েভে, স্মলেন্‌স্কে। সেখানে মানুষ তবু জানে বর্বতরার সঙ্গে লড়াই করছে—আদিম বর্বরতার বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছে—সভ্যতার নাম-না-জানা সৈনিকেরা—অত্যাচারিত, বৃদ্ধবৃদ্ধা, ধর্ষিতা নারী, আর শৃঙ্খলিত পুরুষ। ব্যক্তিগত সান্ত্বনা তাদের কি, জানে না বিনয়। তবু মানুষ হিসাবে তাদের সান্ত্বনা আছে। কিন্তু এখানে একি? এযে নেকড়ে-শেয়ালের কাড়া কাড়ি, মারামারি, জীবন্ত দেহ নিয়ে ছেঁাড়াছুঁড়ি—শিকারের ভাগ নিয়ে আড়াআড়ি—

রাত্রি হচ্ছে—বিনয় কোথায় যাবে? এবার অমিতের খোঁজে গেলে হয়। বিনয় ট্রামে চাপল।

ট্রামে ভিড়, বৃষ্টি পড়ছে, মানুষের মুখে অসম্ভব ক্লান্তি আর ভীতি। দুজন যাত্রীতে কি কথা নিয়ে কথা কাটাকাটি করছে; অপরেরা কিছু বলছে না, কলহ থেমে যাচ্ছে। সেবার বিনয় ট্রামে দেখে গেছে অতি সামান্য কারণে কলহ। এবারও দেখলে মানুষের ধৈর্য নেই, তেমনি কলহ এখনো বাধছে; কিন্তু এখন মানুষ হতাশায় বিহ্বল, আর কলহে বেশি আগ্রহ নেই—তাদের উপর বুঝি চেপে পড়ছে জগদ্দল পাথর।

আমাকে চিনলেন?—কন্‌ডাক্‌টারটি বিনয়কে বললে, নারায়ণ, কেশববাবুর ভাগ্নে।

বিনয় আগ্রহান্বিত হল—এখানে—কন্‌ডাক্‌টার—কেশববাবুর ভাগ্নে!—

দেশের কি অবস্থা, তা বলুন? এখানে রেশন পাই, আমরা একটা লঙ্গরখানাও চালাই—তার থেকে বাঁচিয়ে। কিন্তু দেশের অবস্থা কি?

বিনয় কি বলবে? বললে, সর্বত্র একদশা।

কেশববাবুর ভাগ্নে—ট্রামের কন্‌ডাক্‌টার; কিন্তু আমরা যাত্রীরা তবু মনে করি ওরা মানুষ কি?

হঠাৎ উত্তর কলকাতার বায়স্কোপ-ভাঙা নরনারীর জোয়ার ভেঙে পড়ল। স্তিমিতদীপ কলকাতা,—বৃষ্টি পড়ছে, ভিড় গাড়ীতে,—অকস্মাৎ তারই মধ্যে উজ্জ্বল বেশ, উজ্জ্বল চক্ষু, উজ্জ্বল মুখ নরনারী কলোচ্ছ্বাসে ঢুকে পড়ল। চমকিত হল সমস্ত গাড়ী, যেন উচ্ছল হল, মুখর হল। বিনয় চমকিত না হয়ে পারল না। সদ্য-দেখা বায়স্কোপের গল্পে তারা মুখর, ভিড়ের সকল কষ্ট উপেক্ষা করা সকৌতুক মন্তব্য তাদের মুখে—পরিহাস-হাসি, পরস্পরে আহ্বান, রসিকতার বিনিময়। ... আশ্চর্য কলকাতা, আশ্চর্য! জীবনোচ্ছ্বাস থামেনি, ইনফ্লেশানের জোয়ারে তা ফেঁপে উঠছে। এত টাকা নিয়ে ওরা কি করবে নইলে? ... আশ্চর্য! আবার এরই মধ্যে বালিগঞ্জ ষ্টেশনে আরও কয়েকটি লোক মরছে, এরই মধ্যে আবার প্রমোদ চৌধুরী বের হচ্ছে মানুষ শিকারে, গীতা বেরিয়েছে কয়লার চেষ্টায়, হয়ত বিনয়দের বাড়ির সামনেকার সেই ডাষ্টবিন ঘাটছে সেই অর্ধ-উন্মাদ রমণী; শৌরীনের বাড়িতে অনিল বোস এসে জমেছে—সাহিত্যিকরা এসেছে, কত বড় সৃষ্টি করছে কে কে তারা, বিঘোষিত করছে তারা তা আশ্চর্য ভাষায়—আশ্চর্য আন্তরিকতায়! ... আর উষা হয়ত শুনছে ... দিনের বেলার মার-খাওয়া নিরন্নদের খবর।

সেক্রেটারিয়েটে বৃথা গিয়েছিল পরদিন বিনয়—জাহেদ নেই, মিষ্টার সেন গেছেন ছুটিতে। সুধা ও অমিতকেও পেল না। বিনয় গেল তার কারখানায়। বসে বসে সোনাপুরের জন্য ওষুধ পাঠানোর ব্যবস্থা করলে।

শেয়ালদ'র দিকে আর এগোতে চায় না বিনয়। কিন্তু দুর্বার তার আকর্ষণ। পা যেন সেদিকেই অজ্ঞাতে চলতে চায়। ফিরে আসে বিনয় —এদিকে-ওদিকে আবার ভিড় সেই কাঙালীর। কখন সন্ধ্যা হলে একটা ছোট্ট লঙ্গরখানা ফ্যান-ভাত দেবে—লোক জমে আছে এখন থেকে তাই।

'ওই যে, ওদিকে—একটা মেয়ে অপেক্ষা করতে করতে অজ্ঞান হয়ে পড়েছে।' কারা ভিড় থেকে বের করে নিয়ে এসেছে তাকে। 'হয়ত মরে যাবে,' কে বললে। শুইয়ে দিলে ফুটপাতে। বিনয় দাঁড়িয়ে পড়ল—সে ডাক্তার, দেখবে না? কিন্তু দেখবার কি আছে আর? না দেখেও তো বিনয় জানে ওড় পীড়া কি। রাস্তার ওপার থেকে আর একটি বুভুক্ষু তার এলুমিনিয়মের ভাঙ্গা থালা দিয়ে বাতাস করতে লেগে গেল, একজন মাথায় জল দিতে গেল। বাঁচবার আশায় খাওয়া-খাওয়ি করে পরস্পরে এরা; আবার বাঁচাতেও চায় একজন আর জনকে তবু! বিনয় দেখলে, তাদেরই কে একজন ওবেলা অন্য লঙ্গরখানা থেকে আনা ভাতের ফ্যান জোগাড় করে রেখেছিল, তাই এখন মেয়েটার মুখে ঢেলে দেবার চেষ্টা করছে—হয়ত এক চুমুক খেতে পারলে মেয়েটা শক্তি পাবে; আবার চক্ষু মেলবে, তাকাবে, উঠে বসবে; আবার চাইবে বাঁচতে, চাইবে ফ্যান, চাইবে ভাত; আবার দাঁড়াবে লাইনে, আবার ধাক্কা সইবে, মারামারি করবে, কাড়াকাড়ি কড়বে,—তবু বাঁচবে, বাঁচতে চাইবে, বাঁচবে, হাঁ, বাঁচবে আবার। ··· কিন্তু বাঁচবে কতক্ষণ, ক'দিন?

বিনয় এগিয়ে চলল। সামনের ডাষ্টবিনের মধ্য থেকে কতকগুলো বড় বড় হাড় নিয়ে টানাটানি করছে একটি ক্ষুধার্ত বালক—ছুটি হাড়ের মাঝখানে যে

নরম মাংসটুকু তা'ই নেওয়ার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। আর তারই পাশে দুটি কুকুর অন্য একটি হাড়ের রক্তমাখা অংশ চাটছে। মানুষে-পশুতে আজ খাদ্য নিয়ে মারামারি—মানুষ আর জয়ী নেই, সম্রাট নয় যে অবজ্ঞাভরে কুকুরকে মাংস ছেড়ে দেবে। কিন্তু আছে তো তেমন মানুষও ?—আছে না কলকাতায় এল্‌সেশিয়ানের মালিক ? গ্রেট ডেনের অধিকারী ? ··· গাড়ীতে চা'ল আসছে না, কিন্তু রেসের ঘোরা আসছে মেহ্‌রার, বিলিতী কুকুর দার্জিলিং থেকে ফিরছে। ··· তবু কুকুরের জমিদারী আজ আমরা কেড়েও নিচ্ছি—ডাষ্টবিনে আজ কাক-কুকুরের থেকে মানুষের ছানা অনেক বেশি —আবার নিজেরাও মানুষে মানুষে সে ডাষ্টবিনের স্বত্ব নিয়ে মারামারি করছি।

গলির বাড়ি থেকে প্রায় জোর করে ঠেলে বার করে দিলে এক ভদ্রলোক—এক মা আর তার বছর সাতেকের মেয়েকে। মায়ের হাতে একটা বাঁশের চেলা, আর এক হাঁড়ি ফ্যানভাত। এক হাতে পিছনে ফিরে মুখে পুরছে তা মা, নিঃশ্বাস ফেলবার সময় নেই, মুখে পুরছে আর পুরছে। এক একবার কাঁদতে কাঁদতে মেয়ে এগিয়ে আসে, দে মা এট্টু, দে মা—এট্টু। বাঁশের চেলার এক-এক ঘা বসিয়ে তাকে তাড়ায় মা। কাঁদতে কাঁদতে মেয়ে সরে যায়—আবার ফিরে আসে তখনি, আবার বাঁশের ঘা দিয়ে তাড়াতে হয় তাকে। ··· তাড়াতে হয়,—কাক তাড়াতে হয়, কুকুর তাড়াতে হয়, শেয়াল তাড়াতে হয়—মেয়েকেও তাড়াতে হয়—বাঁচতে হবে যে—মাকেও বাঁচতে হবে।

আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের মোড়—ওদিকে শিয়ালদ'র বৌবাজারের মোড়—ফুটপাতের কাছে একটা ন'দশ বৎসরের মেয়ে শুয়ে পড়ে আছে। মরা কি ? না, মরা নয়। মৃত্যু তার শিয়রে দাঁড়িয়ে, তবু ডান হাতটা শেষবারের মত পথচারীদের উদ্দেশ্যে উত্থিত হল। সহস্রের ব্যস্ত পদক্ষেপ চলে যাচ্ছে। বিনয় দাঁড়িয়ে একটা আনি বা'র করে দিলে আবার। শীর্ণ হাত শক্তভাবে মুঠো হল একবার, তারপর ঢলে পড়ল। সমস্ত শরীরটা একবার কুঞ্চিত হয়ে উঠে ; রক্তহীন ঠোঁটের মধ্য দিয়ে নিঃশ্বাস বেরিয়ে গেল কি ?

বিনয় দেখল মুঠো খুলে আনি পড়ে গেছে পার্শ্বে—ফুটপাতের উপরে। বিনয়কে পয়সা বার করতে দেখেই ছুটে এসেছিল আর একটা মেয়ে ওপার থেকে—ছোঁ মেরে সেই আনিটা নিয়ে সে পালাল, একবার মুখ ফিরিয়ে দেখলে বিনয়ও ছুটছে কিনা তার পিছনে।

বিনয় দাঁড়িয়ে দেখছে ওষ্ঠের শেষ কম্পন শেষ হয়ে গেল।

অনেক মৃত্যু দেখেছে বিনয়—ডাক্তার সে, অনেক মৃত্যু দেখেছে। কিন্তু এমন মৃত্যু দেখেছে কি আর? ওপারে বিকালের 'কিউ' ভাঙে নি, দুর্বার গতিতে কলকাতায় অপরাহ্ণের ট্রাফিক গর্জে উঠছে, মাথার উপরে আকাশ—চারদিকে অজস্র পদপাত, অজস্র কোলাহল, অজস্র স্বীকৃতি জীবনকে, অজস্র উল্লাস ঐশ্বর্যের—আর তার মধ্যে একটি নাম-না-জানা বালিকার অস্ফুট প্রশ্ন আকাশের কাছে, তার পৃথিবীর কাছে; মানুষের কাছে, তার বিধাতার কাছে—

আর তোমার কাছেও—না, বিনয়? তোমার কাছেও। তোমার কাছেও কি প্রশ্ন নেই তার?

উদ্‌ভ্রান্ত উদ্দেশ্যহীন পদে বিনয় ঘুরতে লাগল। কোথায় কিছু মনে নেই—সত্যই কি প্রশ্ন রেখে গেল সেই মেয়ে? কোনো অনুচ্চারিত প্রশ্ন? অনুচ্চারিতই বা কোথায়? ··· শিথিল হাত থেকে পড়ে গেছে তার আনি, ওষ্ঠের প্রান্তে কেঁপে কেঁপে শেষ হয়ে গেছে তার প্রাণ—তবু কি বিনয় বলবে সে ভাষা অস্পষ্ট, সে ভাষা অনুচ্চারিত? সংবাদপত্রের অক্ষরে তা মুদ্রিত হয় নি, ওই রেডিওর যন্ত্রাশ্রয়ে তা প্রস্ফুট হয় নি—এ্যাসেম্বলিতে রাজা-উজীরের কথায়, খাদ্য-বাদশাহের বিবৃতিতে, অনিল বোসের গল্পে, এমেরির অমৃত-ভাষণে কত সত্য বিঘোষিত হচ্ছে—বিনয় শোনো—বসে বসে শোনো। এই তো উচ্চারিত বাণী, স্পষ্ট বাণী—আর কি মূল্য সেই বাণীর যে বাণী পথে পথে শুরু হল, শুরু হল গৃহে পথে প্রান্তরে?

গলি ঘুরে ঘুরে বিনয় একটা ছোট পার্কের বেঞ্চে এসে বসেছিল—কতক্ষণ মনে নেই। বৃষ্টি পড়ছে যেন। বিনয় সচকিত হল, উঠে পড়ল। তাই তো রাত হয়েছে। কোথায় যাবে সে—কোন্ দিক দিয়ে? বিনয় মনে মনে পথ ঠিক করে চলল। একটু যেতে চেপে এল বৃষ্টি। দাঁড়াবে কোথায়? ছোট্ট গলির রকের পাশে বিনয় দাঁড়াল।

আসুন—কে আহ্বান করলে বিনয়কে।

কাজ কি, থাক।

একটু দেখুন—বৃষ্টির ছাট আছে, জল হবে। ভেতরে বসুন।

সত্যই জল হবে। বিনয় ইতস্তত করে চলল। পাশের গলির ভিতর দিয়ে কেমন পেরিয়ে গেল ভিতরের একটা অন্ধকার আঙ্গিনায়। এদিকে সেদিকে ঘর। একটা ঘর সামনেই। ভিতরে পা দিয়ে বিনয় থমকে দাঁড়াল—একি, কোথায় এসেছে সে? একটা লম্বা দোতলা টিনের ঘর—তার এ-ঘরে ও-ঘরে কেমন চাপা কণ্ঠ, মত্ত-জড়িত স্বর। বিনয় এদেশে মানুষ নয়, কিন্তু সে নির্বোধ অজ্ঞও নয়। ডাক্তার সে, পৃথিবীর একটা সাধারণ জ্ঞান তার স্বভাবগত। কেমন যেন তার মনে হল—কোনো একটা অস্বাভাবিক আবহাওয়া তার চারদিকে; অস্বচ্ছন্দ হয়ে উঠল বিনয়। দাঁড়িয়ে রইল।

লোকটি খুব আপ্যায়িত করে হেসে বললে, দেখবেন, আমার এ বাজে জায়গা নয়।

কি জায়গা এ?

দেখবেন এখনি। তারপর কি খাবেন? চপ্ কাটলেট—তা এ আবার মাংস খেতে চাইবে না। বলে বামুন। এখন কিন্তু আমার চপের গুণে সব সয়। আরে সব গেল, আজ আর বামুন! আর বামুন আজ না কে বলুন তো? কিন্তু আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন? বসুন। যাক্, আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি—

চলে গেছল লোকটা। একটা অস্বস্তি ও দুর্নিবার সন্দেহ বিনয়কে পেয়ে বসছে। না, আর দাঁড়াবে না সে এখানে। বৃষ্টি পড়ছে বাইরে? তাতে কি?

ভিজে-ভিজে কে ছুটে এসে উঠল বিনয়ের দুয়ারে—প্রায় বিনয়ের গায়ের উপর এসে পড়ল। পিছিয়ে গেল বিনয়। দুয়ার পেরিয়ে ভেতরে এসে দাঁড়াল এক নারীমূর্তি। বিনয়ের দিকে দুর্নিবার আতঙ্কে চোখ মেলে তাকাল প্রথম। তীক্ষ্ণ লোভাতুর হয়ে উঠল চোখ পরমুহূর্তে। তারপর সে মুখে একটা হাসি ফুটল—কঙ্কালের মুখ যেন হাসল। অথচ কঙ্কাল কই? রূপ ছিল তার একদিন আর যৌবন নিঃশেষ হয় নি এখনো। কেমনতর হাসি হেসে বললে—বায়নার সুর তার কণ্ঠে,—খাবারের কথা বলেছ? দু'জনার মতো কিন্তু চাই—

বিনয়ের চোখ জ্বলে উঠল। বেরুবার জন্য সে পা বাড়াতে গেল।

কোথায় যাবে?—সভয়ে বললে সে মূর্তি। সে ভাষা কলকাতার নয়। এ কণ্ঠও আর কৃত্রিম নয়।

বাইরে।

বাইরে! কেন?—সবিস্ময়ে প্রশ্ন হল আবার।

কাজ আছে।—বিনয় অগ্রসর হতে গেল।

বাঃ, সে কি কথা!—হতাশা ও ব্যথা সেই কণ্ঠে।

বিনয় চমকিত হল, বললে, হাঁ, আমি জানতাম না—

আবার যেন হাসি ফুটল মুখে, এ্যাঃ। তারপর আবার বায়নার চেষ্টা, যাবে, বললেই হল? যাও তো—

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বিনয় বললে, সরে দাঁড়াও!

নিবে গেল হাসি। দুয়ার থেকে সরতে সরতে বললে সে সভয়ে, কিন্তু আমি খাই নি যে কিছু—

সেই কথা—'খাই নি'। 'খাই নি'—কত বড় নিষ্ঠুর বিভীষিকার ইঙ্গিত ওই শব্দ ক'টির মধ্যে। পথে পথে তার কত রূপ দেখেছে বিনয়।

থমকে দাঁড়াল আবার সে। 'খাই নি'। বিনয় দাঁড়িয়ে রইল, পা উঠল না। আবার বিনয় তার মুখের দিকে তাকাল—বিভ্রান্ত, ব্যাকুল তার দৃষ্টি—সমস্ত দেহের উপর কাতরতা অসহায়তা। সচকিত হল বিনয় আবার।

খাবার আসছে—খেয়ো। বলে পকেট থেকে টাকা খুলতে গেল,—কত? দু' টাকা?

বিহ্বলের মত হাত পেতে সে টাকা নিলে। তারপর চোরের মত তাড়াতাড়ি ঘরের চৌকাঠের ফাঁকে তা পুরে ফেলল। সাম্‌নে এগিয়ে এল, ভয়ে কাঁপছে দেহ, কাঁপছে তার গলা, ব্যাকুল মিনতি তাতে, বলো না, ওকে বলো না, দোহাই ওকে বলো না—

কে এ তোমার?

কেউ নয়, হোটেলওয়ালা, চপ কাটলেটের দোকান ওর।

বিনয় কুতূহলী হল, শুনে যেতে চায় সে আরও।—তোমরা কে? এ বাড়ির নও?

এ বাড়ি কার, জানি না। গার্ডবাবু কাজ দেবে বলে নিয়ে এল।

বিনয় এবার জাগ্রত হল, তার বুদ্ধি সক্রিয় হয়ে উঠল।

কোথা থেকে এলে তুমি? কোথায় ছিলে? কোথায় বাড়ি?

এবার নির্বাক হল সেই মূর্তি। বিনয় আবার প্রশ্ন করলে, কোথায় বাড়ি? কোন্ জিলায়? কোন্ গাঁয়ে? কে আছে তোমার? কি তার নাম? কি নাম তোমার?

অকস্মাৎ ভেঙে পড়ল সে রমণী: না, না, আমার কেউ নেই—আমার কেউ নেই—কিছু নেই। বাড়ি নেই, ঘর নেই, গ্রাম নেই—

একটা রুদ্ধ ক্রন্দন এবার অসংলগ্ন উক্তিতে ফেটে পড়ল। বিনয় বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বাইরে বৃষ্টি একটু কমছে। পদশব্দ শোনা যাচ্ছে গলিতে, কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে, যে বৃষ্টি, ভিজে যাবে গরম চপ্—আসতে পারি না। কই, নাও এসে—এই যে দুয়ার খুলেই রেখেছে—

সম্বৃত হয়ে দাঁড়িয়েছে নারীমূর্তি। অনভ্যস্ত অভিনয়ে হেসে বলছে, এই যে।

দু'ডিস—তা রেখে দিও,—খাওয়া হলে কাল সকালে ধুয়ে দেয় যেন—বললে সেই লোকটা সে নারীকে।

বিনয়ের দিকে তাকিয়ে হেসে সে বললে, ভালো জিনিস। এ বাজারে এমন পাবেন না আর। দেখছেন তো—বুঝুন—হেঁ-হেঁ—

বিনয়ের সমস্ত শরীর যেন আবার গ্লানিতে ভরে উঠল। দাম ফেলে দিলে কথামত সে পাঁচ টাকা। লোকটা আরও দাঁড়াতে চায়, বিনয়কে আপ্যায়িত করতে চায়। বিনয় ঘৃণা দমন করে বললে, যাও।

এঁজ্ঞে, হাঁ। তা খেয়ে আপনাকে বলতে হবে—যে খায় না সেও কিন্তু একবার খেলে আমার চপ্ ছাড়ে না। তাই না?—একবার সে রমণীর দিকে হেসে তাকাল, পরে বিদায় নিলে। লোহার কলাই-করা ডিসের উপর রুটি, ভাত, মাংস না অমনি একটা কিসের ঝোল, আর চপ্—সে ডিস নামিয়ে রেখে গেল। মেয়েটি তা সাজাতে লাগল লুব্ধহস্তে।

দুয়ার থেকে সরো—বিনয় বললে—আমি যাই।

যাবেন? খাবেন না আপনি?—এবার তার কথায় ও দৃষ্টিতে সম্ভ্রম এবং সন্ত্রস্ততা ফুটে উঠেছে। যেন সে দৃষ্টিতে এ জিজ্ঞাসা—কেমন অদ্ভুত ধারা এ মানুষ?

বিনয় সংক্ষেপে বললে, না।

তবে?—তারপর আবার নতুন চেষ্টা বিকৃত আদরের, খাবার এসেছে যে। কিন্তু নিবে গেল তা বিনয়ের মুখ দেখেই।

বিনয় বললে, খাও এবেলা। পথ ছাড়ো।

আমি খাব!—যেন সে নারী বুঝতে পারল না, বিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে রইল।—একা আমি—?

আর কেউ আছে নাকি? কে আছে? পুরুষ? না, কে?

আবার বুঝি সাড়া পড়ল সে রমণীর মনে : না, না, কে থাকবে আবার? মা হোটেলের বাসন মাজেন, মাংস খেতেনও না; এখন জ্বরে জ্বরে বেহুঁস।

একটা তটরেখা দেখতে পেল বিনয়। বললে, মা আছেন? আর কেউ নেই?

কপাল যার পুড়েছে কে থাকে তার? দেওর? শ্বশুর? খেতে পায় নি তারা নিজেরা। তাড়িয়ে দিয়েছে। মা পারে না—পেটের জ্বালায়ও ফেলতে পারে না। নিজে মরল না—আমিও মরতে পারলাম না। ভাবলাম, খোকন বাঁচবে কি করে? তাকে ছেড়ে যাব কোথা?

বিনয় বাধা দিয়ে বললে, তোমার ছেলে আছে?

হঠাৎ যেন রমণী আবার কুণ্ঠিত হয়ে পড়ল, কই? কে বললে? মিথ্যা কথা। না, না, বিশ্বাস করবেন না আপনি। কেউ নেই আমার, কেউ নেই। কোনো বোঝা নয় সে, কোনো বোঝা নয়। সত্যি, কি বোঝা সে? দু'বছরের শিশু মাত্র। কিছু খাবে না, কিছু পরবে না।

কোথায় সে?

ঘুমুচ্ছে, মায়ের কাছে ঘুমুচ্ছে। রাত্রিতে কাঁদত আগে। রাগ করত টিকেটবাবু, গলা টিপে ধরেছিল একদিন—ছোট শিশু, কি করবে? সারারাতে গলা শুকিয়ে আসে না—আমি কাছে না থাকলে?—ভেঙে পড়ল আবার বলতে বলতে সেই মেয়ে।

আর একটা ভগ্ন বাঁধের প্রান্তরেখা জেগে উঠছে বিনয়ের সামনে। সে বললে, কিন্তু বাড়ি ছেড়ে এলে কেন?

কই বাড়ি?—স্থির হল সে আবার—কাকারা পালিয়ে গেলেন যেখানে পারেন—এখানে-ওখানে। একা বাড়ি—চোর-ডাকাত হানা দিচ্ছে। নানা রকম মানুষ আসে, বলে, খেতে দেবে। আর ক্ষুধায় যে পোড়া পেট জ্বলে। কই চা'ল? কচুর শাক, রাঙা আলু, গাছের ডাল, বন জঙ্গল—কই আর

তা? আতপ চা'ল পাই না, দুদিন উপোষ করে ছিলাম সে জন্য—বামুনের বিধবা, বামুনের মেয়ে আমরা খাই কি? দেবদিয়ার হরকালী ঠাকুরের মেয়ে সরযূ, কাকলির 'পুকুর বাড়ির' মেজ বউ—খাব কি করে সিদ্ধ চা'ল? তাই উপোষ করেছি। কিন্তু আমি মরলে খোকন মরবে যে? চললাম শেষে শহরের দিকে—রাঁধুনি হব দু'জনায় মায়ে-মেয়েতে। অনেক করে এলাম ষ্টেশনে, গাড়ীতে উঠতে পারি না, ষ্টেশনের বাইরে গাছতলায় বসে রইলাম, আবার পরদিন গাড়ী। টিকেটবাবু আমাদের দেখলে—বেশ তো, তার বাড়িতে রাঁধব। রেলের মানুষ, তারা চা'ল-ডাল পায় সপ্তাহে সপ্তাহে। বাঁচলাম, কিন্তু—

চুপ করলে সরযূ, মাথা নিচু করলে: কিন্তু ক্ষুধা বড় জ্বালা। খোকন ক্ষুধায় কাঁদে, কাঁদতে কাঁদতে গলা ওর শুকিয়ে ওঠে, কিছু পায় না আমার কাছে। মা গলায় দড়ি দিতে গেলেন একদিন, আমি দিতে দিই নি। বড় ভয় করে আমার; মা না থাকলে কে থাকবে আমার আর? মা না থাকলে খোকনও বাঁচবে না যে।

একটা গভীর নিস্তব্ধতা ঘরে রইল কিছুক্ষণ জমে। বিনয় বললে, এখানে এলে কেন?

মরতে।—তারপর আবার বললে, আরও বেড়ে গেল চা'লের দাম। খোকন রাত্রে কাঁদে, টিকেটবাবুর সহ্য হয়না তা। বলে, 'বিক্রী করে ফেল্ এটাকে—আপদ।' চা'ল নাকি চল্লিশ টাকা। ষ্টেশনে ষ্টেশনে কাঙাল—চা'ল নেই। দেশ থেকে টিকেটবাবুর পরিবারও এসে যাবে—তাদের দেশেও চা'ল নেই। বাবু চা'ল-ডাল পায়, এখানেই তাই সংসার চালাবে এখন তারা। আর আমি—আমরা? 'কলকাতায় খাবার দিচ্ছে বাবুরা, ভাত দিচ্ছে, খিচুড়ি দিচ্ছে, ছেলেদের দুধ পর্যন্ত দেয়'। ছেলেদের দুধ পর্যন্ত দেয়। গাড়ীতে চাপিয়ে দিলে টিকেটবাবু, গার্ডবাবু নিয়ে এল।

বিনয় নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। একটু পরে বললে, এখান থেকে চলে যাও না কেন?

কোথায়?

বাড়িতে, গ্রামে।

বাড়ি কই? আমরা যে মরে গেছি।

বিনয় একটু ভেবে বললে, এক কাজ করবে? অনাথ আশ্রমে যাবে?

না, না, না, সেখানে ওরা খোকনকে রেখে দেবে—কেড়ে নেবে—আমার খোকনকে কেড়ে নেবে—আতঙ্ক তার কণ্ঠে, চোখে।

নেবে না।

বিশ্বাস করেলো না সে। আতঙ্কে শিউরে বললে, নেবে—ওরা বলেছে নেবে, নেবে। কাজ দিন আমাকে, কাজ দিন—যেখানে খুশী কাজ দিন—ছ'মুঠো ভাত দিন, একটু দুধ দিন খোকনের জন্য—ভাত, শুধু ফ্যান ভাত।

বিনয় ভাবতে লাগল। কি ব্যবস্থা হতে পারে আর।

ক্ষুধা বড় জ্বালা—বড় শত্রু—কে বুঝবে তা? মরতেও দেয় না মানুষকে। কেন এ জ্বালা, কেন এ আগুন? মরে গেলাম, পুড়ে গেলাম—কেন? কোন্ জন্মের পাপে? কোন্ পাপ আমার? কবে শেষ হবে এ পাপ? শেষ হবে কি? বলুন, আপনি তো ভদ্রলোক—শেষ হবে কি?

শেষ করতে চাইলে শেষ হবে।

শেষ করতে চাই না? এমন করে শেষ হয়েছি, তবু শেষ করতে চাই না? এতবার বলি, 'নারায়ণ আর কতদিন—শেষ করো, শেষ করো তোমার এই শাস্তি—শেষ করো, শেষ করো। এই যেন শেষবারের মত তোমার নাম মুখে নিই, এই করো।' শেষ চাই না তবু?

বলতে বলতে হঠাৎ উৎকর্ণ হল সে, চমকে উঠল। ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে মূর্তি, ওই খোকন জাগল। আবার কাঁদছে বুঝি ক্ষিদেয়।

বিনয় দাঁড়িয়ে রইল ঘরে। খানিকক্ষণ পরে হঠাৎ মনে পড়ল—সে

যাবে। আঙিনায় নেমে পড়ল। গলিটা ডানদিকে বুঝি? বৃষ্টি, অন্ধকার, পা বাড়াতে হচ্ছে সন্তর্পণে—পিছন থেকে কে ছুটে এসে চাপা গলায় ব্যাকুলভাবে বললে, শুনুন, যাবেন না। ছেলে নেবেন? ছোট ছেলে,—সুন্দর দেখতে। বিশ টাকা দিতে চেয়েছিল নয়াগঞ্জের সেই মারোয়াড়ী বউ—আপনি পাঁচ টাকা দেবেন? দেবেন না? না হয় দু'টাকা? না, না, নিন। টাকায় কাজ নেই, আপনি নিন—খোকন বাঁচবে না না হলে। নিয়ে আসি আমি তাকে—নিন। নিয়ে চলে যান। কিছু না, শুধু একটু খাওয়াবেন—অমনি তাজা হয়ে উঠবে। সুন্দর দেখবেন, ওর বাবার মতন—ফর্সা ও।

না। বাঁচাতে চাইলে তাকে শুদ্ধই এখান থেকে চলে যাও কোনো অনাথ আশ্রমে।

না, না, অনাথ আশ্রম না, তারা খোকনকে মেরে ফেলবে—কেড়ে নেবে, আমাকে দেখতেও দেবে না—।

বেশ, অন্য কোথাও যাও।

কোথায়? পথে তো আমি থাকতে পারব না। সবাই তেড়ে আসবে আবার।

বিনয় এগিয়ে গেল সামনে। পিছনে অর্ধস্ফুট মিনতি মিলিয়ে যেতে লাগল, খোকনকে নিয়ে যান আপনি—ওকে বাঁচান। বাঁচুক, খেয়ে বাঁচুক আমার খোকন,—আমার খোকন—

রাস্তায় এসে পড়ল বিনয়। রাত্রিতে অন্ধকার হয়ে উঠেছে পথ। বৃষ্টি পড়ছে একটু-একটু! লোকজন কমে গেছে, রিক্‌শা ছুটে চলেছে মেয়ে-পুরুষ নিয়ে। বিনয় কিছু দেখছে না, ভাবছে না, লক্ষ্য করছে না। তার সমস্ত মস্তিষ্ক জুড়ে যেন কত কালের আগুন জ্বলে উঠেছে। সেখানে চিন্তা নেই, যুক্তি নেই; অসংলগ্ন কথা আর দৃশ্যের টুকরো জ্বলন্ত অঙ্গারের

মত যেন ছুটে ছুটে পড়ছে। মাথায় আগুন লেগেছে—কোনো বারুদের কারখানায় নয় যে একবার বিস্ফোরণে শেষ হবে। এ যেন কোন কয়লা-কুঠীর অন্ধঘরে অগ্নিকাণ্ড—ধোঁয়া আর জ্বলন্ত কয়লা—চিন্তা আর বিষাক্ত বাষ্প—মস্তিষ্কের কোঠায় কোঠায়।

'আমার খোকন', 'আমার খোকন'—

এই তো তার বাঙ্‌লা দেশ, এই তো তার ব্যাকুল ক্রন্দন—ভারতবর্ষের দুয়ারে, পৃথিবীর দুয়ারে, দেবতার কাছে, মানুষের কাছে ···

কোথায় এসেছে বিনয়? ট্রামের লাইন না? কোন্ ট্রাম? অন্ধকারে দেখা যায় না কিছু। এস্‌প্লানেডের ট্রাম? কোথায় যাবে বিনয়? 'দেবদিয়া? সোনাপুর? না, না, এস্‌প্লানেড। উন্মাদ হল নাকি বিনয়? সে বালিগঞ্জ যাচ্ছে—বালিগঞ্জে ট্রায়েঙ্গুলার পার্কের নিকটে তার বাড়ি—মানে, শচীপ্রসাদের বাড়ি—'মিষ্টার এস, পি, চৌধুরী'র, 'চৌধুরী এণ্ড কো'র কর্তা—টালিগঞ্জে যার লোহার কারখানা, বেলঘড়িয়ায় যার বাল্‌ব তৈরী হচ্ছে, বাঙ্‌লা দেশে নতুন শিল্প যুগের পত্তন করছে যে।

এস্‌প্লানেডের ট্রাম। এটা আসছে কোথা থেকে? 'রাজাবাজার'? সেই শেয়ালদ'র উত্তরে—পেরিয়ে যেতে হয় সে মড়ার সার, সেই মৃত্যুযাত্রীর মিছিল—সেখানে মেয়েরা মরে, বুড়ীরা মরে, কিন্তু দেখেছে সেই মিছিলে বিনয় কোনো যুবতীর মুখ? তারা মরে না—তারা বাঁচে। মনে পড়ল পাদ্রী ক্যাশের কথা—যুবতীরা বিক্রী হয়, তারা বাঁচে। কোথায় বাঁচে? কোন সে গলিতে? কোন্ গলি?—তাইত, বিনয় কলকাতার গলি চেনে না—সে কি আর খুঁজে পাবে সে গলি? দেবদিয়ার সরযূকে—তার খোকনকে বাঁচাতে পারবে কি? কে চেনে এ পাড়া? কে চেনে? অমিতরা চিনবে নিশ্চয়। হাঁ, অমিতরা চিনবে—খুঁজে বের করবে বললে—সে গলির হোটেলের পিছনে কোথাও আছে দেবরিদয়ার সরযূ—যে বলেছিল বিনয়কে, তার খোকনকে সে ছাড়বে না কিছুতে;—খোকনকে ফেলে একদিন সে মরতে

চায় নি—সে-ই চাইছে তবু আজ তার খোকনকে দিয়ে দিতে বিনয়কে—শুধু খোকনকে বাঁচাক বিনয়। 'বাঁচুক আমার খোকন, আমার খোকন—'

বড় দেরী হয়ে গিয়েছে বিনয়ের। একা হেনা বসে আছে ডিনার নিয়ে। শচীপ্রসাদ এসে বসল। মোটা চুরুটে টান দিয়ে শচীদা' বললে, কোথা ছিলে? সন্ধ্যায় ফিরলে না। সেই পাকাদেখা মিষ্টার সেনের ছেলের। তিনি তো ভয়ানক দুঃখ করলেন—তুমি এলে না বলে। এখানে ওখানে গাড়ী পাঠান, ফোন করেন—তোমার পাত্তাই পান না। খুব দুঃখ করলেন।

বিনয় বলবার চেষ্টা করলে, বরাৎ খারাপ।

খারাপ বলে খারাপ। একটা পাকাদেখার খাওয়া বটে! মিষ্টার সেন চমকে দিয়েছেন। কলকাতার কে বাকী আসতে? ব্যবসায়ী বণিক, মন্ত্রী মন্ত্রীদের প্রতিপক্ষ, সব। কন্যাপক্ষও তো কম নয়—বহু-পুরুষের বনেদি ঘর। কনে চাঁপাডাঙার রায়বাহাদুরের বড় নাত্‌নি। সোয়া শ' বছর ধরে ওদের সেরেস্তায় পাকাদেখার হিসাব রয়েছে খাতাপত্রে; সে সব গুণে গুণে হয়েছিল আয়োজন তাঁদের। কিন্তু তাঁদেরও হার মানিয়ে দিয়েছেন মিষ্টার সেন। 'মেনুটাই' পড়ে শেষ করা যায় না। রয়েছে ছাপা পুরোপুরি চৌষট্টি পদ। দেখবে, এনেছি—ঘরে রাখবার মতোই। আমি বললাম, মিষ্টার সেন, এতো পাকাদেখা, সবে 'টেলিগ্রাফী' সংস্করণ হল। কিন্তু আসল সংস্করণ তো রয়েছে—বউ ভাত। ওঁর আপিসের 'স্বদেশী'র সাহিত্যিক সম্পাদক—সেই যে আমাদের শৌরীনের ওখানে আসে—বলল, 'ঠিক স্যর, কবিকঙ্কণে একটা তালিকা আছে—তিনশ' বছর আগেকার বাঙালী কি খেত। এটাও ছাপিয়ে দেওয়া যাক—পূজো সংস্করণে—তেরশ' পঞ্চাশেও বাঙালী কি খেতে জানত। খেতে পায় না আজ বাঙালী, কিন্তু খেতে জানে—খাওয়াতেও বাঙালী জানে। মারোয়াড়ী নয়, ভাটিয়া নয়, পাঞ্জাবী নয়—খেতে জানি আমরা।'

বিনয় কথা বলতে পারছে না, শুধু বল্‌লে, শচীদা, নেমন্তন্ন বাঙলা দেশে চারদিকে পড়ে গেছে—এদিকে প্রীতিভোজন, ওদিকে কাঙালী ভোজন, এদিকে তোমরা লনে, বাড়িতে ছাদে ; ওদিকে ফুটপাতে, পার্কে, গলিতে, —দেশশুদ্ধ নেমন্তন্ন।

পরিপূর্ণ উৎসবের আনন্দে শচীপ্রসাদের মন বড় স্নিগ্ধ। সে লক্ষ্য করলে না, বললে, যা বলেছ, দেশশুদ্ধই নেমন্তন্ন। সত্তুর হাজার লোকের নেমন্তন্ন এক কলকাতায় চালাচ্ছি আমরা রোজ। তাতেই কি আবার মিষ্টার সেনকে কম খাটতে হয়? না, অরগ্যানাইজিং ব্রেন বটে! দেখিয়ে দিলে এক পাকাদেখার খাওয়াতেই—কোথায় নাটোরের কাঁচাগোল্লা, ঢাকার অমৃতি—এসে গেছে সব ডাইং আর্টস্ অব বেঙ্গল। কিন্তু মেহ্‌রা খুঁতখুঁত করছে, 'বাঙলা দেশ ড্রাই। জাহাজ-ভরতি ড্রিঙ্কস নাবছে—মিষ্টার সেন কি সে খবরটাও জানেন না?' শৌরীন ছিল, হেসে বললে, না, মিষ্টার সেন সেকেলে স্বদেশী। ওসব তাঁর বাড়িতে হবে না—অন-প্রিন্সিপল। পূজোর সংখ্যা স্বদেশীর আয়োজন করবেন, একটা পার্টি দিলাম সাহিত্যিকদের তাই চীনা হোটেলে। মুকুল বলে, 'বাবা, থাকতে চান'। অনিল বোস শুনে বল্‌লে, 'মাটি করবে। সাতান্ন টাকা বোতল শ্যাম্পেন ঠিক করে এসেছি। কিন্তু তার হিসাব বিলে থাকবে না—মুকুল তা দেবে। মিষ্টার সেন জানলেও দেবেন না—অন-প্রিন্সিপল। ওসব তিনি বুঝবেন না।' মেহ্‌রা বলেন, 'শ্যাম্পেন তোমরা চেনো বাঙালীরা?' শৌরীন হেসে বল্‌লে, 'চিনি মানে? এ নিয়ে গৃহবিচ্ছেদ হয়ে যায়।' তারপর শৌরীন আমাকে বলে, 'সেদিন উষাও রাগ করলে তো ওই ডিনারের জন্য, আর প্রদ্যোতের উপরও রাগ করে চলে গেছল তাই রেণুকা।' উৎকর্ণ হল বিনয়—উষার রাগ, রেণুকার রাগ—কিজন্য?

যাই বলো,—তাকাল শচীপ্রসাদ হেনার দিকে—শ্যাম্পেন না হলে এই চৌষট্টি পদও যেন খাপ্‌ছাড়া হয়।

তারপর আবার বিনয়কে বলতে লাগল শচীপ্রসাদ, সত্যি কি আয়োজন! অধ্যাপক মানুষ সেন রায়, পি-এচ্-ডি; একটা খাবার গবেষণা করে ফেললেন: 'খাওয়া কি মশায়, সোজা কালচারে হয়? ক'টা সভ্যতার এ ঐশ্বর্য আছে? ছিল ইরানীদের একটা, ফরাসীদের একটা, আর চীনাদের একটা। এই তিন জাতের থেকে পৃথিবীর সেরা শিল্প তিন রকম ভোজন-কলা জন্ম নিয়েছে।

বিনয় একবার কুতূহলী হল, সেন রায়? সেন রায় জেলে না? তাকে না ধরে নিয়ে গিয়েছিল?

শচীপ্রসাদ বল্‌লে, সে তো কবে? তার জন্য বরাবরই সেন রায় জেলে থাকবেন নাকি? বেরুবার পথ যেন তাঁর চেনা নেই।

বিনয় বল্‌লে, অথচ গবর্ণমেণ্ট ছাড়ছেও তো না। হাইকোর্টের মধ্যে ধরে নিচ্ছে মানুষকে। তা নিয়ে কত আন্দোলন, সমালোচনা, জজদের রাগ—কান দেয় তাতে পুলিশ?

তা আছে। কিন্তু সেন রায়েরও বেরুবার মত জোর আছে।—বলে হাসলে শচীপ্রসাদ এবং বল্‌লে—আর সে মন্ত্রী নয়, তোমাদের মন্ত্রীদেরও মুনিব তাঁরা। যাক্‌গে সে সব, নানা লোকে নানা কথা অমন বলেই। বিশেষত সেন রায় আবার তোমাদের বন্ধুদের ছাড়েন না তো—তিনি আর ডাক্তার খাঁ হলেন আমাদের এজুকেশুনাল ফ্রণ্টের গাউলেইতার। তাতেই তোমরা তাঁর নামে ওসব কথা বলো।

এতক্ষণ কি আমি বলেছি, না তুমি বলছ?

শচীপ্রসাদের মেজাজ এখন খুব স্নিগ্ধ: আমি কি বলেছি? আমি বলছি তাঁর খাদ্যতত্ত্ব নিয়ে রিসার্চের কথা। তুমি তো বলবে—শচীদা একবার হেনার দিকে সকৌতুকে তাকালে—বলবে, 'সেন রায় না তার ছাত্রী চিত্রা মিত্রকে কি আনডিউ এ্যাপ্রোচ করেছিল?' বাজে কথা। না হয় হলই বা সত্য। কত কি হল। ধরা পড়েছে সেন রায়! আর তোমার তো রাগের

কারণ নেই তাতে বিনয়। তুমি তো চিত্রাকে বিয়ে করবে না আগেই ঠিক করে ফেলেছিলে, তবে আর কি? আর চিত্রারও এর মধ্যেই জামসেদ-পুরের ইঞ্জিনিয়ারকে বিয়ে করতে কোনো বাধা হয় নি। তবে সেন রায়ের উপর আর অতটা রাগ করো না—তোমরা ভাই-এ বোনে।

একটা পুরানো অধ্যায় বিনয়ের এইখানকার জীবনে 'চিত্রা মিত্র। বিনয় এক সময়ে নিজে না বুঝে প্রায় তার সঙ্গে বাগদত্ত হতে চলেছিল। চিত্রা অবশ্য চমৎকার মেয়ে—সুরূপা ও সুকণ্ঠী, বড়ঘরেরও। সেন রায়ের আচরণেই নাকি ব্যাচারীর তখন নার্ভাস ব্রেক্ ডাউনের মত হয়। হবে না? মেয়ে হিসাবে সে বেশ। তবু বিনয় তাকে বিয়ে করলে ভুল করে ফেলত, তা বুঝেছে আগেই। শান্ত ও সুগায়িকা—'সুগৃহিনী হবে চিত্রা নিশ্চয়। কিন্তু গৃহ কই বিনয়ের? বিনয় তো পথকেই গৃহ করে ফেলতে চলেছে। গৃহ কার আছে? আছে সবুর?

হেনা ততক্ষণ ছল বিরক্তিতে বল্‌ছে শচীপ্রসাদকে, বলব না, তোমাদের সেন রায় যেন একটা মানুষ! ওকে এখনো কলেজে পড়াতে দেয়? ওর ক্লাশে এখনো মেয়েরা যায় আবার?

আরো বেশি-বেশি যায়। যাবে না? সেন রায় একে তো বেশ সুললিত কান্তি, তাতে আবার সুমধুর ভাষী, আর তাতে আবার সুমার্জিত কালচারী। শুনবে তাঁর কথা? পাকাদেখার খাওয়া নিয়ে একটা রসাল রিসার্চ করে ফেললে, বল্‌লে, কোন্ জাত ক্যুলিনারি আর্টসে কি দিয়েছে। রসিক লোক যোগানন্দবাবু, হাস্যরসের অবতার। বলেন, 'সব দেশের আর্টসই দেখছি এখন 'স্বদেশী' হয়ে উঠছে, মিষ্টার সেন। নেমন্তন্ন তো একজনকে করেছেন—কিন্তু তর্পণ হচ্ছে তিন জন্মের আত্মার। মিষ্টান্ন পায়েস খাওয়া বাঙালী আত্মা বসেছেন, কোর্মা কালিয়া হালুয়া খাওয়া মোগলাই আত্মাও বসেছেন, আর চপ্-কাটলেট-স্যাণ্ডউইচ-আইসক্রীম খাওয়া সাহেবি আত্মাও এসেছেন।

ব্যাচারাদের উদর একটা বলেই বড় বিপদ হয়েছে—তিন পুরুষের নেমন্তন্ন, পেটটা এক পুরুষের।

বিনয় আর পারছে না শুনতে। না, খাবে সে পরে। স্নান করবে? হাঁ, সে স্নান করবে। খুব স্নান করতে হবে। কিন্তু স্নান করলেই কি সব ধুয়ে যাবে তার দেহ থেকে, মন থেকে? ধুয়ে যাবে দিনের অভিজ্ঞতা, মনের গ্লানি?

সারাদিন বিনয় খায় নি—চা-ও খায় নি। ডিনার আসছে। হেনা বলছে, অনেক কষ্টে পেয়েছি ভালো মটন, চপ্ করেছি।

'ক্ষুধা বড় জ্বালা'—বিনয়ও তা বুঝছে। আরও বুঝবে, আরও বুঝবে; তারও 'তিনজন্মের আত্মা' এখনি তৃপ্ত হবে আর মুছে যাবে মনের গ্লানি!

২০

বিনয় যখন অমিতকে পেল, অমিত তখন বাড়ি ফিরছে নৈহাটী না বজবজ কোথা থেকে। সবিস্ময়ে অমিত বললে, তুমি কখন বিনয়? কবে এলে এখানে?

বিনয় তাকে তখনি কালকের ঘটনা বললে।

ঘুরতে লাগল অমিত আর বিনয় গলির পর গলি। পাড়াটা বিনয় আন্দাজ করতে পারে। কিন্তু কলকাতার সব চেয়ে ঘন-বসতি বাসিন্দাদের পাড়া এটা—খাঁটি কলকাতার একটা পাতা। সে পাতা পড়বার মত কোনো চক্ষু নেই বিনয়ের, সাহায্য পাচ্ছে না তাই অমিতও।

রাত দশটা বাজে। ব্ল্যাক আউট, বৃষ্টি পড়ছে। অমিত বললে, এভাবে হবে না, বিনয়। কাল এ পাড়ার লোকদের বলে একটা স্কোয়াড তৈরী করতে হবে, এখানকার মুরুব্বিদের সমিতিকে ধরতে হবে। তাতে যদি কোনো পথ হয়।

হতাশ হয়ে বিনয়ও ফিরে চলল। সত্যই তার মূর্খতার শেষ নেই— গলির নাম, বাড়ির নম্বর কিছুই সে কাল লক্ষ্য করে নি।

অমিত বললে, চলো। সারাদিন বাইরে কাটিয়েছি, এক পেয়ালা চা খেয়ে নিই। তুমি পয়সা দেবে, তারপর তুমি ট্রাম ধরো।

চলো।

দোকানে বসে বিনয় বললে, কিন্তু অমিদা' আর নয়।

কি নয়, বিনয় ?

পাহাড় ভেঙে পড়েছে আমাদের মাথায়—হিমালয়ের মত পাহাড়। আমরা চূর্ণ হয়ে যাচ্ছি, পরাজয় সম্পূর্ণ হয়েছে।

কিসের পরাজয়, বিনয় ?

তোমার আমার চেষ্টার।—বিনয় হঠাৎ ভারী গলায় বলতে লাগল, মেদিনীপুর থেকে চট্টগ্রাম, সব তোমরা দেখছ হয়ত; আমিও দেখছি। কেউ বলছে শ্মশান, কেউ বলছে মন্বন্তর। আমি কি দেখছি জানো? পরাজয়—আমার জাতির পরাজয়, তোমার নীতির পরাজয়, মানুষের পরাজয়; এতদিনকার বাঙালী প্রাণের এই নিঃশেষ পরাজয়।

কোনো পরাজয়ই নিঃশেষ নয়, বিনয়, কোনো জয়ও নিঃশেষ নয়। —শান্তহাস্যে অমিত বললে।

কিন্তু কোথায় তোমরা? এই আকাশ-ভাঙা দুর্ভাগ্যের মধ্যে কোথায় তোমরা? তোমরা কই ?

অমিত বললে, বঞ্চিতদের মধ্যে, বঞ্চিতদের পাশে। আমরা তো বঞ্চিতেরই দল—

মামুলি কথা। এসব বিনয় শুনবে না: পরাজয় চোখে দেখেও দেখবে না, অমিদা' ?

খুব দেখছি। দেখছি না, কি বলো বিনয়? দু'মাসের মধ্যে বাঙলার জীবন থেকে আমাদের নাম মুছে যেতে বসল। অথচ মৃত্যুর এই পথে

প্রত্যেকটি পদে আমরা প্রতিরোধ করেছি এতদিন। দেখেছিলে আর কাউকে কণ্ট্রোলের ‘কিউ’তে, দেখেছিলে খাস্ত-বাড়ানোর প্রস্তাবে ? এখনো আর ক’জন বলে কণ্ট্রোলের কথা, রেশনিংএর কথা ?

অথচ তোমরা তলিয়ে গেলে—

কিন্তু জাত তলিয়ে যাচ্ছে, সেইটাই কি আরও বড় কথা নয় ? পচিশ লক্ষ মরেছে, এক কোটি মরতে বসেছে—

ঠিক কথা। তাতেই তো তোমাদের পরাজয় সম্পূর্ণ হয়েছে, বলছি।

আমরা অপরাজেয় বিনয়। সংগ্রাম শেষ হয় নি—ছুটো যুদ্ধ শেষ হয়েছে, আরও যুদ্ধ সামনে রয়েছে ; শেষ যুদ্ধে যে জিতে সেই জিতে সংগ্রামে। সেই শেষ জয় আমাদের নিশ্চিত।

এখনকার মত পরাজয় মানছ তো।

কোনো পরাজয়ই আমরা মানি না—সে আমাদের ইতিহাসই নয় আমরা বঞ্চিতের দল। এক হিসাবে বঞ্চিত মানেই তো পরাজিত। তবু জানি বঞ্চিতের ইতিহাসের পরিণতি কোথায়। তুমিও তো দেখছ, স্মলেনস্ক, খারকভ, সেবাষ্টোপোল কি পরাজয় ? মুসোলিনির আবিসিনিয়া জয়ই কি চরম কথা ? জাপানের পিকিং সাংঘাই বর্মা জয়ই শেষ যুদ্ধ ? না, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভারত অধিকারই তোমার-আমার জাতির ইতিহাসের শেষ সত্য ? না, বিনয়,—ইতিহাসে মানুষের পরাজয় স্থায়ী হয় নি—বারে বারে স্থির হয়েছে মানুষের জয়।

বিনয় তাকিয়ে রইল অমিতের মুখের দিকে। সেই শীর্ণ মুখ থেকে কেমন একটা স্থির আশ্বাসের আভাস যেন ছড়িয়ে পড়ছে। এমন শান্ত আশ্বাস বিনয় আজ কোথাও দেখে নি বাঙলা দেশের এই অন্ধকারে। বিনয় চোখ নামিয়ে নীরবে চায়ের পেয়ালা তুলে নিলে। ··· ‘মানুষের জয়’ ?—কই ? কোথায় ? মানুষের ইতিহাসে কি সত্যই সেই পরম আশ্বাস এরা দেখতে পাচ্ছে আজও ? এত আশ্বাস, এত বড় সম্ভাবনার স্বপ্ন, এরা

কোথায় দেখতে পায় এই দুর্ভাগ্যের মধ্যে মানুষের? সত্যই কি মানুষ এত মহৎ যে, মহৎ সে হতে পারবে আবার?

অন্য মনে চলল বিনয় অমিতের সঙ্গে। অমিতরা ইতিহাসে কোথায় পেল এমন আশ্বাস? বিনয় তাদের বিশ্বাস দেখে কত সময়ে হেসেছে, পরিহাস করেছে—তাদের বিশ্বাস যেন একটা ছাঁচে-ঢালা স্বপ্ন। কিন্তু এমন দিনে চোখ মেলে যারা ভবিষ্যতে বিশ্বাস করতে পারে তারা কি তুচ্ছ মানুষ? বিনয়ের মনে হল—এতো শুধু অমিতদের বিশ্বাস নয়, এ যে বিনয়ের পক্ষেও এক পরম আশ্বাস, ইতিহাসের অমৃত। সভ্যতার সমুদ্রমন্থনে গরলের সঙ্গে সঙ্গে আজ এই অমৃতও উঠছে নাকি? কোথা থেকে পায় এরা সেই বার্তা? কেমন করে সঞ্চয় করে এমন প্রাণদায়িনী প্রেরণা? এই শীর্ণ অমিতের চোখেও আসে শুকতারার সুরম্য দীপ্তি, প্রভাত তারার পরম আশ্বাস?

অমিদা' নাকি?—পরিচিত নারীকণ্ঠ বললে, যাক্, বাঁচলাম। কিন্তু তুমিও যে! বাঁচা গেল। শীঘ্র চলো। তোমাকেই দরকার বেশি—

সুধা গুপ্তা! ব্যস্ততার শেষ নেই তার—চুল মুখে উড়ে পড়ছে।

বাড়ি ফিরছিলাম,—সে টেনে নিতে নিতে বললে, এদিকে দেখি একটু ভিড়! ব্যাফল-ওয়ালের পিছনে কেমন শব্দ। এগিয়ে গিয়ে দেখি ছেলেপিলে হচ্ছে এক কাঙালী মেয়ের। এসো, তোমাকে পেয়ে বাঁচলাম। কিন্তু এলে তুমি কবে?

পরশু। কিন্তু বাড়ি থাকো তুমি কখন?

সব সময়ে—যতক্ষণ বাড়ির বাইরে না থাকি। এখন, খাখাও তোমার ডাক্তারির বিদ্যা।

ডাক্তারির এ বিদ্যা আমার বেশি জানা নেই।

একটু জানা থাকলেই হবে, বাঁচাও। ততক্ষণ আমি আমাদের ডাক্তার বন্ধুদের ফোন করছি—একটা বেড যে করে হোক করতেই হবে।

ডাক্তারও তোমাদের বন্ধু হয় ?

আশ্চর্য হচ্ছ ?

হব না ?

ডাক্তার সত্যকারের ডাক্তারই হতে পারে না নইলে। আমাদের বন্ধু না হলে সে করে ব্যবসাদারী। নাও, ছাখো, এখন এই মেয়েটিকে।

আলো এল। কাছাকাছি বাড়ি থেকে সুধা গজ নিয়ে এল। একটা ডাক্তারী দোকান থেকে আরও ওষুধ নিয়ে এল অমিত। বিনয় তার অখণ্ড মনোযোগ আর উৎসাহ নিয়ে নিজের কাজ হাতে নিলে।

ধীরে—অত্যন্ত ধীরে—যেখানে শত সহস্র মরছে—যেখানে কালই হয়ত মরবে আবার কেউ—সেই ব্যাফল-ওয়ালের আড়ালে এক গাড়ী-বারান্দার নিচে ক্রন্দনধ্বনিতে আপনার আবির্ভাব ঘোষিত করলে এক মানবপুত্র।

মৃত্যুর অন্তঃপুরে আবির্ভূত হল নতুন জীবন।

জীবনের জয়গান থামে না একেবারে। 'মানুষের জয়' মিথ্যা নয় তো।

বিনয় যখন বাড়ি ফিরল তখন তার মুখে রয়েছে একটা সার্থকতার ঔজ্জ্বল্য—সে সামান্য কিছু করতে পেরেছে আজ। বৃহৎ আশা সে দেখছে না কিছু, কিন্তু নিজের শক্তিতে তবু আস্থা সে ফিরে পেয়েছে।

শচীপ্রসাদ বাড়ি ফিরে এসেছে অনেকক্ষণ আগেই। বিনয়কে দেখে সানুযোগ কণ্ঠে বললে, কোথায় ছিলে ? দুপুরে তোমার জন্য বসে শৌরীন আর আমি টিকেট নিয়ে—এ্যাসেম্‌বলিতে যাব।

কি ব্যাপার সেখানে ?—বিনয় প্রসন্ন চিত্তে জিজ্ঞাসা করলে।

ডাক্তার মুখার্জি আজ সেই 'ফুড'-এর সেন্সর প্রস্তাব তুললেন। ওয়াণ্ডারফুল।

কি বললেন ?

শুনতে হয়। একেবারে 'স্ম্যাস্' করে দিয়েছেন।

কি বলেছেন?

কাল কাগজে দেখবে। এর পরে আর বলতে হবে না খাদ্যের এই কেলেঙ্কারির জন্য দায়ী কে।

কে দায়ী?—বিনয় জিজ্ঞাসা করলে হেসে। তার মনে তেমন উষ্মা নেই আর আজ এখন।

শচীপ্রসাদ সবিস্তারে বলে গেল—মানুষের সৃষ্টি এই পাপ—'ম্যান্‌মেড্'—ইস্পাহানি, মোসলেম্ লীগ্, ইংরেজ; এরা 'যুদ্ধ-যুদ্ধ' করে সব শেষ করেছে; যুদ্ধের ফল এই মৃত্যু। সকলের মূলে যুদ্ধ—

কোন্ যুদ্ধ, বল্‌ছ? এ যুদ্ধ? আমি ভাবলাম যেভাবে মূল আবিষ্কার করছ, দায়ী বুঝি এ যুদ্ধ নয়, পলাশীর যুদ্ধ।

পলাশীর যুদ্ধ! তার মানে? তুমি কি বলতে চাও?

সকলের মূলে পলাশীর যুদ্ধই। তাতেই ইংরেজ রাজত্বের পত্তন হল—তাতেই পৃথিবীতে সাম্রাজ্য নিয়ে যুদ্ধের গোড়া পত্তন হল, আমাদের দেশে তাতেই তোমার হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে তৃতীয় পক্ষ স্থান করে নিলে; তাতেই ইস্পাহানিরও আবির্ভাব, সুরাহবর্দী-নাজিমুদ্দিনেরও জন্ম—জন্ম আবার তোমার আমারও। অবশ্য ওদের একটু আগে আমরা, হিন্দু ভদ্রলোক ও ব্যবসায়ীরা ওদেরও অগ্রজ—তবে পলাশীর পরে। পলাশীর পাপ তাই বল্‌ছিলাম—

তুমি ঠাট্টা করছ? দায়ী ওরা নয়? দায়ী তবে কে?

দায়ী কে নয়, তাই আমাকে বরং বলো না?—বিনয় বললে হেসে।

বিনয় চুপ করলে, পরে আবার বললে, দায়ী যে কে নয়, তাই বলো। এ যে পাপচক্র, বাড়ে আর বাড়ে। পলাশীর পাপ বললেও হবে না—'এ আমার, এ তোমার পাপ।' কিন্তু তার থেকে উদ্ধারের পথ কি, তা'ই এখন বরং বলো।

শচীপ্রসাদ বললে, তা'ই তো বলেছেন ডক্‌টর মুখার্জি! আমরাই তো লোকদের বাঁচাচ্ছি—এত লঙ্গরখানা চালাচ্ছে কলকাতায় কে? খাওয়াই, পরাই, আমরাই ওদের ওষুধপত্র পর্যন্ত দিই—

বিনয় একটু সংযত হয়েছিল। এবার হেসে ফেলল: ওষুধপত্র! থাক্‌, শচীদা, দেখেছি ন্যাশনাল মেডিসিনের জিনিস। আমি ডাক্তার, আমাকে আর ও কথা না বোঝালে। ও ওষুধ যেন নিজেরা খেয়ো না।

ঘুম এলো না আজও বিনয়ের চক্ষে। জানালায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল—মেঘে ঢাকা আকাশ ম্লান; পৃথিবীরও রূপ নেই আর। কিন্তু অনুভূতির সেই তীব্র অস্থিরতা আজ বিনয়ের মনে নেই। এই তো সে দেখলে—এরই মধ্যে মানুষের জয়। নতুন জীবন আবির্ভূত হচ্ছে—একি কম কথা?…সেই ছোট ছেলেটা—সেও আবার এই পৃথিবীতে এই দুঃখ-বেদনার বোঝা ঘাড়ে নেবে—বড় হবে, কাজ করবে, ভালোবাসবে, …পৃথিবীতে নতুন সন্তান দান করবে! একি কম কথা—কম আশ্চর্য ব্যাপার?

কোথা থেকে এল সুধা—কর্মিষ্ঠ মেয়ে সে। জীবনকে স্বাগত করবার জন্যই যেন সে জন্মেছে, ঘুরছে, ছুটছে। বিনয়ও যেন আজ তাকে নতুন করে পেল এই নবসৃষ্টির সামনে তার সঙ্গিনী।

বিনয় ভাবতে চেষ্টা করলে অমিতের মতো—সব অন্ধকার হয় নি, সব অন্ধকার থাকবে না। প্রাণের একটি দীপকণা জ্বলে উঠেছে—বিনয় তাতেই একবারের মত সার্থক মনে করে নিজেকে। প্রাণকে স্বাগত করছে সেও।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিনয় দেখতে লাগল—মেঘে ছাওয়া আকাশ, আকাশ জুড়ে অন্ধকার। একবার তবু তারি ফাঁকে দেখা দিলে ছোট্ট একটি তারা;

সামান্ত ছোট একটি তারা—যেন নবজাত শিশু। এই মেঘের পারেও তারাময়ী বিভাবরী জেগে আছে তবে ?—নিশ্চয়ই জেগে আছে। কিন্তু সে ধ্রুব আশ্বাস বিনয় নিজের মনের ভেতর পায় কই তবু ? সে দৃষ্টি তার কই—অমিতের মত, সুধার মত ?

আলোকের জননী, তুমিই না বিভাবরী ? সত্য হও তবে বিনয়ের কাছে, সত্য হও, সত্য হও।

২১

খোঁজ করেও সরযূকে পাওয়া গেল না।

সুধা ও বিনয় নতুন উগ্যমে লেগে গেল কাজে—বাঁচাতে হবে কলকাতার পথের মানুষদের, বাঁচাতে হবে সোনাপুরের ক্ষুধিত মানুষদের। দু'জনায় দেখা হয় প্রায় প্রতিদিন, আর দেখা না হলেও অন্তরূপ ভাবে না। বিনয় জানে সুধা হয়ত গেছে কোন্ বস্তীতে কি বৈঠকে ; সুধা জানে বিনয় হয়ত খাটছে কোন্ দুঃস্থের হাসপাতালে বা চা'লের খোঁজে।

বিনয়ের কাছে কিন্তু সত্য তবু এ কথা—পর্বতচূড়া ভেঙে পড়ছে, গুঁড়িয়ে যাচ্ছে গ্রাম, জনপদ। কিই বা সোনাপুর, আর কিই বা কলকাতা ? পাড়ায় পাড়ায় লঙ্গরখানা, মানুষ কলকাতায় অন্তত এখন না খেতে পেয়ে মরবার কথা নয়। কিন্তু মরছে তবু, মরছে খেতে পেয়ে,—কি খাচ্ছে ঠিক নেই। পেলেই খায়, আকণ্ঠ খায়, চেয়ে খায়, কেড়ে খায়, চুরি করে খায়, খায় আর মরে। কলেরা বাড়ছে, শোথ বাড়ছে, ম্যালেরিয়া বাড়ছে ; টাইফয়েড

চলছে, চলছে বসন্ত, আর পুষ্টিহীন মানুষের দেহে নানারোগ দেখা দিচ্ছে, কুৎসিত রোগে পর্যন্ত দেশ ছেয়ে যাচ্ছে। দেখছে আর বিনয় বুঝছে—আসছে মহামারী।

মহামারী সামনে অমিদা', আর কিছু করা সম্ভব নয়। ওষুধ পর্যন্ত পাবে না দেশে।

বিনয় তাই অমিতকেও বললে তার ওষুধের কারখানার কথা: আমার কারখানা, আমিই জানি তাতে খাঁটি ওষুধ পাবে না আর।

অমিত গম্ভীর হয়ে গেল, বললে, তুমি নিজে তার ভার নিচ্ছ না কেন? মানুষকে বাঁচাবার এতবড় উপায় তোমার হাতে, তা দেখবে না, আর কেবল বলবে 'পরাজয়, পরাজয়'।

শচীপ্রসাদকে বিনয় বললে, এমন ভাবে ভেজাল ওষুধ তৈরী করা বন্ধ করো, শচীদা।

শচীপ্রসাদ সাশ্চর্যে বললে, ভেজাল! ভালো ওষুধ তবে কাদের?

জানি না। তবে মানুষ এ ওষুধে বাঁচবে না।

মানুষ কি ওষুধে বাঁচে নাকি? চা'ল নেই, ডাল নেই, ছেলেদের দুধ নেই, কিছু নেই, সব উজোড়, আর তুমি দেশ বাঁচাবে ওষুধ খাইয়ে?

মিথ্যা নয় তাও। তবু বিনয় বললে, না, ওষুধে ভেজাল আমি সইতে পারি না।

শচীপ্রসাদ ক্ষুণ্ণ হল:—তুমি দ্যাখো না কেন কি করতে পার?—তারপর জানালে শচীপ্রসাদ, কেমিক্যালস কোথায়? আর কেমিক্যালস কি, কয়লা পর্যন্ত পাবে না কারখানার জন্য। মিলিটারি কন্‌ট্রাক্ট আছে, তাই আমার বরাদ্দ আছে; কিন্তু কয়লা পাই কই তবু? তার থেকে নিয়ে চালাতে হয় এই ওষুধের কারখানা। তুমি নিজে একবার বলো না তোমার মন্ত্রী বন্ধুদের—

খোঁচা ছিল কথাটায়। শচীদা' ও তাঁর বন্ধুরা ধরে নিয়েছে বিনয় মন্ত্রিমণ্ডলের পক্ষপাতী। নইলে মন্ত্রীমারা খেলায় তার আপত্তি কেন?

মিষ্টার মুরারি সেন বিনয়কে সানন্দে সংবর্ধনা করেছিলেন। বললেন, আপনার দেখাই নেই ডক্টর মজুমদার। শুনি—এসেছেন, আজ আসবেন, কাল আসবেন—কই? আপনার তার পেয়েছি, জবাবও দিয়েছি। তা পেয়েছেন? আমি তো চা'ল দিতেই চাই সকলকে; কিন্তু মালগাড়ী আমরা পাই না। দেখছেন তো রিলিফ চালাচ্ছি আমরাই।

মিষ্টার সেন ফাইল উল্‌টিয়ে উল্‌টিয়ে দেখাতে লাগলেন তাঁদের রিলিফ কমিটি কতগুলো লঙ্গরখানা চালাচ্ছে, কি রকম তার চা'ল আদায়ের জন্য লেখাপড়ি করতে হচ্ছে সরকারের সঙ্গে।

রিলিফ আপিসে যাবেন আপনি? চলুন না সন্ধ্যায়? এত বড় ব্যাপার! শ্যামাপ্রসাদবাবু না হয় টাকা তুললেন, বিবৃতি দিলেন, বক্তৃতা করলেন। কিন্তু কাজের তিনি জানেন কি? আশুতোষের ছেলে হলেই হয়?—বলে মিষ্টার সেন হাসলেন, বুঝলেন ডাক্তার মজুমদার, আশুতোষরা কাজের জোরে আশুতোষ হন!

বিনয় বুঝলে তার কথা। মুরারি সেনের গোঁফ তাকে মনে করিয়ে দিলে আশুতোষরা কি জাতীয় মানুষ। বলতে লাগলেন মুরারি সেন দৃঢ়স্বরে, অর্গ্যানিজেশান সহজ কথা নয়। সেজন্য কর্মী হতে হয়, 'নেতা' হলে চলে না। ওঁরা নেতা হতেই জন্মেছেন, আমরা জন্মেছিলাম কর্মী হয়ে। সে কি শিক্ষানবিশীর দিন গিয়েছে আমাদের। দাঁড় টানো তো দাঁড়ই টানো, পঞ্চাশ মাইল হেঁটে চলো এক রাত্রিতে—সে সব না করলে কেউ পারে কিছু গড়তে?

মিষ্টার মুরারি সেন তাঁর পুরোনো স্মৃতির পাতায় যেন চোখ রেখে কথা

বলছিলেন। মুখে এবার একটু গর্ব, একটু আত্মপ্রসাদ। যশোদা চৌধুরার মতো তিনিও জীবনের সেই অধ্যায় ভুলতে চান না—একদিন তিনি বিপ্লববাদী দলের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন, গত যুদ্ধের সময়ে রাজবন্দী ছিলেন। এ কথা ভুলবেন কি করে ?

অর্গ্যানিজেশান সহজ কথা নয় তো। করবে কে ? ডাক্তার খান, কি প্রফেসর মল্লিক ? এ সব বাক্যবাগীশ ? ইউনিভার্সিটির খোসামোদে-পাওয়া ফার্ষ্টক্লাশ আর জমিদারের নায়েব-গোমস্তার মত প্রোফেসর দিয়ে মডার্ন অর্গ্যানিজেশান হয় না। ওরা ছেলেদের মাথা খায়, খাক ; কাজের কাজে ওদের কি শক্তি আছে ? আসল কাজের মানুষ খুঁজতে হবে অন্যখানে —আমাদের মধ্যে, স্বদেশীওয়ালাদের মধ্যে।

বিনয়ের মনে পড়ল অমিতের আশা—রাজবন্দীরা বেরুলে কাজ হয়। সে বললে, তাদের বের করে আনুন এবার—রিলিফের কাজে চাই যে—

লিখেছি 'স্বদেশী'তে, দেখছেন না ?

গান্ধীজী, জওহরলালের জন্য লিখেছেন ?—কই ?

একটু গম্ভীর হলেন মিষ্টার সেন ঃ তাঁদের সম্বন্ধে লেখা চলে না। তাঁদের মুক্তি চাইলে কংগ্রেস আন্দোলনকে ছোট করা হবে। আর থাকুন না ওঁরা জেলে,—দেশ-বিদেশে এই গবর্মেণ্টই তাতে মুখ পাচ্ছে না।

বিনয় বুঝলে বৃথা চেষ্টা। মিষ্টার সেন বললেন, আর ওঁরা বাঙলার জানেন কি ? সুভাষ থাকলে বরং বাঙলার কাজ হত। এদিকে একা কি করি আমি ? আপনারা আসুন না ? আপনি আসুন—এসব কাজের ভার নিন —

বিনয়ের মনে বিস্ময় জাগল। সত্যই তাকে চান মিষ্টার সেন ? সেই গোঁফ যেন সূচ্যগ্র প্রশ্নের মত তাকিয়ে আছে বিনয়ের দিকে আর চোখ যেন দেখছে বিনয়ের অন্তস্তল। বিনয় বললে, মিষ্টার সেন, আগে সোনাপুরকে বাঁচাই।

গোঁফের ফাঁকে মৃদু হেসে সেন বললেন, সোনাপুর বাঁচবে।—চোখের ইসারা করে তিনি জানালেন, ওখানে মুসলমান আছে বেশি।

কিন্তু মরছে বেশি কারা জানেন? জেলে, মাঝি, পাটনি, যোগী এসব হিন্দু ছোট জাত।

সেন তৎক্ষণাৎ বললেন, তবেই দেখুন, হিন্দুরা সেখানেও রিলিফ পাচ্ছে না।

বিনয় বুঝাতে লাগল, তা নয়। ছোট হিন্দুর কেউ আপনার নেই—

মিষ্টার সেন গম্ভীর দৃষ্টিতে তাকে দেখতে লাগলেন। তাঁর গোঁফের আড়ালে হাসি নেই। শেষে বললেন, ঠিকই। তবু লঙ্গরখানায় ওরা যেতে পারে, খেতে পারে। কিন্তু ভদ্রলোকেরা মরতে চলেছে আরও বেশি। তাদের তো কেউ দেখে না, তারা লঙ্গরখানায়ও যেতে পারে না।—আপনারা মালগাড়ী আর পারমিট আদায় করুন—হাজার মণ করে চা'ল আমরা পাঠাব সপ্তাহে সোনাপুরে।

পারমিট আমি পাব কোথায়?—বিনয় নিরুপায় ভাবে বললে।

সেন হেসে বললেন, আপনিই পাবেন। লীগের মন্ত্রীরা আছেন—

বিনয় তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, গোঁফের আড়ালে হাসি দেখা যাচ্ছে না কি? মিষ্টার সেন বললেন, পাবেন আপনি—সে আমি জানি।

তারপর মিষ্টার সেন গম্ভীর হয়ে বললেন শচীপ্রসাদকে, তা হলে মিষ্টার চৌধুরী, আপনাদের কারখানার মজুরদের রেশনটা হপ্তায় এবার থেকে এক সের কমিয়ে দিন।

আমাদের কারখানায়?—সবিস্ময়ে শচীপ্রসাদ বললে।

নইলে ডক্টার মজুমদারকে চা'ল দিই কোথা থেকে? হাতে লঙ্গরখানাগুলো রয়েছে—এক ছটাকও এদিক ওদিক করবার উপায় নেই। তারপরে মুকুলের বিয়ে দিন 'পনের পরে—জিনিসপত্র জোগাড় করি কি করে?

আমিই বা পাব কোথায়?

ওর থেকেই বের করে নেবেন, হয়ে যাবে।—মিষ্টার সেন এমন অর্থপূর্ণ ভাবে বললেন যেন শচীপ্রসাদের আপত্তি কিছুই নয়।

শচীপ্রসাদ তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল। পরে বললে, এক সের করে রেশন কমাতে বলছেন, তাতে গোল হবে। ন' সেরের জায়গায় হয়েছে এখন হপ্তায় সাড়ে পাঁচ সের। মজুরেরা ক্ষেপে আছে—

কি করবে? ষ্ট্রাইক? তা ওরা করবে না। আর করলেই বা কি? কয়লা পাচ্ছেন না, কাজও কমছে, ওরা দু'দিন কাজ বন্ধ করলে তো ভালোই। তা ছাড়া দেখুন, ওদের তো সাড়ে পাঁচ সের লাগেও না। আপনিই তো বলছিলেন—ওরাও লঙ্গরখানা চালায়? তা হলে ওদের চা'ল কমালে ক্ষতি কি? সে চা'ল তো দেশের লোকই খাবে।

তা ওরা মানবে না। বলবে, আমাদের লঙ্গরখানা আমরা চালাব।

মিষ্টার সেন বিনয়ের দিকে তাকিয়ে হাসলেন, বললেন, ভেবেই দেখুন, ডক্টর মজুমদার। যত বেটা মেড়ো, দেশে ছাতু জোটে না; এখানে বাঙ্‌লায় খুব চা'ল রেশন মারছিস। তার থেকে এক-আধ সের দিয়ে বাঙ্‌লার মানুষকেই বাঁচা—তা হবে না। আপনি তো বলেন, সব বেঁটে নিলে হয় সমানভাবে, রেশানিং হলে মানুষ বাঁচবে। হয় না, ডক্টর মজুমদার, হয় না। কেউ কাণাকড়ি দাবী ছাড়বে না, তবে অন্যেই বা বাঁচবে কি করে? আমার তো গোলা খুলে দিয়েছি, দেখুন এখন মালগাড়ী পান কিনা।

বিনয় বুঝতে পারছে না—মজুমদারের রেশন না কেটে কি মিষ্টার সেন দিতে পারবেন না চা'ল? আর শচীদাই বা কেমন? তার কারখানার মজুরদের রেশন কাটার কথা বলেন মিষ্টার সেন, আর শচীদা তা সহ্য করে?

গাড়ীতে বসে বিনয় বললে, শচীদা, তুমি রাজী হলে কেন ওঁর কথায়?

শচীদা বললে, রাজী হলাম কই? রাজী আমি হই নি। তবে বিনয়, রাজী-গররাজীর কথা তো নয়, মিষ্টার সেনের সঙ্গে সে কথা নয় তো—

রাজী-গররাজীর কথা নয়। বিনয় তা বুঝছে—মুরারি সেন পুঁজির কর্তা। শচীপ্রসাদ কারখানা গড়ে, ইন্‌ডাষ্ট্রিয়ালিষ্ট; কিন্তু পুঁজির লেন-দেন তার হাতে নয়। মিষ্টার সেন সেদিকে তাঁর মুরুব্বি। শুধু মুরুব্বি নয়, বিনয় বুঝছে, পুঁজিদার বলে মিষ্টার সেন প্রায় শচীপ্রসাদের মুনিব। কর্মী ব্যক্তিত্ববান্ পুরুষ শচীপ্রসাদ, কিন্তু মিষ্টার সেনের কাছে নয়। বিশ্বকর্মা আজ কুবেরের অনুচর হয়েই বেঁচে আছে। লক্ষ্মী বন্দী আজ কুবেরের ট্যাকশালে।

জাহেদের সঙ্গে দেখাই হয় না বিনয়ের।

বড় ব্যস্ত ডাক্তার সাহেব। কি কাণ্ড দেখুন। একটা সামান্য মামলা, কিছুতেই ম্যাজিষ্ট্রেট তা তুলে নেবে না। তিন তিনটা নোট গেছে ডিপার্টমেণ্ট থেকে। মালেক সাহেব একটা সম্মানিত লোক—দেখুন তো।

জাহেদুদ্দীন বিনয়কে বোঝাতে লাগল—মালেকের বিরুদ্ধে সেই ঘুষের মামলাটা উঠিয়ে না নেওয়া কত বড় চক্রান্ত। সৈয়দ সাহেবের ডিপুটি সেক্রেটারী মিষ্টার বিহারী সেন, তিনি পর্যন্ত তাতে বাধা দেন—কি হবে এ দেশের?

মিষ্টার সেন গেছেন ছুটিতে এখন। ছুটি থেকে ফিরবেন না—স্ত্রী মারা গিয়েছে। পেনসেন নেবেন এবার—বিনয়ের প্রশ্নের উত্তরে জানালে জাহেদ।

কবে মারা গেলেন তাঁর স্ত্রী?

হল কিছুদিন। ওই এক ধরণের মানুষ, কেমন সিচুয়েশান্ বুঝতে চান না—চাকুরেদের যা হয়—একেবারে পলিটিক্‌স্ বোঝেন না? বলেন, 'হবে না কেন?' হবে কি? গবর্মেণ্ট অব ইণ্ডিয়ার চক্রান্ত—মালগাড়ী দেবে না। পাঞ্জাব গবর্মেণ্টও জুটেছে সে সঙ্গে—

বিনয় শুনতে লাগল—শ্রীবাস্তব, বেহুল, ছোটুরাম, বলদেও সিং।

জাহেহুদ্দীন কত নিগূঢ় সংবাদ রাখে আজ নিখিল ভারতীয় পলিটিক্সের !

বিনয় ভাবছে, বিহারী সেন, সেই পরিহাস-প্রিয় মানুষটি। বড় চাকরে, অবস্থাপন্ন, কিন্তু তাঁরও ঘরে হানা দিচ্ছে মন্বন্তর। খাদ্যের অভাব ছিল না তাঁর, সেখানে মৃত্যুর পথ তৈরী হল ভেজাল খাদ্যে। মরলেন বিহারী সেনের স্ত্রী। অমন মানুষ বিহারী সেন, মরে তাঁরই স্ত্রী, তাঁরই মেয়ে—

কানে গেল আবার 'শ্রীবাস্তব, ছোট্টুরাম,'—

বিনয় বললে, সে তো হল, ওসব হাই পলিটিক্স্ যাক্—

হাই পলিটিক্স্ কি ? ভেতরের ব্যাপার বুঝতে হবে তো, ডাক্তার সাহেব। আপনারা বাইরে থেকে নানা কথা শুনছেন, কিছু বুঝতে পারেন না। ভেতরের খবর জানলে বুঝতেন কি না করছি আমরা—

'ভেতরের খবর' আরও বিনয়কে তাই শুনতে হল। 'বীজধান ভরতি মালগাড়ী পড়ে রয়েছে। নষ্ট হচ্ছে বীজ। লোকে গাল দেয় আমাদের—'

এই সেই জাহেহুদ্দীন—শাহেহুদ্দীনের ভাই—আজ 'হাই পলিটিক্সের' প্যাঁচ বোঝাচ্ছে বিনয়কে—

তবু জাহেদকে নিয়েই যেতে হবে বিনয়কে ইলাহি ভাইর আপিসে।

সোনাপুরে তো আপনার চা'ল পাই নি—বললে বিনয়।

চা'ল তো দিচ্ছিই, কাপড় কম্বলও দিচ্ছি। কিন্তু দেখেছেন আমাদের মুস্লিম চেম্বার অব কমার্সের রিলিফ কলকাতায় ? দেখবেন ?

কিন্তু সোনাপুরে কি দেবেন ?

মালগাড়ী পেলে সব দোব—যত চান। এই দেখুন—

ফাইল এল—তাঁরও ফাইল আছে মুরারি সেনের মতোই। দেখা গেল —লীগের সেক্রেটারী হাফেজের নামে তার গেছে দিন তিন আগে, 'যত সাহায্য চাই, ব্যবস্থা করো—আমরা দিচ্ছি।'

ইলাহি-ভাই জানালেন, হাফেজ ব্যস্ত—জিলা লীগের নির্বাচন হচ্ছে।

কাজী আবার দল পাকিয়েছে আমাদের বিরুদ্ধে, দেখ্‌ছি আমরা। হাফেজ সাহায্য বিলি করবে—কিন্তু মালগাড়ী কই?

বুঝলে বিনয় সাহায্য যাবে হাফেজের মারফৎ। মুরারি সেনও এমনি চান—তাঁদের রিলিফ যেন তাঁর লোকের হাত দিয়ে যায়। রিলিফ নয়, কার হাত দিয়ে রিলিফ যাবে, সেইটাই বড় কথা। রিলিফও পলিটিক্‌স্‌।

পলিটিক্‌স্‌ বৈকি?—শুনে বললে অমিত,—তবে মন্ত্রিত্বের পলিটিক্‌স্‌ না হলেই ভালো হত। আজ রিলিফ মানে এদেশের সমাজ সভ্যতাকে ভেঙে পড়তে না দিয়ে টিকিয়ে রাখা—মানুষকে পায়ের উপর খাড়া রাখা, পা বাড়াবার ব্যবস্থা করে দেওয়া। এ পলিটিক্‌স্‌ নয় তো, পলিটিক্‌স্‌ তবে কি? শকুন-শেয়ালের মারামারি?

জানি না, বুঝি না। আগে লোককে বাঁচাই তো—বললে বিনয়।

নিশ্চয়। বাঁচা-মরা নিয়েই তো পলিটিক্‌স্‌। কিন্তু রিলিফ এদের পলিটিক্‌স্‌ কেন জানো? রিলিফে আজ বড় প্রোফিট বলে। রিলিফের চা'ল তার কর্তারা চোরাবাজারে চালায়। তারা মজুরের রেশন কমায় অখাদ্য দিয়ে, চোরাবাজারে বিক্রী করে মালিকেরা সেই চা'ল। রিলিফ আজ ভালো বিজ্‌নেস্‌—

সত্য জানো, অমি'দা?

খোঁজ নাও—ন্যাশনাল আয়রনের রেশন কমাচ্ছে। কারণ, চা'ল বাঁচলেই চোরাবাজারে তা বিক্রী করা যাবে। কিন্তু সাবধান, এসব কাজে বেশি এগিয়ে যেয়ো না আবার, খুনখরাবী হয়ে যেতে পারে। হাঁ, খুনখরাবী হবে। ভাবছ বুঝি ঠাট্টা করছি। কাগজের 'কোটা' নিয়ে খুন হয়েছে জানো? মহারথীদের ভাগ-বখরার গোলমাল হয়। একদল সুবিধা করতে পারছিল না। অন্যদলের সম্বন্ধে তারা বলে, 'ওরা চোরাবাজারে

কাগজ চালায়।' গবর্মেণ্টই কি এমন কথায় চুপ করে থাকতে পারে? সরকারী কর্মচারীরা তদন্ত করে; পকেট ভরে ওঠে, খুশী হয়ে যায় তারা। তারা বললে, 'বাজে কথা।' কিন্তু প্রথম দল আবার চালাল নালিশ। তারপর? পথের উপরে এ দলের কর্তা তখন রাত্রি দশটায় খুন।

বিনয় এরূপ একটা সংবাদ শুনেছিল। তার কারণ শুনে স্তব্ধ হয়ে গেল। শেষে বললে, তবু তুমি বলবে, নিরাশার কারণ নেই, আমরা জিতব? কি আশা দেখছ তুমি?

অমিত হাসল। বললে, যে আশা সত্য হয়ে উঠেছে—এসব মিথ্যার মধ্য দিয়েই। কবি বলেন নি 'রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন?'

বিনয় একটু চুপ করে রইল, পরে বললে, ওসব কবিতা। আমি ডাক্তার মানুষ, যুক্তি চাই, বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে চাই—

সুধা বললে, যুক্তির অভাব নেই, বিনয়। কিন্তু তোমার তা দেখবার মতো আগ্রহ কই? পড়বার, বুঝ্‌বার মত ইচ্ছা কই?

বিনয় বুঝল। বললে, সুধা, তোমার দেওয়া বইটা পড়ি নি, অন্যায় হয়েছে। পড়ব, কথা দিচ্ছি। কিন্তু বইএর যুক্তি থেকে আমি ঘটনার যুক্তিকে বড় বলে মানি। ঘটনা চাপা পড়ে গিয়েছে আজ কথার আর তর্কের ধূলিতে। তোমরা অবশ্য আশার স্বপ্ন দেখছ। কিন্তু তা দেখছ বইএর পাতা থেকে। আমি তা দেখতে পারি না। পারলে ভালো হত। একটা আশ্বাস পেতাম, মানুষের উপরও একটা বিশ্বাস রাখতে পারতাম।

চা'ল, ডাল, আটা, বাজরা রওনা হয়ে গেল; কাপড়ের গাঁট ও কম্বলের গাঁটও রওনা হল। ঘুরছিল বিনয় এই নিয়ে এ-রিলিফ কমিটির আপিসে, ও-রিলিফ কমিটির আপিসে। এরই মধ্যে বিনয়ের এই ভাবে দেখা হয় সুধার সঙ্গে, কথা হয়, তর্ক হয়, আর হয় এম্‌নি ভাবে

মনের সঙ্গে মনের পরিচয়। বিনয়ের নিকট চিন্তনীয় হয়ে উঠেছিল তাতে এই কথা—কোথা হতে অমিত সুধা পায় এমন আত্মপ্রত্যয় আর অপরাজেয় আশা? কাজের মানুষ বিনয়ও তো কম নয়। কিন্তু তার অন্তরে যেন একটা কিছু নেই—নেই এমন নিশ্চয়তা-বোধ, এমন দৃঢ় আস্থা। এইখানটাতেই ওরা আস্তিক—ঠাকুর-দেবতা না মেনেও আস্তিক; আর বিনয় যেন নাস্তিক—তেত্রিশ কোটি দেবতা মানলেও নাস্তিক। মানুষের এমন উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ বিনয় দেখতে পায় না, সে উপলব্ধি করে না—পৃথিবীর ভাঙা-গড়ায় সেও একজন শিল্পী, বিশ্বকর্মার সহকর্মী। দিনে রাতে শত কাজের ফাঁকে ফাঁকে বিনয় নিজেকে এই প্রশ্নই করে, 'কোথা হতে আসে এই আশ্বাস?' এই মন্বন্তরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে নিজেকে বিনয়ের মনে হয় কত ছোট, কত নিরুপায়, কত অকিঞ্চিৎকর। তাই আশ্বাস তার চাই, সে তা পায় কই? অথচ আশ্বাস খুঁজে পায় সুধা অমিত; কি করে তারা তা পায়, তা'ই বিনয়ের বিস্ময়।

এই তো বিনয় শুনছিল ওদের থেকে—আমনের দিন আসছে। সুধারা তার জন্য তৈরী হচ্ছে। শহর থেকে চাষীদের গ্রামে ফিরে যেতে হবে, তাদের খেতে দিতে হবে, পরতে দিতে হবে, কাজের উপযুক্ত করতে হবে। মজুর দুষ্প্রাপ্য হবে—'কিন্তু তবু এক কণা ধানও নষ্ট হতে দোব না', এই সুধাদের শপথ। 'এক মুঠো আমনও যেতে দোব না আজ মজুতদারের হাতে', এই তাদের সংকল্প। রেশনিং চাই, কণ্ট্রোল চাই, আর তারই জন্য গবর্মেণ্টের নিজে কেনা চাই ফুড কমিটির সহযোগে উপযুক্ত পরিমাণ আমন ফসল। এসব আলোচনা আর পরিকল্পনা অমিতরা করতে বসে গেছে; বিনয়কেও নিয়ে গিয়েছে তার মতামত শুনতে। আগেকার দিনে হলে বিনয় হয়ত হাসত। এই দেশ-জোড়া বিপর্যয়ের মধ্যে বেশ আছে এই উন্মাদ যুবকের দল—প্ল্যান করছে, কাজ ভাগ করছে,—যেন সব তাদের প্ল্যান মতো হয়ে যাবে। এরা স্বপ্ন দেখছে। পৃথিবীতে এমন পরিহাসের জিনিস

কি আছে আর স্বপ্নের মত? কিন্তু তবু বিনয়ের আজ হাসি পায় না—পৃথিবীতে এমন দুঃস্বপ্নই কি কোনো কালে কেউ দেখেছে? হাসি তাতে যে মরে যায়। বিনয় হাসতে চেষ্টা করেও মনে মনে স্বীকার করে, না, এই নাস্তিক্যবাদে তার মুক্তি নেই,—কারুর মুক্তি নেই, দেশেরও মুক্তি নেই।

কিন্তু কোথা হতে পাওয়া যাবে আশা, আশ্বাস আর নিশ্চয়তা?

বিনয়ের মনে শত কাজের মধ্যেও এই সব প্রশ্নই হানা দিচ্ছিল সর্বক্ষণ। সে ভাবছিল তার ঔষধের কারখানাকে সংস্কার করার কথা। বল্‌ছিল,

আমি বঞ্চনা করব না; ঠিক ওষুধ দোব। তার জন্যই ইন্‌ভেষ্টমেণ্ট ট্রাষ্টের শেয়ার বিক্রী করে ফেলব। ঐ কারখানার রাসায়নিক তৈরীর জন্য মালপত্র দরকার, তা কিনব। খাঁটি ওষুধ তৈরী করব, শচীদা।

শচীপ্রসাদ বিনয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। শেয়ারগুলো বিক্রী করবে কেন? টাকা চাই। ট্রাষ্টের কাছে তুমি তো মুখ খুললেই তা পাবে। মুরারিবাবু অনেকবার বলেছেনও।

ঠিক তার জন্যই—আমি আর ওই ট্রাষ্ট প্রভৃতির সঙ্গে সম্পর্ক রাখব না।

শচীপ্রসাদ অপমানিত ও ব্যথিত হল বিনয়ের ব্যবহারে। এই ন্যাশনাল মেডিসিন কোম্পানি—কি থেকে এই দেড় বছরে কি হয়েছে, বিনয় তা ভেবে দেখছে না। একটু তর্ক করে ক্ষুব্ধভাবে বললে।

বিনয়, আমরা শুধু আত্মীয় নই, বন্ধু থেকেও বেশি; কিন্তু বিজ্‌নেস্ ইজ্‌ বিজ্‌নেস্। তুমি তোমার কারখানা দেখবে না, অথচ যারা দেখবে তাদেরকে দোষী করবে—এটা বন্ধুরও উপযুক্ত কাজ নয়, বিজ্‌নেসম্যানেরও উপযুক্ত কাজ নয়। তোমার কাজ বুঝে নাও—আমি আর ওতে নেই।

গম্ভীর, স্থির এবং দৃঢ়সংকল্প তার কণ্ঠস্বর। এ শচীপ্রসাদকেই তার কারখানার লোকেরা দেখে, চেনে, ভয় করে—ব্যক্তিত্ববান্ কর্মী পুরুষ!

বিনয় একটু অপ্রতিভ হয়ে গেল। কোথায় যেন নিজের মধ্যে সে জোর পেল না। সত্যই সে কোন্ ন্যায়যুক্তিতে শচীপ্রসাদকে দোষী করে?

দোষী আমি তোমাকে একটুও করি না, শচীদা। এটা তোমার অন্যায় বলা হবে। কিন্তু আমি ডাক্তার, খাঁটি ঔষধ চাইবই তো।

সেজন্য নিজে উদ্যোগী হও।

তুমি উদ্যোগী হলে হবে না কেন?

না, আমি ইঞ্জীনিয়ার, আমি ইন্‌ডাষ্ট্রি গড়ি।

হেনা শঙ্কিত হয়ে উঠছিল। সুযোগ পেয়ে বললে, তোমাকে কতবার বলেছি, দাদা, চলে এসো এখানে। কারখানাটা দেখো। তুমি শুনবে না। কোথায় সোনাপুর—সেখানে পড়ে রইলে। উনি এসবের কি বোঝেন?

হেনা সত্যই মনে করে শচীপ্রসাদের প্রতি অবিচার করেছে এবিষয়ে বিনয়। বিনয়ও বুঝলে তার নিজের দায়িত্ব সে পালন করতে পারে নি, সে কথা সত্য। বিনয় চুপ করে গেল, কিন্তু বুঝলে শচীপ্রসাদ মনে মনে ক্ষুব্ধ অভিমান পোষণ করে রইলো।

দুজনার মাঝখানে ব্যবধান রচিত হয়ে উঠছে—অভিজ্ঞতার ব্যবধান।

হেনার কথায় বিনয় দেখে এল তাদের দুগ্ধ বিতরণ কেন্দ্র। শ' তিনেক ছেলেমেয়েকে দুধ আর বার্লি দেয় ওরা। তার আগে মা'দেরও খিচুড়ী দেয় খেতে।

জীবন চক্রবর্তীর মা করেন এখানে কাজ। তাঁর সঙ্গে দেখা হল, কথাও হল। এই দুই বৎসরে তাঁর বয়স অনেক বেড়ে গেছে; মুখ শুষ্ক শীর্ণ হয়ে উঠেছে, কঠিন হয়ে পড়েছে।

বিনয় বললে, সেবার দেখা করে যেতে পারিনি, তাড়াতাড়ি চলে যাই, বাড়ির ঠিকানা জোগাড় করতে একটু দেরী হল। এবার যাব—

না, না, আপনার যেতে হবে কেন? সে কি মানুষের বাড়ি না মানুষের স্থান? বস্তীর আঙিনায়ও সূর্য দেখা যায় না—আর কতরকমের লোক থাকে—

বিনয় বুঝলে বস্তীতে ঠাঁই নিয়েছেন তিনি। অন্য কথা পেড়ে বললে, জীবনের খবর পেয়েছেন কিছু ইতিমধ্যে আর?

খবর আর কই? সেই যা পেলাম খবর প্রথম সেবার অঘ্রাণ মাসে।

বিনয় একটু আশ্চর্যান্বিত হল। পুত্রের জন্য সেই প্রবল উৎকণ্ঠা নেই আজ আর জীবনের মায়ের মুখে। অথচ দেড় বছর আগে ছেলের খবরের জন্য তিনি আপনার থেকে বিনয়ের ঠিকানা সংগ্রহ করেন, বিনয়কে পর্যন্ত খুঁজে বের করেছিলেন। বিনয় জিজ্ঞাসা করে জানলে কিছু পেন্‌সেন নাকি সরকার তাদের দেবে।

পান নি আপনারা?—বিনয় জিজ্ঞাসা করলে।

পায় তো বউ পাবে—আমি কে?—কথার মধ্যে তাঁর বিক্ষোভ সুস্পষ্ট।

বিনয় বললে, হাঁ, সরকারের আইন তা'ই বটে। ফ্যামিলি মানে ওদের কাছে স্ত্রী আর ছেলেপিলে।

তাই ভালো।—ক্ষুব্ধ বিধবার কণ্ঠস্বর। বিনয় একটু আশ্চর্য হল, বললে, বউ কোথায়?

জীবনের মা রাগ করে বললেন, ছেলেই রইল কোথায়, তার আবার বউ!—পরক্ষণেই যেন এ কথার বিসদৃশতা বুঝে বললেন, ভাইয়ের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। দেশেই ছিলাম দু'জনায়। হরিনাথ জেলে গেল, খেতে পাই না কেউ। তবু সেই গাঁয়ের ছেলেরা মেয়েদের পাঠশালায় শিক্ষয়িত্রী করে আমাদের দিয়েছিল। তাদেরই ইস্কুল—ঋষিপাড়ায়। তারপর—চা'ল নেই। পাঠশালা বন্ধ। ছেলেরা বললে, 'আপনারা অন্যথানে যান।' যাব কোথা? রইলাম জোর করে পড়ে তবু গাঁয়ে।

ঋষিরা তো আগেই খেতে পেত না, মরবে মনে হল। হরিনাথ নেই, তার ছেলেমেয়ে শুদ্ধ তার স্ত্রী চলে গেল ঢাকায় ভায়ের কাছে। তার বাপ-মা গেল কাশীতে—সত্রে খাবে, থাকবে। আমাকে বলে, 'চলো'। বউ ফেলে আমি যাই কোথা? জীবন ফিরে এলে তা হলে বলবে কি? তখন বউকে বললাম, 'তোমার ভাইএর কাছে যাও, বউমা।' বউ যেতে চায় না, বলে, 'তারা খায় কি?' তারা পুরুষ মানুষ, কিছু উপায় করতেই পারে, আমি কি করতে পারি? আমি তবু তাকে পাঁঠিয়ে দিলাম একবার তার ভাইএর কাছে। পরদিনই ফেরৎ দিয়ে গেল তারা। গ্রাম ছেড়ে সবাই চলে গেল। গ্রামেও তো দিন চলে না—উপোস কত করব আর? অমন বয়সের বউ নিয়ে বিনা পুরুষ অভিভাবক কলকাতায় আসতে পারি কি? তাই আবার দিয়ে পাঠালাম বউকে ভাইয়ের বাড়ি—'তোমরা রাখো, আমি মাস-মাস টাকা পাঠাব। আমার বউএর খরচ আমি দোব।' গয়নাপত্র বিক্রী করে দেড়শ' টাকা দিলাম বউ'র হাতে। তা ছাড়া শীগ্‌গিরই তো পেন্‌সেনও সে পাবে। আমি এলাম কলকাতা—খাব, খেতে পাব। নিজে দেখে বউ এনেছি, সে বউকে খাওয়াব না আমি?—সত্য বলছি, বরাবর আমি পাঠিয়েছি টাকা, বাবা, অধর্ম করি নি। এই পঁচিশ টাকা মাইনে দিতেন ওঁরা তখন কর্পোরেশানে—কর্পোরেশানের কাজ জানোই তো। বিকালে এক বাড়িতে রেঁধে দিয়ে আসতাম—পেতাম আরও সাত টাকা। পনের টাকা তার থেকে আমি বউকে পাঠিয়েছি বরাবর। একবারটি ওর ভাই একখানা চিঠি দেয় নি। বউমা লিখত—সরকার কিছু দেয় না। সে আসতে চাইত এখানে। তারপর আজ দু'মাস তারও আর চিঠিপত্র নেই। টাকা পাঠালাম, পঁচিশ টাকা—আমার খরচ কি? আমি তো এখানেই খেয়ে নিই—একবেলা খাই। পাই, খাই এই লঙ্গরখানায়। আর আমার ঘর ভাড়া, আর এই কাপড়-চোপড়—একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে না এলে আর এঁরা রাখবেন না যে। পঁচিশ টাকা পাঠালাম বউকে, টাকা

ফেরৎ এল—'মালিক অনুপস্থিত।' এখানে দেশের লোক যারা ছিল তাদের কাছে ছুটি, কিছু খবর পাই না। নতুন যারা আসে বলে, 'সব দেশ ছেড়ে গেছে। আশী টাকা মণ চা'ল। চা'ল নেই-ই, যে যেদিকে পারে চলে গেছে।'

হঠাৎ জীবনের মায়ের কণ্ঠস্বর অশ্রুবিকৃত হয়ে উঠল: আমি কি করব, বলো তো? আমি কি বউকে চাই নি? সাধ করে বউ আনলাম। ছেলে ডাক্তার হয়েছে—কত আশা জীবনেরও মনে। এক বৎসরের মধ্যে বর্মায় যুদ্ধ বাধল, জীবন আটকা পড়ল কোথায় জানি না। ঠাঁই দিয়েছিল আমাদের হরিনাথ—তাকে নিয়ে গেল জেলে। যা স্বপ্নে ভাবিনি তাই হল—কলকাতার পথে জুতো পায়ে, ছাতা হাতে চাকরি করতে ছুটেছি, ছত্রিশ জাতের রাঁধা কি খাই জানি না,—আর থাকি সেই বস্তী তো নয় নরক পুরীতে—বউকে কি আমি পর ভেবেছি?

বিনয় এবার দেখলে জীবনের সেই মা যেন তাঁর চারিদিকের কঠিন প্রতিবেশকে ভুলে গিয়ে একবার স্নেহে, দুর্বলতায়, অসহায়তায় সেই গ্রাম্য মায়ের মত আবার চোখের জলে ভেসে যেতে লাগলেন।

বিনয় কোনো সান্ত্বনার কথা খুঁজে পেল না। শুধু বললে, মাসীমা, বউএর জন্য আপনি যা করবার তা করতে চেষ্টা করেছেন। কি করবেন আর? তবে খোঁজ পেলে তাকে আনিয়ে ফেলবেন এখানে—হেনাকে বলবেন, টাকাকড়ি, বাড়িঘর, ঠিক হয়ে যাবে।

যেন একটা পথ দেখতে পেলেন জীবনের মা; কিন্তু খোঁজ পাব কোথা? তার ভাই গেল কোথা? কেউ বলে রংপুর, কেউ বলে আসাম। খোঁজ আপনারাও করবেন কি একটু?

বেশ। নাম-ধাম দেবেন। তবু আপনাকেই কিন্তু খোঁজ করতে হবে।

বিনয় বিদায় নিচ্ছিল। জীবনের মা আবার বললেন, দেখুন, আপনারা আছেন। সে তো ইংরেজিও জানত, এখানে এ-আর-পি, যুদ্ধের আরও কত কি আছে। সে এলে ঢুকেও পড়তে পারত তাতে, কি বলেন?

বিনয় চুপ করে রইল। সেই শুষ্ক মুখে বুদ্ধি ও লোভের প্রখরতা ও কঠিনতা ফুটে উঠছে আবার। বিনয় বললে, তাতো পারতই।

আমিই তো তাকে আসতে নিষেধ করেছি বারবার—

পারতই তো—বিনয় মনে-মনে বললে; আর জীবনের মায়ের সেই শেষ লোভ-কঠিন দৃষ্টির কথা মনে করে ভাবলে—ঠিকই তো, ঠিকই ভাবছেন জীবনের মা। ঠিক না ভেবে তাঁর উপায় কি? ক্ষুধা যে তাঁকে সংসারের কঠিনতম সত্যের সঙ্গে পরিচিত করে দিয়েছে। বাঁচবার তাড়না বড় কঠিন; মানুষের সমস্ত বহিরাবরণ, খোলস ও মুখোস, শ্রী ও শোভনতা সবই সমভাবে তাতে ঝরে পড়ে যায়। এই তো জীবনের মা—এতকালের ভদ্রলোক, শিক্ষিত ব্রাহ্মণ পরিবার,—কোথায় তারা আজ? টিকে যদি থাকে—তবুও কি আর সেই পূজা-পার্বণ, সেই ব্রত-উপবাস, সেই নিয়মসংযম, সেই আত্মীয়-পরিজন দশজন নিয়ে ঘরকরা, সেই শালীনতা, শোভনতা, সেই সহজ সামাজিকতা আর এরা ফিরে পাবে? সমাজের একটা স্তর নিচে এরা চিরদিনের মতই নেমে যাচ্ছে আজ; এরা মধ্যবিত্ত নেই আর—বিত্তহীনের স্তরে ক্ষুৎপিপাসুর দলে এরা ভর্তি হচ্ছে।

বিনয় সন্ধ্যার দিকে দেখা করতে গেল বীরুর সঙ্গে। বীরু নেই—সে সোনাপুরে গিয়েছে, এখানকার বাড়িতে ছিল অন্য সকলে।

আরও একটু সচ্ছলতা বেড়েছে যেন তাদের ঘর-দুয়ারের। বসবার ঘরও বটে, আপিস ঘরও-বটে—খান দুই গদীওয়ালা চেয়ার, একটা সোফা, এক কোণে রেডিয়োও আছে। তা'রই মধ্যে একদিকে ছোট এক রোল্‌ড্ টপ্ টেবিল, খানতিন আপিস-চেয়ার। উপায় নেই—কলকাতায় একেবারেই ফ্ল্যাট পাওয়া যায় না আজকাল। এই ফ্ল্যাটেরই ভাড়া ছিল আগে ষাট, তারপর একশ', বীরু সোয়া শ' দিয়েই নিয়েছিল, সেলামিও দিয়েছে হাজার টাকা—নইলে আর পাবেই না।

নিপুণ হস্তে ঘর ঝেড়ে, চেয়ার-টেবিল ঝেড়ে বিনয়কে বসিয়ে চা করতে করতে এসব কথা সপ্রতিভ ভাবে বলে গেল রেণু। যাকে সদা মনে হত একটা রুদ্ধ-গতি ক্ষুব্ধ স্রোতধারার মত, অনেক স্বচ্ছন্দ নয় কি সে এখন? এইরূপই বিনয় আশা করেছিল, তা সফলও হয়েছে। বেণু তত কথা বলতে পটু নয়, একটু সংযত হয়েই বসেছে ঘরে, কথা বলছিল রেণুই।

জিজ্ঞাসা করলে বিনয়, শিশু হাসপাতাল আপনার কেমন লাগে?

চমৎকার লাগে। ছেলেপিলেগুলো কি সুন্দর? কিন্তু কেমন অদ্ভুত মানুষ আপনারা ডাক্তাররা। বিশেষত এখন কত ছেলেপিলে আসছে—আহা, না খেতে পাওয়া ছোট ছোট সব ছেলে? দেখে বুঝা যায় না মানুষ না কি। কিন্তু আপনারা ডাক্তাররা যেন চোখ খুলে দেখতেই চান না। একটু দেখে শুনে ঔষধপত্র দিলেও ওরা বাঁচত সবাই। এই একটা বাচ্চা ছেলে নিয়ে এসেছে কাল—

রেণু বলতে লাগল। বিনয় বুঝলে হাসপাতালে যা ঘটে তাই ঘটছে। এসব ক্ষেত্রে ডাক্তারদের অবহেলাও একটা বাঁধা-ধরা নিয়মে চলে, একটা মাত্রার বেশি তাও বাড়ে না। তবে এই দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ব্যাচারীদের দেখে দেখে বোধ হয় বরাবরকার ডাক্তারদের আর ধৈর্য থাকছে না। হয়ত তারা ঔষধপত্রও পায় না, বেড্‌এর সরঞ্জামও নেই, ষ্টাফও নেই,—এদিকে রোগ বেড়ে যাচ্ছে, নিজেদের বাড়িঘরের পার্শ্বেও দেখছে তারা বীজাণুর বিভীষিকা। বিনয় বুঝছে, রেণুর চোখে তাতেই মনে হয় ডাক্তাররা বড় হৃদয়হীন। বিনয় ডাক্তারদের সমর্থনে এক-আধটুকু বলে, আর রেণু অমনি বলে, না, না, শুনুন আপনি আর একটা কথা বলছি। অমনি আর একটি শিশু রোগীর কথা শুরু করলে রেণু: জানেন, কি দুষ্টু! ওই তো ছেলে! বলে, বউ, গাড়ী যাব—'ভোঁ, ভোঁ'!

অপূর্ববুদ্ধি সেসব শিশুর সংবাদ বিনয় শুনতে পেল কিছুক্ষণের মধ্যেই, রেণুর মুখে যেন তাহাদের কথা আর ফুরোয় না। বীরুর শাশুড়ী এলেন।

তিনি জেলে নীহারের দেখা পেয়েছিলেন। এক কথা নীহারদের ; 'কি করে তোমাদের দিন চলে ? মানুষ কি খায় ? বেঁচে আছে কি কেউ বাঙ্লায় ?' নীহার জানে না, ভগবানের ইচ্ছায় বীরু আজ দু'পয়সা রোজগার করে।

বীরুর শাশুড়ী বলছিলেন, দেখছই তো অবস্থা শহরের—ব্যারাম-পীড়া। বীরুকে অন্তত শেষ দিকটাতে এখানে থাকতেই হয়—পৌষ-মাঘ মাসে। ধাত্রী, ডাক্তার কে ডাকে নইলে সময় মত ?

বিনয় বুঝতে পারল। বললে, হ্যাঁ, যশোদাবাবুকে বললে তিনি তা বুঝবেন। গোল বাধায় তো প্রমোদ। তাকে যশোদাবাবুও পারেন না সামলাতে।

সামলাবে ! প্রমোদ মানুষ নাকি ? হোষ্টেলে যাবার আগে লীলা ছিল এবার এসে আমাদের বাড়ি। তার বাবা এখানে রাখতে চান- -বীরুদের কুটুম্ব ওঁরা। লীলার সঙ্গে দেখা করতে আসে প্রমোদ। লীলা আমাকে বললে, 'জেঠাইমা, আপনি ওকে বিদায় করুন। ওকে কে না চেনে ? সেই সীতাদি'র পিছনে এমনভাবে লেগেছিল সোনাপুরে। বাবা পর্যন্ত দাদাকে বলেছিলেন, শৈলেন, প্রমোদের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখিস না।' মাঝ থেকে বাবা সীতাদি'কেও ক'দিন মিছামিছি দোষী করেন।

বিনয় কুতূহলী হল—তা হলে লীলা চিনে ফেলেছে প্রমোদকে ; না, প্রমোদই পরিত্যাগ করেছে লীলাকে ? যাই হোক্, অন্তত সীতা পরাজিত হয়নি।

বেণু উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিল কি জন্য। রেণু তা বুঝলে।—ক'টা ? সাতটা পনের ? আচ্ছা দিচ্ছি—বিনয়কে রেণু বললে, শুনবেন শারদশ্রী গান—চিত্রা দে গীতশ্রীর ?

বিনয় চমকিত হল। সস্মিত মুখে বললে, নিশ্চয়। গান শুনব না ?

'চিত্রা দে'—মিত্র নয় আর। 'চিত্রা দে গীতশ্রী—শারদশ্রী'—দুইই মানায় পরস্পরে। গান শুনতে লাগল বিনয়।—শারদশ্রী, পুজো আসছে, বাঙালীর উৎসব। 'বেঁচে আছে কি কেউ বাঙ্লায় ?' জিজ্ঞাসা করেছে নাকি

নীহার সেন জেল থেকে। বেঁচে আছে না? তারা গান গায়, গান শোনে—ভোজ দেয়, হোটেলে নাচে গায়। এই তো চিত্রা দে আছে,—চিত্রা দে কেন? আছে বেণু বীরু, আছে বিনয় নিজে, আছে শৌরীন, শচীপ্রসাদ, আছে মিষ্টার সেন। দেখছে বিনয় এই বীরুর ফ্ল্যাট ; ড্রয়িং রুমের ব্যবস্থা ; রেডিয়ো ; এদের সাদর সামাজিকতা। বেঁচে আছে বৈকি বাঙালী।

গান শেষ হল। সত্যই গীতশ্রী ও শারদশ্রী দুয়েতে সুসঙ্গতি আছে। রেডিওতে খুব পরিপুষ্ট কণ্ঠে কে বললে, 'এবার আপনাদের কাছে প্রসিদ্ধ কথাশিল্পী শ্রীযুক্ত অনিল বসু তাঁর নতুন ছোট গল্প পড়বেন—'ক্ষুধা'।

'ক্ষুধা ?'—চমকিত হল বিনয়।

শুনবেন ?—আবার জিজ্ঞাসা করলে রেণু।

না। এবার উঠতে হবে।

তবু রেণু ছাড়তে চায় না। বিনয় অনেক করে বিদায় নিলে।

সব তো ডুবে যায় নি বাঙলার। মধ্যবিত্ত সমাজ অনেকটা তলিয়ে গেছে—জীবন চক্রবর্তীর মা, সেই নাম-না-জানা প্রেসের কর্মচারী, গীতাদের বাড়ি, তাদের সেই প্রতিবেশী—তারা অনেকেই আর মধ্যবিত্ত নেই। কিন্তু এই তো বীরু আছে, শৌরীন আছে, আছে প্রমোদ, ইদ্রিস মিঞা আর জাহেদুদ্দীন। বীরু সেন—এক বছর আগে তাদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা ছিল না ; নীহার তা'ই মনে করে বলে, কি করে দিন চলে তোমাদের ? না, মধ্যবিত্তের একটা অংশ আজ উচ্চতর গ্রামে আরোহণ করে যাচ্ছে—প্রমোদ, যশোদা চৌধুরী, ইদ্রিস কণ্ট্রাক্টর, বীরু—হয়ত সে নিজেও—বিনয় মজুমদার—সে, সেও—

চিত্রা দে, বেণু আর বীরুর এই স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রা, অনিল বোসের গল্প—বিনয়ের মাথায় পাক খেতে লাগল। নীহার সেনের কথা—মানুষে কি খায় ? বেঁচে আছে কি কেউ বাঙলায় ? মনে ঘুরতে লাগল।

রাত্রিতে বাড়ি ফিরে বিনয় পেল প্রমথ'র এক তার—'শিবুদা'র টাইফয়েড। শীগ্‌গির আসুন ঔষধ নিয়ে।'

২২

ঔষধপত্র ঠিক করে বিনয় খবর দিতে গেল অমিতদের, দেখা করতে হবে সুধার সঙ্গে। সুধার সঙ্গে তার সম্বন্ধ স্থির করে ফেলা দরকার। কিন্তু সুধার দেখা সে পেল না, বাইরে কোথায় সুধা গিয়েছে দু'দিনের জন্য।

আপিস থেকে বেরুতে বেরুতে বিনয় অমিতকে বললে, একটা কথা অমিদা' আমার পরিষ্কার করা দরকার—সুধার সম্পর্কে।

অমিত সহাস্যে বললে, তা হলে তা করা দরকার সুধার সঙ্গেই, না? তবে আর কাল যাচ্ছ না সোনাপুর?

যাচ্ছি। কিন্তু কথা দরকার তোমার সঙ্গেই।

অমিত হেসে বললে, তা হলে মানছ সুধার উপর এখন পর্যন্ত আমার দাবীই প্রধান।

সুধার উপর নয়, আমার উপর।

এই রে! এ যে আর এক বিপদে ফেললে। কিন্তু বুঝে নিই আগে। বলো—

আমি একটা প্রস্তাব করেছিলাম ডিসেম্বর মাসে সুধার কাছে। কাজটা আমার পক্ষে দুঃসাহসিক হয়েছিল,—সুধার নিকটে আকস্মিক। খুবই অন্যায় হত যদি মনে ঠিক না বুঝতাম—সুধাকে আমার বাগ্‌দত্তা বলে পরিচিত করলে অন্যায় করব না।

এখন অন্যায়টা বুঝতে পারছ বুঝি, বিনয়? সুবুদ্ধির উদয় হচ্ছে।

না, অন্যায় করেছি, কিন্তু মনে হয় না ভুল করেছি। যাক্। তারপর

এমন কাণ্ড ঘটল ডিসেম্বর মাসে। তোমরা পাগলের মত ছুটতে লাগলে, দেখাই পাই না, কখন কথা বলি—

আর তুমি পাগলের মত মনে করলে জাপানীদের হাতে কলকাতার রক্ষা নেই। কারণ—বলেছে তা' শৌরীন, বলেছে মুরারি সেন।

বিনয় নিজের দোষই স্বীকার করলে—ওটা আমার রেঙ্গুনের অভিজ্ঞতার ফল। কিন্তু অমিত ছাড়লে না। বললে, না, সেই 'অভিজ্ঞতা' কি তা না বোঝারই ফল। তুমি রেঙ্গুনের ঘটনাই দেখেছ,—তখনকার বর্মা, তখনকার জাপানের শক্তি, তখনকার রেঙ্গুন—এসবের সঙ্গে গত ডিসেম্বর মাসের জাপান, তার ঘাঁটির দূরত্ব, তার শক্তির দৌড়, কলকাতার অবস্থা, সব চেয়ে বড় কথা—আমাদের দায়িত্ব—এসবকে মিলিয়ে ছাখো নি। এরূপ খণ্ড ভাবে দেখাই আতঙ্কগ্রস্তের দেখা, পরাজয়বাদিতা।

বিনয় একটু চুপ করে রইল। পরিহাসপ্রিয় অমিতও শক্ত কথা শক্ত ভাবেই বলতে পারে! বিনয় পরে বললে, তুমি ঠিক বলেছ। কিন্তু সেসব চুকে গেছে। তারপরও আমি আসি যাই—অথচ সুধার সঙ্গে কথাটা পরিষ্কার করিনি—

অমিত আবার পরিহাস করে বললে, তা কি আমি পরিষ্কার করব নাকি?

বিনয়ও ছাড়ল না, বললে, ঠিক তাই, কারণ তুমি হলে বর-কর্তা।

ছল করে গম্ভীর হয়ে অমিত বললে, বেশ! তারপর?

বলো তো, সুধা কি আমার কথা ইয়ার্কি মনে করেছে? কিংবা ভাবে নি তো—আমি পালিয়ে বেড়াচ্ছি?

বলেছে নাকি সে সেকথা?

না, না—

তবে?

কিন্তু আমি তো তারপরে আর বিয়ের কোনো কথা তুলি নি তার কাছে—

এবার তুলতে চাও?

আরও আগে তুলতে চেয়েছি, কিন্তু সাহস পাই নি। তার কারণ তুমি।

আমি?

হ্যাঁ।

কথাটা বলেছিলে যে তুমিই তখন—সেই ডিসেম্বর মাসে—'একটা বৃহৎ সত্যের সামানে আমরা আজ বিনয়,'—সুধাও তোমাদের একজন,—'সময় নেই আমাদের।' তারপর থেকে অপেক্ষা করে আছি, সাহস করে জানতেও চাই না—সময় হয়েছে কিনা।

সময় যেমন নেই বিনয়, সময় তেমনি আছেও আবার। কাজের সঙ্গে মিলিয়ে যদি সহকর্মী হও, তা হলে সময় তো বরাবরই রয়েছে।

কিন্তু কাজটা কি?

যা করছ—সে আমার তোমাকে বলতে হবে না।

এই কি সুধারও মত?

তা আমি বলব কি করে? তাকে জিজ্ঞাসা করো না?

বিনয় একটু চুপ করে থেকে বললে, কিন্তু তোমাদের দলের পক্ষে আমার মতামত দরকার হয় না জানো?

দরকার হবে না? বাড়ির মেয়ে কোথায় বিয়ে হবে বাড়ির মানুষ আমরা তা জানব না? তাতে কথা বলব না?

পরিহাস-স্বচ্ছ অমিতের কণ্ঠ। কিন্তু বিনয় বুঝছে, শুধু পরিহাসও নয়। বিনয় বললে, আমি তো তোমাদের কেউ নই।

হলেই পার।

বিয়ের জন্য?

মন্দ কি? রাজা-রাজড়ারা অমন অনেক কাজ করেছেন। তবে আমি বলব, কাজের টানেই তুমি আমাদের হ'য়ো।

কাজ কি আমি করি না?

করো। সে জন্যই তো তোমার যোগ্যতা মানছি সবাই। ভয় পাই আমিও—আমার হাত থেকে তুমি সুধাকে ছিনিয়ে নিতে পার একদিন।

বাধা দিয়ে বিনয় বললে, ঠাট্টা রাখো। আমি কমিউনিষ্ট নই, কিন্তু কাজ করি—

অমিতও তৎক্ষণাৎ বললে, কাজ করো, কিন্তু কাজের মানে বোঝো না।

বিনয় একটু থামল, বললে, তা হোক,—মানুষের মানে বুঝি, ভালোবাসার মানে বুঝি, বিয়ের মানে বুঝি।

অমিত হাসল, বলল, বোঝো না যে, বিনয় এইটাই তোমার বোঝা দরকার। আমরা কমিউনিষ্টরাই ওসব বুঝতে পারি—এইটাও তোমার বোঝা দরকার। তোমরা বোঝো—বরের টাকা আছে, মেয়ের রূপ আছে, কিংবা নেই;—এসব বুঝে হিসেবে-হিসেবে মিল হল, ভালোবাসা টিকল, তথন বিয়ে করো। মানে, ফ্যালো কড়ি, মাখো তেল—এই তো এই সমাজের কথা। কড়ি দিয়ে কেনো, দড়ি দিয়ে বাঁধো—মানবতার কথা, ভালোবাসার কথা বলে লাভ কি?

বিনয় বললে, আমি সেই ব্যবস্থাকে ঘৃণা করি।

কিন্তু কি ব্যবস্থা চাও, তা জানো না। তার জন্যই জানো না—সভ্যতার সমস্ত সম্পদকে উদ্ধার করা, উন্নত করার পথ কি।

তোমরা সভ্যতাকে উদ্ধার করো? না, সংহার করো?

সংহারও করি—উদ্ধার করবার জন্যই। পৃথিবীর সব বড় বিপ্লবীর কথাই তা'ই—I come to fulfil, not to destroy.

বিনয় খানিকক্ষণ নীরব রইল—যেন তার বন্ধু ট্যানারের কথাই শুনছে সে আবার। কিন্তু অমিতের কণ্ঠে আছে সেই মাঝে-মাঝে শোনা স্থির বিশ্বাসের সুদৃঢ়তা, অকৃত্রিমতার স্বচ্ছ আবেগ, সেই আস্থা, সেই আশ্বাস—বিনয় এই তুলনায় নিজেকে অসহায় মনে করে আজ। কি উত্তর দেবে বিনয়? মনে পড়ল তার ট্যানারকে—সে এমনি একটা আশ্বাস দেখেই বুঝি কমিউনিষ্ট হচ্ছে। তাই বলে বিনয় কমিউনিষ্ট হবে কেন? কি জানে সে

কমিউনিজমের ? কি মানে তার ? সে বাঙলা দেশের সাধারণ মানুষ—সাধারণের মত চলে, সে ভাবেই চলতে চায়। ভারতবর্ষকে সে ভালোবাসে--মীর শাহেদুদ্দীনের মত। বুঝবে না এই সহজ সত্য সুধা ?

বিনয় বললে, অমিদা, এসবের উত্তর আমি জানি না। কাল সকালে যাচ্ছি সোনাপুরে। তার দেখ্‌লে—শিবুদা'র অসুখ। সুধাকে পেলাম না, তাকে তোমার বলতে হবে—দেশের দশা, কাজের বিপুলতা সব তো দেখছে—কখন সে মনে করবে তবু সময় আছে, বিনয় সেজন্য তৈরী হয়ে আছে। বিনয় কমিউনিষ্ট নয়—কমিউনিজম কি সে জানেও না—সাধারণ মানুষ, শাহেদুদ্দীনের সহকর্মী সে, তোমাদের কারুর কাজের ক্ষতি করবে না।

অমিত হেসে বললে, চমৎকার বিনয়, একেবারে বিনয়াবনত !

২৩

ষ্টেশনে নমতেই প্রথম জানালে শিবুদার অবস্থা ভালো নয়।

দেখুন গে। কিন্তু বাঁচানো চাই, নইলে পাহাড়খাড়ীতে আমাদের নাম মুছে যাবে।

নার্সিং হচ্ছে ?

সীতা ছিল এতদিন। তারও জ্বর হল, তাই ফিরিয়ে এনেছি। কেশববাবুর স্ত্রী, 'মাসীমা', এখন আছেন। কেশববাবু এদিকে সেই ভয়ে কাঠ—সরকারী চাকুরে, শিবুদা' একটা নার্কামারা স্বদেশী।

এসময়েও বিনয়ের হাসি পেল—সব বদ্‌লাচ্ছে, কিন্তু মানুষ আবার যা তা'ই থাকছেও। কেশববাবু ভাবছেন এতেই বা তাঁর চাকরি যায়।

কিন্তু শুধু শিবুদার অসুখ নয়, সমস্ত সোনাপুর যেন অসুখের কবলে। এতটা বিনয়ও কল্পনা করে নি। তৈরী হতে হতে শুনতে লাগল—দারুণ

ম্যালেরিয়া দেখা দিয়েছে জেলায়। সীতা বিছানা নিয়েছে আবার। কলেরাও তেমনি ; বসন্ত চলেছে ; শোথে বহু লোক শেষ হচ্ছে—'আমাদের ভাবীজীও তাতে শয্যাশায়ী। হাঁ, শিবুদার পরেই তাঁকে দেখতে যেতে হবে মীরপুরে। হাজার মানুষকে লঙ্গরখানায় থাইয়ে, এতদিন পরিশ্রম করে এখন ভাবীজী নিজেই একেবারে অচল। মীর সাহেবেরও তা'ই— তবে তত বেশি হয় নি। ওদিকে বুড়ী বাঈ আম্মা,—মনুর মা, হঠাৎ দুদিনের জ্বরে মরে গেলেন—

বাঈ আম্মা মরে গেলেন ? কবে ?

এই পাঁচদিন। জানাতেও পারিনি আগে—সময় ছিল না। তাঁকে মাটি দিয়ে এলাম—পার্টিশুদ্ধ গেছলাম।

সেই বাঈ আম্মা—বিনয়ের চোখে তিনি একদিন সমস্ত দেশের প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন—নেই তিনি আর। জানলেনও না কোথায় তাঁর খালেকুজ্জমান—কোন্ মুলুকের জন্য লড়াই করছে।

একটু পরে বিনয় জিজ্ঞাসা করলে, টি-এ-বি ইন্‌জেক্‌শান্ নিয়েছিলে তোমরা ? শিবুদা নিয়েছিলেন ?

তাঁর কথা বলে লাভ নেই। কলেরা হচ্ছিল ওদিকে। টি-এ-বি যা পাই পাঠাই ; সবাইকে শিবুদা নিজে ইন্‌জেক্‌শান্ দেওয়ালেন। মতি ডাক্তার বলেন, 'আপনি নিলেন না, শিবুদা ?' 'আমরা স্বদেশী, আমাদের কলেরা হবে কি ?' যেন কি মন্ত্র জানেন। ওদিকে সুধীর বোস, প্রোফেসার 'গান্ধীবাদী সত্যাগ্রহী', তিনি পড়েছিলেন টাইফয়েডে। এখন সেরে উঠছেন। ওদিকেই তিনি ছিলেন গা ঢাকা দিয়ে। শিবুদা তাঁকে করতেন নার্সিং। তারপর যা হবার হল। আগে খোঁজও দেন নি। পাঁচদিন পরে আমরা জানলাম ; বিজয়বাবু মাষ্টার খবর পাঠালেন—তখন আবার বুকেরও গোল ছিল।

বিনয় আপনাকে সম্বরণ করতে পারলে না, দিস্ ইজ্ ক্রাইম্, প্রমথ দিস্ ইজ্ ক্রাইম্। তোমরা চাও মানুষকে বাঁচাতে ?

প্রমথ চুপ করে গেল : নিন্ স্নান করুন, থাওয়া-দাওয়া করুন, আরও অনেক আছে, শুনবেন পরে।

কিন্তু বিনয় সহজে শান্ত হতে পারল না—এমনভাবে শিবুদা আত্মহত্যা করতে গেল !

ততক্ষণে সীতা উঠে বসেছে। সে ডাক্তারদার সঙ্গে যেতে চায় আবার পাহাড়খাড়ী আজই। প্রমথ মানা করছে। সীতা বলছে, ডাক্তারদা, আপনি তো আছেন, ভয় কি ? তা ছাড়া আমার টি-এ-বি নেওয়াও আছে। বিনয় বলছে, 'একটু পরে যাও, সীতা ; দুটো দিন অপেক্ষা করে যেও।' কিন্তু শিবুদার জন্য সীতা সত্যিই বড় উদ্বিগ্ন। বারে বারে তার কথা—'এমন আত্মভোলাও হয় মানুষ ? একেবারে নিজের অসুখটাও ভুলে থাকে ?' প্রমথও ক্ষুণ্ণ ও চিন্তিত, 'এমন করে শিবুদা'র নিজেকে ভুলে থাকার মানে পার্টির আসল লক্ষ্য ভুলে যাওয়া।' সীতা বিরক্ত হচ্ছে এ কথায়, 'তোমাদের ওই তর্ক ভালো লাগে না, প্রমথ। পার্টি-পার্টি করেই তো লোকটা এমন অন্য সব ভুলে রইল।' দু'জনায় তর্ক বাধল।

আবার সীতা বললে, ডাক্তারদা' যাব আমি ?

নিশ্চয়। তবে দু'দিন পরে।

বিনয় তৈরী হতে হতে রিলিফ্ ও অন্য কথা শুনতে লাগল। দুঃখের মধ্যেও হাসি পেল। যাক্ মোটের উপর যে সাহায্য কলকাতায় বিনয় উদ্যোগী হয়ে বের করতে গেছল, মিষ্টার সেন সে সাহায্য যথাস্থানেই পাঠিয়েছেন—মানে, পাঠিয়েছেন বৈকুণ্ঠবাবু সুরেশবাবুদের কাছে। মুস্লিম্ চেম্বার অব কমার্সের সাহায্য এখানকার লীগ নিলে না। হাফেজকে প্রাণপণে চেপে ধরেছিল প্রমথ : 'কিন্তু আমাদের চাপে কাবু হবার মানুষ হাফেজ নয়। সে বলে, আমাদের অনেষ্ট ওয়ার্কার কই ! জিনিসপত্র সব কাজীর দল লুটপাট করে খাবে !—লীগের নির্বাচনে এবার কাজীই হয়েছে সেক্রেটারি, হাফেজের দল হেরে গেছে। মুসলমানরা ক্ষেপে গিয়ে বলে, 'হাফেজ তো

লুঠ করেছে চোরা-কারবারে।' মুসলমানরা ব্যাপার বুঝছে; হিন্দুরা কিন্তু বুঝছে না। আমাদের রিলিফ্ কমিটির টাকা নেই, জেঁকে বসছে হিন্দু রিলিফ্ কমিটি মিষ্টার সেনের জিনিসপত্রে।

তা হলে আমাদের কোনো কাজ নেই আর?

নেই কেন? লঙ্গরখানা সব আছে। চালাচ্ছি মুসলমান মেয়েদের জন্য পর্যন্ত লঙ্গরখানা, দুগ্ধকেন্দ্র চালাচ্ছে আমিনা। সব সমিতি চালাচ্ছে আমাদের কর্মীরা। নেই আমাদের টাকা, নেই আমাদের সম্বল। কিন্তু বসন্ত ঘোষ এসেছেন জেল থেকে—আমাদের সমিতির কাজে তিনি নাম্‌তে চান—

সেই বসন্ত ঘোষ—গত আগষ্টে বিনা কারণে তাঁকে গ্রেফ্‌তার করে রাজবন্দী করা হয়। এ জিলার পুরোনো কর্মী তিনি—সুরেশ দত্তও তাঁকে ভয় করেন; তিনি কাজে নাম্‌লে সত্যি কাজ হবে। এসব লোক বাইরে থাক্‌লে আজ কত কাজ হতে পারত, বিনয় আবার ভাবলে।

বিনয় তৈরী হচ্ছিল, পাহাড়খাড়ী যেতে হবে। সীতা একটা বই এগিয়ে দিলে। প্রমথ বললে, নিন, ট্যানার আপনাকে দিয়ে গেছে।

ট্যানার! সে চলে গেছে নাকি? কোথায়?

আবার কোথায়? আসামে—কমিউনিষ্টদের ওরা রাখে দেশে?

India To-day বইএর নাম। 'To Doctor B. M. and other fellow-fighters of Indian Freedom.—D. T.' বিনয় বুঝলে, বললে, 'ভারতীয় স্বাধীনতার সংসৈনিক' সে—ওর ধারণা তাই। কিন্তু আর ক'জন গোরা সৈনিক তা মনে করে?

আর একখানা বইয়ের কথা মনে পড়ল। নিজের ছোট সেল্‌ফে খুঁজতে গেল বিনয়, সুধার দেওয়া Socialist Medicine in the Soviet Union. বইখানা কোথায়?

বিনয়কে খুঁজতে দেখে সীতা বললে, ও সে বইখানা খুঁজছেন বুঝি?

কোন্‌খানা বলো তো?—বিনয়ই বললে।

যেখানা সুধাদি'র দেওয়া।

কি করে জানলে কার দেওয়া?

লেখা রয়েছে নাম আর তারিখ। কিন্তু তারিখটার মানে কি দাদা? 'বিশে ডিসেম্বরের স্মরণে'।

বিনয় বুঝলে, সীতা সব অনুমান করেছে। ভালোই হয়েছে। বললে, আমার বিয়ের তারিখ সীতা।

ডিসেম্বরে বিয়ে?

কেন কমিউনিষ্ট পাঁজিতে দিন-ক্ষণ নিয়েও মারামারি আছে নাকি? আমি ভাবছিলাম বরক'নের গণ মিললেই হয়—গণতন্ত্রের যুগ তো। কিন্তু কাকে বিয়ে করলেন?

বসেছি, বিয়ে করেছি, এমন সময় সাইরেন বাজল। বাসরে যেতে না যেতেই সব পালাল।

কে? বর না ক'নে?

বর বলে ক'নে, ক'নে বলে বর।

তারপর?

'নৌকাডুবি'—শেষ দিকটা এখনো লেখা হয় নি।

এ বইতে তার কোনো হদিস মিলবে নাকি?

দেখি, এ পর্যন্ত পড়ি নি।

সীতা সাশ্চর্যে বললে, এখনো পড়েন নি?

বিনয় বললে, পরীক্ষা নাও।

একবার পড়ে দেখুন না, ডাক্তারদা?—বললে প্রমথ।

বিনয় বললে, এবার পড়ব—সময় যতটুকু পাই শিবুদা'র কাছে।

প্রমথ বললে, তাই করবেন। তারপরে কিন্তু অনেক কাজ।

প্রমথ গাড়ীতে যেতে যেতে বিনয়কে জানালে অনেক কথা ঃ—গ্রাম শূন্য। আমাদের কর্মীরাও পালিয়ে গেছে। বিনোদ ভৌমিককে মনে আছে? বাড়ীতে মা বাবা উপোষ; চোখে তো দেখতে পারে নি, পালিয়ে চলে গেছে আসামে। প্রকাশ খবর না দিয়ে কুমিল্লা গিয়ে ছোটখাট কণ্ট্রাক্ট করছে। ডাকিয়ে আনলাম, বললাম, কাজই যদি করবে এখানে যশোদাদের সঙ্গে করো না। সে বলে, 'এখানে আমি এসব কণ্ট্রাক্ট করলে আপনাদের নাম খারাপ হবে। দেখছেন তো বীরুর জন্য কত বেগ পেতে হয়।'—একটু থেমে প্রমথ আবার বললে,—আর-এক মুশকিল নীরদকে নিয়ে। ওর দুর্বল মস্তিষ্ক। বেগমপুরায় ছিল সে। তখন বেগমপুরার পথে পথে মানুষ মরে থাকে, গ্রামে ঘর থেকে শেয়ালে টেনে মানুষ খায়—কেমন সেসব দেখে মাথা খারাপ হয়ে গেছে নীরদের। কি বলে না-বলে ঠিক নেই।

কি বলে?—বিনয় জিজ্ঞাসা করলে।

প্রমথ বললে, আমাকে বলে 'ডাক্তারদা, জানেন, রেণুদি আমাকে ভালোবাসেন'। বীরুর শালী রেণু তাকে বিয়ে করবে—এই বলে বেড়ায় নীরদ। ওকে বাড়ি পাঠিয়ে দিলাম—শহরে শুনলে নানা কথা লোকে বলবে।

বিনয় চুপ করে রইল, দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। জানত সে রেণুর স্নেহের স্পর্শে নীরদের দুর্বল মন বিচলিত হয়েছিল। বিনয়কে সে বলেছিলও, 'রেণুকে আমি বিয়ে করব'। হয়ত নীরদ ভালো হয়ে উঠত। কিন্তু এই মন্বন্তরের বিভীষিকায় আবার তাতে বাধা পড়ল। দুর্ভাগা নীরদ! বড় প্রিয় সে বিনয়ের।—যখন সে মরতে চলেছিল, বিনয় তাকে বাঁচতে সাহায্য করেছে। এখন কি করবে বিনয় আর?

প্রমথ বললে, পার্টি মেম্বরদের পঞ্চাশ জনের খোঁজও নেই। মহীউদ্দীনকে নিয়ে এসেছি; হাসপাতালে আছে, আমাশয়, চিকিৎসা চলেছে। আর দয়ারামকে মনে আছে? এখানে সেবার গ্রামের অবস্থা জানিয়ে গেল। খবর নেই পরে আর পনের দিন। সেই মাসেও শৈলদি তাদের বাড়ি

গেছলেন—চিঁড়ে দিলে, নারকেল আনলে—'বামুনের বিধবা না খেয়ে যাবেন কি?' চা'ল, ডাল, তেলও জোগাড় করে দিলে। আর এখন শুনলাম দয়ারাম সেবার বাড়ি ফিরে গিয়ে আমাশয়ে পড়েছিল,—দু মাস ওরা ভাতের চেহারা প্রায় দেখে নি—খেয়েছে সেই শাকালু রাঙালু এসব। প্রথম মারা গেল স্ত্রী, তারপর দয়ারাম নিজে, দিন কুড়ির মধ্যে সাত জনের সে পরিবার নির্মূল হয়ে গেল—বাড়ি একেবারে খালি।

গাড়ী চলছে। বিনয় নীরবে বসে রইল। প্রমথ বললে, আর পথ নেই। সব কর্মী পড়ছে এখন জ্বরে—এই তো সীতাকে দেখলেন। মাঠে দেখছেন তো—এবারে সোনা ঢেলে দিয়েছে যেন আমাদের জমিতে। কিন্তু কাটবে কে?

বিজয় চক্রবর্তীর বাড়িতে শিবুদা'র এখন স্থান। অসুখ গুরুতর বুঝে বিজয়বাবু বাজারের ভাঙাঘর থেকে তাকে নিয়ে আসেন নিজের বাড়ি।

টুনির মা, কেশববাবুর স্ত্রী তখন বসে ছিলেন; বিনয় ও বিজয়বাবুকে দেখে তিনি ঘোমটা একটু টেনে দূরে সরে গিয়ে দাঁড়ালেন।

বিনয় প্রথম একবার দাঁড়িয়ে দেখলে রোগীকে—এই শিবুদা? বিনয়ের সমস্ত মন কেঁপে উঠল। এই শিবুদা? এই—এই—

ঔষধপত্র দেখল, জ্বরের ওঠানামা দেখল, রোগীর বিবরণের খাতা দেখল—তা লিখেছে কখনো সীতা, কখনো বিজয়বাবুর মেয়ে, কখনো বিজয়বাবু নিজে, কখনো বা তার কোনো ছাত্র শিবুদা'র প্রিয় অনুচর।

টুনির মা এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন ঘোমটার আড়াল থেকেই, কেমন দেখলেন?

বিনয় বললে, মন্দ নয়, তবে এ অসুখে কিছু বলা যায় না।

তিনি তবু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। প্রতিবেশিনী হলেও এর আগে কোনো দিন বিনয়ের সঙ্গে তিনি কথা বলেন নি—বিনয়ের জন্য

খাবার তৈরী করেছেন, অন্তরাল থেকে তার খোঁজ-খবর নিয়েছেন। কিন্তু আজ তিনি শিবুর জন্য নিজের ব্যাকুলতা আর গোপন করতে পারলেন না। বিনয়ই নিজ থেকে বললে, আপনি যান এবার। ওঁরা বাসায় অসুবিধায় আছেন, কে রাঁধে, কে দেখে ?

যাব ?

হাঁ, এ অসুখে সময় তো নেবেই। জোর করে আমাদের কিছু করবার সাধ্যও নেই।

টুনির মা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চুপ করে রইলেন। কিন্তু তিনি সোনাপুর ফিরে গেলেন না, বললেন, সীতা আসুক, আমরা একজন থাকব।

সত্যই করবার কিছু নেই। বিনয় তবু বসে রইল। দেখছে, শুনছে। আজ শিবুদা প্রলাপ বকছেন না বিশেষ। সামান্য দু'একবার কথা বলেন। যেমন—কখনো দলের কোনো কথা, কিংবা চা'লের ও খাদ্যের সম্পর্কে। এসব ছাড়া তাঁর মাথায় আর কি আছে ? আর এইসব সম্বন্ধেই দু'চার জনের নাম বলেন মাঝে-মাঝে—ওঁদের সহকর্মীদের নাম, প্রমথর কিংবা মজিদের, সীতার বা মাসীমা'র। মাঝে মাঝে নাম বলছেন অন্যান্য আত্মীয়া গৃহিণীদের—যাঁরা পরম স্নেহে ওঁকে আপনার করে নিতেন।

সমস্ত রাত বিনয় দেখলে, বলতে গেলে একটি মুহূর্তের জন্য সে তার চক্ষু সরিয়ে নেয় নি। প্রত্যেকটি সামান্যতম কথাও কান পেতে শুনেছে। যে শিবুদা'কে গাইতে শুনলে সে আগে পরম কৌতুক বোধ করত, এবার তারই একটা গান রাত্রিতে বার বার কান পেতে শুনলো—'চলো চলো অনশন বন্দী, ক্রীতদাস।' ওই এক লাইনেই চোখে জল এল বিনয়ের। কিন্তু কোনো দৃঢ় ধারণা সে রোগের অবস্থা সম্বন্ধে করতে পারলে না। শিবুদা'র মাথা পরিষ্কার হয় নি, তার পাকশক্তি সম্বন্ধেও বিনয় সুনিশ্চয় হতে পারছে না, এদিকে দুর্বল হচ্ছে রোগী। উপায় নেই—জোর চলবে না। রোগের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

বিনয় তাই লক্ষ্য করতে লাগল বসে বসে। বসে বসে পড়তে লাগল কখনো নিজের ঘরে—কখনো গল্প করতে লাগল বিজয়বাবুর সঙ্গে,—দু'শ' ছেলের মধ্যে ইস্কুলে পঞ্চাশটিও ছাত্র আজ নেই, মাষ্টারও নেই—বিজয়বাবু তবু চালাচ্ছেন ইস্কুল।

এল সীতা।

বিনয় একটু আশ্বস্ত হল। সীতা রোগীকে সেবা করতে জানে, বোঝা গেল। তা ছাড়া, সত্যি শিবুদা'কে সীতা বরাবরই খুব আত্মীয় মনে করে—তাকে ক্ষেপানোই ছিল সীতার একটা বড় কৌতুক। বিনয়ের মনেরও একটু জড়তা ভাঙল সেই সীতা এসে যাওয়ায়। কথা কওয়ার লোক পাওয়া গেল। শুনল বিনয় কত কথা—সীতাদের কাজের কথাও। আর শিবুদা'র জন্য তারা দু'জনেই সমভাবে ভাবতে লাগল।

বিজয়বাবু নিয়ে গেলেন বিনয়কে এক বাড়িতে—রোগী দেখাবেন।

বিনয় চিনতে পারল না প্রথম। রুগ্ন, ভগ্নস্বাস্থ্য, বিছানায় গা এলিয়ে বসা একটি সামান্য মানুষ। পরে কণ্ঠস্বরে বুঝলে সুধীর বোস।

নিজেই সুধীর বোস বললেন, আমিই মিথ্যা করে ডাকিয়ে পাঠিয়েছি আপনাকে—রোগী দেখতে নয়, রোগীর কথা শুনতে। কেমন আছে শিবু?

শিবু তাঁর ছাত্র—প্রিয় ছাত্র। একসঙ্গে এক সময়ে তাঁরা কংগ্রেসের আন্দোলনে জেলে গিয়েছেন। তারপর তিনি গেলেন ওয়ার্ধা, আর শিবু হল নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে শেষে কমিউনিষ্ট। তবু কেউ তাঁরা কাউকে ছাড়েন নি।

বিনয় শিবুদা'র অবস্থা বললে। সুধীর বোস চুপ করে রইলেন অনেকক্ষণ। পরে বললেন, জানেন কি সে আমাকে নার্স করতে আসত?

হাঁ, শুনেছি।

কি মনে হয় আপনার? এখান থেকেই তো রোগে ধরেছে তাকে?

অত সহজে তা বলা যায় না। কতভাবেই তো আসতে পারে।

ম্লান হাসি হেসে সুধীরবাবু বললেন, তাঁতে আমার সান্ত্বনা নেই। সে না বাঁচলে আমাকে দারুণ ভাবে সে শাস্তি দিয়ে যাবে। অন্যায় করবে আমার উপর। আমি তার পার্টির কেউ নই, দল হিসাবে তারা আমার অস্পৃশ্য। তবু সে গোপনে গোপনে আমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখত। তার পার্টি তা জানলে তাকে কঠিন শাস্তি পেতে হত। এখনো পেতে হবে—বাঁচলে। কিন্তু সে না বাঁচলে আমাকে আরও কঠিন শাস্তি পেতে হবে। আমি কমিউনিষ্ট নই—

আমিও নই,—বললে বিনয়।

আপনিও নন?—তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বিনয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন সুধীরবাবু। তারপর চোখ বুজে রইলেন। একটু পরে যেন কিসের বিরুদ্ধে তিনি তর্ক করছেন, তেমনিভাবে বলতে লাগলেন, না, আমি কমিউনিষ্ট নই, কমিউনিষ্ট হব না—ভারতবর্ষ আমার দেশ, তার সভ্যতা, তার সাধনা, তার আদর্শ, এই আমার আদর্শ। না, কিছুতেই এর থেকে বিচ্যুতি আমি সহ্য করব না। কিন্তু সে না বাঁচলে—কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে আমি দাঁড়াব কি করে? না, তাদের বিরুদ্ধে আমাকে দাঁড়াতে হবে—দাঁড়াতে হবে—দাঁড়াতে হবে—

সুধীরবাবু বারে বারে বলতে লাগলেন, যেন বায়ুগ্রস্ত লোক, তাদের বিরুদ্ধে আমাদের দাঁড়াতে হবে, দাঁড়াতে হবে—

কিন্তু শিবুদা বাঁচলও না। আরও জটিলতা দেখা দিল। আঠার দিনের দিন সংজ্ঞা ফিরে এল; একবার ছোট শিশুর মত সে বললে, মাসীমা, আমি বাঁচব তো?—টুনির মা ও সীতা তখন শয্যাপার্শ্বে, তাদের চিনতে পেরে হাসল। নাম ধরে ডাকলও সীতাকে সস্নেহ কণ্ঠে। তারপর সকালে বিনয় এল। ডাক্তারদা,—ক্ষীণস্বরে শিবুদা বললে, আমি কাজ করতে পারব?—

বিনয় উৎসাহ দিয়ে বললে, নইলে আপনাকে ছাড়ছে কে?

একটু উৎফুল্ল হল যেন সে। মনে হল একটু ক্ষীণ হাসি তার ওষ্ঠাধরে। প্রমথকে, একবার মজিদকেও, খুঁজল। তারপর আবার ডাকল সীতাকে, মাসীমাকে ; কি বলতে চাইল সীতাকে। সীতা শাসন করে বললে, 'চুপ'। ক্ষীণ হাস্যে শিবুদা চুপ করলে, কথা বললে না। আর কথা বলতে পারলেও না—সে রাত্রিতে তার হৃদ্‌যন্ত্র বন্ধ হয়ে পড়ল।

২৪

বিনয়ের সঙ্গেই ফিরে এসেছিল সীতা আর মাসীমা—কেশববাবুর স্ত্রী। সেই থেকে তিনি কাঁদছেন। সীতা মাসীমার কাছে গিয়ে বসে প্রায়ই ; যথাসম্ভব স্বাভাবিক ভাবে তাঁকে নানা কথা বলে।

বিনয় কিন্তু বুঝেছিল, সীতাও আর সে সীতা নেই। তার সেই বালিকার মত স্বচ্ছন্দ কথাবার্তা, চলাফেরা সব যেন শিবুদা'র অসুখে স্তম্ভিত হয়ে গেছল। আরও স্তব্ধ হল শিবুদার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে। অবশ্য সে হাসে এখনো, কিন্তু সে হাসি একটু বিষণ্ণ। সে কথা বলে তেমনি, কিন্তু তা আর অজস্র নয়, ঝর্ণার মত নয়। এই আঘাতে সীতার অন্য এক রূপও বিনয় দেখতে পেল—সীতার সঙ্গে নূতন আত্মীয়তা অনুভব করলে বিনয় আবার এই মুহূর্তে।

আশ্চর্য! সুধাকে সে এত নিকটে পেতে চায় ; অথচ সীতাকেও তো দূর মনে হয় না আজও বিনয়ের। না, হয়ত এই সমস্যার মীমাংসা বিনয় করতে পারবে না। কারণ, সত্যি সীতার এই নূতন রূপও তো কত নিকট বলে ঠেকছে বিনয়ের চোখে। সে আর সীতা, এরা দু'জনাই শিবুদাকে বুঝেছিল, চিনেছিল—তেমন ভাবে তার বন্ধুরাও তাকে বোঝে নি। তারা দেখত তাকে দলের মানুষ হিসাবে। আর এরা—যারা দলের নয়—বিনয়, সীতা, মাসীমা—এরাই দেখছে শিবুদা'কে শিবুদা বলে।

এই কথাই বিনয় বলছিল, একটা কথা দেখছ, সীতা,—এই মাসীমা কত ভালোবাসতেন শিবুদা'কে ?

সীতা হাসল। বলল, তা আর আশ্চর্য কি, ডাক্তারদা? ভালো শিবুদা'কে কে না বাসত ?

না, সে ভালোবাসা নয়। তাকে ওরা বুঝত কি কেউ ?

সীতা উত্তর দিলে না। অন্যদিকে তাকিয়ে রইল।

তুমি, আমি, মাসীমা,—আমরা ওদের পার্টির কেউ নই—আমরাই বরং জানি শিবুদা' কি ছিলেন।

সীতা তবু উত্তর দিলে না। মাথা নিচু করলে। বিনয় ততক্ষণ বলছে, আমরা ওকে বুঝেছিলাম, কারণ তাকে ভালোবেসেছিলামও আমরাই। ভালোবাসিনি—কি বলো সীতা ? কথা বলছ না যে, তুমি ?

সীতা মুখ তুলল। এবার তার চোখে জল টলটল করছে। বিনয় থমকে গেল—একি !

কি বলব ?—সীতা উত্তর দিলে। কিন্তু ঠিক উত্তর নয়। এ যেন সেই নির্ভরশীলা বালিকা সীতার বিনয়ের কাছে নিবেদন। একটি দুর্বল বালিকা, দুটি সজল চোখ তুলে তার কাছে যেন বন্ধুত্বে, সহমর্মিতায়, বেদনায় নির্ভর করবার মত আশ্রয় প্রত্যাশা করছে। বিনয় অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল, বললে, না ; বলছিলাম—মানে, ওকে ভালো একভাবে বাসত সবাই—কিন্তু বুঝেছে কি ওরা কেউ ?

সীতা বললে, সে কথা মিথ্যা নয়, ডাক্তারদা। নিজেকেও তিনি নিজে বুঝতে চাননি—এমন মানুষ।

এই কথাই আমিও বলছিলাম সীতা,—নিজেই নিজেকে বুঝতে চাননি—সোৎসাহে বললে বিনয়।

সীতা বলল, এত ক্ষেপাতাম ওঁকে—সহজ মানুষ, সরল মানুষ, জানতাম ওঁর বুদ্ধি কম। নিজেও বুঝতেন না কেন আমার কাছেই ওঁর

এত গল্প, আমাকেই বোঝাতে হবে ওঁর সব কথা, আমার খোঁজ করতে হবে ওঁর এত।

বিনয় চমকিত হল—এক নতুন আবিষ্কারের সামনে নাকি সে? তা বুঝবার জন্যই বললে, তুমি বুঝতে সীতা?

আমার তো না বুঝে উপায় ছিল না। বুঝতেন না এক শিবুদা, কিন্তু বুঝতেন নিশ্চয়ই আপনারাও।

বিনয় এক নূতন আবিষ্কারের সামনে এসে গেল নাকি? সীতার চোখে জল, মুখে একি কথা! সোনাপুরের মানুষদেরই বিনয় মনে করেছিল অন্ধ, শিবুদা'কে চেনে না। কিন্তু বিনয়ই কি কম অন্ধ—চিনেছিল সে এই সীতাকে?

বিনয় বললে, বুঝব না কেন? জানতাম শিবুদা'কে তুমি ভালোবাসতে, সীতা। বাসতে না?

বাসতাম না?—সহজ কণ্ঠ ফিরে আসছে সীতার। পরিহাসের কণ্ঠ নয়, সহজ অকৃত্রিম বন্ধুত্বের কণ্ঠ।—বাসতাম না? তাঁকে, আপনাকে না পেলে এখানে আমি কার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতাম?

সেই নির্ভরশীলা বালিকার সহজ কণ্ঠের কথা,—নারীর একান্ত ভালো-বাসার কথা তো এ নয়। এমনি ভালোবাসাই সীতা বাসত তবে শিবুদা'কে, বাসে বিনয়কেও—প্রমথকেও। ভালোবাসার একটা সহজ রূপ যেন বিনয় দেখতে পেল, বিশ্বস্ত অগ্রজ সে সীতার চক্ষে। জীবনে সীতা অগ্রজ লাভ করেনি, তাই সমস্ত প্রাণ দিয়ে চেয়েছে তেমনিতর স্নেহের আশ্রয়। পেয়েছিল সে শিবুদা'কে, পেয়েছে বিনয়কে, প্রমথকে।

এই কথাই বিনয় বারেবারে বুঝেও এতদিন বুঝতে পারেনি। বুঝতে চায়ও নি। কিন্তু একেবারেই কি বুঝতে পারেনি বিনয়?

বিনয় সোনাপুর থাকবে না, থাকতে চায় না। শিবুদা'র মৃত্যুতে তার সোনাপুরের উপরও যেন আকর্ষণ কমে গেছল। অন্যদিকে তার মন এবার স্থিরও হয়ে আসছিল। পাহাড়খাড়ীর গ্রামে বসে সে এবার পড়ল সুধার দেওয়া বই, ট্যানারের দেওয়া গ্রন্থখানা। বিনয়ের জীবনের অভিজ্ঞতাই যেন পাতার পর পাতা থেকে তার সাম্‌নে কথা কয়ে উঠল।

চারশ' বৎসর ধরে চিকিৎসা-বিদ্যা হয়েছে চিকিৎসা-ব্যবসা। রোগী দাম দেয়, ডাক্তার মতামত লেখে; রোগী পয়সা ফেলে, ঔষধ কেনে। এমনি ভাবেই হয়েছিল তারপর ঔষধের কারবার—কারখানাই ক্রমে বড় হয়ে উঠল। মালিকেরা পয়সা দেয়, ডাক্তাররা ঔষধের ফরমুলা জোগায়; মালিকেরা টাকা ফেলে, নতুন ফরমুলা নষ্ট করে ফেলে ডাক্তাররা। ডাক্তারখানা ঔষধ রাখে, ডাক্তাররা সেই ঔষধই ব্যবস্থা করে। ন্যাশনাল মেডিসিন থেকে বিনয়ই পাঠায় স্যাম্প্‌ল, পাঠায় ডায়েরি, দেয় ডাক্তারদের নানা প্রীতি-উপহার, কমিশন। এমনি বেড়ে উঠেছে ব্যবসাদারী চিকিৎসা—টাকা-সর্বস্ব সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে। এই কথাই বিনয় বুঝতে চায়নি; বুঝল এবার। তেমনি সাগ্রহে সে পড়ল—এদিকে নূতন আরোগ্য প্রণালীও আবার গড়ে উঠছে। তাতে পয়সা দিয়ে ডাক্তারের সাহায্য না কিনলেও চলে; চিকিৎসার থেকেও রোগ না জন্মাতে দেওয়াই তার প্রধান কথা; স্বাস্থ্যসদন সেই মতে সমস্ত সরকারের হবে দায়িত্ব; আর সত্যই মানুষ জীবন-যাত্রার ঠিক মত পরিকল্পনা করলে স্বাস্থ্যপূর্ণ জীবন মনুষ্যও গড়ে তুলতে পারে। পৃথিবীর একটা বৃহৎ ভূমিখণ্ডে চিকিৎসা বিদ্যার এমনি ভাবে পুনর্জন্ম হচ্ছে।

বিনয়ের চারদিককার জগৎ যেন কেমন নতুন অর্থ গ্রহণ করতে লাগল। মনে পড়ল বিনয়ের বীরুর দাদাকে—ঔষধের দোকানের চক্রান্তে তিনি বিনয়ের হাতেই মরলেন সেবার; সীতার ম্যালেরিয়া—প্রভাত চৌধুরীর অসুখ—কেশববাবুর পীড়া—ঔষধের অভাবে ও বাজে ঔষধে দেড় বছর ধরে সোনাপুরে এই সত্যই তার চোখের সামনে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে।

মহামারীর ভূমিকা তৈরী হয়েছে তখনি, এখন তা আরও যেন সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে দিনের পর দিন।

ভাবীজীকে দেখ্‌তে গিয়ে একথাই বিনয়ের নিকট আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল।

মীরপুরে গেছল বিনয়—ভাবীজীকে দেখতে। শ্রীহীন মীরপুর; যা দেখে গেছল তাও যেন নেই। তবু এ গ্রামে শাহেদুদ্দীন ছিলেন। মীরপুরের মীরবংশ গরিমা হারায় নি, এতদিনকার স্বদেশী ঐতিহ্য নিয়ে' এবার তাদের বংশধর শাহেদুদ্দীন এ গ্রামকে আগলাতে চেষ্টা করছেন। আর প্রথম থেকে সেসব চেষ্টা হওয়াতে চরম দুর্দশা এ গাঁয়ের হয় নি। তবু কোথায় সেই মীরপুর?

প্রথমেই বিনয় দেখতে গেল ভাবীজীকে। বিনয়ের কাছে পর্দা করতেন না তিনি। তারপর শহরে গিয়ে সম্মেলনে আরও একটু পর্দা কমল। এবার মীরপুরের লঙ্গরখানা চালাতে গিয়ে পর্দা একেবারে চুকিয়ে দেন—মীরপুরের মীর বংশের জেনানা, এই দুদিনের মধ্যে কিন্তু পর্দাও তিনি ছাড়লেন—লঙ্গরখানা চালাতে হবে যে।

বিনয় ভাবীজীকে দেখে চমকে উঠল। তিনি উঠে বসেছেন—শোথ এসেছে, হাত-পা ফোলা তখনো, হাঁপাচ্ছেন। বিনয়কে দেখে তবু সহাস্যে বললেন—বেঁচে আছি, ভাই সাহেব। কিন্তু একা এলেন যে। আমার সে বোন কোথায়?

বিনয়ও বললে, আনি নি, নইলে পাছে ঈর্ষায় মরে যান—আপনার থেকেও সুন্দরী কেউ আছে।

এর থেকেও সুন্দরী? দেখছেন কেমন চেহারা ফিরে গেছে?

শাহেদ সহাস্যে বললেন, একেবারে রসে টস্ টস্ করছেন, ভাই, দেখে আবার লোভ হয়—

এখনো পরিহাস কমে নি শাহেদ সাহেবের। অথচ এবার তিনি একেবারে ভগ্ন, জীর্ণ। তাঁর চোখের প্রখরতা যেন নিস্তেজ হচ্ছে, শুধু চোখের হাসি

ঘুচতে চায় না। বিনয় তাঁর জন্য ঔষধপত্র নিয়ে এসেছিল, আরও আবশ্যকীয় ঔষধ নিয়ে এসেছিল গ্রামের জন্য, মীর সাহেবকে দেবে। শাহেদ সাহেব দেখলেন; তিনি মৃদু হেসে নিলেন সেসব। পরে বল্‌লেন, ডাক্তার কেন আর এসব ঔষধ? গরীবদের আর সান্ত্বনা দেবার দরকার নেই।

বিনয় জিজ্ঞাসু-নেত্রে তাকাল। মীর সাহেব বললেন, যে যুগে কুইনাইন তেতো হয় না, আমরা সে মধুর যুগে জন্মেছি; লবণও আজ তেমন লোনা নয়—চিনিও অবশ্য তেমন মিষ্টি নয়।

বিনয় একটু পরে বল্‌লে, কি হবে বলুন? ঔষধ একটা ব্যবসা; রোগও ডাক্তারদের একটা ব্যবসা—মুদ্দোফরাসের ব্যবসা মড়া পোড়ানো; মানুষের জীবনই আজ একটা ব্যবসায়ের জিনিস।

শাহেদ বললেন, ওহে ডাক্তার এযে গভীর তত্ত্বে পৌঁছলে—সংসারটাই ব্যবসাদারী—

না, না, আমি তত্ত্ব-টত্ব বুঝি না। যা দেখছি, তাতে বুঝেছি—সত্যকার ডাক্তারি এ সমাজে করা যায় না। করা যায় ডাক্তারি ব্যবসা, তাও খুব বড় হলে। নইলে করতে হয়, দাবাইখানার দালালি, ঔষধের কারখানার দালালি, আর ঔষধের ব্যবসাদারী—যা করছি আমি।—বলে বিনয় জানালে তার ঔষধের কথা। শাহেদ সাহেব শুনে একটু যেন লজ্জিত হলেন, আমি কিন্তু এসব জানতাম না।

বিষণ্ণ আজ শাহেদুদ্দীন, কিন্তু তবু অনমনীয়। হয়ত ভাঙ্‌বে, কিন্তু মচ্‌কাবে না।

কাজী এসেছিল—মীর সাহেবকে শহরে নিয়ে যাবে, তাঁকেই লীগের প্রেসিডেণ্ট করবে—লীগ এবার তাদের হাতে এসেছে। তর্ক সে করতে লাগল। সেই খেলাফতের দিন থেকে সে মীর সাহেবের সঙ্গী ছিল। জোরও সে করতে পারে—কেন আসবেন না আপনি লীগে? মুসলমানের নিজের জিনিস লীগ।

শাহেদুদ্দীন হাসেন, বলেন, মুসলমানকে ভালোবাসি বলেই আসব না। আমরা কংগ্রেসে না থাকলে কে কংগ্রেসকে বোঝাবে—মুসলমান কি চায় ?

কংগ্রেস বুঝবে সে কথা ?

বোঝাতে জানলে বুঝবে।

এখনো বিশ্বাস করেন এ কথা ?

বিশ্বাস করবার কারণ আছে—কংগ্রেস স্বাধীনতা চায়।

আমরা চাই না ?

বোঝাতে পেরেছ সে কথা দেশের লোককে ? সেই কথাটাই পরিষ্কার করে তোলো। লোকে যেন মনে না করে তোমরা তোমাদের পাকিস্থান চাও সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে।

আমাদের প্রস্তাব দেখুন লাহোরের।

দেখেছি। কিন্তু কাজও দেখাও এখন।

কি ভাবে, বলুন ?

কেন ? এই তো আমাদের মুসলমানের দেশ বাঙ্‌লা, চোখের উপর তা মরছে। বাঁচাও তাকে। ছাখো, কংগ্রেস নেই ; আজ তোমাদের উপর এই দেশকে বাঁচাবার দায়িত্ব। তোমরা যদি এবার দেশকে বাঁচাও, কাজের মধ্য দিয়েই দেশের লোকের মনকে তোমরা দখল করে নিতে পারবে। এত বড় সুযোগ লীগের সামনে—আর সে পরীক্ষায় তোমরা কি করছ ?

কাজী চুপ করে রইল। পরে বললে, কংগ্রেসই বা কি করছে ?

শাহেদুদ্দীন হাসলেন, পরকে দোষ দিলেই কি নিজের দোষ কাটবে ? মনে রেখো, কংগ্রেসের ঐতিহ্য আছে—বড় ঐতিহ্য। ঝড়ে, বাদলে, বন্যায়, অনাবৃষ্টিতে, দুর্ভিক্ষে ভূমিকম্পে সে দেশের সেবা করেছে। বার বার সে গবর্ণমেণ্টের মার মাথা পেতে নিয়েছে,—এভাবে তৈরী হয়েছে তার ঐতিহ্য।

আজ কংগ্রেস জেলে—কিন্তু তোমরা আছ বাইরে। দেশ কংগ্রেসকে সহজেই ক্ষমা করবে, কিন্তু লীগকে ক্ষমা করবে কেন—এখন যদি তোমরা ফেল মারো?

কাজী চুপ করে রইল। শাহেদুদ্দীন বললেন, লীগের ঐতিহ্য গড়ো ভাই। কংগ্রেসের ঐতিহ্য আছে দেশ সেবার। তোমার ঐতিহ্যও তত বড়ই হতে পারে—যদি এবেলা কাজে লাগো।

· হিন্দুরা কংগ্রেস ছেড়েছে, সব এখন হিন্দুসভা। আপনি আসুন, সে ঐতিহ্য আমরাও গড়ব।

মুসলমানও তাই বেইমানি করবে? না, আমি রইলাম—তোমার ঐতিহ্যের সাক্ষী যেন দিতে পারি আমার কংগ্রেসের কাছে—দিন যখন আসবে। আমি মুস্‌লিম কংগ্রেস্‌ম্যান্—

সেই শীর্ণ মুখে সেই হাসি—স্নিগ্ধ ও দৃঢ়। কিন্তু দীর্ঘনিঃশ্বাসও পড়ল. কিন্তু সাক্ষী দোব হয়ত শেষ পর্যন্ত শুধু মরা মানুষের।—বিনয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন আবার মীর শাহেদুদ্দীন।

বিনয়কে দেখাতে নিয়ে গেলেন শাহেদুদ্দীন তার মরা মানুষের গ্রাম মীরপুর। এতদিনকার গ্রাম, হাট-বাজার—সব যেন ছন্নছাড়া। হাটে তেমন দোকান আসেনি। বাজারের কয়েকটা ঝাপ আর খোলা হয় না—দোকানী নেই। জেলেপাড়া খালি হয়ে গেছে। যোগীরা অনেকেই বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছে—মনসাতলা খালি পড়ে। না খেয়ে মরে নি কেউ, বললেন শাহেদ, মরেছে অখাদ্য খেয়ে।

এ গ্রামের একটা হিসাব নিয়েছে প্রমথরা—কে ছিল, কে আছে, কার কি আছে আর নেই, কে জমি বেচেছে, কাকে, কতটা। শাহেদুদ্দীন বললেন, সবাই বেচেছে, খাবে কি নইলে? ইস্‌লাম ব্যাপারী এবার বর্ষায় এক মণ চা'ল ধার দিয়েছে এককানি জমির বদলে। ফসল শুদ্ধ জমিও অনেকে বিক্রী করে দিয়েছে। এখনো বিক্রী করছে; পাকা ফসল ক্ষেতে, তাও দেরী করতে পারছে না।

বিনয়ও এ দৃশ্য দেখেছে। পাহাড়খাড়ীতে ইস্কুল ঘরের ওপারে সাব্ রেজিষ্টারের অফিস। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কাজ চলত—মাস খানেক আগে নাকি রাত্রি একটা পর্যন্ত চলত। জমি বিক্রী হচ্ছে, রেহান হচ্ছে, তার রেজিষ্ট্রি হচ্ছে। বিনয় সেই লোকজনদের সঙ্গে কথাও বলেছে। ঘরে আর কিছু নেই? ঘটী বাটি? হাল বলদ?—সোয়াশ', দেড়শ', এক-একটা গরুর দাম, কে সামলাতে পারে এ লোভ? গরু বিক্রী হয়ে গেছে, মড়কেও শেষ হয়েছে।

শহরে ফিরেও শুনেছিল মজিদের মুখে এসব কথা। ক'দিন হল বীরু এসেছিল তার গ্রামে। বাড়ির চারদিককার জমি সে কিনে নিয়েছে। তাছাড়া প্রায় একশ' একর জমি সে কিনেছে শহরের কাছেই। বলে, 'জমিটা যাচ্ছিল নকুল সাহাদের হাতে। অথচ এ জমিতে বাঁধ বেঁধে, গত বৎসর চাষের যোগ্য করিয়েছি আমি।' মজিদের সঙ্গে কথা হতে বীরু বলেছে, 'কৃষকরা ফসল করেছে, নেবে। আমাকে আমার ফসলের আধভাগ দিয়ে দিলেই হল।' মজিদ তাই বলে, বীরু সেনও আধভাগ চায় ফসলের! শেষটা অবশ্য এবারকার মত ছ'আনাতেই রাজী হয়েছে।

বীরুর সঙ্গে বিনয়ের দেখা হয় নি, কিন্তু দেখা হওয়া দরকার ছিল। এ সময়ে বীরু কিছু করছে না তাঁর দেশবাসীকে বাঁচাতে, বন্ধুদের বাঁচাতে?

মজিদের মুখে শুনল, তার মাথায় বড় বড় স্কিম। সায়েন্টিফিক্ ফার্মিং করবে এ জমিতে, তাই জমি কিনছে। কৃষকদেরও শেয়ার থাকবে যেমন যে কাজ করে। ট্র্যাক্টর চলবে, রীতিমত 'কলখোজ'—কেবল তার মালিক বীরু সেন, অবশ্য যতদিন সোভিয়েট না হয়!—মজিদ ব্যঙ্গভরে হাসতে থাকে, এর চেয়ে আমার শ্বশুর ইদ্রিস কণ্ট্রাক্টার ভালো। অত কলখোজ টোজের খোঁজ জানেন না। বলেন, 'সবেরই তো আমার মেয়ে জামাই মালিকানা পাবে—আর জামাইতো তোদের কৃষক সভার সেক্রেটারী। জানিস, ইচ্ছা করলেই লাট সভার মেম্বার হতে পারবে?'

আমিনার সঙ্গে মজিদের জীবনযাত্রার পথে আজ ইদ্রিস্ আর তাই বাধা দেয় না—আমিনার জীবন স্বচ্ছন্দ, কর্মক্ষম।

শাহেদুদ্দীন গল্প করতে করতে বলেন, মুসলমান ঘরের মেয়ে—বাহাদুর বলতে হবে ওকে আর মজিদকে। পঁচিশ বছর আগে আমরা পারি নি, আজ ভাবছি—বাধা ছিল কোথায় ?

ফিরবার পথে বিনয় আসছিল গল্প করেতে করতে। কৃষক সভার সুজা মিঞা তার সঙ্গী। শহরের কাছে পথের পার্শ্বে একটা পুলের উপর বসে কারা গল্প করছে—দুটো বিড়ি জ্বলছে তাদের মুখে—এ-আর-পি'র লোক বলে মনে হচ্ছে পরিচ্ছদে। সুজা মিঞা এগিয়ে গেল: কে ও গণি নাকি ?

হুঁ। সুজা মিঞা ?

সুজা মিঞা সেদিকে গেল। বিনয় বুঝলে সে বিড়ি খেতে চায়, বিনয়ের সামনে খাবে না। বিনয় একটু এগিয়ে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। শুনতে পেল তাদের কথাবার্তা।

সুজা মিঞা ইতস্তত করছিল হয়ত, গণি মিঞাই বললে, ওঁর সামনে খেতে বাধা নেই। সমস্ত রাত এক সঙ্গে জাগি, আমরাও খাই। উনিও এখন বিড়ি খান!

কার কণ্ঠ বিনয় শুনতে পেল—পরিচিত কণ্ঠ: বিড়িও খাব না ? ক্ষুধা তা হলে মানবে কেন ? দ্যাখো না, সূর্য আর অস্ত যায় না। সেই কখন থেকে ক্ষিদে পেয়েছে; কিন্তু রাত্রি না হলে খেতে পাব না।

আপনার মনে যেন সে মানুষ বলে চলল, ক্ষিদে, কেন পাস ? কেন পাস তুই, ক্ষিদে ? বুঝছিস না—সূর্য ডোবে নি, রাত হয় নি। ভাত জুটবে না তোর দুবেলা—কেন পাস ক্ষিদে, কেন পাস ?

মার্জিত তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর। এ স্বর বিনয়ের পরিচিত। কিন্তু কার তা বিনয় আর মনে করতে পারছে না।

একটু পরে সুজা মিঞা ফিরে এল। বিনয় জিজ্ঞাসা করলে, কে কে ওখানে বসে কথা বলছে ?

সেই গণি মিঞা আর মাষ্টার সাহেব এ-আর-পি'র।

মাষ্টার সাহেব !

এক মুহূর্তে বিনয় দাঁড়িয়ে পড়ল—তাই কি? নিশ্চয় সেই কণ্ঠস্বরই তো শুনেছে বিনয় ! প্রভাত চৌধুরী ! বিনয় জানে—জ্বলন্ত অঙ্গারের মত তার মনীষা ! এ-আর-পি'র এই মাঠের পার্শ্বে বসে বিড়ি টানছেন তিনি—সুজা মিঞা গণি মিঞার সঙ্গে, আর বলছেন, ক্ষিদে, কেন পাস, কেন পাস ? এখনো সূর্য ডোবে নি যে।

গভীর বেদনায় বিনয়ের মন ভরে' উঠল। পনের বছরের ইস্কুল মাষ্টার—বাংলা দেশের এক চিন্তাশীল রত্ন যে—সেই প্রভাত চৌধুরী ! বিধাতা, এ দেশকে তুমি কোথায় নিয়ে চললে ! মৃত্যুই তো তার একমাত্র দণ্ড নয়—সে যে অন্ধ হয়ে যেতে চলেছে। ইস্কুলে কলেজে ফৌজ এল আগেই; করোনেশান ইস্কুল যাচ্ছে, সীতাদের ইস্কুল আর বসে নি, পাহাড়খাড়ীর ইস্কুল প্রায় নেই, মফিজ মিঞার পাঠশালা বন্ধ হয়ে গেছে, চলে না। মাধব পণ্ডিত খেতে গেছলেন সোনাকান্দির লঙ্গরখানায়। সিভিক্ গার্ডরা তা চালায়। তারা সরকারী নিয়মে সুশৃঙ্খল করে মানুষকে বেত হাতে—পণ্ডিতের মাথা ফেটে গেছে বেতের আঘাতে।

আর এই শহরের উপকণ্ঠে প্রভাত চৌধুরী বলছেন, ক্ষিদে, কেন পাস ? কেন পাস, ক্ষিদে ?

সুজা মিঞা বললে, মাষ্টার সাহেবের মাথা ঠিক নেই এখন। তাই গণি বললে চোখ ইসারা করে। ওঁর স্ত্রী মরে গেছেন—প্রায় খেতে না পেয়ে।

বিনয় আর শুনতে চায় না। না শোনাই ভালো—তাতেই শান্তি। মানুষকে সে বাঁচাতে চায়। কিন্তু পৃথিবীর একি পরিহাস—বাঙ্‌লা দেশের

শিক্ষা-দীক্ষা সংস্কৃতি মনীষা—যা বাঙালীর প্রিয়, বাঙালী যা নিয়ে গর্ব করে, বাঙালীর ভরসা—বাঙালী শিক্ষক, বাঙালী ছাত্র, বাঙালী মনীষী, বাঙালী বুদ্ধিজীবী—তাদের একটা জেনারেশান্ নিঃশব্দে মুছে যাচ্ছে দেশ থেকে—দেখছে না তা কেউ? এই দুর্ভাগ্যের তাড়নায় প্রভাত চৌধুরীর মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে—যেমন গেছে নীরদের, যেমন যাচ্ছে আরও কত জনের—হয়ত যাবে তোমারও বিনয়—তোমারও।

সমস্ত দেশ যে উন্মাদাগার—
টাকার নেশায় উন্মাদ সবে—

বেরিয়ে এল এ সময়ে গভর্ণমেণ্টের প্রস্তাব—যা ইস্পাহানী চান, যা গোয়েঙ্কা-নোপানি চান, সমস্ত চেম্বার অব কমার্স চায়, তাই হয়েছে। শ্যামাপ্রসাদবাবু আর সুরাহাবর্দী সাহেবরা এ বিষয়ে বরাবর একমত—গভর্ণমেণ্ট পারতে চা'ল কিনবে না, ব্যবসায়ীদের "ব্যবসায়ের স্বাধীনতা" বজায় থাক্‌বে।

বিনয় ক্ষেপে গেল তা শুনে: তাতো গত বছরও ছিল, তারই তো ফল এই ত্রিশ লক্ষের মৃত্যুদণ্ড।

সুরেশবাবু বললেন, ফ্রি ট্রেড্ ঠিক জিনিস নয় ত কি?

দেখলাম এক বছর ধরে। আবার কেন? পৃথিবীর কোনো জায়গায় স্বাভাবিক অবস্থা নেই—যুদ্ধই তো অস্বাভাবিক ব্যাপার। কোনো ব্যবসায়ে স্বাভাবিক স্বাধীনতা নেই, লোহায় নেই, কয়লায় নেই, কাগজে নেই, কাপড়ে নেই,—চলায় নেই, ফেরায় নেই, আলোতে নেই, আকাশে নেই—শুধু চা'লের ব্যাপারে খাটবে এই স্বাধীনতা?

সুরেশবাবু বললেন, তেমন অবস্থা হলে তো সরকার থেকে চা'ল কিনতেই হবে। রেশানিং নয় তখন করবে—ছোট বড় গঞ্জে শহরে।

ততক্ষণে আরও পঞ্চাশ লক্ষ মৃতদেহের হাড়ে সার হোক বাঙ্‌লার ক্ষেতে।

সত্যই বেগমপুরার হাটে, শহরের বাজারে, এদিকে সেদিকে পুনরাবির্ভূত হচ্ছে এবার ভাদ্র-আশ্বিনের আউশ—যা উড়ে গেছল একদিনে বাজার থেকে।

বিনয় ধৈর্য রাখতে পারে না আর। জিজ্ঞাসা করে মুকুন্দ পালকে, মুকুন্দবাবু, এ আউশ এল কোথা থেকে?

কোথায়? ওঃ! দু'একজন গৃহস্থরা রেখেছিল—নিজেদের জন্য রেখেছিল,—এখন বিক্রী করে দিচ্ছে, আমনের দিন আসছে কিনা সামনে।

আউশ শুভ্র হাস্যে আবির্ভূত হল—

বিনয় বৃথা অপেক্ষা করলে—শুনবে নেতাদের কণ্ঠে বা কাগজের পৃষ্ঠায় এবার ভাদ্রের সেই ষড়যন্ত্রের বিক্ষোভ—লক্ষ লক্ষ বাঙালী এই আউশ না পেয়ে মরেছে। কিন্তু শুনল—নেতারা 'স্বাভাবিক বাণিজ্য পথের' নামতা পড়ছেন।

শুভ্র হাস্যে আউশ লক্ষ লক্ষ মানুষের কঙ্কালকে ব্যঙ্গ করতে লাগল।

২৫

টেলিগ্রাম পেয়ে বিনয় এসেছিল কলকাতায়। নেমেই জিজ্ঞাসা করলে শচীপ্রসাদকে, টি-এ-বি ইন্‌জেকশান্ দেওয়া হয়েছিল?

হাঁ।

কোথাকার এম্‌পুল?—আমাদের? 'এনেম্'?

শচীপ্রসাদ উত্তর দিলে না। অন্য দিকে তাকিয়ে রইল।

বিনয় আর কিছু বললে না। বিনয় জানে, শচীপ্রসাদ তার কন্যা ইরাকে খুব ভালোবাসে—ভয়ানক ভালোবাসে।

শয্যাপার্শ্বে হেনা উপবিষ্ট। উষাও থাকে প্রায় সমস্তক্ষণ। নার্স রয়েছে,

দুজন ইউরোপীয় নার্স থাকে ;—শচীপ্রসাদ টাকার পরোয়া করে না। ইরাকে সে ভালোবাসে। 'শী মাষ্ট হ্যাভ্ বেষ্ট্ নার্সিং। বেষ্ট মেডিকেল্ এড্।' পেট্রল-ভরা মোটর দাঁড়ানো থাকে, দরকার হলেই ছুটবে। 'বেষ্ট' ঔষধওয়ালাদের বলা আছে—'বেষ্ট্' মেডিসিন্ যা চাই, যেখান থেকে হোক জোগাড় করবে, টাকার প্রশ্ন নেই। শচীপ্রসাদের ভালোবাসা যেন দুহাতে টাকা খরচ করে বোঝাতে চায়—সে ইরাকে ভালোবাসে। কলিকাতার ধনিক মহলের অর্ধেক লোক জানে—মিষ্টার এস, পি, চৌধুরীর মেয়ে ইরার টাইফয়েড। টেলিফোনের কাছে বিশেষ লোক রাখা হয়েছে, জবাব দেবার জন্য। অজস্র লোকে, কারখানায়, ডালহৌসি স্কোয়ারে, চেম্বারের মিটিংএ, মিষ্টার সেনের ব্যাংকে শচীপ্রসাদকে জিজ্ঞাসা করে, 'কেমন আছে আপনার মেয়ে?' 'ডাক্তাররাই জানে', উত্তর দেয় মিষ্টার চৌধুরী। প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ সেসব ডাক্তার। নাম করতে করতে মিষ্টার এস, পি, চৌধুরী এক-এক সময় রীতিমত বিশ্বাস করে—সত্যই ইরা ভাগ্যবতী। পরে আবার থমকে যায়—ইরা তার বড় 'পয়া' মেয়ে। শচীপ্রসাদের সৌভাগ্য ইরার সঙ্গে সঙ্গে।

অশ্রুমুখী হেনা বিনয়কে বলতে বলতে ভেঙে পড়ে, আমি কেন মরতে ওকে নিয়ে যেতাম ওসব দুগ্ধকেন্দ্রে আর লঙ্গরখানায়?

কিন্তু তখন তো অসুখ হয় নি।

তখনই ধরে থাকবে।

বিনয় বলে, তা কি বলা যায়?

শচীপ্রসাদ যেন হেনাকেই সান্ত্বনা দিতে চায় : তাতে আর কি? ওর টি-এ-বি ইনজেক্‌শান নেওয়া হয়েছিল।

কিন্তু মাঝে মাঝে শচীপ্রসাদ নিজেই যেন বিনয়ের কাছে সান্ত্বনা খোঁজে : জানো, "এনেম" এম্‌পুলই বেষ্ট। আমি তোমাকে দেখাতে পারি গবর্ণমেণ্ট কেমিষ্টের ওপিনিয়ন। হয়ত আমরাই সেবার ঠিক কেমিক্যালস পাই নি—সব যুদ্ধে যাচ্ছে। কিছু কি রাখ্‌লে এরা দেশে—

বিনয় সংক্ষেপে বলে, তা হবে

দুবার দুদিন পরে সুধা এসে দেখে গেল ইরাকে। কোথা থেকে সে খবর পেয়েছে—উষার থেকে হয়ত।

কিন্তু ইরা, ইরা, বিনয়ের অত আদরের ইরা—সেই বর্মার ইরাবতীর তীরে যার জন্ম—বড় আদরে সেদিন বিনয়ই তার নাম রেখেছিল ইরা। তার মামার কারখানার ঔষধের শক্তিহীনতার জন্য সত্যই তাকে' দিতে হবে তার অমন প্রাণ বলি? অমন শুভ্র প্রাণ, নিষ্পাপ প্রাণ, নির্মাল্যের মত সুন্দর প্রাণ? বিনয় যেন বহু বহু আবেগের চাপা-পড়া ঝড়ের বেগে একেবারে ফেটে পড়তে চায় ক্ষণে-ক্ষণে। আবার সাম্‌লে উঠে,—না, না, ডাক্তার সে। ইরা তো নয়, এ যে একটা প্রাণ—বিরুদ্ধ বীজাণুর সঙ্গে সংগ্রামে ব্যাপৃত। বিরুদ্ধ বীজাণু রয়েছে ওর দেহের কোষে কোষে, নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে, ঘরে-বাতাসে। এসেছে তারা বাতাস থেকে, সহস্র জীবনকে নিঃশেষ করে নির্মম তেজে। এসেছে তারা মৃত্যুর বাহনরূপে শিকারের খোঁজে; আর এসেছে তারা মুনাফার মৃগয়ান্তের শেষ দানরূপে মহামারীর বাহিনী। এসেছে মহানগরীর পথ থেকে তার প্রাসাদে ···

কি ভাবছে বিনয় উন্মাদের মত? বিনয় বেরিয়ে গেল ঘর থেকে—হেনা কোথায়? সেও কি বুঝেছে ইরার প্রাণশক্তি ক্রমশ পরাজয়ের দিকে এলিয়ে পড়ছে?

শচীপ্রসাদ তার নিজের ষ্টাডিতে ঝুঁকে পড়েছে। টেবিলের উপর তার মাথা নুয়ে পড়েছে কোন অদৃশ্য দেবতার উদ্দেশ্যে। ইরা তার সৌভাগ্যের প্রতীক—তার সমস্ত শুভের মূল। তার টেবিলের উপরে—মাথার সামনে নটরাজ-মূর্তি। এই ছোট মূর্তি ছিল সেই টেবিলের শোভা এতদিন—তার কালচারবোধের প্রমাণ। এখন?

বিনয় বাধা দিল না, চলে এল।

হেনা তার ছোট কামরায় নারায়ণ পটের সামনে নতজানু হয়ে বসেছে,

বল্‌ছে, ঠাকুর, দয়া করো, দয়া করো।—বিনয়কে দেখেই দু'চক্ষু প্লাবিত করে তার অশ্রু বইতে লাগ্‌ল।

বিনয় নীরবে বসে রইল তার পার্শ্বে।

কোথায় মানুষ, কোথায় দেবতা? দু'হাতে আমরা মৃত্যুর খড়্গ শান দিচ্ছি, বলি সংগ্রহ করছি,—দয়া নেই, মায়া নেই, লজ্জা নেই, ঘৃণা নেই; ভাবি না মানুষের প্রাণ কত বড় অমূল্য সম্পদ, ভাবি না কত বড় ঐশ্বর্য জীবন। শুধু খুঁজি ধন, লাভ, মুনাফা,—আরও মুনাফা, আরও মুনাফা। দুহাতে মুনাফার শিকার জোগাড় করি, লোভের বলি কুড়োই। তারপর একদিন যখন রক্তের গন্ধ নাকে আসে, যখন মৃত্যুর দানব রক্তমুখ নিয়ে আমাদেরই দিকে তার রক্তাক্ত হাত বাড়িয়ে দেয়, তখন বলি, 'ঠাকুর রক্ষা করো, রক্ষা করো! তুমি দয়াময়, রক্ষা করো।' তখন মনে থাকে না—মৃত্যু মহানগরীর পথ থেকে আসবে প্রাসাদেও, মনে থাকে না মন্বন্তর তার বলি নেয় নিরন্নদের থেকে, কিন্তু মহামারী বলি নেয় অন্নপতিদের ঘর থেকেও, তখন মনে থাকে না—এ আমার, এ তোমার পাপ।

হেনা অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলছিল, জানো দাদা, এ আমার পাপ। ...

আরও দিন দশ বিনয় রইল কলকাতায়। তারপর হেনাকে বললে, আমার ইচ্ছা আমি ডাক্তারদের সঙ্গে যাই, একটু ঘুরে আসি দু'একটা জেলা। এখানে ঊষা রইল, সুধা রইল, খবর দিয়ো দরকার হলে; ফিরবই।

শচীপ্রসাদ যেন বজ্রদগ্ধ বনস্পতির মত স্থির হয়ে আছে।

জানো, ইরা ছিল আমার সৌভাগ্য। দেখবে এবার সব গোলমাল হবে। শুরু হয়েছে—নইলে ও আমাদের ছেড়ে যাবে কেন? আমার পাপেই চলে গেল।

কি বলো, শচীদা? তুমি এমন বাজে কথা বলো? কাজ করবে মানুষের মত।

শচীদা সান্ত্বনা পায় যেন—সান্ত্বনাই সে চায় বিনয়ের থেকে। একটু স্থির হয়ে জিজ্ঞাসা করে, এখন যাবে কোন্ দিকে বিনয়?

প্রথম তো যাব মেদিনীপুরে—পরে হয়ত ঢাকায়—আরও অন্যত্র।

শচীপ্রসাদ অত্যন্ত ভীতভাবে বাধ-বাধ স্বরে বললে, 'ঔষধপত্র তো বলেছিই; যদি টাকা চাই তোমাদের, তা হলে—লিখবে তো?

বিনয় সুধার সঙ্গে দেখা করলে। তার মন বড় ভারাক্রান্ত; আপনার কথা সে বলতে পারে না আজ।

পাহাড়খাড়ীতেই সুধার চিঠি পেয়েছিল বিনয়। সুধা লিখেছিল:

একদিন খুব আকস্মিক ভাবে দাবী করেছিলে। দাবী করার মত শক্তি তোমার নিজের মধ্যে পেয়েছিলে, তাই তো দাবী করতে পেরেছিলে। সে শক্তি এল কোথা থেকে? বলা ও না-বলা অনেক মুহূর্তের জানাশোনা থেকে, অনিবার্য সত্যের মত আগে থেকেই তা তোমার মনে তুমি অনুভব করে থাকবে। নইলে তুমিই কি অমন ভাবে দাবী করতে পারতে? না আমিই পারতাম তা স্বীকার করতে—এক মুহূর্তে? কারণ, আমিও তো শুধু তোমার দাবীকে স্বীকার করিনি, আমার নিজের দায়িত্বকেও স্বীকার করতে হয়েছে। সে দায়িত্ব কি, তা বলছি।

আমি কাজ চাই—আর কত কাজ আজ। তুমি অমিদা'কে জানিয়েছ, কাজের পথে তুমি বাধা হবে না। তোমার কথায় আমার সম্পূর্ণ আস্থা আছে। জানি, তুমিও কাজের পৃথিবীর মানুষ। কাজ করো খুব, ভালো কাজ করো। কিন্তু তুমি কাজ চেনো না। কিছু চিনতে হলে জানতে হয় তার পটভূমি। যে কাজের পুরো মানে আমরা জানি না, সে কাজ হয় হবে

নেশা, নয় বোঝা। আমার কথা বুঝছ ? আমার কাজকে হয় তোমার মন দিয়ে বুঝে নিতে হবে, নইলে তার সঙ্গে মনে মনে তোমার যুঝে মরতে হবে। আমার দায়িত্বটা এখানে। তুমি শুধু কাজের পথে বাধা না হলেই আমার দায়িত্ব ফুরোয় না। তুমি যেন মনে মনে আমার কাজকে বুঝে তা তোমার-আমার কাজ বলে স্বীকার করে নিতে পার।

কথাটা কি এখন আমার মনে পড়ল ?

না। সেই ডিসেম্বরের সকালেই নিজের মনে আমি বুঝেছিলাম—তুমি তা করবে। কেন ? তুমি কাজের মানুষ। কাজের পুরো মানেও তুমি বুঝতে চাইবে, আর ক্রমেই তুমি তা বুঝে উঠবেও। আমি অপেক্ষা করে আছি। তোমার নিজের মধ্যে যেদিন এই বোধ দেখবে সেদিন তুমি আবার অমনি ভাবেই তা সজোরে ঘোষণা করবে—আমার সেদিনও আবার বলবার কিছু থাকবে না—স্বীকার করে নিতে হবে তোমাকে—এবং আমাকেও।

সেদিন কবে ? তুমিই তা বলবে।

বিনয় সোনাপুরে এ পত্র পেয়ে তখন অনেক ভেবেছে। সুধা কি চায় ? সুধা কি চায়, বিনয় জীবনকে দেখবে তার মতো চোখ দিয়ে ? হয়ত বিনয় আজ জীবনকে সত্যই আগেকার চোখ দিয়ে আর দেখে না। অনেক পরিবর্তিত হয়েছে তার দৃষ্টি। পৃথিবীর কি মূর্তি না দেখছে আজ বিনয়। এই বাঙলা দেশে সে কি না দেখছে—দেখছে মানুষ-মারা ব্যবসা, দেখছে ঔষধ নিয়ে মৃত্যু-রচনা। কিন্তু তবু সে কমিউনিষ্ট নয়। সে শাহেদুদ্দীনের বন্ধু। কোনো দলের তাঁবেদারী করতে বিনয় পারবে না, করবে না—কিছুতেই না।

বিনয় সুধাকে জানিয়েছিল সোনাপুরে ফিরে শাহেদুদ্দীনকে দেখে এসে :

সুধা, আমি সাধারণ মানুষ। এ দেশের মানুষ, এ দেশকে চাই, মানুষকে চাই।

কাজ আমি বুঝতে চাই, বুঝবও। কাজের দাবীকে আমি সত্যই এত বড় বলে বুঝি যে, আমি কোনো দলের দাবী আমার উপরে মানতে পারি না। কাজের দাবীকে তত বড় বলে বুঝি বলেই তো বলতে পারি, কাজের পথে আমি বাধা হব না—তোমার না, কারুর না। এই কথা পালন আমার দায়িত্ব।

কবে থেকে তুমি আমার এ দায়িত্ব, আর আমার দায়িত্ব তোমারও বলে গ্রহণ করবে? সেদিনের অপেক্ষায় আছি।

চিঠি এসেছিল তারও পরে। সুধা লিখেছে, বিনয়ও উত্তর দিয়েছে। কিন্তু কাজ ফেলে বিনয় তবু যেতে পারে নি—মহামারীতে মানুষ হাজারে হাজারে মরছে, ঠিকাদারের হাতে পণ্য হয়ে উঠছে নারীদেহ। যে কোনো মূল্যে মানুষ বাঁচতে চায়। আর তাই মরছে মানুষ, মরছে তার সভ্যতাও। সুধাকে সে জানিয়েছে এ সব কথা—ব্যাধি ছেয়েছে দেশকে, ব্যাধি ছেয়েছে সমাজের মন।

ইরার অসুখের তার পেয়ে এমনি সময়ে বিনয় কলকাতা চলল। হয়ত সে আর ফিরবে না শীঘ্র। শুনে সীতা সেই নির্ভরশীলা বালিকার মত বলেছিল, শিবুদা' নেই, আপনিও চললেন ডাক্তারদা'। কার দিকে যে এবার এখানে দরকার হলে তাকাব জানি না।

সীতা ভালোবাসে তাকে, বাসত শিবুদা'কে। বিনয়ের কাছে সে ভালোবাসার অর্থ এখন পরিষ্কার। বিনয় বললে একটু দ্বিধার সঙ্গে, প্রমথ রইল, সীতা।

সীতা তাকিয়ে রইল তার মুখের দিকে, বললে, তা জানি।

বিনয় একটু ইতস্তত করে বললে, কিন্তু প্রমথ তো তোমাকে ভালোবাসে—

হাঁ।—সীতা অপ্রতিভ হল না। আত্মসচেতন মেয়ের মত স্থিরভাবে বললে, তবে সে তা বলবে না।

আর তুমিও ভালোবাস তাকে—

হাঁ। কিন্তু আপনাকে ছাড়া আর কাউকে আমিও তা বলতাম না।

সীতা, মনে কিছু করো না, বাধা কি? তুমি ত নিজে শিবুদা’কেও বিয়ে করতে পারতে না?

সীতা তবু অপ্রতিভ হল না। যেন এই প্রশ্নের সঙ্গেও সে পরিচিত। সে উত্তর দিলে, কিন্তু অন্যকেই কি বিয়ে করতে পারতাম?

কেন? শিবুদা’ কষ্ট পাবেন ভেবে?

হ্যাঁ। আর নিজেই বা আমি সুখী হতাম কি করে?

কিন্তু এখন বাধা কি সীতা? আজ তো শিবুদা’ নেই, সে সমস্যা নেই—

বাধা নেই, ডাক্তার দা?—একই সময় এই উত্তরে ছিল যেন সীতার জিজ্ঞাসা, আর প্রত্যাশা। সে বললে, বাধা কি শিবুদা’ নাকি? বেঁচে থাক্‌লেও তিনি বাধা হতেন না, না থেকেও তিনি বাধা নন।

বাধা তবে কে?

সীতা হেসে বললে, আপনি সুধাদি’কে নয় জিজ্ঞাসা করবেন, কি বাধা?

কি বাধা সীতা? প্রমথ কমিউনিষ্ট আর তুমি কমিউনিষ্ট নও, এই?

সীতা হেসে ফেল্‌ল, এটা বাধা না কি?

বাধা নয় কেন?

আমি কমিউনিষ্ট হতে পারি না?

হতে পার?

কেন পারব না? কাজ করছি, ওরা আপত্তি করবে কেন?

তোমার আপত্তি হবে না?

কি আপত্তি?

আপত্তি—আপত্তি—আমরা কি এ দেশকে নিজের দেশ মনে করি না

কেন করব না? আমাদের দেশ নইলে কোথায়?

কিন্তু কমিউনিষ্টদের যে দেশ নেই—তারা আন্তর্জাতিক।

তাই যদি হয় তাতেই বা কি? আমার বাবা সংস্কৃত শ্লোক আওড়াতেন—

মাতা মে পার্ব্বতীদেবী, পিতা দেবো মহেশ্বরঃ।
বান্ধবা শিবভক্তাশ্চ স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্॥

'পিতা আমার মহেশ্বর, মাতা পার্বতী, পৃথিবীর সকলে ভাই, দেশ ত্রিভুবন।' অথচ লবণ আইনের নামে সেবারও তিনি জেল খেটে এলেন—এ দেশ যে তাঁরও।

তা হলে তোমার বাধা কি, সীতা?

বাধা নেই? বাধা—প্রমথর দায়িত্ব, আমার দায়িত্ব।

সে আবার কি, সীতা?

প্রমথ ভাবে—তার কাজ অনেক, সোনাপুরের দায়িত্ব তার কাঁধে। এটাই তার দেমাক—মানে, তার দুর্বলতা।

আর, তুমি? তোমার দুর্বলতা নেই?

সীতা হেসে বললে, আছে বৈকি? প্রমথকে জানাতে হবে—ওটা তার দেমাক, মানে দুর্বলতা।

কি করে জানাবে তা?

সে দেখবে, সীতা মানুষটা ছোট নয়, কাজের পথে কারো পিছনে পড়ে থাকবার মত মানুষ নয়।

কি করে দেখবে তা, প্রমথ?

চোখ আছে দেখবে, মন আছে বুঝবে, তারপরে বুদ্ধি আছে মানবে।

আর তুমি?

আমি? জিজ্ঞাসা করবেন সুধাদি'কে?

কেন তুমি বলো না।

দেখছি, বুঝছি, মানছি—

বিনয় দেখল সীতার মুখে সেই বালিকার সকৌতুক হাসি আর নেই, দায়িত্বশীল মেয়ের দৃঢ়তা—সে সম্পূর্ণ সচেতন, আবার সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরা।

বিনয়ও ঠিক করে ফেলেছিল তখন—সুধাকেও মান্‌তে হবে বিনয় মানুষটা দলের মানুষ নয়, কিন্তু দলের কারো থেকে ছোটও সে নয় কাজে। বুঝতে হবে সুধারও—দেমাক্ মানে দুর্বলতা।

অমিত ও সুধার সঙ্গে দেখা করতে এসে কিন্তু এখন বিনয় সে সব আর বল্‌তে পারল না। ইন্নুর মৃত্যু তাকে এ সব থেকে দূরে নিয়ে গেছে। সে বললে, কাজের পথে পা বাড়িয়েছিলাম প্রথম না-বুঝে সোনাকান্দি আর চাঁপাডাঙ্গায়। বেরিয়েছি যখন, তখন থাম্‌তে চাই না। দেশকে নিজের করতে চাই, চিন্‌তে চাই, বুঝতে চাই—

এখনো বুঝতে পারছ না নাকি, বিনয়?

বুঝতে পারি কই সুধা, বাঙলা দেশকে? মাদ্রাজী আর পাঞ্জাবী, ভাটিয়া আর মারোয়াড়ী যখন বলে, 'মানুষ শুকিয়ে শুকিয়ে মরে বাঙলায়—যে বাংলায় মেয়েরা পিস্তল হাতে মরতে জানে; বাংলা কি মূর্দার দেশ হল?' তখন ভাবি কি হল সে বাঙলার?

অমিত বললে, যারা পিস্তল হাতে মরে তাদেরই ঐতিহ্য আমাদের, বিনয়। মনে পড়ে শিবুদা'কে? কেমন করে মরল সে? দেখেছ বাঙ্গী আম্মাকে—কোনো আই-সি-এস তাঁর সামনে দাঁড়াতে পারেনি। শুনেছ দয়ারামের কথা—কর্মীদের খাইয়েছে, নিজে মরেছে সবংশে—মরবার শিক্ষা কি আমরা পাই নি?

কিন্তু সান্ত্বনা কই তাতে?

সান্ত্বনা, সন্তুষ্টি—ওসব চাই না। সচেতন আছি—আমরা ভুল করি নি, হার মানব না।

তবে পঞ্চাশ লাখ লোক মরছে কেন?

আমাদের কার্যপদ্ধতি ঠিক ; কিন্তু আমাদের একার কর্মশক্তি কতটুকু ?

কিন্তু মানুষকে বাঁচাতে পারলে কই ?

পারতাম, যদি কংগ্রেস নেতারা বাইরে থাকতেন।

তাতে কি হত ? তাঁরা তোমাদের গ্রহণ করতেন নাকি ?

না, আমাদের গ্রহণ করতেন না। কিন্তু আমাদের প্রোগ্রাম গ্রহণ করতেন—চোরা-কারবারীর আর চোরা কর্মচারীর এই মৃত্যুর ব্যবসা বন্ধ করতেন।

কিরূপে ?

হাজার হলেও দেশের মানুষকে তাঁরা মরতে দিতেন না ব'লে। না, বিনয়, গান্ধীজী, আজাদ বা জওহরলাল এমন মন্ত্রীমারা পাপচক্রে ডুবিয়ে দিতেন না দেশকে। এই চক্র থেকে দেশকে বের করবার পথ করতে পারতেন তাঁরাই—তেমন শক্তি, সাহস, দেশপ্রীতি তাঁদেরই আছে।

বিনয় ধীরে ধীরে বললে, তুমি এত বড় বলে মনে কর কংগ্রেসকে ?

অমিত হেসে বললে, করব না ? সেই প্রথম দিন থেকে আমি কংগ্রেসের সভ্য। কলেজের খাতায় নাম কাটিয়ে কংগ্রেসের খাতায় নাম লিখিয়েছিলাম আমরা—এত ছিল আমাদের তেজ। এক দিনও তো তার সভ্য-পদ ছাড়িনি।

কিন্তু তোমরা তো কমিউনিষ্ট ?

অমিত হাসল, বললে, বিনয়, আমরা এ দেশের বিপ্লববাদের সন্তান, সনস্ এণ্ড ডটারস্ অব্ ইণ্ডিয়ান্ রিভোল্যুশন। দেয়ালে দেয়ালে চল্লিশ বছর মাথা ঠুকেছি ; কিন্তু মাথা ঠুকে ঠুকে পথও বের করে নিয়েছি। মাথা থেকে রক্ত ঝরে পড়েছে বারবার—কিন্তু তবু বিপ্লবী প্রেরণাকে অস্বীকার করিনি। এ মাটির সেই প্রেরণারই পরিণতি আমরা। বিপ্লবী ঐতিহ্য তো মিথ্যা হয় নি, তাই আমরা আজ কমিউনিষ্ট—শ্রেষ্ঠ পরিচয় একালের বিপ্লবীর।

বিনয় অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, তবু কেন দেশের শিক্ষিত লোক এত বিরোধী তোমাদের অমিদা' ?

অমিত ম্লান হাস্যে বললে—কারণ, বিনয়, আমরা জাত খুইয়েছি।

বিনয় তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

অমিত বললে, আমরা 'ভদ্রলোক' নই, 'স্বদেশী' নই—কমিউনিষ্ট। ভদ্র শ্রেণী ত্যাগ করেছি ; ছোটলোকের শ্রেণীকের আপনার করছি ; ভদ্র-লোকেরা আমাদের এ স্পর্ধা সইবে কেন ?

বিনয়ের এক মুহূর্তে মনে পড়ে গেল এই কথার ভিতরকার বেদনাটুকু। এক দিন ঠিক এই কথাই তাকে বলেছিলেন শাহেদুদ্দীন—সেই প্রথম পরিচয়ের দিনে—'মুসলমান আমাকে চায় না, কারণ, আমি জাত খুইয়েছি—আমি কংগ্রেসম্যান্।' সেদিনকার শাহেদুদ্দীনের মুখ বিনয়ের চিরদিন মনে আছে—ঈষৎ হাসিতে ভরা, কিন্তু বেদনায় বিদ্ধ। আজ বিনয় অমিতের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল—তেমনি হাসি আছে, তেমনি বেদনা আছে, কিন্তু আছে স্থির গর্বের চিহ্নও।

বিনয়ের মনে আজ আর সংশয়, ক্ষোভ বা দর্প নেই। শিবুদা'র মৃত্যু তাকে বিচলিত করেছিল, ইরার মৃত্যু তাকে যেন আরও নতুন করে গড়ছে। সে বুঝতে চায় দেশকে, বুঝতে চায় নিজেকে, বুঝতে চায় এদেরও। বিনয় অনেকক্ষণ চুপ করে রইল, পরে বললে, তোমাদের সব কথা বুঝতে পারি না এখনো। কিন্তু বুঝতে হবে এর মানে। হয়ত বুঝব—না, বুঝব না, কি মনে হয়, সুধা ?

সুধা উত্তর দিলে, মানুষের এত বড় দুর্ভাগ্যের সঙ্গে তুমি দিন-রাত্রি মুখোমুখি কাটাচ্ছ, বিনয়, আর তাতেও সত্য হয়ে উঠবে না তুমি ?

সত্য ? সত্যই কি এরা চায়, সত্য হতে চায় নিজেরাও ?

বিনয় মনে মনে বললে, আমি তাই যেন হই,—সত্য হই,—সুধা।

তিন মাস পরে বিনয় কলকাতায় ফিরল।

সকালে বসে-বসে শচীপ্রসাদ স্কিমটা বিনয়কে বোঝালে। গবর্ণমেণ্টের সে অনুমতি নিয়েছে—ন্যাশানাল মেডিসিন কোং শেয়ারওয়ালা লিমিটেড কোম্পানি হতে পারে।

বিনয় শুনছে, বুঝছে সেই শচীপ্রসাদ আবার আশ্বস্ত হয়ে উঠছে,—কর্মিষ্ঠ পুরুষ যে কারখানা গড়তে পারে, গড়ে আনন্দ পায়। ইরার শোকে আর সে আত্মসংশয়ী নয়।

বিনয় শুনে বললে, এমনি কিছু করতে হবে যেন মুনাফার লোভে কোম্পানি না চলে।

শচীপ্রসাদ হেসে বললে, সে সব আমি জানি না। তুমি দেখো এখন। এদিকে কয়লা নেই—আমাদের লোহার ও বাল্‌বের কারখানাও অচল হয়ে পড়ছে। সব নিজে বুঝে-শুঝে নাও—মনে রেখো, বিজনেস আর রিলিফ এক কথা নয়। কিন্তু তুমি বীরু সেনের কথা লিখেছিলে। সে আসবে দুপুরে—দুদিন ধরে তোমাকেই খুঁজছে সে। তাকে কিন্তু পাওয়া যাবে মনে হয় না। সে অন্য বড় বিজ্‌নেসে হাত দিয়েছে,—ব্যাঙ্ক আছে, মোটর তৈরীর কথা ভাবে। এখানে একটা মাঝারি গোছের কারখানা কিনে ফেলেছে। খুব কাজের লোক কিন্তু।

আহা বীরু! বিনয়ের মনে পড়ল, বীরু কিছু দিন আগে বেণুকে হারিয়েছে। সে সংবাদ বিনয় পেয়েছিল মাঘ মাসে মেদিনীপুর শহরে ফিরে—ইডেন হাসপাতালে প্রসবকালে বেণু মারা গিয়েছে। বীরু অনেক অনুতাপ আর করে লিখেছিল, সত্যই যখন সে বেণুকে ভালোবেসে উঠছে এমনি সময়ে বেণু রইল না। আর রেণুদি'র যে কি অবস্থা বুঝতেই পারছেন—এ সব লিখেছিল বীরু। বিনয় সান্ত্বনা জানিয়েছে, খুব কৌশলে আভাসও দিয়েছে—সংসারধর্মে

বীরুর যদি আবার আগ্রহ থাকে তাহলে এবার সে নিজের প্রতি সুবিচার করবার সত্যই অবকাশ পাবে। রেণুদি' রয়েছে ;—তাকে বীরুর মনে রাখতে হবে। আর সত্যই বেণুর আত্মাও তাতেই তৃপ্তি পাবে রেণু ও বীরু সান্ত্বনা পেলে। বীরু তার জবাবে বিনয়কে জানিয়েছে, একদিন কি হত কে জানে, তবে রেণুদিকে সে আবার নূতন করে বিরক্ত করতে চায় না।

বীরুর কথা বিনয়ের মনে পড়তে লাগল—কাজে কর্মে নিজেকে বেণুকে ভুলে থাকতে চায় বুঝি বীরু ? কিন্তু জীবনকে ওর স্বীকার করা উচিত, করতেও হবে। তার হাতে বরং বিনয়ও দিতে চাইছিল তার ব্যবসায়ের ভার।

কর্মিষ্ঠ শচীপ্রসাদ চল্‌ল কারখানায়। বিনয় বেরুবে না এবেলা আর। হেনা বলেছে, নাই বা গেলে আজ কারখানায় দাদা—বৎসরের প্রথম দিনটা, থাকো বাড়ি।

বৎসরের প্রথম দিন ! ১৩৫১ ! গত বৎসরের প্রথম দিনটা বিনয়ের মনে পড়ল—সোনাপুরে সে তখন। হঠাৎ সাইরেন বাজল—শিশুসহ সেই ভিক্ষুণীর দেহ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। তারপর সেই আগুন—চিন্ময়ের মায়ের সেই আহত মূর্তি, হাসপাতালে বিনয় ছুটল।—আর কিছু মনে নেই—আর কি ? অগ্নিদগ্ধ রন্ধনশালায় এক ভিখারিণী মাতা দু'হাতে হাঁড়ির ভাত গিলছে—মনে পড়ল সেই দৃশ্য। তারপর অমন কত দৃশ্য দেখেছে বিনয়—মৃত্যুর কী রূপই না দেখেছে, এখনো দেখছে। দেখা কি শেষ হয়েছে ?

বিনয় হাতে তুলে নিলে দৈনিক কাগজগুলো। সেদিন সোনাপুর ছিল মন্বন্তরের মুখে, আর মাথায় গর্জে উঠেছিল জাপানের বিমান। আজ সমস্ত বাঙ্‌লা মন্বন্তর ও মহামারীর কবলে—বুভুক্ষু ক্ষত-বিক্ষত,

—অথচ টাকার জোয়ার দেশে ;—আর দুয়ারে এসে গেছে জাপানী 'ইম্পীরিয়াল আর্মি'। 'ইম্পীরিয়াল আর্মি'—আবার 'ইম্পীরিয়াল'? বিনয়ের সমস্ত চেতনা ওই একটি কথাতেই জাগ্রত, বিদ্রোহী হয়ে উঠে।

বিনয় কাগজ খুলে নিলে। ··· ইম্ফলে জাপানীরা আসছে, আরবে মার্কিনে ইংরেজে তৈলের মুনাফা স্বীকার করছে, সোভিয়েট শক্তি ফিওডোসিয়া ও সিম্ফারপোল দখল করেছে, রোমে মিত্রশক্তি পৌছলেই ইতালির রাজা সিংহাসন দান করবেন। নূতন বড়লাট উনসত্তর দিনে প্রদেশগুলোতে সফর শেষ করেছে। ··· সরকারী হিসাবে কলকাতার বিভিন্ন হাসপাতালে পূর্বদিন মরেছে ৩ জন, আর ১৬ই অক্টোবর থেকে ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত সরকারী হিসাবে মোট মরেছে ২৪,১০৪ জন পীড়িত নিরন্ন। সাপ্তাহিক মৃত্যু এখনো এ সহরে ১,২০০,—বরাবর এ সময়ে সাপ্তাহিক মৃত্যু থাকে ৫০০এর কম। এই তো ৫ বৎসরের যুদ্ধে সমস্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে মরেছে ৬ লক্ষ আর এক বাঙলায় আমরা এমেরির হিসাবেই গত ৬ মাসে মরেছি ৬ লক্ষ। ... কত ব্যাঙ্কের, কত ইনসিওর অফিসের, কত ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের নববর্ষের নমস্কার, প্রীতিসম্ভাষণ, কলমের পর কলমে বিনয় দেখেছে। টাকার জোয়ার চলেছে ··· এই এক বৎসরের মধ্যে এসব ব্যাঙ্কের অধিকাংশই চালের বাজারে মজুতদারীতে নেমে পড়েছে, এদের ঘরে কাগজের টাকা আজ ছাপিয়ে পড়ছে। দায়ী কি এরাও নয় বাঙলার ত্রিশ লক্ষের মৃত্যুর দায়ে? ... দেখলে বিনয় আবার বাক্‌চিত্র, ছায়াচিত্রেরও মহোত্তর ঘোষণা কত স্তম্ভ ব্যাপী—'হামারী বাৎ' জ্যোতিতে, পূরবীতে ও পূর্ণতে 'সমাধান', রক্সীতে 'কিস্‌মৎ', রূপবাণীতে 'শহর থেকে দূরে', উত্তরায় 'মাটীর ঘর', রঙ্‌মহলে 'চরিত্রহীন', 'ভোলামাষ্টার', শ্রীরঙ্গমে 'বিপ্রদাস', মিনার্ভায় দেবদাস', মায়াপুরীতে 'পাপের পথ' ··· কত পড়বে বিনয়? বিনয় যেন দেখলে নরনারী ছুটছে আমোদের নেশায়!

চোখ পড়ল বিনয়ের 'বাঙ্‌লার নানাস্থানে মহামারী'। সে সংবাদও আছে তাহলে বাঙালীর সংবাদপত্রে! বিনয় চোখ বুলিয়ে গেল—বহরমপুরে বসন্তের প্রকোপ ··· ঢাকা শহরে ··· বাখরগঞ্জ জেলার ত্রৈমাসিক হিসাব ··· শুধু এই? আমেরির অনুপাত নষ্ট হবে না হলে? যে বাঙ্‌লা মন্বন্তরে মরেছে—সে মহামারীতে মরেছে অনেক গুণ। মরেছে সে চট্টগ্রামে, মরছে সে নোয়াখালীতে, মরছে সে মেদিনীপুরে, মরছে সে ঢাকায়, ফরিদপুরে, বরিশালে, শিলেটে। অন্তত দু' কোটি লোক বাঙ্‌লায় মরবার পথে চলেছে। ··· থাক্, বিনয়, থাক্, মহামারীর হিসাব আর দেখতে না—১৩৫০ মন্বন্তরের নামে আমরা উৎসর্গ করেছি, ১৩৫১তে মহামারীর হাতে সঁপে দিচ্ছি বাঙলাকে,—এই তো 'নব বর্ষের শুভ সম্ভাষণ'। ···

বিনয় দেখতে লাগল 'নানাস্থানে বাজারের অবস্থা'। সেন্সরের পাশ করা আর সরকারের জোগানো দর ··· কে বলে, বিনয়, এবার চা'লের দামই শুধু আগুন নয়, সব এতদিনে আগুন হয়ে গেছে। তিন গুণ বেড়ে গেছে জিনিসের দাম—বেড়ে গেছে? তিন গুণ? কাগজের টাকাও চারগুণ বাজারে। যারা বড়লোক তারা আরও বড় লোক হয়েছে। যারা গরীব তারা গরীবই ছিল, হয়েছে আরও গরীব।

টাকার জোয়ার চলেছে—সব কিনবার মত টাকা আছে মানুষের। দেখেছে বিনয়—ছেলে কিনছে, জমি কিনছে, অজস্র কিনছে নারীদেহ ··· শুধু নেই আজ মানুষের বাঁচবার অধিকার, নেই মানুষের দাম—

এই কথাই সাব্যস্থ করে গেল কি ১৩৫০?

•

শৌরীন এল সকালে দেখা করতে। কাগজ রেখে দিল বিনয়।

বিনয়দা' যে! আপনি এসে গেছেন, দেখছি। চলুন তা হলে আজ। আজ সন্ধ্যায় ওরা 'জাতীয় লেখক সঙ্ঘের' উদ্বোধন করছে কি না—পয়লা বৈশাখ আজ।

কারা উদ্বোধন করছে ?

অনিলরা, বাঙলাদেশের সাহিত্যিকরা। ইউনিভার্সিটি প্রফেসররা আছেন, ছাত্ররা আছে ; ডাক্তার মুখার্জি পেট্রোন হবেন। প্রেসিডেণ্ট মিষ্টার সেন—

মিষ্টার সেন ? না, স্যার রাজপ্রসাদ রক্ষিত ?—বিনয় কৌতুক গোপন করে জিজ্ঞাসা করলে।

হাঁ, তিনিও আসবেন। তবে প্রেসিডেণ্ট মিষ্টার সেনই, আমি সেক্রেটারি।

তুমি ? তুমি 'জাতীয় লেখকদের' সেক্রেটারি ?

কি করি, ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু লেখকেরা ছাড়ে না। আমার হাতে এত কাজ, ব্যাঙ্ক, ট্রাষ্ট। 'সাহিত্যের' যুগ্ম সম্পাদক করেছি অনিলকে। তাকে বলি, 'তুমি এসব করো—আর্ট, সাহিত্য'। কিন্তু অনিল বোস বলে, 'দাদা, তুমি না থাকলে হবে না। আসল মানুষ হলে তুমি—'বঙ্কিমচন্দ্রের পরে নতুন করে গোড়াপত্তন করতে হবে তো জাতীয়তার।'

তা ঠিক। কিন্তু তোমাকে জাতীয়তাবাদী বলে ভাবিনি কিনা। তুমি বলতে যে, আমি ন্যাশনালিষ্ট, তুমি সোশ্যালিষ্ট।

হাঁ, তা অবশ্য ঠিক বলেছেন। তবে সোশ্যালিজম অর্থ হচ্ছে ন্যাশানালিজেশন ; মানে, কলকারখানা জাতির সম্পত্তি করা—সব সম্পত্তি হবে জাতির।

যেমন অনেকটা তোমাদের রুশিয়া করেছে, না ?

হাঁ, রুশিয়া করেছে, তবে করেছে তা জার্মানি—জার্মানিই করেছে। কলকারখানা মজুরের নয়, মালিকেরও নয়—জার্মান ফোল্‌কের, জার্মান জাতের।

বিনয় প্রথম বিস্মিত হল, তারপর কৌতুক বোধ করলে। বললে, তা হলে কিন্তু নামটা একটু বদলে রাখা উচিত—'জাতীয় সমাজতন্ত্রী লেখক সঙ্ঘ'। বদলানো যায় না ?

শৌরীন ঠিক বুঝতে পারল না। বললে, হাঁ, কিন্তু তাতে আবার মুরারিবাবুর অমত হতে পারে।

মুরারিবাবুর ? কেন ?

হঁা, তিনি নানাভাবে সাহায্য দেবেন, আর প্রিসাইড্ করছেন। বুঝছেন না ?—সেকালের স্বদেশী তো,—শৌরীন মাথা দেখিয়ে সহাস্যে বললে, কিছু নেই ওখানে। নিরেট। 'জাতীয়' থাকা চাই, নইলে 'স্বদেশী' ওর কাগজের নামে নাম। বুঝছেন তো, কত রকমের লোক নিয়ে আমাকে চালাতে হয়। এই ট্রাষ্টে দেখুন—আপনি ছেড়ে দিলেন কেন ? আমি বলছি, রিজনেব্ল কথা, টাটা-বিড়লা প্ল্যানে আমরা সাপোর্ট না দিয়ে পারি ? অথচ মুরারিবাবুর আপত্তি।

শৌরীন বলে গেল—কি কাণ্ড হবে ! ভারতবর্ষে পথে পথে মোটর, ক্ষেতে ক্ষেতে ট্র্যাক্টর, পাড়ায় পাড়ায় এরোপ্লেন—কত লোহার কারখানা, কাগজের কল, কাপড়ের কল—চাই শুধু ফিন্যান্স—ফিন্যান্স ···

বিনয় শুনতে লাগল।

হেনা এল, শৌরীনের কথা ঘুরে গেল। সে বললে হেনাকে, তার পেয়েছি, হেনাদি'। বিকেলে একটা সভা আছে কিন্তু, তাই বলতে এলাম। আমি সেখান থেকেই গাড়ী নিয়ে ষ্টেশনে যাব—আটটার আগেই যাব—ডিউ টাইম তো আটটা চব্বিশ। কিন্তু ওঁদের আমার ওখানে উঠতে হবে।

হেনা বললে, ছোট মামা আমাদের এখানে উঠবেন জানিয়েছেন। এখানেই উঠুন প্রথমে তাঁরা, তারপরে না হয় তুমি নিয়ে যাবে। আর উষাও এসে যাবে ততদিনে।

শৌরীন কেমন বিপন্ন হল, বললে, সে আসবে না, হেনাদি', এখন। মিসেস্ মিত্র এসেছেন কাল এ-আই-ডব্লিউ-সি' থেকে, বললেন, 'উষা নামল—ওয়ার্ধায়।'

ওয়ার্ধায় ?

হঁা, দেখুন। মিসেস্ মিত্রকে বলেছে, 'ওয়ার্ধার বেসিক্ এজুকেশ্যানের কাজ দেখব'। তা নিয়ে ডেষ্টিটিউট্ হোম গড়বে নাকি এখানে। দেখুন

তার কাণ্ড! সেই কাঙালী ছোঁড়াটা তো পালিয়ে গেল সেবার ওর পড়ার তাড়াতেই।

কবে আসবে তা হলে ঊষা?

কি করে বলব? এদিকে ষ্টুডেণ্ট্‌রা ক'দিন ধরে বলছে, 'মিসেস্ মিত্রকে নিয়ে আসবেন, স্যর, উদ্বোধন সভায়'। আমাদের মেয়ে শাখার প্রেসিডেণ্ট করতে চায়। কি করি বলুন তো হেনাদি'?

বিপন্নভাবে শৌরীন তাকালে হেনা ও বিনয়ের দিকে। বিনয় বুঝতে পারল না কি ব্যাপার। ঊষা ও শৌরীনের মনান্তর যে রেণুকার মৃত্যুর পরে বেড়ে গেছল, তা তার মনেই ছিল না। হেনা বললে, কি করা যায়, শৌরীন? দ্যাখো মামা মামী আসছেন, ওঁরা ঊষাকে বুঝিয়ে পড়িয়ে দেখবেন।

শৌরীন বললে, আমি বলেছি, আপনিও তো দেখেছেন—আনরিজ্‌ন্‌বল আমি নই। প্রদ্যোতের জন্য আমি কম করেছি? সে তো আমারই কাজিন্। থাক্, ঊষা নিজের খুশীতে থাক্,—বাড়ী তো ওরই নামে, বাড়ীতেই থাক্। কাজ যা হয় করুক, একটু বুঝে শুনে করুক—আই ডোণ্ট গ্রাজ মানি। তবে একটু রিজন্‌বল্ হওয়া দরকার তো—লোকে নইলে কি বলে? দশজন আছে—একটা সমাজ আছে, লিটারেরি মেন্‌রা আছে, ফ্রেণ্ডস্ আছে, প্রেষ্টিজ আছে—আর দেখুন তো সবাই কি ভাবছে এখন!

হেনা কথা বললে না। পরে বললে, দ্যাখো, মামা আসুন।

বিনয় বুঝল সব। হেনা উঠে গেল কাজে। শৌরীন আবার বললে, তাড়াতাড়ি উদ্বোধনটা শেষ করতে হবে—শ্বশুরমশায় আসছেন, ষ্টেশনে ঠিক সময়ে যেতে হবে। বলেছিও আমি সেকথা ডক্‌টার মল্লিককে। প্রোগ্রাম লম্বা করি নি। কিন্তু মুশকিল হবে প্রেসিডেণ্টকে নিয়ে—মুরারি সেন একবার দাঁড়ালে বিবেকানন্দ অরবিন্দ থেকে একেবারে বেঙ্গল

টেক্‌সটাইল বোর্ড ও মারাশোল কলিয়ারি, কোনোটাই না বলে ছাড়বেন না। বলে শৌরীন হাসল।

বিনয়ও হাসল—কতদিন মুরারি সেনের বুদ্ধির প্রশংসা শুনেছে সে শৌরীনের কাছেই। বিনয় বললে, ছোট করেই লিখে দিয়ো না তুমি বক্তৃতা?

হেসে শৌরীন বললে, না দাদা, সেদিকে জুটিয়ে ফেলেছে এক ছোকরাকে—ফার্ষ্ট ক্লাশ ফার্ষ্ট ইন্ ইকনমিক্‌স। সেও চিনে ফেলেছে মুনিবকে—কিছু বাদ দেয় না—সব লিখে দেয়—ম্যায়, 'স্বদেশী' ও 'প্রিন্সিপল্'। সবই 'প্রিন্সিপল্' তো, 'স্বদেশী' মুরারি সেনের।—বলে হাসল শৌরীন আবার, যাবেন তো সভায়? শুনবেনই।

বিনয় বললে, আজ আমি যাব না ভাই, কারখানায় কাজ আছে।

শৌরীন বেশি অনুরোধ করতেও ভুলে গেল—কারখানার কথা উঠছে। তাতে যথেষ্ট আগ্রহশীল সে। বললে, টাকা নিন্ না। আমরা ইন্‌ভেষ্ট করছি। ট্রাষ্ট থেকে টাকা দোব। বি রিজ্‌নেবল্, বাড়িয়ে ফেলুন এবার কারখানাটা, বেশ, ট্রাষ্টের টাকা না নেন—আমি নিজে দিচ্ছি। বড় করুন, এই এখন সময়—ওষুধের কারখানার। আমি টাকা জোগাব,—আমি রিজনেবল, মুরারি সেনের মত নই—কত চাই আপনার?

শৌরীন যেন টাকা নিয়ে প্রস্তুত, দিতে পারলে বাঁচে। শৌরীন 'রিজনেবল্' যে।

বিনয় বললে, একটু বুঝে দেখি, সব দেখে নিই আগে।

তা ঠিক।

বিদায় নিলে শৌরীন। দুয়ার থেকে আবার বললে, কিন্তু কারখানার জন্য টাকার দরকার হলে বলবেন। ডোণ্ট বি আন্‌রিজনেবল্।—তারপর তার মনে পড়ল, আচ্ছা সন্ধ্যায় আসছিই তো—শ্বশুরমহাশয়কে নিয়ে। তখন কথা হবে আবার।

বিনয়ের মনে পড়ল—মিষ্টার সেন সেকালের 'স্বদেশী', সবই চলে সেই 'প্রিন্সিপ্‌লে'। শৌরীন একালের 'সোস্যালিষ্ট', সবই চলে তার 'রিজনে',—সর্বদাই 'রিজনেবল্‌' সে।

বিনয় বসে বসে দেখল শৌরীনের স্বপ্রতিষ্ঠিত, সচেতন গতিভঙ্গী। গাড়ীতে গিয়ে উঠল শৌরীন, গাড়ী ছুটল।

বুঝল বিনয়—উষাকে অনেক অনেক দূরে ফেলে চলে গেছে, শৌরীন—কোথায়? সাহিত্যের সভায়—সোসাইটিতে—টাকার বাজারে ···

দুপুরের রৌদ্র তখনো কমে নি—বীরুকে দেখে উল্লসিত হল বিনয়। প্রায় চিনতে পারছিল না, সুটপরা—কে এই স্মার্ট যুবক? 'ওঃ বীরু যে।'—ডাক্তারের কেস্‌-নোট থেকে বিনয় রিপোর্ট তৈরী করছিল—সরিয়ে রাখল সেসব।

বীরু একটু হেসে বললে, হ্যাঁ, কিন্তু বড় বিপদে পড়েছি। আপনার জন্য এ ক'দিন অপেক্ষা করছিলাম। কাজে পড়েছি, নইলে আমিই আপনাকে আনতে ছুটতাম।

কি ব্যাপার বলো তো?

বীরু বললে, বলছি, কিন্তু বেশ গোপনীয়। আর আমাকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করতেই হবে আপনার। কেমন? কথা দিন?

নিশ্চয়। কথা দোব না? তুমি কি অন্যায় কিছু বলবে নাকি?

না।—বলে বীরু বললে, বিপদ এই—রেণুদি' ক্ষেপে গেছে, বিয়ে করতে চায়।

বিনয় বাধা দিয়ে বললে, তাতে বিপদ কি? বিয়ে করো এবার, তাই তো ঠিক কাজ।

বীরু বললে, না, না, তা নয়। মানে, সে বিয়ে করছে—এক মুসলমানকে।

মুসলমানকে।

হাঁ। রেণু যে হাসপাতালের নার্স, রজ্জব সরকার সেখানে ডাক্তার,—হাঁ, রজ্জব সরকার, এম-বি। চেনেন? ভয়ানক ওস্তাদ। আবার ঢঙ করে বলে, 'আমি রাজীব সরকার'। কে বললে, আগে নাকি বিয়েও করেছিল—বাড়ি চুঁচুড়ায় কিংবা মালদহে।—এখন বলুন তো কি করা যায়?

বিনয় চুপ করে বসে রইল। পরে বললে, কিন্তু তুমি কেন রেণুকে বিয়ে করতে চাইলে না তার আগে?

বীরু বিব্রত হল। বললে, আপনি বুঝছেন না, সে কি একটা কথা হ'ত?

কেন নয়? সে তোমাকে ভালোবাসত—

বীরু বাধা দিয়ে বললে, এই বুঝি তার প্রমাণ?

বিনয় বললে, তা'ই। সে ভালোবাসতে চায়, ঘর চায়, সংসার চায়; তা' থেকে তাকে বঞ্চিত করে রাখলে চলবে কেন? সে এসব খুঁজবেই।

বীরু চুপ করে রইল। বললে, আমি কি বলে তাকে বিয়ে করতাম?

ভালোবাসতে বলে—

বীরু বিনয়কে বাধা দিয়ে বললে, আপনি কি যে বলেন ঠিক নেই।

তুমি ভালোবাসতে না রেণুকে?

আহা, সে হল একটা মমতা, করুণা—তাকে আপনি ওরকম কিছু মনে করবেন না।

বিনয় আঘাত পেল। একটু থামল, পরে বললে, বেশ, তাই নয় ঠিক। কিন্তু তুমি তাকে ভালোবাসতে পারতে নিশ্চয়—বিয়ে করলে।

বীরু বললে, কিন্তু বিয়ে হয় কি করে? বাবা-মা অন্য দিকে কথা দিয়ে বসে আছেন।

বিনয় চমকিত হল, এ খবর সে জানত না। বললে, কোথায়?

সে আমাদের পাল্টা ঘর, বেশ সম্মানী লোক। আপনি চেনেনও তাঁদের—বৈকুণ্ঠবাবুর মেয়ে লীলার সঙ্গে।

লীলার সঙ্গে!—বিনয়ের যেন চোখে পলক পড়ল না।

বীরু অন্য দিকে তাকিয়ে রইল। পরে বললে, ওদের ভয়ানক পীড়াপীড়ি। কিন্তু আমি বলেছি, 'এ বৈশাখে হবে না'।

তুমি কথা দিয়েছ তবে?

বাবা দিয়েছেন। বলেন, সকল রকমেই ভালো সম্বন্ধ।

লীলার নামে অত কথা তুমি জেনেও এত সহজে রাজী হলে?

এবার বীরু গম্ভীর হল: দেখুন' ওসব কথার এক বিন্দুও সত্য নয়। প্রমোদ বেল্লিক হতে পারে, কিন্তু লীলা আমাদের কাছে প্রথম রিক্রুট হয় স্বদেশীতে। আমি তাকে জানি। ভালো মানুষ পেয়ে মিছামিছি লোকে তাকে লাঞ্ছিত করে। লোকের মিথ্যা কথায় কান না দেবার মত সাহস আমার আছে। সত্যি না?

বিনয় ধীরে ধীরে বললে, সত্য।

তারপর অনেকক্ষণ পরে বিনয় বললে, আমাকে কি করতে হবে, বীরু?

তা বলতেই আসা। রেণুদি' বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে তাদের নার্সদের এক আস্তানায়। কেউ গেলে দেখাও করে না। আপনি চলুন—বুঝিয়ে নিয়ে আসবেন। এ বিয়ে থেকে ওকে বাঁচান। একটা ভদ্র পরিবারের মান সম্ভ্রম রক্ষা করুন।

বিনয় এবার স্থির চিত্তে বললে, কিন্তু সে বিয়ে করছে—মান-সম্ভ্রম নষ্ট হবে কেন তাতে?

মুসলমান যে—হোক্ না 'লেখাপড়া জানা মডার্ণ ভাবাপন্ন। ওরা বলে 'প্রোগ্রেসিভ'। বলুক—বীরু হঠাৎ বেশ জোর দিয়ে বললে, কিন্তু সে আপনাদের পার্টি মেম্বর নয়, সে খবর আমি নিয়েছি।

বিনয় সচকিত হল।

রেণুর অনুপযুক্ত নয় তো? আর রেণুকেও অমন বুভুক্ষিত চিরকাল থাক্‌তে হবে, তাও আমি সমর্থন করি না।

বীরু কিছুক্ষণ বিনয়ের দিকে তাকিয়ে রইল। শেষে বললে, তাই বলে মুসলমান বিয়ে করবে ?

বিনয় বললে, বীরু, তুমি না কমিউনিষ্ট ?

বীরু বললে, তাই বলে যে সমাজে রয়েছি তার নিয়ম মানব না ? মানুষের মতামত পায়ে ঠেলা যায় না কি ? এই তো সোনাপুরে সীতা ক্ষেপে উঠেছে প্রমথকে বিয়ে করবে, শুনেছেন ?

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বীরু একবার বিনয়ের মুখভাব দেখতে লাগল। তার সে দৃষ্টিও বিনয়ের চক্ষে নতুন। বিনয় বুঝলে তার অর্থ। বললে, তাই নাকি ? তাতে আপত্তি কি, বীরু ? প্রমথ তো মুসলমান নয়।

আপত্তি কি! আপনিও বলছেন—আপত্তি কি ? মানে, আপনার মহত্ত্ব আছে, যতই ছলনা করে থাক আপনাকে সীতা—আপনি তা না বললেন, লোকে কি তা জানে না ? তা ছাড়া, প্রমথ ভালো ব্রাহ্মণ বংশ, সীতারা কায়স্থ ; তার ওপর বিয়ে করবে রেজেষ্ট্রী করে।

বিয়ে করবে তো ?

বিয়ে করলেই হল ? যান সোনাপুর, দেখবেন। কমিউনিষ্ট পার্টি ডুবতে বসেছে। এমনিতেই আমি ওদের প্রোগ্রাম বিশ্বাস করতাম না—ওরা ইংরেজের দালালি করছিল কিছুদিন ধরে—বিট্রেড্ দি রিভোল্যুশান।

বিনয় বাধা দিয়ে বললে, ওসব থাক্ বীরু, আমি রিভোল্যুশানের ট্রেডই করি না, তা রিভোল্যুশান বিট্রেড্। কিন্তু আমাকে দিয়ে এ কাজে তোমার কোনো সাহায্য হবে না। আমি রেণুর বিবাহে বাধা দিতে পারব না।

বীরু বিস্ময়ে এবং দুঃখে নিষ্পলক হয়ে বসে রইল। বললে, আপনিও আমাকে নিরাশ করলেন, ডাক্তারদা'।

আমি আমার নিজের কাছেই একটা নৈরাশ্যস্বরূপ—বিনয় বললে ইংরেজিতে। বললে আবার, নাও, চা খাও, বীরু।

বীরু ঘড়ি দেখে বললে, কিন্তু—আমার সময় নেই যে।

তবু খাও। যাবে কোথায়?

আমেরিকান্ সাহেবদের সঙ্গে কথা হচ্ছে। আমি ওদের কাজ কিছু কিছু পেয়েছি এ অঞ্চলে। যুদ্ধের পরে ওরা প্রকাণ্ড কল-কারখানা গড়বে। মোটরেরও কারখানার কথা হচ্ছে। সব কথা ঠিক হলে মিষ্টার চৌধুরী আর আপনার সঙ্গে সব বিজনেস্ বন্দোবস্ত করব। ওদের সঙ্গে এনগেজ্‌মেণ্ট ফেল করতে চাই না, চা'রটায় পৌঁছতে হবে।

বেশ, চা'টা তাড়াতাড়ি শেষ করে যাও।

বীরু তাড়াতাড়িই চা খেয়ে নিলে।

আর একবার রেণুকে ফেরাবার জন্য বিনয়ের সাহায্য ভিক্ষা করে বীরু বিদায় নিলে—পারলে রাত্রিতে আবার সে আসবে। দেখুক বিনয় ভেবে কথাটা।

চমৎকার সচেতন দৃঢ় ও স্বচ্ছন্দ গতি—বিনয় বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল। বিনয়ের কি জানি কেন মনে পড়ল আবার শৌরীনকে—এমন স্বাচ্ছন্দ্য আর শক্তি নেই তার গতিতে। জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত আজ শৌরীনও, সম্পূর্ণ স্বার্থ-সচেতন—যেন নতুন দিনের মুরারি সেন সে। কিন্তু বীরু যেন আরও তেজোময়, সচেতন—আর চতুরও আজ সে। কেমন সীতার কথা পাড়লে —যেন বিনয় পায়নি সীতার নিজের লেখা চিঠি। বীরুও চতুর হয়ে উঠছে ··· সেই বীরু সেন—যাকে বিনয় একদিন সোনাপুরে প্রথম দেখেছিল—রৌদ্রে পোড়া মলিন দেহ—কিন্তু স্বাস্থ্যবান—কমিউনিষ্ট কর্মী, আর আজ দেখছে, সুপুষ্ট সুদৃঢ় যুবক, পুষ্টিকর আহারে পালিত সৌন্দর্যময় দেহ—কর্মিষ্ঠ ব্যক্তিত্ববান মানুষ—যেন শচীপ্রসাদের সগোত্র! তেমনি গতি, তেমনি কর্মিষ্ঠ! ··· এই একটা বৎসরের মধ্য দিয়ে—এই যুদ্ধের ঠিকাদারী, মন্বন্তর, মহামারীর মধ্য দিয়ে—জন্মলাভ করেছে এক নূতন ধনিক, নূতন মালিক—শৌরীন দত্ত, বীরু সেন ···

হেনা এসে বসল। বললে, ঘুমুলে না দুপুরে?

না, এবার বেরুব।—বিনয় সস্নেহে বললে।

এত রোদ্রে? কোথায়?

অমিত আর সুধার সঙ্গে দেখা করব।

ছোট মামা-মামী আসছেন সন্ধ্যায়।

মনে আছে। কিন্তু শৌরীন যে অন্য মানুষ হয়ে গিয়েছে।

হেনা ধীরে ধীরে বললে, উষাও তো বদলে গিয়েছে, কে জানত সে এমন ডুবে যাবে কাজে।

মিথ্যা কথা নয়—ভাবল বিনয়—উষাও এই একটা বছর কেমন হয়ে গিয়েছে। হেনা একটু পরে বললে, এবার বিশ্রাম কর দাদা এখানে ক'দিন।

কেন রে?

আস্তে আস্তে হেনা বললে, তুমিও যে অন্য মানুষ হয়ে যাচ্ছ? সেই বর্মা থেকে ফেরা অবধি তুমি একদিন খেলোনি, খেলাও দেখোনি; একদিন বায়স্কোপে যাও নি, কোনো গান বাজনায়, আমোদ আনন্দে যাও নি—কেবল ঘুরেছ আর ঘুরেছ। আর আজ দেখেছ তোমার চেহারা? রঙ পুড়ে তামাটে হয়ে গেছে, চোখের কোনে কালি পড়েছে, চুল উঠে যাচ্ছে, হাতগুলো পর্যন্ত শক্ত কঠিন হয়ে উঠ্‌ছে—যেন মার্কামারা কমিউনিষ্ট—সেই তোমার শিবুদা'র মত।

বিনয় হেসে উঠল, তোমার যেমন কথা। হাত আবার পুরুষের নরম থাকে নাকি? রাখো, একটু স্নান করে আসছি বেরুবার আগে।

স্নান করতে করতে বিনয়ের হাঁসি পেতে লাগল হেনার কথা মনে করে। সে ফিরে এসে আরশীতে নিজেকে দেখে আবার হাসতে লাগল। সত্যি বলেছে হেনা—সেই 'ডক্‌টর বিনয় মজুমদার' আর নেই; এ যেন কোন রৌদ্র-দগ্ধ, ক্ষুধিত, চির উত্তেজিত রাজনীতিক কর্মী। ··· তুমি রাজনীতিক কর্মী, বিনয়? ··· এই এক বৎসরের মধ্যে—১৩৫০ এর মধ্য দিয়ে—মুনাফার

নূতন কাণ্ডারীই জন্মে নি তা হলে শুধু? তোমার মত চেতনাশূন্য কর্মীদেরও নবজন্ম হয়েছে তবে? …

কেমন আত্মসমাহিত স্থিরপদে বীরু গেল মার্কিনদের সঙ্গে কথা বলতে—নতুন কারখানা গড়বে সে, সোনাপুরের জমিহারাদের জমিতে সে গড়বে কলখোজ্, করবে কো-অপারেটিভ্ ফার্মিং, স্যাভয় ঘাস হবে, কাগজের কারখানা বসবে, ট্র্যাকটরে চাষ হবে, মার্কিন এয়ারফিল্ডের ষ্টেশন হবে,—কত আশা বীরুর, কত স্বপ্ন,… নতুন শচীপ্রসাদ চৌধুরী যেন—সেই বীরু আর নেই … সেই বীরু নেই—সেই বিনয়ও নেই? …

নতুন পাওয়া সত্যের মত কথাটা বিনয়কে যেন উচ্ছসিত করে তুলল। সত্যি বলেছে হেনা—বিনয়ের দেহ পর্যন্ত পরিবর্তনের চিহ্ন বহন করছে। আর তার মনই কি রয়েছে অপরিবর্তিত? তার কেন, কে রয়েছে অপরিবর্তিত আর অপরিবর্তনীয়? হেনা? হেনাই বা কি? এই তো দেখেছে বিনয় হেনাকে—ইরাকে হারিয়ে সে আরও মমতাময়ী হয়েছে, গম্ভীর হয়েছে, গভীর হয়েছে। দেখছে শচীদা’কে—শোকের প্রথম আঘাত কাটিয়ে আবার কার্যক্ষেত্রে অগ্রসর হয়ে যাচ্ছে শচীপ্রসাদ। কর্মী মানুষ সে। কিন্তু আজ আর তার মুখে সে আশার আলো নেই—‘কয়লা নেই, ফ্যাক্টরি বন্ধ হচ্ছে। কাজ কমছে। অর্ডার কম’—বলে শচীদা’। ‘আমেরিকা থেকে জাহাজ বোঝাই মাল আসছে। আমি বলি, সাইকেল তৈরী করি, দেশের লোকের ব্যবহারের জিনিস তৈরী করি। ওরা বলে, না, সে জন্য কয়লা এখন দেওয়া যায় না। না, এ দেশে স্বাধীন না হলে কলকারখানাও খোলা যাবে না।’ এই সুর শচীদার মুখে? ‘মিষ্টার এস, পি, চৌধুরীর’ মুখে? … কিন্তু অন্যেরা? মথুরাদাস টেক্‌সটাইল বোর্ডে কর্তা হয়ে বসেছেন। মুরারি সেন বেঙ্গল টেক্‌সটাইল বোর্ডে চেপে বসেছেন। শৌরীন—সেই একদিনকার ‘সোস্যালিষ্ট’ শৌরীন—ব্যাবসা তার ফেঁপে উঠেছে, ব্যাঙ্ক আছে, ট্রাষ্ট আছে, ‘জাতীয়’ সাহিত্য গড়ছে; আর উষার সঙ্গে

প্রস্তোতকে উপলক্ষ করে যে মতান্তর মনান্তর হল, আজ তা গৃহান্তরে শেষ হচ্ছে। সেই শৌরীন নেই, সেই উষাও নেই। ... কেই বা আছে ঠিক সেই? এই তো দেখল বিনয় বীরুকে। বীরুই হয়ে গেছে এত পরিবর্তিত—সেই কমিউনিষ্ট বীরু। ... অথচ যশোদা চৌধুরী তো পরিবর্তিত হয় নি—সে হোসিয়ারী মিল খুলবে, ব্যাবসা খুলবে; আবার প্রমথদেরই সঙ্গে খুলছে তাঁতীদের কো-অপারেটিভ, জেলেদের কো-অপারেটিভ। বসন্ত ঘোষের সঙ্গে কল্পনা করছে—নতুন এগ্রিকালচ্যারাল ইস্কুল—মেয়ে ইস্কুলের কথা। 'এককালে আমি স্বদেশী ছিলাম, মাষ্টার ছিলাম' বলে যশোদা চৌধুরী। 'মাষ্টার'...কিন্তু কোথায় প্রভাত চৌধুরী আজ? কে জানে কেমন আছেন তিনি? কোথায় বা কোন্ ইস্কুল? কোথায় কে? ডুবে যাচ্ছেন শাহেদুদ্দীন ··· বিনয় জেনেছে, ভাবীজী নেই। লিখেছিলেন শাহেদুদ্দীন সে সে খবর দিয়ে, 'যারা রয়েছে বিনয় অন্তত দেহে আর মনে তারা যে মানুষ হবে, এমন সম্ভাবনাই বা কই? কই সে দেহের ওষুধ? কই সে মনের ওষুধ? ডাক্তারখানা কই? ইস্কুল কই?' ··· ভাবীজী নেই—অর্ধেক পৃথিবী শূন্য শাহেদুদ্দীনের কাছে—নিরাশা তার চোখে। ··· নেই আরও কত কে? নেই বাঙ্গ আম্মা, নেই দয়ারাম, নেই শিবুদা'। বিনয়ের অতি প্রিয় নীরদ, সে বিকৃত মস্তিষ্ক হয়ে গেল। কেশববাবু বাধ্য হয়ে পেনশেন নিয়েছেন; আবার মাসীমা এসে গেছেন সীতাদের সঙ্গে—শিবুদা'র মুখ তিনি ভুলতে পারেন না যে। এল বিজয় চক্রবর্তী, বেরিয়ে এল রোগীর সেবায় গান্ধীবাদী সুধীর বোস—মানুষকে বাঁচাবার কাজে তিনি দূরে থাক্‌বেন কি করে?—আর অমনি হ'ল তার জেল।··· এলো না তবু কতজনা আরও—বৈকুণ্ঠবাবু, সুরেশ দত্ত, জাহেদ আর হাফেজ। বড় হয়ে উঠছে তারা ব্যাঙ্কে, ব্যবসায়, নতুন নতুন চাকরির মালিক হয়ে। বড় হয়ে উঠছে কতজনা—ইদ্রিস কণ্ট্রাকটার জমি কিন্‌ছে, নারিকেলের দড়ী আর তেলের কারখানা খুলবে, ট্যানারি দেবে। ... বড় হয়ে উঠ্‌ছে কতজনা—টাকার

জোয়ার চলেছে, ব্যাঙ্কে ব্যাঙ্কে টাকা, কত নতুন ব্যবসা আর কত নতুন আয়োজন—আর কত ক্ষুধা, রোগ, মহামারী, মৃত্যু—মাতৃত্বের অপমৃত্যু, নারীত্বের সমাধি ···

ডুবে গেছে চাষী—ডুবে গেছে মধ্যবিত্ত, সভ্যতা চূর্ণ হয়ে গেছে—রাজেন বাড়ুজ্জে, মফিজ, প্রভাত দত্ত, সীতা রায়, মাধব পণ্ডিত ··· নিবে যাচ্ছে শিক্ষার দেউটি বাঙলা দেশে। বেতনের বান্দা আজ সবে, ওয়েজ স্লেবস্—মেয়ে পুরুষে সমানে পথে বেরিয়েছে, ট্রামে ভিড় করছে ···

এখানে ছিলেন ? কে প্রশ্ন করলে বিনয়কে ট্রামে। কাণ্ডাক্টর।

ওঃ, নারায়ণ না ? হাঁ, কেশববাবুর ভাগ্নে ।—তারপর, কেমন আছ ?

বেশি ভিড় নেই এসপ্লানেডগামী ট্রামে নারায়ণ বললে, মামীমার কথা, শুনেছেন ? কাজ করছেন প্রমথদাদের সঙ্গে। মামা রাগ করেন। বোঝেন না, আমি তাঁকে বলেছি, আমাদের আছে কি যে, আঁকড়ে থাকবেন ? মন্বন্তর মহামারী রাখল কি ? 'বলেছি মামাকে'—নারায়ণ বললে—'মজুর তো সবাই ; তবে সাহস করে সেই কথাই মেনে নেব না কেন ? কণ্ডাকটার হয়ে এই তো ভালোই বেঁচে আছি—কাজ করি, খাটি, খাই,—লজ্জা কি তাতে ?' বরং গর্বই আছে—তুনিয়ায় আমরাই কলকাঠি। আর আজ নয় কাল আমরাই নেব সেই কলকাঠি নিজ হাতে ।

শুনতে শুনতে চলল বিনয় সকৌতুকে। কি বলে নারায়ণ গাঙ্গুলী ট্রাম কণ্ডাক্টর ? ···

এমনি কথাই বলেছিল সেদিন দ্বিজু খড়গপুরে । বিনয়কে দেখে দ্বিজু সিগারেট দূরে ফেলে দিলে। বললে, 'ফৌজের তুটো কারখানা থেকে তাড়িয়েছে, এসেছি রেলওয়েতে মিস্ত্রী ফিটার। আমরা মজুর, মিস্ত্রী ; গড়ব বিপ্লব, গড়ব নতুন পৃথিবী—

দ্বিজু ছিল প্রমথদের দলের ছাত্র ; সে বলতে পারে ওসব বুলি। কিন্তু কি বলে এই নারায়ণ গাঙ্গুলী—গ্রামেই সে মানুষ, পরিবার আছে, পরিজন আছে ?

গাড়ী বদলাতে হল বিনয়ের এস্‌প্লানেড্‌এ। একি কাণ্ড! এ যেন আবার মানুষের প্লাবন! বিনয় উঠে বসেছিল কোনো রকমে। কেউ দরজা দিয়ে, কেউ জানালা দিয়ে উঠতে লাগল। ভিড়, ভিড়, ভিড়— মারামারি হুড়োহুড়ি। এরই মধ্যে মেয়েরাও ঠেলে ঠুলে উঠছে আবার। জনকয় মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে ঠাসাঠাসি ভিড়ে। বিনয়ের নিকটের সীটে কে বললে তার সুটপরা বন্ধুকে, এই সিট্‌ দিবি না? লেডিজ্‌—

উপবিষ্ট বন্ধু বললে, রাখ্‌! ওরা সাপ্লাইয়ের মেয়ে।

'সাপ্লাইর মেয়ে।' বিনয় যেন অস্বচ্ছন্দ বোধ করছিল, দাঁড়িয়ে আছে মেয়ে—ভিড়ে টাসাঠাসি। বিনয় দাঁড়িয়ে সাম্‌নেকার মেয়েটিকে বললে, বসুন।

না, না, থাক।

কিন্তু কে এ? গীতা না? গীতা রায়?

বিনয় বললে, গীতা!

ডক্‌টার মজুমদার!

বসো।

আপনি বসুন।

বসো বলছি তুমি—লেডিজ্‌—

লেডিজ্‌ আবার কি? 'সাপ্লাইর মেয়ে'—খেটে খাই—

বিনয় তার কথার পরিহাসে ও স্পষ্টতায় সচকিত হল। এত স্পষ্টভাষী হয়েছে গীতা! ভিড়ের মানুষ তাকিয়ে রইল গীতার মুখের দিকে।

তা বুঝেছি। কিন্তু বসো তুমি, নইলে আমি কথা বলব না।

হেসে গীতা বসল, বললে, আমার কিন্তু খারাপ লাগে না। খাট্‌ছি, খাচ্ছি,—বাঁচছি; তা না হলে চলত কি করে? জানেন—পরীক্ষা দিয়ে দিয়েছি? শেষ হল এই তিন দিন।

বি-এ পরীক্ষা না? কি করে দিলে? কেমন হল?

ছুটি পেয়েছিলাম বিনা মাইনেয় পনের দিন। পাশ হয়ে যাব বোধ হয়।

মা কেমন? ওরা—ছোট ভাই আর বোন?

মায়ের মাথার একটু গোল রয়ে গেছে। আর নুটু ছুট্‌কে ভরতি করিয়ে দিইছি ইস্কুলে এখানে—মানুষ হতে হবে তো।

বিনয় সপ্রশংস নেত্রে তাকিয়ে রইল গীতার মুখের দিকে।

গীতাই আবার বললে, সোনাপুর থেকে এলেন?

না, যাচ্ছি। দিন পাঁচ সাত পরে।

দিদির খবর জানেন?

জানি, খুশীই হয়েছি—তোমরা হও নি?

হয়েছি বৈ কি? বলবেন দিদিকে, বিয়ের সময় যেতে পারব না—অনেক খরচ তো। তবে একবার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে আসতে পারবেন না ওঁরা, দিদি আর প্রমথবাবু? মা দেখতেন।

নিশ্চয় আসবে—আমিই নিয়ে আসব।

বেশ। আর বলবেন ওঁকে, এদিক ভাবতে হবে না। আমি চালিয়ে নেব—শর্টহ্যাণ্ডটা শিখে ফেলব। বেশি খাটতে হবে—তা খেটেই তো খেতে হবে। তাতে আমি ডরাই নে—ডরটা কি পৃথিবীতে মানুষের?

এসে গেছে ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট্, নামল বিনয়।

‘ডরটা কি পৃথিবীতে মানুষের?’ সহজ, আশ্চর্য কথা এক সহজ বালিকার। এই পৃথিবীতে বিনয় দেখছে দুরন্ত অন্ধকার গর্জে উঠছে চারদিকে—সমাজ, সংসার, শিক্ষা, মায়া, মমতা, সব তলিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারে। আর সেই বালিকা সীতার বালিকা বোন—‘সাপ্লাইএর মেয়ে’ গীতা—ভাই নিয়ে, বোন্ নিয়ে, মাকে নিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে—ভিড়ের ঠাসাঠাসি গাদাগাদি সব তুচ্ছ করে বলছে, ‘ডরটা কি পৃথিবীতে মানুষের।’ … না, নির্ভয় মানুষও জন্ম নিয়েছে এই অন্ধকারের মধ্যেই—দ্বিজু, নারায়ণ, গীতা …

অমিত বললে, সুধা আসছে স্নান সেরে। আজ আমাদের একটা জলসা আছে—মজুরদের জলসা। কর্পোরেশনে ওরা জিতেছে নির্বাচনে!

বিনয়ের মনে পড়ল। বললে, আচ্ছা, তাতো জিতলে, কিন্তু কি বুঝছ বলো তো? সামনে কি দেখছ? মন্বন্তর মহামারী, জাপানের বঙ্গাভিযান?

হয়ত; কিন্তু শুধু তাই নয়।

আর কি?

দেখছি মুসলমান জনসাধারণের এই সচেতনতা—তাদের নেতাদের উপর চাপ। দেখছি, ইউ, পী'র কংগ্রেসীদের মুসলমানদের আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকার মেনে নেওয়া; দেখছি মিসেস্ নাইডুর চাপা-না পড়া মতবাদ; এ্যাসেম্ব্লিতে দেখেছি কংগ্রেস-লীগের মিলন—বুঝছি যদি কংগ্রেস নেতারা বাইরে আসেন, আজ দেশের মোড় ঘুরে যায়।

'যদি'—

হাঁ, 'যদি'। বিদেশে টিটো দাঁড়াচ্ছে, হুগল দাঁড়াচ্ছে, ইতালির পথ উন্মুক্ত হচ্ছে—আমাদের পথ আমরা যদি উন্মুক্ত করি তবেই না আজ মুক্তি!—পৃথিবী-জোড়া মানুষের জয়যাত্রাও তবেই না সার্থক হয়! কিন্তু 'যদি'—নইলে কি হতে পারে আবার জানো? মহামারী আর মারামারি! —স্বাধীনতার এই সুযোগ অমনি যাবে।

সুধা এসে গেছল। বিনয়কে দেখে খুশীতে তার চোখ ভরে উঠল।

জানতাম, তুমি আসবে শীঘ্রই। কিন্তু এসে ভালো করেছ আজ। চল জল্‌সায়।

তোমরা জলসা করো এখনো?

অমিত বললে, হাঁ, 'এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গে ভরা'। কিন্তু দেখবে জাত মেরে দিয়েছি আমরা কালচারের—ভদ্রলোকের জিনিস রইলো না আর গান-বাজনা। আমরা তাকে একেবারে ছোটালোকের জিনিস করে

ফেলেছি। সোজা কথা—দেখাই মৃত্যুর নাচ—আর গাই নবজীবনের গান।

কিন্তু 'নবজীবন' দেখছ কোথায় তোমরা?

কেন? সর্বত্র। তুমি তা দেখছ না? কি দেখছ তবে?

বিনয়ের মনে পড়ল—গীতা, দ্বিজু, নারয়ণ গাঙ্গুলী ··· কিন্তু বিনয় বললে, সেই চাঁপাডাঙ্গার মাঠে বিহারী সেন বলেছিলেন, বাঁচবার পথ নেই বাঙলার আর। তার আর্থিক বনিয়াদ একেবারে ঘুণে-ধরা। যুদ্ধ এল, একটু নাড়া পড়ল, একেবারে ভেঙে পড়ল সেই জীবন। তারপর আমি কি দেখছি জানো? দেখছি মৃগয়া। অনেকে অনেক কিছু বলে, দুঃস্থ, বুভুক্ষু; দুর্ভিক্ষ মন্বন্তর—আমার কি মনে হয় জানো? যত দেখছি, মনে হয়—মৃগয়া—মুনাফার মৃগয়া। দেশ জোড়া এক মুনাফার মৃগয়া চলেছে—দয়া, মায়া, মমতা, কিছু নিই আর—আর দেখতে দেখতে সেই মুনাফার মৃগয়া হয়ে পড়েছে মানুষের মৃগয়া আজ এ দেশে।

অমিত স্মিত হাস্যে বাধা দিয়ে বললে, সব দেশে—

বিনয় থেমে বললে, অন্য দেশের কথা জানি না।

না জেনে পার? তাদের মুনাফার মৃগয়াই তো গোলাবারুদে, কামানে-বিমানে সর্বগ্রাসী যুদ্ধে পরিণত হয়েছে।

বিনয় একটু ভাবলে, বললে, তা ঠিক।

অমিত সুধাকে বললে, না, সুধা, আমার আর আশা নেই, দেখছি।—তোমাকে হারাতেই হল। বিনয়ও কমিউনিষ্ট না হয়ে ছাড়ছে না।

বিনয় অপ্রতিভ হয়ে গেল আবারঃ কেন? এতে কমিউনিজমের কি দেখলে।

অমিত হাসতে লাগল, বললে, বীজমন্ত্র।

বিনয় তাকিয়ে রইল সুধার দিকে।

সুধা বললে, এটাই কমিউনিষ্টদের মূল কথা—এই সভ্যতা আজ শুধু একটা মুনাফার মৃগয়া।

বিনয় একটু নীরব রইল। তারপর বললে, না, আমি কমিউনিষ্ট নই তবু। কারণ আমি আরও কিছু চাই—আরও কাউকে ভালোবাসি, শুধু তোমাকে নয় সুধা, শুধু তোমাকে নয় অমিদা'—আমি আরও কাউকে ভালোবাসি।

অমিত সকুতূহলে বললে, কাকে, বিনয়, কাকে?

বিনয় গম্ভীরভাবে বললে, আমি ভালোবাসি ভারতবর্ষকে।

কাকে বিনয়?—তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অমিতের চোখে জ্বলে উঠল, সুধার চোখ নেচে উঠল।

বিনয় যেন অপ্রতিভ হল। তবু বললে, ভারতবর্ষকে! তোমরা তাকে চাও?

'ভারতবর্ষকে!' 'ভারতবর্ষকে!' ···অমিতের সেই শীর্ণ ওষ্ঠে কোন অস্ফুটবাণী কাঁপতে লাগল এক অদ্ভুত হাসির সঙ্গে; চক্ষু তার মেদুর হয়ে হয়ে উঠল এক স্বপ্নে।

অপরাহ্ণের রৌদ্রাভা অমিতের মুখে—একি হাসি, একি দৃষ্টি, একি জ্যোতি সেই মুখে! কোথায় পড়েছিল বিনয় consumption of the soul—এ যেন সেই আত্মার রক্তঢালা বেদনাময়হাসি।

বিনয়ের মন মেনে মিলে তাঁরা আত্মা প্রত্যক্ষ করেছে এক ভারত সন্তানকে—যে ভরতবর্ষের স্বাধীনতার কথা ভেবে পথে বেরিয়েছে; আর আজও নির্বাসিতের সেই মর্মদাহ নিয়ে অপেক্ষা করছে তার স্বপ্নের ভারতবর্ষকে দেখতে।

'ভারতবর্ষকে!' ··· স্বপ্ন ভরা চোখে বলতে বলতে যেন আবার চিরদিনকার কৌতুকে ফিরে এল। অমিত উত্তর দিতে গেল—

কিন্তু বিনয় আর উত্তর চায় না। সেই মুখ, সেই হাসি, অমিতের সেই স্বপ্নভরা, বেদনাভরা চোখ থেকে বিনয় ততক্ষণে পেয়ে গেছে তার সমস্ত সংশয়ের উজ্জ্বল উত্তর।

শেষ